উৎসর্গ

যাঁহাদিগকে
জগতের জনকজননীস্বরূপ বলিয়া
জানিতে পারিলে জীবগণ
পরমাশান্তিলাভ করে
আমাদিগের সেই জনকজননী
৺শ্রীহীরালাল ঘোষ
এবং
৺শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর
শ্রীচির উদ্দেশে
এই অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থখানি
উৎসর্গীকৃত হইল।

নিবেদন।

ভগবদিচ্ছায় আজ বহুদিনের চেষ্টায় অদ্বৈতসিদ্ধির মিথ্যাত্ব-মিথ্যাত্ব পর্য্যন্ত অংশটী অনুবাদ, টীকা এবং তাৎপর্য্যসহ প্রকাশিত হইতে চলিল। টীকাটী মূলমাত্র বুঝিবার উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছে। যাঁহারা অধিক জানিতে চাহিবেন, তাঁহারা সিদ্ধিব্যাখ্যা, লঘুচন্দ্রিকা ও বিট্‌ঠলেশীয় মধ্যে তাহা দেখিতে পাইবেন।

এই গ্রন্থ মাধ্বসম্প্রদায়ের মহাধুরন্ধর তার্কিক পূজ্যপাদ ব্যাসতীর্থ স্বামী বিরচিত ন্যায়ামৃত নামক গ্রন্থের প্রত্যক্ষর প্রতিবাদ। পূজ্যপাদ ব্যাসতীর্থ স্বামী অদ্বৈতসিদ্ধান্তের গ্রন্থসমুদ্র মন্থন করিয়া এই ন্যায়ামৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের সকল কথাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অতি নিপুণতা সহকারে খণ্ডিত হইয়াছে, পাঠকালে মনে হয়, ইহার আর উত্তর নাই। কিন্তু অদ্বৈতসিদ্ধির চমৎকারিতা এই যে, ইহা পাঠকালে ন্যায়ামৃতের সকল আপত্তিই স্বপ্নরাজ্যের ন্যায় বিলীন হইয়া যায়। মনে হইবে—ন্যায়ামৃতকার এরূপ অসঙ্গত কথা বলিলেন কি করিয়া?

যাহা হউক, ন্যায়ামৃতকার স্বীয় সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে এই সকল আপত্তি উদ্ভাবন করেন নাই। কেবলমাত্র অদ্বৈতমতের খণ্ডনমানসেই তিনি ন্যায়ামৃত গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। এজন্য এই গ্রন্থপাঠে দ্বৈতবাদী মাধ্বসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত বিশদরূপে বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু পূজ্যপাদ মধুসূদনসরস্বতী মহাশয় মাত্র স্বসিদ্ধান্তব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে উক্ত ন্যায়ামৃতের সকল আপত্তিই নিরস্ত করিয়াছেন। তিনি এমনভাবে স্বসিদ্ধান্তের বর্ণন ও ব্যাখ্যান করিয়াছেন যে, তাহাতে কোনরূপ পূর্ব্ব-

পক্ষেরই অবসর থাকিতে পারে না। আর ইহাতে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তাও হইয়াছে। ইহাতে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের প্রায় কোন কথাই পরিত্যক্ত হয় নাই, প্রত্যুত সমস্ত কথাই অতি বিশদভাবে বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রতিপক্ষকে আক্রমণ বা অনপেক্ষিত কথার অবতারণা করিয়া পূর্ব্বপক্ষনিরাসের চেষ্টা করা হয় নাই। আর তাহাতে প্রসঙ্গতঃ পূর্ব্বপক্ষসমূহ একেবারে নির্ম্মূলিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ন্যায়ামৃত গ্রন্থের রচনা এ জাতীয় নহে।

তাহার পর অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থের রচনাভঙ্গি দেখিলে ইহাই সুস্পষ্ট হয় যে, স্বীয় সিদ্ধান্তের রহস্য উদ্ঘাটনই পূর্ব্বপক্ষনিরাসের একমাত্র উপায় রূপে অবলম্বিত হইয়াছে।

ন্যায়ামৃতগ্রন্থে প্রদর্শিত আপত্তি লৌকিক বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থের বক্তব্য কিন্তু শাস্ত্রোজ্জ্বলিত প্রজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্য পূর্ব্বপক্ষ যেমন অনায়াসবোধ্য, সিদ্ধান্তপক্ষ সেরূপ নহে। যাঁহার বেদান্তশাস্ত্র বিশেষভাবে অনুশীলন করা আছে, তিনিই ইহার রহস্য যথার্থ উপভোগ করিতে পারিবেন।

ন্যায়ামৃতগ্রন্থে সর্ব্বত্রই দেখা যায়, অদ্বৈতসিদ্ধান্তের রহস্য না বুঝিয়াই পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করা হইয়াছে। যেমন, শুক্তিতে রজতভ্রমের বাধজ্ঞানে ব্যাবহারিক রজততাদাত্ম্যাপন্ন প্রাতিভাসিক রজত নিষেধ্যরূপে বিষয় হইয়া থাকে। এই অদ্বৈতসিদ্ধান্তের অভিপ্রায়টী ন্যায়ামৃতকার না বুঝিয়াই ব্যাবহারিকরজতের নিষেধ করা হয়, মনে করিয়া অদ্বৈত মতের উপর দোষারোপ করিয়াছেন। তদ্রূপ সৎ ব্রহ্ম ও অসৎ বন্ধ্যাপুত্র ভিন্ন যে শুক্তিরজতস্থানীয় মিথ্যারূপ একটী তৃতীয়কোটি আছে, তাহাও ন্যায়ামৃতকার অস্বীকার করিতে চাহেন। শুক্তিরজত সৎও নহে অসৎও নহে, ইহা স্বীকার না করিয়া তাহাকে অসৎ কোটির মধ্যেই পরিগণিত করিবার জন্য তিনি আগ্রহান্বিত। বস্তুতঃ সকল বিবাদের

নাথ ঘোষ মহাশয় এই কার্য্যে অত্যন্ত উৎসাহী হইয়া আমাকে প্রবৃত্ত ও উৎসাহান্বিত করিয়াছিলেন। একমাত্র তাঁহারই উৎসাহ ও তাঁহার প্রাণপাত পরিশ্রমে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। রাজেন্দ্র বাবু বৃদ্ধবয়সে যেরূপ উৎসাহ ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা যুবকেরও অসাধ্য।

কিন্তু গ্রন্থসঙ্কলিত হইলেও ইহার প্রকাশ একরূপ অসম্ভাবিতই ছিল। কারণ, এই গ্রন্থপ্রকাশে কোন লৌকিক লাভের সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ, এই গ্রন্থের 'মুদ্রণাদিকার্য্য বহু অর্থব্যয় ও পরিশ্রমসাধ্য। এইরূপ কার্য্যে কোন সাধারণ ব্যক্তিই অগ্রসর হইতে পারেন না। কিন্তু পরমকল্যাণভাজন শ্রীমান্ ক্ষেত্রপাল ঘোষ মহাশয় কেবল শাস্ত্ররক্ষা-মানসে অর্থব্যয়ের দিকে লক্ষ্য না করিয়াই এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ইতঃ পূর্ব্বে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সমগ্র গ্রন্থ-প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া দুইভাগে তাঁহার অমূল্য উপদেশপূর্ণ প্রায় ৪২খানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে সেই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত অদ্বৈতবাদের চরম গ্রন্থ এই অদ্বৈতসিদ্ধি প্রচার করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টি এবং বঙ্গবাসীর মুখ উজ্জ্বল করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বেদান্তশাস্ত্রের রক্ষাসাধনও করিলেন। আশীর্ব্বাদ করি—ইঁহারা দুইজনেই ও দীর্ঘজীবনলাভ করিয়া এইরূপ সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকুন এবং ভগবচ্চরণে অচলাভক্তি সম্পন্ন হউন।

শ্রীশ্রীবাসন্তী পূজা
১২ই চৈত্র, ইং ২৬শে মার্চ
সন ১৩৩৭, ইং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ।

অনুবাদক
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

সম্পাদকের নিবেদন।

পূর্ণকামের সকল কামনাই যেমন নিত্য পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, পূর্ণকামের ভক্তেরও তদ্রূপ কোন কামনাই অপূর্ণ থাকে না। ভগবানের রাজ্যে মানব যাহা চায়, তাহাই পায়। বিলম্ব বা শীঘ্রতা কেবল চাহিবার দোষ গুণে হয়।

আমাদের বহুদিনের চেষ্টা, আজ ভগবদিচ্ছায় অংশতঃ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইল। অদ্বৈতসিদ্ধির "মিথ্যাত্ব-মিথ্যাত্ব" পর্য্যন্ত অংশের প্রথম ভাগ বঙ্গভাষায় বঙ্গসন্তানের পাঠোপযোগী হইয়া প্রকাশিত হইল। এই প্রকাশব্যাপারের ইতিহাস এই—

বেদান্তশাস্ত্রের চরমগ্রন্থ আলোচনার অভিলাষী হইয়া সন ১৩২২ সালে মদীয় সুহৃদ্বর ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং আমি, পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় মহাশয়দ্বারা খণ্ডনখণ্ডখাদ্য ও চিৎসুখী গ্রন্থ এবং পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়দ্বারা অদ্বৈতসিদ্ধি ও সিদ্ধান্তলেশ গ্রন্থের অনুবাদ করাইয়া "শাস্ত্রসারসংগ্রহ" নামে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করি। কিন্তু মহাযুদ্ধের আরম্ভ হওয়ায় এবং শাস্ত্রী মহাশয় ও তর্কভূষণ মহাশয় কাশীধামে চলিয়া যাওয়ায় অদ্বৈতসিদ্ধির দ্বিতীয়মিথ্যাত্বলক্ষণের কিয়দংশ-মাত্র প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া যায়। বহু চেষ্টা করিয়াও বহুদিন পর্য্যন্ত পুনরারম্ভ করিতে পারি নাই; কারণ, কলিকাতায় এই গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনাকারী পণ্ডিতের সন্ধান পাই নাই।

এই সময় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়, হরিদ্বার গুরুকুল সংস্থানের অধ্যাপনাকার্য্য ত্যাগ করিয়া মহামহোপাধ্যায়

লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় মহাশয়ের পদে কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ে অভিষিক্ত হন। শাস্ত্রীয় সম্পর্কে তাঁহার সহিত পরিচয় হইবার পর তাঁহার শাস্ত্রপারদর্শিতা দেখিয়া আমরা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হই। একদিন কথায় কথায় তর্কতীর্থ মহাশয় আমাকে দুঃখ করিয়া বলেন—"বিদ্যার্থীর অভাবে আমার অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থের আলোচনা হইতেছে না; সকল বেদান্ততীর্থপরীক্ষার্থীই অদ্বৈতসিদ্ধির বিকল্প অপেক্ষাকৃত সরল শ্রীভাষ্য পড়িয়াই বেদান্ততীর্থপরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে চাহে; আপনারা কেন আমার সহিত অদ্বৈতসিদ্ধি আলোচনা করুন না?" আমার অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থপাঠের পিপাসা তখনও নিবৃত্ত হয় নাই। ইহাতে আমি ও আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রমোদেশ্বর সেন মহাশয় উভয়ে তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট অদ্বৈতসিদ্ধি আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

এই আলোচনাকালে আমি আমার অভ্যাসবশে মূলগ্রন্থের একটী আক্ষরিক অনুবাদ লিখিতে প্রবৃত্ত হই। পূর্ব্বোক্ত উদ্যমে অদ্বৈতসিদ্ধি-প্রকাশে অসমর্থ হওয়ায়, কিয়দ্দূর লিখিবার পর ইচ্ছা হইল—সমগ্র মূল গ্রন্থটী ঐরূপ অনুবাদসহ প্রকাশিত করিব। কিছুদূর এইভাবে অগ্রসর হইবার পর পণ্ডিত মহাশয় যে সব অতিরিক্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বেদান্তসিদ্ধান্তের কথা বলিতেছিলেন, তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া তাহা তাৎপর্য্যরূপে লিখিতে আরম্ভ করি। এই সময় আমার ইচ্ছা হইল—আমার অনুবাদ ও পণ্ডিতমহাশয়ের তাৎপর্য্যসহ অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থখানি আবার প্রকাশ করিব। এমন সময় একদিন পণ্ডিতমহাশয় আমার উক্ত আক্ষরিক অনুবাদটী দেখেন। কিন্তু আমার অনুবাদটী তাৎপর্য্যগ্রহে কঠিন হইবে বিবেচনা করিয়া পরমোৎসাহী পণ্ডিতমহাশয় পরহিত-কামনায় নিজেই ইহার অনুবাদকার্য্যে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমি ত তাহাই চাহিতেছিলাম, আমি তন্মূহূর্ত্তেই পণ্ডিতমহাশয়কে তজ্জন্য অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তিনি তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া অচিরে মূলমাত্রের

অর্থাবগতির জন্য একটী টীকার আবশ্যকতা অনুভব করিলেন। তখন আমার সংকল্প হইল—তাঁহার টীকা, অনুবাদ ও তাৎপর্য্যসহ বর্ত্তমান আকারে অদ্বৈতসিদ্ধির প্রকাশ করিব। পণ্ডিতমহাশয় বলিতে লাগিলেন এবং আমি লিখিতে লাগিলাম। ভগবদিচ্ছায় আজ ছয়, সাত বৎসরের চেষ্টায় বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাহাই প্রকাশিত হইল।

কিন্তু সকল কার্য্যেই দোষগুণ দুইটী দিক্ থাকে। তাৎপর্য্য অগ্রে লিখিয়া পরে অনুবাদ লেখায় ইহাতে একটী দোষ হইল এই যে, অনুবাদ ও তাৎপর্য্যমধ্যে কিছু কিছু পুনরুক্তি হইয়া গেল। অবশ্য মুদ্রণকালে ইহা পরিহার করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু বিষয়গুলি এতই দুরূহ যে, সেই পুনরুক্তি ইহার প্রয়োজনীয় বলিয়াই বোধ হইল। এজন্য আর তাহার পরিহার করিবার চেষ্টা করা গেল না। এইরূপে পরম শ্রদ্ধাস্পদ তর্কতীর্থ মহাশয় এই পরিশ্রম স্বীকর না করিলে আজ এতটুকুও অদ্বৈতসিদ্ধি প্রকাশে সমর্থ হইতাম না। ইহাই হইল অদ্বৈতসিদ্ধিপ্রকাশে দ্বিতীয় প্রচেষ্টার ইতিহাস।

যাহা হউক, অতঃপর অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থপাঠে পাঠকের মনে প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য উৎপাদন করিবার অভিপ্রায়ে একটী সার্দ্ধচারিশত পৃষ্ঠার ভূমিকা এই গ্রন্থে সংলগ্ন করা হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তির জন্য (১) গ্রন্থপরিচয়, (২) গ্রন্থকারপরিচয়, (৩) গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের পরিচয় এবং (৪) গ্রন্থপাঠের ফলপরিচয় এবং সামর্থ্য উৎপাদন অভিপ্রায়ে (৫) ন্যায়শাস্ত্রের পরিচয়মুখে মীমাংসা ও বেদান্তসিদ্ধান্তের পরিচয় এবং (৬) সংক্ষেপে অপরাপর মতবাদের পরিচয় এই ছয়টী বিষয় অপরাপর নানা কথার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

এই সকল বিষয়ের মধ্যে 'বেদান্তচিন্তাস্রোতের ইতিহাস' ব্যতীত মধুসূদনের সময় ও জীবনচরিত সম্বন্ধে আমি মহতের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার সুযোগ পাই নাই। কারণ, এ বিষয়ে কেহই কিছুই লিপিবদ্ধ

করিয়া যান নাই। ইহা প্রধানতঃ প্রবাদ হইতেই সঙ্কলিত হইয়াছে। এজন্য খুবই সম্ভব ইহাতে ভ্রম, প্রমাদ ও ন্যূনতা সকল দোষই আছে। তথাপি তাহা লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য—যদি কোন যোগ্য ব্যক্তি ইহাতে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে ইহা তাঁহার পক্ষে কিঞ্চিৎ সহায় বা সংশোধনযোগ্য একখানি পাণ্ডুলিপি হইতে পারিবে।

ভূমিকামধ্যস্থ 'বেদান্তচিন্তাস্রোতের ইতিহাস' স্বর্গীয় প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রথমে সঙ্কলন করেন। "বরিশাল শঙ্করমঠ" হইতে পরমপ্রীতি-ভাজন শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষের যত্নে (ইনি এক্ষণে সন্ন্যাসী) "বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস" নামে তিন ভাগে উহা প্রকাশিত হয়, এবং উহার প্রথম দুই ভাগ আমিই সম্পাদন করি। এস্থলে আমি তাহারই পুষ্টি-সাধন, পরিবর্ত্তন এবং যথামতি শোধন করিয়া ইহা সঙ্কলিত করিয়াছি। তাঁহার গ্রন্থে শতাব্দী অনুসারে (৯০) নব্বই জন আচার্য্যের পরিচয় ও মতবাদবর্ণন ছিল, কিন্তু ইহাতে আমি "অদ্বৈতবেদান্তচিন্তাস্রোতে বাধা ও তাহার অতিক্রম"ক্রমে ১৮১ জন আচার্য্যের পরিচয় ও আবির্ভাবক্রম-মাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছি ; তথাপি এখনও অনেকেই অবশিষ্ট রহিয়াছেন, ইতিহাসে তাঁহাদের স্থান এখনও নির্ণয় করিতে পারি নাই। বিষয়টী বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া একখানি পৃথক্ গ্রন্থও রচিত হইয়াছে, কিন্তু মুদ্রিত হইবে কি না—জানি না। যাহা হউক, এই ইতিহাসমধ্যে বেদান্তচিন্তাস্রোতে অদ্বৈতসিদ্ধির স্থান কোথায়, তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে।

তাহার পর এই অদ্বৈতসিদ্ধির মত দুরূহ গ্রন্থপাঠে সামর্থ্য উৎ-পাদনের জন্য ন্যায়শাস্ত্রের পরিচয়মুখে যে বেদান্ত ও মীমাংসা শাস্ত্রের পরিচয় দিয়াছি, তাহাতেও আমি গ্রন্থবাহুল্যভয়ে বহু বিষয়ই লিপিবদ্ধ করিয়াও মুদ্রিত করিতে পারি নাই। অপর দার্শনিকমতের পরিচয়, যাহা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও নিতান্তই সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। উহাও বিস্তৃতভাবে

লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম, কিন্তু গ্রন্থবাহুল্যভয়ে তাহাও বর্জন করিয়াছি। অবশেষে অদ্বৈতসিদ্ধিপাঠের জন্য কতিপয় অত্যাবশ্যক পাঠ্য গ্রন্থের তালিকামাত্র প্রদান করিয়াই উক্ত প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছি। ফলতঃ এই গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য উৎপাদনের জন্য এক্ষেত্রে যথাসম্ভব সাধ্যমত চেষ্টাই করিয়াছি, এখন উদ্দেশ্যসিদ্ধি ভগবানের হস্তে।

যাহা হউক, এই ভূমিকাপ্রণয়নকার্য্যে আমার পরিচিত ও শ্রদ্ধেয় বহু পণ্ডিতবর্গ আমাকে এতই সাহায্য করিয়াছেন যে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করা যায় না, অথবা নাম করিয়াও তাঁহাদের পরিচয় দিবার আবশ্যকতা হয় না। যেহেতু ইঁহারাই আজ পণ্ডিতসমাজে গণ্য মান্য ও পূজনীয় ব্যক্তি। তথাপি মধুসূদনের জ্ঞাতি-বংশধর গণ্যমান্য বহু পণ্ডিতের নিকট আমি যেরূপ সাহায্য পাইয়াছি, তাহা চিরকাল স্মৃতিপটে জাগরূক থাকিবে।

এই অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থখানি নব্যন্যায়ের রীতিতে লিখিত বলিয়া একদিকে সাধারণের পক্ষে যেমনই দুরূহ, অন্যদিকে ইহা একবার বুঝিতে পারিলে—জীব, জগৎ, ব্রহ্ম, মুক্তি ও তাহার সাধন প্রভৃতি দার্শনিক বিষয়গুলির সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই থাকে না। এই গ্রন্থপাঠে এই বিষয়গুলি এতই পরিষ্কার হইয়া যায় যে, মুমুক্ষু হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে পরমার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে ইহা আলোচনা করিলে জীবন সার্থকবোধ হইবে, জীবন্মুক্তি করায়ত্ত হইবে, জীবাভিন্ন অদ্বৈতব্রহ্মের জ্ঞানধারা অজ্ঞাতসারে এমনই প্রবাহিত হইবে যে, নিদিধ্যাসন সহজ হইবে, এই প্রস্তরসম কঠোর কঠিন এই জগৎপ্রপঞ্চ স্বেচ্ছাকল্পিত মনোময় জগতের ন্যায় অন্তঃসারশূন্য বোধ হইবে, ছায়ার মত স্বসত্তাহীন প্রতিভাত হইবে; অন্যদিকে যাবতীয় বিষয় হইতে আমিত্বেরও প্রকাশক সেই স্বয়ংপ্রকাশের অসীম জ্যোতিতে হৃদয় ভরিয়া যাইবে, পূর্ণ পূর্ণতর হইতে পূর্ণতম-ভাব প্রকটিত হইবে—সকলই আমাতে কল্পিত বলিয়া দৃঢ়নিশ্চয় হইবে, শোকতাপ

অন্তহিত হইবে। অথবা নিঃসংশয়ে অদ্বৈতবাদ বুঝিবার পক্ষে এমন গ্রন্থ আর নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

আজকাল সাধারণতঃ ইহাকে পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠার জন্য পাঠ করা হয়, কিন্তু শ্রদ্ধাসহকারে মুক্তির উপায়জ্ঞানে ইহা পাঠ করিলে ইহার উক্ত ফল অনিবার্য্য। ইহাতে বাধ্য হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, ইহাতে সমাধি স্বতঃই উপস্থিত হয়। সিদ্ধমহাযোগী মহামতি মধুসূদন ইহাকে সিদ্ধাবস্থার অনুভবদ্বারা সিদ্ধির চরম সহায়রূপে রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার উপাদেয়তা, ইহার উপকারিতা বলিয়া শেষ করা যায় না, অনুষ্ঠান ভিন্ন বুঝাও যায় না। ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় ভূমিকামধ্যে দ্রষ্টব্য।

অন্যদিকে, ভাগ্যক্রমে আমরা ইহার অনুবাদক পরমশ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়কে পাইয়াছি। তর্কতীর্থ মহাশয় যেরূপ প্রাণ দিয়া ইহাকে প্রাঞ্জল করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বেদান্তসিদ্ধান্তের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারগুলির মর্ম্মোদ্ঘাটনপূর্ব্বক যথাযোগ্যস্থানে যেরূপ নিপুণতাসহকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য যে বহুল পরিমাণে সিদ্ধ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পাঠকবর্গ শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করুন, আমাদের কথার সত্যতার আভাস পাইবেন। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয় সুস্থশরীরে স্বচ্ছন্দমনে দীর্ঘজীবন লাভ করুন, তাঁহার নিকট আমরা অনেক আশা করি। তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, সূক্ষ্মদৃষ্টি, চিন্তাশীলতা ও বিদ্যাবত্তা দেখিয়া মনে হয়—তাঁহার দ্বারা বেদান্তবিদ্যায় বঙ্গদেশের মুখ নিরতিশয় সমুজ্জ্বল থাকিবে। বাঙ্গালী মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থ যেমন বেদান্তবিদ্যাতেও বাঙ্গালীকে পণ্ডিতসমাজে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছে, আশা হয়—পণ্ডিত মহাশয় এই জাতীয় গ্রন্থের টীকাদি রচনা করিয়া সেই গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। বাঙ্গালীর রচিত বেদান্তসিদ্ধান্তে চরমগ্রন্থ অদ্বৈতসিদ্ধির

"সিদ্ধিব্যাখ্যা" নামক টীকাটী, শুনা যায়, মধুসূদনের শিষ্য একমাত্র বাঙ্গালী "বলভদ্রই" রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাও মূলগ্রন্থ বুঝিবার পক্ষে অনুকূল নহে। কারণ, তাঁহার লক্ষ্য ছিল—অদ্বৈতসিদ্ধির খণ্ডন-প্রয়াসী ন্যায়ামৃততরঙ্গিণীকার মহামতি ব্যাসরামের আক্রমণের উত্তর দান করা। কিন্তু আমাদের তর্কতীর্থ মহাশয়ের এই "বালবোধিনী" টীকাতে মূলের অর্থটী ভাল করিয়া সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। অথচ অতিদুরবগাহ লঘুচন্দ্রিকা, সিদ্ধিব্যাখ্যা এবং বিট্ঠলেশীয় টীকার অতি প্রয়োজনীয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কথাগুলিও গৃহীত হইয়াছে। সিদ্ধি-ব্যাখ্যা যদি বাঙ্গালী বলভদ্রের রচিত না হয়, বা বলভদ্র যদি বাঙ্গালী না হন, তবে অদ্বৈতসিদ্ধি রচিত হইবার পর এই প্রথম বাঙ্গালী অদ্বৈত-সিদ্ধির টীকারচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এখন ভগবান্ মধুসূদনের কৃপায় টীকাটী সম্পূর্ণ হউক—ইহাই প্রার্থনা।

মনে করিয়াছিলাম—এই গ্রন্থখানিকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করিব। কিন্তু তাহা আর পারিলাম না। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়ের অবকাশ অল্প, আর মধুসূদনের কৃপায় আমারও ক্ষুদ্র ভাণ্ড পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, এখন সর্ব্ববিধ প্রবৃত্তির অভাব অনুভূত হইতেছে।

যাহা হউক, এই ভাগে ভূমিকা ও প্রথম মিথ্যাত্বলক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইল, দ্বিতীয় ভাগে অবশিষ্ট চারিটী মিথ্যাত্বলক্ষণ এবং "মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব" নামক পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত থাকিবে। উহারও অর্দ্ধেকের উপর ছাপা শেষ হইয়া গিয়াছে।

অদ্বৈতসিদ্ধির চমৎকারিতা ভালরূপে বুঝিতে হইলে, ইহা যে গ্রন্থের খণ্ডন, সেই ন্যায়ামৃত গ্রন্থখানিরও ভাল করিয়া আলোচনা করা আবশ্যক। এজন্য পূজনীয় পণ্ডিত মহাশয় সেই ন্যায়ামৃত গ্রন্থেরও একটী বিশদ অনুবাদও করিয়াছেন, আমরা এই সঙ্গে এই গ্রন্থের পরিশিষ্টাকারে তাহারও আবশ্যকীয় অংশ সংযোজিত করিলাম।

এই গ্রন্থপ্রকাশে মদীয় মধ্যম ভ্রাতা পরমকল্যাণভাজন শ্রীমান্ ক্ষেত্রপাল ঘোষ ইহার মুদ্রণব্যাপারে যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। তিনি এ বিষয়ে মুক্তহস্ত না হইলে এ কার্য্য সম্পন্ন হইত না। আমার বহুদিনের আশা আজ তাঁহার দ্বারা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইল। দেবদ্বিজ-গুরুগণের আশীর্ব্বাদ তাঁহার উপর বর্ষিত হউক। এক্ষণে সেই আনন্দময় সকলকে আনন্দে রাখুন—ইহাই প্রার্থনা। ইতি

শ্রীশ্রীবাসন্তী পূজা
১২ই চৈত্র, ইং ২৬শে মার্চ্চ
সন ১৩১৭, ইং ১৯০১ খৃষ্টাব্দ।

সম্পাদক
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

অদ্বৈতসিদ্ধিভূমিকা।

অদ্বৈতসিদ্ধিভূমিকার
সামান্য সূচী।

শুদ্ধিপত্র।

৭৩ পৃষ্ঠা ২০ পং=১৯৩৩=১৮৬০।

১১৮ " ২৪ " =ছত্রেশ্বর=ক্ষেত্রেশ্বর।

১১৯ " ১৬ " =লক্ষিত হয়=লক্ষিত হয় না।

অদ্বৈতসিদ্ধিভূমিকার সূচীপত্র।

শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ।

অদ্বৈতসিদ্ধি

ভূমিকা।

ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা।

তত্ত্ববহুল অপ্রচলিত বা দুর্ব্বোধ গ্রন্থের ভূমিকা বিশেষ প্রয়োজন। এজন্য এরূপ গ্রন্থের ভূমিকা লেখা একটা রীতিই হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সেই ভূমিকা লিখিবার পূর্ব্বে দেখা উচিত—ভূমিকা শব্দের অর্থ কি, এবং তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্যই বা কি ?

ভূমিকাশব্দের অর্থ।

ভূমিকা শব্দের অর্থ—'ক্ষুদ্র ভূমি' বা 'ভূমি' অর্থাৎ ক্ষেত্র। কোন সুপ্রশস্ত অভীষ্ট উচ্চভূমিতে আরোহণ করিতে হইলে যেমন অল্প-উচ্চ ক্ষুদ্র ভূমিরূপ সোপান বা পাদপীঠ আবশ্যক হয়, তদ্রূপ কোন প্রমেয়-বহুল দুরূহ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইলে, আসমাপ্তি-গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি এবং গ্রন্থোক্ত বিষয় বুঝিবার সামর্থ্য উৎপাদনের জন্য ভূমিকাপাঠ আবশ্যক হইয়া থাকে। ভূমিকা ও সোপান এই দৃষ্টিতে একার্থক।

অথবা যেমন কোন বিস্তৃত ক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে শস্য উৎপাদন করিতে হইলে কোন ক্ষুদ্র ভূমিতে বীজ রোপণ করিয়া অঙ্কুরিত হইবার পর সেই বিস্তৃত ক্ষেত্রে তাহাদিগকে বপন করিলে অভীষ্ট পরিমাণ শস্যলাভ হইয়া থাকে, তদ্রূপ নানা দুরূহ তত্ত্বপূর্ণ কোন বিশাল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার পূর্ব্বে তাহার ভূমিকা পাঠ করিয়া আসমাপ্তি সেই গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি ও সেই গ্রন্থোক্ত বিষয় বুঝিবার সামর্থ্য লাভ করিতে হয়। এই দৃষ্টিতে ভূমিকা বলিতে ক্ষুদ্র ভূমি মাত্র বুঝায়।

ভূমিকা শব্দের অন্য অর্থ—ভূমি বা ক্ষেত্র; অর্থাৎ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ফলপ্রদ পাদপে পরিণত হইবার যোগ্যস্থান। শস্যাদি উৎপাদন করিতে হইলে যেমন ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়, আবর্জ্জনা বা জঙ্গল পরিষ্কার, ভূমিকর্ষণ ও বারিসেচনাদি করিয়া শস্য উৎপাদনের সামর্থ্য সম্পন্ন করিতে হয়, তদ্রূপ বিচারবহুল দুর্বোধ গ্রন্থে আসমাপ্তি অধ্যয়নে প্রবৃত্তি ও বুঝিবার সামর্থ্য উৎপাদনের জন্য ভূমিকাপাঠ আবশ্যক হয়।

সুতরাং গ্রন্থবিশেষের ভূমিকা বলিতে সেই গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি এবং সেই গ্রন্থোক্ত বিষয়সমূহ বুঝিবার সামর্থ্য যাহা দ্বারা উৎপন্ন হয় তাহাকেই বুঝায়। আর তজ্জন্য ভূমিকামধ্যে এই সকল বিষয়ের আলোচনাই আবশ্যক, অন্য বিষয়ের আলোচনা অনাবশ্যক। এতদনুসারে এই ভূমিকামধ্যে আমরা এই কয়টী বিষয়ই আলোচনা করিতে চেষ্টা করিতেছি।

ভূমিকামধ্যে আলোচ্য বিষয়।

এখন গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি ও বুঝিবার সামর্থ্য উৎপাদনের জন্য কি কি বিষয় আলোচ্য—ইহা যদি নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে দেখা যায়—

(ক) গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্য—

১। গ্রন্থ পরিচয়,

২। গ্রন্থকার পরিচয়,

৩। গ্রন্থ-প্রতিপাদ্যবিষয়ের পরিচয়, এবং

৪। গ্রন্থপাঠের ফল

—এই চারিটী বিষয় জানা আবশ্যক হয়। কারণ, ইহাতে প্রবৃত্তির হেতু যে "বলবৎ অনিষ্টের অজনক ইষ্টসাধনতাজ্ঞান" তাহাই জন্মিয়া থাকে। বস্তুতঃ কি উদ্দেশ্যে ও কিরূপ অবস্থায় গ্রন্থখানি লিখিত—ইহা যদি জানা যায়, আর সেই উদ্দেশ্য যদি সাধু ও মহৎ বলিয়া বিবেচিত হয় এবং সেই অবস্থাটী যদি বহুগুণসম্পন্নিত প্রয়োজনীয়-ঘটনাবহুল হয়,

তাহার পর গ্রন্থকার যদি সাধুচরিত্র পরহিতাকাংক্ষী মহদ্ব্যক্তি হন এবং গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের আভাস যদি পাওয়া যায় এবং তাহাতে যদি সুফললাভের আশা হয়, তাহা হইলে শ্রেয়স্কামী মহত্ত্বাভিলাষী কাহার না সেই গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি জন্মে? অতএব গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্য—(১) গ্রন্থ, (২) গ্রন্থকার, (৩) গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়, (৪) ও গ্রন্থপাঠের ফল—এই চারিটী বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক। তাহার পর—

(খ) গ্রন্থপাঠে সামর্থ্য উৎপাদনের জন্য—

১। অনুকূল শাস্ত্রের জ্ঞান এবং

২। প্রতিকূল শাস্ত্রের জ্ঞান

আবশ্যক হয়। কিন্তু এই গ্রন্থপাঠে সামর্থ্যের জন্য—

৩। যে শাস্ত্রে বুদ্ধি মার্জিত হয় সেই শাস্ত্রের জ্ঞানও আবশ্যক হয়। তন্মধ্যে বুদ্ধি মার্জিত করিবার জন্য ন্যায় ও মীমাংসা শাস্ত্রের জ্ঞান এবং অনুকূল ও প্রতিকূল শাস্ত্রের জ্ঞানের জন্য সামান্যতঃ যাবতীয় দার্শনিক মতবাদের জ্ঞান এবং বিশেষতঃ অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত এবং দ্বৈতমতবাদের জ্ঞান আবশ্যক। তথাপি প্রতিকূল মতবাদের জন্য, রামানুজ ও মাধ্ব প্রভৃতি বিরোধী মতের এবং অনুকূল মতবাদের জন্য অদ্বৈতমতের অবান্তরভেদের জ্ঞান আরও বিশেষভাবে আবশ্যক। কারণ, ইহা ব্যতীত এই গ্রন্থের তাৎপর্য্যগ্রহ ভালরূপ হইতে পারে না। অতএব এই ভূমিকামধ্যে একে একে এই কয়টী বিষয় যথাসাধ্য আলোচনা করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তির জন্য গ্রন্থপরিচয়।

অদ্বৈতসিদ্ধি নামের হেতু।

এই গ্রন্থের নাম অদ্বৈতসিদ্ধি। কারণ, এই অসংখ্য বস্তুপূর্ণ বিবিধ বিচিত্র জগৎপ্রপঞ্চ প্রত্যক্ষ হইলেও—অথবা আপাততঃ সর্ব্ববিধ প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইলেও যে, এক অদ্বৈতবস্তুই বিদ্যমান রহিয়াছে—

যুক্তি ও শ্রুতিবলে ইহা সিদ্ধ করাই—অনুমানাদি প্রমাণদ্বারা এবং পরীক্ষাদ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করাই—এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। কিন্তু একাধিক বস্তু থাকিলে অদ্বৈত সিদ্ধ হইতে পারে না, দ্বৈতজ্ঞানসত্ত্বে অদ্বৈতবোধ উৎপন্ন হইতে পারে না। কারণ, দ্বৈত ও অদ্বৈত—পরস্পরবিরোধী। দ্বৈত থাকিলে অদ্বৈত থাকে না, অদ্বৈত থাকিলে দ্বৈত থাকে না। অবশ্য ব্যক্তি-জাতি, অংশ-অংশী প্রভৃতির ন্যায় দ্বৈত ও অদ্বৈত পরস্পর অবিরোধী বলিলে দ্বৈতসত্ত্বে অদ্বৈত সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু তাহা হইলে সে অদ্বৈত, দ্বৈতের মত দৃশ্য হয় না। অর্থাৎ যে সম্বন্ধে দ্বৈতের ভান হয় ঠিক সেই সম্বন্ধে অদ্বৈতের ভান হয় না। প্রত্যুত সেই অদ্বৈত দ্বৈতেরই আশ্রিত হয়। এজন্য সে অদ্বৈত দ্বৈতের মত দৃশ্যই হয়। যেমন, ঘট-পটাদি দ্বৈত বস্তু সংযোগ সম্বন্ধে দৃশ্য হয়, কিন্তু তাহাতে যে অদ্বৈত 'সত্তা'জাতি আছে, তাহা সংযুক্তসমবায় সম্বন্ধে দৃশ্য হয়। ভিন্নসম্বন্ধে তাহারা পরস্পর পরস্পরের অবিরোধী বলিয়া ভিন্নসম্বন্ধেই দৃশ্য হয়, একই সম্বন্ধে উভয়ই দৃশ্য হয় না। এই কারণে দ্বৈতের অবিরোধী অদ্বৈত অদ্বৈতই নহে। এতাদৃশ অদ্বৈত সিদ্ধ করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। দ্বৈতবিরোধী অদ্বৈত সিদ্ধ করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। প্রকৃত অদ্বৈত সর্ব্বতোভাবে একই হয় বলিয়া অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার দ্বিতীয় রহিত হয় বলিয়া, এই পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চকে—এই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ দ্বৈতরাজ্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হইয়াছে। দ্বৈতকে মিথ্যা না বলিলে দ্বৈতবিরোধী অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না। এইরূপে সর্ব্ববিধ প্রমাণদ্বারা এই দ্বৈত প্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া এক অদ্বৈত বস্তুকে সিদ্ধ করায় এই গ্রন্থের নাম 'অদ্বৈতসিদ্ধি' হইয়াছে।

অদ্বৈতসিদ্ধিরচনার হেতু।

কিন্তু কোন কিছু প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে দেখিলে, পূর্ব্বে তাহা অসিদ্ধ ছিল, অথবা তাহার সিদ্ধিতে সন্দেহ ছিল—এইরূপই অনুমান

হয়। যেহেতু যাহার অসিদ্ধি থাকে, অথবা যাহার সিদ্ধিতে সংশয় থাকে, তাহারই সিদ্ধি করা প্রয়োজন হয়। যাহার অসিদ্ধি থাকে না, অথবা যাহার সিদ্ধিতে সংশয় থাকে না, তাহা সিদ্ধ করা প্রয়োজন হয় না—ইহাই সাধারণ নিয়ম। সুতরাং অদ্বৈত সিদ্ধ করিবার জন্য—অদ্বৈতনিশ্চয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিবার জন্য—অদ্বৈতসিদ্ধি রচিত হইতেছে দেখিয়া এই গ্রন্থরচনার পূর্ব্বে অদ্বৈত অসিদ্ধ ছিল, অথবা অদ্বৈতের সিদ্ধিতে সংশয় ছিল—ইহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়।

অদ্বৈতসিদ্ধিরচনার উপলক্ষ।

বস্তুতঃ এই অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থরচনার উপলক্ষই হইতেছে—অতি ভীষণ কূটতার্কিক দ্বৈতবাদী মাধ্বসম্প্রদায়ের শিষ্যপরম্পরায় অদ্বৈততত্ত্ব অসিদ্ধ বলিয়া অদ্বৈতমতখণ্ডনের বহুশতাব্দী ধরিয়া চরম চেষ্টার প্রত্যুত্তর-দান। মাধ্বসম্প্রদায় যে ভাবে অদ্বৈত অসিদ্ধ করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তাহাতে এ সময় সত্যান্বেষী সুধীবর্গের মনে, এমন কি বহু অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতধুরন্ধরের মনে অদ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে বিষম সংশয় জন্মিয়া গিয়াছিল, আর তজ্জন্য সেই সব অদ্বৈতবিশ্বাসী বিদ্বৎকুলের মনে অদ্বৈতনিশ্চয়ের দৃঢ়তাসাধনের প্রয়োজনবোধ হয়। এই অদ্বৈত-বিষয়ক সংশয়ের জন্য এবং সেই সংশয়নিরাসপূর্ব্বক স্বমতের দৃঢ়তাসাধন-রূপ প্রয়োজনের জন্য এই অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থের রচনা করা হয়। অদ্বৈত-সিদ্ধি, মাধ্বমতাবলম্বী পণ্ডিতধুরন্ধর মহামতি ব্যাসাচার্য্যের কৃত ন্যায়ামৃত গ্রন্থোক্ত অদ্বৈতবাদখণ্ডনের প্রত্যক্ষর প্রতিবাদ।

অদ্বৈতসিদ্ধিরচনার বিশেষত্ব।

এখন মনে হইতে পারে, অদ্বৈতসিদ্ধি রচনা করিয়া অদ্বৈত সিদ্ধ করিবার প্রয়োজন—কি এই গ্রন্থরচনাকালেই হইয়াছিল? তৎপূর্ব্বে কি হয় নাই? আর তজ্জন্য কি এই জাতীয় গ্রন্থ ইহার পূর্ব্বে আর রচিত হয় নাই? বস্তুতঃ শাঙ্করভাষ্য, খণ্ডনখণ্ডখাদ্য ও চিৎসুখী প্রভৃতি এ

জাতীয় গ্রন্থ ত পূর্ব্বেও রচিত হইয়া গিয়াছে? অদ্বৈতসিদ্ধিরচনার বিশেষ হেতু কি?

কিন্তু এই কথাটী বুঝিতে হইলে আমাদের, অদ্বৈতবেদান্তের চিন্তা-স্রোতের উৎপত্তি, সেই চিন্তাস্রোতে বিভিন্ন সময়ে যে সব বাধা উৎপন্ন হইয়াছিল, এবং সেই সব বাধার প্রতিকার বিভিন্ন সময়ে যেরূপ হইয়া গিয়াছে, তাহার জ্ঞান আবশ্যক। এক কথায় অদ্বৈতচিন্তাস্রোতের একটী ইতিহাস আলোচনা আবশ্যক। এই বিষয়টী আলোচিত হইলে অদ্বৈতচিন্তাস্রোতের কোন্ অবস্থায় অদ্বৈতসিদ্ধির উৎপত্তি হইয়াছে, এবং তাহার পূর্ব্বে এই জাতীয় অপর গ্রন্থের উদ্ভব কোন্ অবস্থায় হইয়াছে, সুতরাং অদ্বৈতসিদ্ধিরচনার বিশেষত্ব কি—তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। অদ্বৈতসিদ্ধিরচনার বিশেষত্ব বুঝিতে হইলে অদ্বৈতচিন্তা-স্রোতের ইতিহাসের জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

বেদান্তচিন্তায় অদ্বৈতসিদ্ধির স্থান।

কিন্তু এই ইতিহাস আলোচনার পূর্ব্বে যদি এক কথায় ইহার উত্তর দিতে হয়, তাহা হইলে এক্ষণে এত মাত্র বলা যাইতে পারে যে, অদ্বৈত-মতখণ্ডনে মাধ্বসম্প্রদায়ের ব্যাসাচার্য্যের কৃত ন্যায়ামৃতের ন্যায় সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন গ্রন্থ—অদ্বৈতমতখণ্ডনে এরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারপূর্ণ পূর্ণাবয়ব গ্রন্থ—ইহার পূর্ব্বে আর রচিত হয় নাই। আর অদ্বৈতসিদ্ধির মত অদ্বৈতমতস্থাপনের—অদ্বৈতমতখণ্ডনখণ্ডনের সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন গ্রন্থ—এরূপ ন্যায়ের সূক্ষ্মতা ও বিচারপরিপাটীপূর্ণ গ্রন্থ—ইহার পূর্ব্বে আর রচিত হয় নাই। ন্যায়ামৃতের পূর্ব্বে—অদ্বৈতমতখণ্ডনের উদ্দেশ্যে যত গ্রন্থ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের সমুদায় কথা, এবং ভবিষ্যতে যত কথা উঠিতে পারে, প্রায় সে সমুদয় কথাই ন্যায়ামৃতে যেমন লিপিবদ্ধ হইয়াছে, অদ্বৈতসিদ্ধিতেও তদ্রূপ অদ্বৈতমতস্থাপনের জন্য, অদ্বৈতমত-খণ্ডনের খণ্ডনের জন্য তৎপূর্ব্বে যত কথা হইয়া গিয়াছে, সে সমুদায় কথাই

এবং ভবিষ্যতে যত কথা উঠিতে পারে, প্রায় সে সমুদায় কথাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধি ন্যায়ামৃতের প্রত্যেক অক্ষরের প্রতিবাদ বলিলেই হয়। এই দুই জাতীয় দুই গ্রন্থের পর যে সব খণ্ডনমণ্ডন হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহা ইহাদেরই টীকা বা ব্যাখ্যার আকারেই হইয়াছে এবং হইতেছে। অদ্বৈতমতের প্রতিকূলে যত কথা, তাহা যেমন ন্যায়ামৃতে আছে, অদ্বৈতমতের অনুকূলে তদ্রূপ যত কথা, তাহা অদ্বৈতসিদ্ধিতে আছে। অদ্বৈতসিদ্ধিরচনাহেতুর সংক্ষেপে ইহাই বিশেষত্ব। এক্ষণে দেখা যাউক—অদ্বৈতচিন্তাস্রোতে অদ্বৈতসিদ্ধির স্থান কোথায়। এই স্থান নির্ণয় করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির এই বিশেষত্ব চিন্তা করিলে ইহা আরও ভালরূপ বুঝিতে পারা যাইবে।

অদ্বৈতচিন্তাস্রোতের ইতিহাস।

কলিযুগে বৈদিক অদ্বৈতবাদের অবস্থা।

অদ্বৈতচিন্তার মূল প্রস্রবণ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক বেদ। এই বেদরূপ প্রস্রবণ হইতে অদ্বৈতচিন্তার ধারা প্রথম প্রবাহিত হয়। কালক্রমে বেদপ্রচারের অল্পাধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রচারেরও অল্পাধিক্য হয়। পরিশেষে দ্বাপরের শেষে যখন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদবিভাগাদি করিয়া বেদের প্রচারবাহুল্য সাধন করেন, তখন ব্রহ্মসূত্র ইতিহাস পুরাণ ও স্মৃতি প্রভৃতিদ্বারা অদ্বৈতচিন্তার প্রচারাধিক্য সংসাধিত হয়। ব্যাসদেবের এই ব্রহ্মসূত্র হইতে মনে হয়, ব্যাসদেবের পূর্ব্বে কাশকৃৎস্ন, ঔড়ুলোমী, কার্ষ্ণাজিনি, আত্রেয়, জৈমিনি, আশ্মরথ্য, বাদরি ও ব্যাসরায়ণ * প্রভৃতি

---

* ইহাদের মধ্যে কাশকৃৎস্ন অদ্বৈতবাদী। শুনা যায় ইনি পূর্ব্বমীমাংসার সংকর্ষণকাণ্ডের, মতান্তরে দেবতাকাণ্ডের রচয়িতা। বেদান্তসূত্রে ১।৪।২২তে ইঁহার নাম উক্ত হইয়াছে।

কার্ষ্ণাজিনি—উভয় মীমাংসায় ইঁহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্র ৩।১।৯ দ্রষ্টব্য। ইনি দ্বৈতবাদিক। জৈমিনি ইঁহার মত খণ্ডন করিয়াছেন, মীঃ ৪।৩।১৭ সূত্রে উদ্ধৃত ও ৬৮সূত্রে খণ্ডিত হইয়াছে। তদ্রূপ ৬।৭।৩৫ উদ্ধৃত ও ১৮সূত্রে খণ্ডিত হইয়াছে।

মুনিগণের ব্রহ্মসূত্র জাতীয় কোনরূপ বেদান্তদর্শনগ্রন্থ ছিল। মহাভারতের সনৎসুজাতীয় পর্ব্বাধ্যায় হইতে জানা যায়, ভূমণ্ডলে মানবাবির্ভাবের প্রারম্ভে অর্থাৎ সত্যযুগে সনকাদি ব্রহ্মার মানসপুত্রগণের মধ্যেও এই অদ্বৈতচিন্তাধারা প্রবাহিত ছিল এবং ত্রেতাযুগে বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের মধ্যেও এই অদ্বৈতবাদ প্রচলিত ছিল। দ্বাপরে অদ্বৈতবাদের অবস্থা ব্যাসদেবের ভারতাদি এবং ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থ হইতেই জানা যায়। ব্যাসের পর তৎপুত্র শুকদেব এবং শিষ্য বোধায়নাদি ঋষিগণের মধ্য দিয়া এ সময় অদ্বৈতমত প্রচলিত থাকে। বস্তুতঃ, বেদের পর ঋষিযুগে অদ্বৈতবাদের অবস্থা জানিতে হইলে আমাদের এখন ব্যাসকৃত ইতিহাস ও পুরাণাদিরই শরণগ্রহণ ভিন্ন উপায় নাই।

আত্রেয়—বেদান্তদর্শন ৩।৪।৪৪ সূত্রে ইঁহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রকার ঔড়ুলোমীর মতদ্বারা ইঁহার মত খণ্ডন করিয়াছেন। জৈমিনি মীমাংসাদর্শনে কার্ষ্ণাজিনির মত খণ্ডনার্থ আত্রেয়ের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তদ্রূপ বাদরির মত খণ্ডনার্থ এই মত গৃহীত হইয়াছে। এজন্য ইনি বোধ হয় পূর্ব্বমীমাংসক ছিলেন।

ঔড়ুলোমী—বেদান্তদর্শন ১।৪।২১ সূত্রে ইঁহার নাম আছে। এ মতে সংসারদশায় ভেদ ও মুক্তিতে অভেদ হয়। ইহা পাঞ্চরাত্র নিম্বার্ক বা শৈবমতের অনুরূপ ভেদাভেদবাদ। পূর্ব্বমীমাংসায় ইঁহার নাম নাই। আত্রেয়মতখণ্ডনার্থ ব্রহ্মসূত্রে ৩।৪।৪৫ সূত্রে এই মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

আশ্মরথ্য—বেদান্তদর্শন ১।২।২৯, ১।৪।২০-সূত্রে ইঁহার নাম আছে। ভামতীর মতে ইনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। জৈমিনির মীমাংসাদর্শনে ৬।৬।১৮ সূত্রে ইঁহার মত খণ্ডন করিয়াছেন। ইনিও বৈদান্তিক আচার্য্য।

জৈমিনি—ইনি পূর্ব্বমীমাংসক। পূর্ব্বমীমাংসায় ইনি বাদরায়ণের সহিত কোথায় একমত, কোথায় ভিন্নমত হইয়াছিলেন। বেদান্তদর্শন ১।২।২৮, ১।২।৩১ ইত্যাদি সূত্রে ইঁহার নাম আছে।

বাদরি—ইনি বৈদান্তিক আচার্য্য। বেদান্তদর্শন ১।২।৩০ ও ৪।৩।১১, সূত্রে ইঁহার নাম উক্ত হইয়াছে। মীমাংসাদর্শনে ৬।১।২ সূত্রে ইঁহার মতের উল্লেখ আছে। জৈমিনি ৬।১।২৮ সূত্রে ইঁহার মত খণ্ডন করিয়াছেন। ইঁহার মতে সকলেরই বৈদিক কার্য্যে অধিকার আছে। জৈমিনি তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। ইনি জৈমিনি অপেক্ষা প্রাচীন। ইনি সগুণব্রহ্মবাদী।

বাদরায়ণ—অদ্বৈতবাদী। ইঁহারই অপর নাম ব্যাসদেব। বাদরি অপর ব্যক্তি ও প্রাচীন। ইনি জৈমিনির সমসাময়িক। ব্রহ্মসূত্রে ১।৩।২৬, ৩৩, প্রভৃতিস্থলে ইঁহার নাম আছে।

কুরুক্ষেত্রের পর অদ্বৈতবাদের অবস্থা।

ইহার পর কুরুক্ষেত্রসমরে ক্ষত্রিয়নাশের ফলে যখন আবার সদাচার ও শাস্ত্রসেবার অভাব হয়—গীতায় অর্জ্জুনের আশঙ্কাবীজ ফলভবায়নত মহাপাদপে পরিণত হয়—তখন অদ্বৈতচিন্তাস্রোত ক্রমে মন্থরগতি প্রাপ্ত হয় এবং ব্যাসের মতের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা হইতে আরম্ভ হয়। এই ভাবে বুদ্ধদেবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অদ্বৈতবাদের অবস্থা দিন দিন মন্দই হইতে থাকে। এই সময় কোন্ গ্রন্থসমূহ রচিত হয়, তাহা ঠিক্ বলিতে পারা যায় না, এজন্য এ সময়ে অদ্বৈতবাদের নিদর্শন ঠিক্ পাওয়া যায় না। আর এই জন্যই মনে হয়—এই সময় অদ্বৈতচিন্তাস্রোত মন্থরগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

বৌদ্ধযুগে অদ্বৈতবাদের অবস্থা।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রায় দুই সহস্রবৎসর পরে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ-শতাব্দীতে শাক্যসিংহ বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হয়। শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব বেদোক্তপথেই সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি, অদ্বৈতমতই অবলম্বন করেন, এজন্য কোষগ্রন্থে তাঁহার নাম 'অদ্বয়বাদী' বলিয়া উক্ত হইতে দেখা যায়। * এইরূপে এই সময় অদ্বৈতচিন্তাস্রোত বৌদ্ধগণের মধ্যদিয়া প্রবলবেগে বহিতে থাকে। কিন্তু বুদ্ধদেব তৎকালে কর্ম্ম-পরায়ণ বেদসেবিগণের দুর্ব্বুদ্ধি ও দুর্দ্দশা দেখিয়া বেদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। তাহাতে বৌদ্ধমত বেদমূলকমত হইলেও মূলচ্ছেদী মতে পরিণত হইল। এই মূলচ্ছেদী বৌদ্ধমতের সংস্পর্শে বৈদিক অদ্বৈতমত বিকৃতাকার ধারণ করে। যে শূন্যকে † বেদে সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ বলা হইয়াছে, সেই শূন্যকে বৌদ্ধমতে অসৎ বলা হইল। ভ্রমকল্পিত জগতের অধিষ্ঠানকে বেদে সৎস্বরূপ বলা হইয়াছে, বৌদ্ধমতে

* "সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতঃ বুদ্ধঃ ...... অদ্বয়বাদী বিনায়কঃ"—অমরকোষ।

† আনন্দঘনং শূন্যম্, ব্রহ্ম আত্মপ্রকাশং শূন্যম্—নৃসিংহ তাঃ উঃ ৬।২, ৪।

তাহাকে অসৎ বলা হইল। বৈদিক অদ্বৈতমতে রজ্জুতে সর্প মিথ্যা, রজ্জু কিন্তু সত্য, সর্প প্রতীত হইলেও নাই; কিন্তু বৌদ্ধমতে বলা হইল—সর্পও নাই রজ্জুও নাই। বৈদিকমতে জ্ঞানস্বরূপই মূলতত্ত্ব, বৌদ্ধমতে ক্ষণিক বিজ্ঞানধারাই মূলতত্ত্ব। এইরূপে বৈদিক অদ্বৈতমত বৌদ্ধমত-সংস্পর্শে বিকৃতাকার ধারণ করিল। বুদ্ধদেবের কিছু পরে নন্দ রাজার সময়, বর্ষপণ্ডিতের ভ্রাতা এবং পাণিনি মুনির গুরু 'উপবর্ষ' ব্যাসদেবের ব্রহ্মসূত্রের উপর যে বৃত্তি রচনা করেন, তাহাতে বৌদ্ধ-অদ্বৈতবাদ কিছু-মাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না। চন্দ্রগুপ্তের সময় বাৎস্যায়ন ন্যায়ভাষ্য রচনা করিয়া বৌদ্ধ-অদ্বৈতবাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিলেন না। বৌদ্ধগণের বিকৃত অদ্বৈতবাদ এ সময় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেই থাকিল। এইরূপে বুদ্ধদেবের পর প্রায় পাঁচশত বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ খৃষ্টজন্মের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ বিক্রমাদিত্য রাজের (৫৭ পূঃ খৃষ্টাব্দ) আবির্ভাব পর্য্যন্ত অদ্বৈতমত বৌদ্ধমতের মধ্য দিয়াই প্রবলভাবে প্রচলিত হইতে থাকে।

বিক্রমাদিত্যের পাঁচশত বৎসর পর্য্যন্ত অদ্বৈতবাদের অবস্থা।

বিক্রমাদিত্যের পর পাঁচশত বৎসর পর্য্যন্ত, দেখা যায়—পাতঞ্জল ভাষ্যকার ব্যাসদেব, সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণ, বৈশেষিক ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ, মীমাংসা ভাষ্যকার শবরস্বামী, বেদান্তের ব্যাখ্যাকার দ্রবিড়াচার্য্য প্রভৃতি বৈদিক দর্শনাচার্য্যগণ শিক্ষাক্রমে বৌদ্ধমতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া নিজ নিজ মতানুসারে বৈদিক ধর্ম্মরক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। এ সময় বৈদিক অদ্বৈতবাদের পক্ষ হইতে কেহই তাদৃশ দৃঢ়তাসহকারে মস্তক উত্তোলন করেন নাই, অথবা করিলেও তাহার কোন চিহ্নই বর্ত্তমান নাই। পক্ষান্তরে অশ্বঘোষ নাগার্জ্জুন দিঙ্নাগ অসঙ্গ বসুবন্ধু প্রভৃতি বৌদ্ধগণের বিকৃত অদ্বৈতমতের প্রভাবে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছিলেন না; বৌদ্ধগণের বিকৃত অদ্বৈতবাদেরই মহদুপকার হইয়াছিল। এজন্য

বুদ্ধদেবের পর প্রথম পাঁচশত বৎসর এবং তৎপরে আবার পাঁচশত বৎসর অর্থাৎ মোট এক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অদ্বৈতবাদ এক প্রকার বৌদ্ধগণের সম্পত্তিবিশেষ হইয়াছিল। এই জন্যই বোধ হয় অমরকোষে বুদ্ধের একটী নাম অদ্বয়বাদী বলা হইয়াছে।

বিক্রমাদিত্যের পাঁচশত বৎসর পরে অদ্বৈতবাদের অবস্থা।

বুদ্ধদেবের প্রায় একসহস্র বৎসর পরে, অথবা বিক্রমাদিত্যের পাঁচ শত বৎসর পরে, অর্থাৎ যে সময় উত্তর ভারতে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন এবং দক্ষিণ ভারতে চালুক্য রাষ্ট্রকূট ও পল্লব বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন, অন্য কথায় খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে, মীমাংসকাচার্য্য মহামতি প্রভাকর ও কুমারিল প্রভৃতি আচার্য্যগণ বিচারে ধর্ম্মপাল, ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রভৃতি বৌদ্ধতার্কিকগণকে পরাজিত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে নিতান্ত নির্জ্জীব করিয়া ফেলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা অদ্বৈতবাদের সমর্থন করেন নাই। সুতরাং অদ্বৈতবাদ তখনও যেন বৌদ্ধগণের আশ্রিত ছিল। কিন্তু ঠিক এই সময়ে ভর্তৃহরি ঔপনিষদসম্প্রদায়বাদী এবং ব্রহ্মনন্দী ও গৌড়পাদ বেদান্তসম্প্রদায়বাদী অদ্বৈতচিন্তাস্রোতের সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। অদ্বৈতবাদ আবার বৈদিকসম্প্রদায়ের শরণ গ্রহণ করিলেন। *

(১) ভর্তৃহরি প্রথমে অদ্বৈতবাদেরই প্রবর্তনায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু পরিশেষে ভর্তৃহরি ঔপনিষদসম্প্রদায়ে অন্তর্নিহিত হইয়া গেল। বৌদ্ধগণের মধ্যে ভর্তৃহরি যেরূপ বৌদ্ধসম্প্রদায়ের কথা শুনা যায়,

তাহাকে অসৎ বলা হইল। বৈদিক অদ্বৈতমতে রজ্জুতে সর্প মিথ্যা, রজ্জু কিন্তু সত্য, সর্প প্রতীত হইলেও নাই; কিন্তু বৌদ্ধমতে বলা হইল—সর্পও নাই রজ্জুও নাই। বৈদিকমতে জ্ঞানস্বরূপই মূলতত্ত্ব, বৌদ্ধমতে ক্ষণিক বিজ্ঞানধারাই মূলতত্ত্ব। এইরূপে বৈদিক অদ্বৈতমত বৌদ্ধমত-সংস্পর্শে বিকৃতাকার ধারণ করিল। বুদ্ধদেবের কিছু পরে নন্দ রাজার সময়, বর্ষপণ্ডিতের ভ্রাতা এবং পাণিনি মুনির গুরু 'উপবর্ষ' ব্যাসদেবের ব্রহ্মসূত্রের উপর যে বৃত্তি রচনা করেন, তাহাতে বৌদ্ধ-অদ্বৈতবাদ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না। চন্দ্রগুপ্তের সময় বাৎস্যায়ন ন্যায়ভাষ্য রচনা করিয়া বৌদ্ধ-অদ্বৈতবাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিলেন না। বৌদ্ধগণের বিকৃত অদ্বৈতবাদ এ সময় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেই থাকিল। এইরূপে বুদ্ধদেবের পর প্রায় পাঁচশত বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ খৃষ্টজন্মের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ বিক্রমাদিত্য রাজের (৫৭ পূঃ খৃষ্টাব্দ) আবির্ভাব পর্য্যন্ত অদ্বৈতমত বৌদ্ধমতের মধ্য দিয়াই প্রবলভাবে প্রচলিত হইতে থাকে।

বিক্রমাদিত্যের পাঁচশত বৎসর পর্য্যন্ত অদ্বৈতবাদের অবস্থা।

বিক্রমাদিত্যের পর পাঁচশত বৎসর পর্য্যন্ত, দেখা যায়—পাতঞ্জল ভাষ্যকার ব্যাসদেব, সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণ, বৈশেষিক ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ, মীমাংসা ভাষ্যকার শবরস্বামী, বেদান্তের ব্যাখ্যাকার দ্রবিড়াচার্য্য প্রভৃতি বৈদিক দর্শনাচার্য্যগণ শিষ্যানুক্রমে বৌদ্ধমতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া নিজ নিজ মতানুসারে বৈদিক ধর্ম্মরক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। এ সময় বৈদিক অদ্বৈতবাদের পক্ষ হইতে কেহই তাদৃশ দৃঢ়তাসহকারে মস্তক উত্তোলন করেন নাই, অথবা করিলেও তাহার কোন চিহ্নই বর্ত্তমান নাই। পক্ষান্তরে অশ্বঘোষ নাগার্জ্জুন দিঙ্নাগ অসঙ্গ বসুবন্ধু প্রভৃতি বৌদ্ধগণের বিকৃত অদ্বৈতমতের প্রভাবে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছিলেন না; বৌদ্ধগণের বিকৃত অদ্বৈতবাদেরই জয়জয়কার হইয়াছিল। এজন্ত

বুদ্ধদেবের পর প্রথম পাঁচশত বৎসর এবং তৎপরে আবার পাঁচশত বৎসর অর্থাৎ মোট এক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অদ্বৈতবাদ এক প্রকার বৌদ্ধগণের সম্পত্তিবিশেষ হইয়াছিল। এই জন্যই বোধ হয় অমরকোষে বুদ্ধের একটী নাম অদ্বয়বাদী বলা হইয়াছে।

বিক্রমাদিত্যের পাঁচশত বৎসর পরে অদ্বৈতবাদের অবস্থা।

বুদ্ধদেবের প্রায় একসহস্র বৎসর পরে, অথবা বিক্রমাদিত্যের পাঁচ শত বৎসর পরে, অর্থাৎ যে সময় উত্তর ভারতে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন এবং দক্ষিণ ভারতে চালুক্য রাষ্ট্রকূট ও পল্লভ বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতে-ছিলেন, অন্য কথায় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে, মীমাংসকাচার্য্য মহামতি প্রভাকর ও কুমারিল প্রভৃতি আচার্য্যগণ বিচারে ধর্ম্মপাল, ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রভৃতি বৌদ্ধতার্কিকগণকে পরাজিত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে নিতান্ত নির্জ্জীব করিয়া ফেলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা অদ্বৈতমতের সমর্থন করেন নাই। সুতরাং অদ্বৈতবাদ তখনও যেন বৌদ্ধগণের আশ্রিত ছিল। কিন্তু ঠিক্ এই সময়েই ভর্তৃহরি ঔপনিষদ্‌সম্প্রদায়দ্বারা এবং সুন্দরপাণ্ড্য ও গৌড়পাদ বেদান্তসম্প্রদায়দ্বারা অদ্বৈতচিন্তাস্রোতের সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। অদ্বৈতবাদ আবার বৈদিকধর্ম্মাবলম্বীর শরণ গ্রহণ করিলেন। *

(১) ভর্তৃহরি প্রকৃতপক্ষে অদ্বৈতমতেরই গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু অচিরে ভর্তৃহরির ঔপনিষদ্‌সম্প্রদায় অস্তমিত হইয়া গেল। বৌদ্ধগণের গ্রন্থে ভর্তৃহরির যেরূপ বৌদ্ধপক্ষপাতের কথা শুনা যায়,

* ঔপনিষদ্‌সম্প্রদায়ের মধ্যে ভর্তৃপ্রপঞ্চ বোধ হয়, একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। অনেকে মনে করেন এ দুইজন অভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু এরূপ মনে না করিবারও কারণ যথেষ্ট আছে। তবে এ বিষয়ে এখনও স্থির হয় নাই। শঙ্করবিজয়মতে একজন ভর্তৃহরি ঔপনিষদ্‌সম্প্রদায়ের আচার্য্য ছিলেন দেখা যায়। সুন্দরপাণ্ড্য একজন অদ্বৈতমতের আচার্য্য, ইঁহার বাক্য শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে চতুর্থ সূত্রে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহার গ্রন্থ পাওয়া যায় না বলিয়া ইঁহাকে এস্থলে গ্রহণ করা হইল না।

তাহাতে বোধ হয়, তাঁহার এই বৌদ্ধমতানুরাগই তাঁহার মতবিলোপের একটী কারণ। যে কারণে বৌদ্ধমত ভারত হইতে বিলুপ্ত হয়, সেই কারণেই বোধ হয়, তাঁহার ঔপনিষদসম্প্রদায়ও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। এদিকে গৌড়পাদের বেদান্তমতপ্রচারের প্রচেষ্টাও যে একটী কারণ নহে, তাহা বলা যায় না। আজ ঔপনিষদসম্প্রদায়ের কোন গ্রন্থই নাই। ভর্ত্তৃহরির এক বাক্যপদীয় গ্রন্থ ব্যতিরিক্ত আর কোন গ্রন্থই পাওয়া যায় না। আর তাহাও ব্যাকরণসম্প্রদায়ের গ্রন্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ, ঔপনিষদসম্প্রদায়ের গ্রন্থ নহে।

(২) **গৌড়পাদ** দেবীভাগবত পুরাণের মতে 'ছায়া শুকের' সন্তান। ইনি মাণ্ডুক্যকারিকা, সাংখ্যকারিকাভাষ্য, উত্তরগীতাভাষ্য, শ্রীবিদ্যাতন্ত্র-ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতবেদান্তের প্রচারে বদ্ধপরিকর হন। বেদান্তমতে এই সব গ্রন্থ আজ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। অন্য কোন সম্প্রদায়েরই এত প্রাচীন গ্রন্থ আজ আর পাওয়া যায় না। এজন্য বেদান্তের ইতিহাসে ইঁহাকেই এক্ষণে মূলপুরুষরূপে গ্রহণ করা হইল।

(৩) **গোবিন্দপাদ** গৌড়পাদের শিষ্য। এই গোবিন্দপাদের শিষ্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য উক্ত মাণ্ডুক্যকারিকার উপর ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এই শঙ্করাচার্য্যই অদ্বৈতবেদান্তমতের আজ প্রবর্ত্তক ও প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া পূজিত হইতেছেন। অদ্বৈতবেদান্তমত বলিতে আজ শঙ্করাচার্য্যেরই মত বুঝায়। বৌদ্ধমতসংস্পর্শে বিকৃত অদ্বৈতমতের সংস্কারে ভর্ত্তৃহরি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু গৌড়পাদই কৃতকার্য্য হন। গৌড়পাদের মত তাঁহার প্রশিষ্য শঙ্করাচার্য্য প্রচার করিলেন। সুতরাং বৌদ্ধমতসংস্পর্শে বৈদিক অদ্বৈতমত যেটুকু বিকৃত হইয়াছিল, তাহা সংশোধিত হইল, আর তাহার ফলে বৌদ্ধমতও সুতরাং অস্তমিত হইল। বৈদিক অদ্বৈতমত বৌদ্ধকবল হইতে মুক্তিলাভ করিল।

নির্দেশ অনুসারে তাঁহার প্রধান চারিজন শিষ্য ভারতের চারিপ্রান্তে চারিটী মঠ স্থাপন করিয়া গ্রন্থরচনা ও সম্প্রদায়প্রবর্তনদ্বারা বেদান্তপ্রধান বৈদিক ধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। ইঁহার সময় ৬৮৬—৭২০ খৃষ্টাব্দ।

অদ্বৈতবেদান্তধারায় বাধা ও প্রতীকারক্রমে বেদান্তের ইতিহাস।

অবশ্য আজকাল অন্যমতে বেদান্তের বহু ভাষ্যাদি পাওয়া যায়, কিন্তু সে সব ভাষ্যই শঙ্করের পরবর্তী। অধিক কি, তাহারা শঙ্করাচার্য্যের উদ্ধৃত পূর্ব্বপক্ষমতেরই বিস্তারবিশেষ। শঙ্করের পূর্ব্বের একখানিও বেদান্ত-ভাষ্য আজ আর পাওয়া যায় না। এই সব ভাষ্যের মূল মত শঙ্করের পূর্ব্বেও ছিল, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ শঙ্করের পূর্ব্বেই বৌদ্ধাদির সংঘর্ষে বিনষ্ট হয় এবং অবশিষ্টাংশ শঙ্করাভ্যুদয়ে বিলুপ্ত হয়। * এজন্য ঋষিপ্রণীত গ্রন্থের পর, লভ্যমান সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ অনুসারে, যদি বেদান্তচিন্তাস্রোতের মূল নির্ণয় করিতে হয়—যদি জীবিত সম্প্রদায় অনুসারে বেদান্তচিন্তার প্রস্রবণ নির্ণয় করিতে হয়—তাহা হইলে গৌড়পাদ ও শঙ্করের অদ্বৈতবেদান্তধারাকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। অদ্বৈতবেদান্তচিন্তাধারাই আজ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ধারা। ইহা হইতেই ইতিহাস আরম্ভ করিতে হয়। বস্তুতঃ, বেদান্তচিন্তা-স্রোতের ইতিহাস এই স্থান হইতেই যথাক্রমে পাওয়া যায়। ইহার পূর্ব্বের ইতিহাস, গ্রন্থাভাবে সঙ্কলন করিতে পারা যায় না। বলা বাহুল্য, আমরা এস্থলে যাঁহাদের সংস্কৃত ভাষায় বেদান্তগ্রন্থ আছে, তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই বেদান্তের এই ইতিহাস সঙ্কলন করিতেছি। কারণ, যে অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থের স্থাননির্ণয়ের জন্য এই ইতিহাস সংকলিত হইতেছে, সেই গ্রন্থখানি সংস্কৃত ভাষাতেই লিখিত। তাহার পর এই

---

* রামানুজাচার্য্য ও মাধ্বাচার্য্যের গ্রন্থে যে সব প্রাচীন ভাষ্যকারের নাম পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে বোধায়ন, উপবর্ষ, ভারুচি, কপর্দ্দী, ভর্তৃহরি, ভর্তৃপ্রপঞ্চ, বিতুস্বামী, দ্রবিড়াচার্য প্রভৃতি নামগুলি উল্লেখযোগ্য।

ইতিহাসসঙ্কলন অদ্বৈতবেদান্তচিন্তাস্রোতে "বাধা ও তাহার প্রতীকার"—এই ক্রমে বর্ণিত করিতেছি। কারণ, এই বেদান্তমতে যে সব গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহা অদ্বৈতমতখণ্ডনার্থ এবং অদ্বৈতমতস্থাপনার্থ। অদ্বৈত-বেদান্তমতের বিরোধী আচার্য্যগণ, অদ্বৈতমতের প্রচারে, তাহার খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আর তাহা দেখিয়া অদ্বৈত আচার্য্যগণ স্বপক্ষস্থাপনার্থ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন—এইরূপেই বস্তুতঃ এই বেদান্তচিন্তাধারা অদ্যাবধি প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। অদ্বৈতমতটী লভ্যমান সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থপরিপুষ্ট বলিয়া, আর সেই অদ্বৈতবেদান্তমতের খণ্ডনরূপেই দ্বৈতাদি বেদান্তমতসমূহ বলিয়া সেই দ্বৈতাদি বেদান্তমত-ধারাকে অদ্বৈতমতে বাধা বলিয়া কল্পনা করা হইল। বস্তুতঃ, অদ্বৈত-মতের প্রভাব বিস্তৃত না হইলে, অদ্বৈতমতে বেদান্তের ভাষ্যাদি রচিত না হইলে—পরবর্ত্তী এই সব দ্বৈতাদিমতের ভাষ্যাদি জন্মিত কি না, তাহা নিতান্তই সন্দেহের বিষয়।

শঙ্করশিষ্যগণের সময় অদ্বৈতবেদান্তের অবস্থা।

আচার্য্য শঙ্করের বহু শিষ্যের মধ্যে পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, হস্তামলক ও তোটকাচার্য্য—এই চারিজন শিষ্য প্রধান। ইঁহাদের মধ্যে আবার, পদ্মপাদাচার্য্য এবং এবং সুরেশ্বরাচার্য্যই গ্রন্থরচনায় প্রধান।

(১) পদ্মপাদাচার্য্য শঙ্করাচার্য্যকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের উপর বেদান্ত-ডিণ্ডিম নামক টীকা রচনা করিয়া বেদান্তভাষ্যধারায় এবং শঙ্করকৃত-প্রপঞ্চসার তন্ত্রের উপর একখানি টীকাগ্রন্থ রচনা করিয়া স্বতন্ত্রগ্রন্থ ধারার পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। শুনা যায়—তিনি শঙ্করের দিগ্বিজয় বর্ণনা করিয়া একখানি শঙ্করচরিত্র গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। উহারই, ত্রংকালনষ্ট কিয়দংশ, প্রায় ১৫০০ শ্লোক, মাধবীয় শঙ্করবিজয়ের টীকা-মধ্যে ধনপতিসূরী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বেদান্তডিণ্ডিম টীকা পদ্মপাদের জীবদ্দশায় নষ্ট হয়, উহার মধ্যে ৫টী সূত্রের ভাষ্যের উপর টীকা,

মাত্র পাওয়া যায়, ইহার নাম পঞ্চপাদিকা। কিন্তু ইহা এতই গম্ভীর ও সারার্থপূর্ণ যে, তাহার টীকা, টীকার টীকা প্রভৃতি বহুগ্রন্থ, বহুপণ্ডিত-শিরোমণি রচনা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া গিয়াছেন। এই পদ্মপাদ, শেষজীবন পুরীধামে গোবর্দ্ধন মঠে অতিবাহিত করেন।

(৬) **সুরেশ্বরাচার্য্যের** পূর্ব্বনাম মীমাংসকাচার্য্য মণ্ডনমিশ্র। ইনি বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিক, তৈত্তিরীয়ভাষ্যবার্ত্তিক, পঞ্চীকরণবার্ত্তিক, ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি, দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রটীকা মানসোল্লাস প্রভৃতি রচনা করিয়া বেদান্তের ভাষ্যধারার পুষ্টি করেন এবং ব্রহ্মসিদ্ধি, নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি এবং স্বারাজ্যসিদ্ধি গ্রন্থরচনাদ্বারা বেদান্তের স্বতন্ত্রগ্রন্থধারার পুষ্টিসাধন করেন। ইনি পূর্ব্বাশ্রমে মীমাংসামতাবলম্বী ছিলেন, শঙ্করের সহিত বিচারে পরাজিত হইয়া অদ্বৈতবেদান্তমতাবলম্বী হন। ইহার সময় ইহার তুল্য পণ্ডিত ভারতে আর কেহ ছিলেন না। ইহার সময় ৬১৫—৭৭৩ খৃষ্টাব্দ।

(৭) **হস্তামলকাচার্য্যকৃত** একখানি হস্তামলক নামক ১৪টী শ্লোকাত্মক গ্রন্থ আছে। আচার্য্য শঙ্কর তাহার ভাষ্য করিয়াছেন।

(৮) **তোটকাচার্য্যের** একটী গুরুস্তবমাত্র আছে। ইহার কৃত অন্যকোন গ্রন্থ নাই।

অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে প্রথম বাধা।

আচার্য্য শঙ্করের তিরোধানের পরই, শঙ্করের শিষ্যবর্গের বেদান্ত-প্রচারের সময় এই বেদান্তস্রোতে প্রথম বাধা উপস্থিত হয়। একদিকে বৌদ্ধপণ্ডিত শান্তরক্ষিত ও তাঁহার শিষ্য কমলশীল এবং জৈনপণ্ডিত বিদ্যানন্দ ও মাণিক্যনন্দী এবং অন্যদিকে বেদমার্গী দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ভাস্করাচার্য্য, নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট ও শিবাদিত্য বা ব্যোমশিবাচার্য্য এই বাধা উপস্থাপিত করেন। শান্তরক্ষিত 'তত্ত্বসংগ্রহ' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাঁহার শিষ্য কমলশীল তাহার টীকা রচনা করেন। উভয়ই বৌদ্ধমতস্থাপন এবং অদ্বৈতপ্রভৃতি অপরাপর মতখণ্ডন করেন।

অতএব দেখা যাইতেছে অদ্বৈতবেদান্তচিন্তাস্রোতে বৌদ্ধাচার্য্য—

(৯) **শান্তরক্ষিত**—তত্ত্বসংগ্রহ গ্রন্থদ্বারা প্রথম বাধা উৎপাদন করিলেন এবং তৎপরে তাঁহার শিষ্য—

(১০) **কমলশীল**—উক্ত তত্ত্বসংগ্রহগ্রন্থের টীকা রচনা করিয়া এই বাধার পুষ্টিসাধন করিলেন।

(১১) **বিদ্যানন্দ**—একজন প্রসিদ্ধ জৈনপণ্ডিত। ইনি তাঁহার গুরু অকলঙ্ককৃত অষ্টশতী গ্রন্থের উপর অষ্টসাহস্রী নামক টীকা রচনা করিয়া এবং অপর গ্রন্থাদির দ্বারা অদ্বৈতমত খণ্ডন করেন। বিদ্যানন্দ, সুরেশ্বরের বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিক হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(১২) **মাণিক্যনন্দী**ও—একজন জৈনপণ্ডিত। ইনি পরীক্ষামুখ প্রভৃতি অপরাপর গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতমত খণ্ডন করেন।

ওদিকে উপবর্ষসম্প্রদায়ভুক্ত দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ও জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদী—

(১৩) **ভাস্করাচার্য্য**—মাধবীয় শঙ্করবিজয়ের মতে শঙ্করের সহিত বিচারে পরাজিত হইলেও পরে বেদান্তদর্শনের উপর একখানি ভাষ্য রচনা করিয়া শঙ্করের অদ্বৈতমত খণ্ডন করেন। এই সময়েই নৈয়ায়িক—

উক্ত প্রথম বাধার প্রতীকার।

অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে এই প্রথম বাধার প্রতীকারকল্পে অদ্বৈতবেদান্ত-সম্প্রদায়ের পক্ষে সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি, অবিমুক্তাত্মভগবান্, বোধঘনাচার্য্য, বাচস্পতিমিশ্র ও প্রকাশাত্মযতি প্রভৃতি বদ্ধপরিকর হন। যথা—

(১৬) **সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি**—সুরেশ্বরাচার্য্যের শিষ্য। ইনি সংক্ষেপশারীরক নামক এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের প্রাধান্য রক্ষা করেন। ইনি শঙ্করের প্রকরণগ্রন্থধারারই পুষ্টি করেন। ইঁহার সময় অনুমান ৭১০—৮১০ খৃষ্টাব্দ।

(১৭) **অবিমুক্তাত্মভগবান্**—অব্যয়াত্মভগবানের শিষ্য। ইনি ইষ্টসিদ্ধি নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া এই বাধার প্রতীকার করেন। ইনিও শঙ্করের প্রকরণগ্রন্থের ধারারই পুষ্টি করেন। ইঁহার সময় বোধ হয় ৯ম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ।

(১৮) **বোধঘনাচার্য্য**—সুরেশ্বরাচার্য্যের শিষ্য। ইঁহার সময় ৭৫৮ হইতে ৯৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। ইনি তত্ত্বসিদ্ধি নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতবেদান্তমতের প্রাধান্য রক্ষা করেন। ইঁহার দ্বারাও শঙ্করের প্রকরণধারারই পুষ্টি হয়।

(১৯) **বাচস্পতি মিশ্র**—প্রায় ৮০১ হইতে ৮৮১ খৃষ্টাব্দ। ইনি বেদান্তের শাঙ্করভাষ্যের উপর ভামতী নামক টীকা রচনা করিয়া এবং সুরেশ্বরের ব্রহ্মসিদ্ধির উপর ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষা নামক টীকা রচনা করিয়া উক্ত প্রথমবাধা বিধ্বস্ত করিয়া দেন। ইনি বেদান্তমতের এই গ্রন্থদ্বয় ব্যতীত, পাতঞ্জলের ব্যাসভাষ্যের টীকা, ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকার উপর টীকা, মণ্ডনমিশ্রের বিধিবিবেকের উপর ন্যায়কণিকা নামক টীকা, ন্যায়দর্শনের ভাষ্যবার্ত্তিকের উপর তাৎপর্য্যটীকা এবং ন্যায়সূচীনিবন্ধ নামক টীকা রচনা করিয়া ভারতীয় দর্শনরাজ্যে অতুলনীয় কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ইনি শঙ্করের ভাষ্যধারারই পুষ্টি বিধান করেন।

(২০) **প্রকাশাত্মযতি**—অনন্তানুভবের শিষ্য। ইনি পদ্মপাদকৃত ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যের বেদান্তডিণ্ডিম টীকার চারিটী সূত্রের যে টীকাংশ, যাহা পঞ্চপাদিকা নামে বিখ্যাত, তাহার উপর পঞ্চপাদিকাবিবরণ নামে এক টীকা রচনা করিয়া উক্ত বাধার সম্পূর্ণরূপে প্রতীকার করেন। ইনিও শঙ্করের ভাবধারারই পুষ্টি সাধন করেন। ইঁহার সময় খুব সম্ভব ৯ম শতাব্দী।

প্রথম বাধাপ্রতীকারের ফল।

অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে এই প্রথম বাধা প্রতিহত হইবার ফলে অব্যবহিত পরবর্ত্তী কালে আবির্ভূত নৈয়ায়িকধুরন্ধর মহাপণ্ডিতবর্গ অদ্বৈতমতের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। ন্যায়শাস্ত্রে সর্ব্বনাম ও সর্ব্বপ্রধান আচার্য্য উদয়নাচার্য্য এবং শ্রীধরাচার্য্য অদ্বৈত-মতের উপর বিশেষভাবে আস্থাবান হইয়াছিলেন। উদয়নাচার্য্য নিজেকে "মায়ার ব্যাপারী" বলিয়া অদ্বৈতমতের উপর সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং শ্রীধরাচার্য্য "অদ্বয়সিদ্ধি" নামক একখানি অদ্বৈত-মতের গ্রন্থই রচনা করেন।

(২১) **উদয়নাচার্য্যের** গ্রন্থ ন্যায়তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি, আত্মতত্ত্ব-বিবেক, লক্ষণাবলী, কিরণাবলী, কুসুমাঞ্জলী, প্রভৃতি। ইঁহার সময় সম্ভবতঃ ৯৪৪ হইতে ১০৪৪ খৃষ্টাব্দ।

অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে দ্বিতীয় বাধার সূচনা ও তাহাতেই বাধা।

অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে প্রথম বাধা প্রতিহত হইতে না হইতেই দ্বিতীয় বাধার সূচনা হইল। নৈয়ায়িক—

(২৩) **বল্লভাচার্য্য**—(৯৮৪—১১৭৮ খৃঃ) ন্যায়মতানুসারে ন্যায়-লীলাবতীগ্রন্থে দ্বৈতমতের উপর আস্থাপ্রদর্শন করায় অদ্বৈতমতের এক-প্রকার খণ্ডনই করা হইল। ওদিকে মীমাংসক—

(২৪) **পার্থসারথী মিশ্র**—শাস্ত্রদীপিকা, তন্ত্ররত্ন, ন্যায়রত্নমালা প্রভৃতি গ্রন্থে দ্বৈতাদ্বৈতমতের প্রতি অনুরাগাধিক্য প্রদর্শন করিলেন ও অদ্বৈতমতের খণ্ডনই করিলেন। এদিকে শ্রীরঙ্গমে—

(২৫) **যামুনাচার্য্য**—(৯১৬—১০৪২ খৃষ্টাব্দ) বিশিষ্টাদ্বৈতমতে সিদ্ধিত্রয়, গীতাতাৎপর্য্যনির্ণয়, স্তোত্ররত্ন এবং আগমপ্রামাণ্য নামক গ্রন্থ প্রচার করিয়া অদ্বৈতমত খণ্ডন করিলেন। কিন্তু কাঞ্চীর অদ্বৈতবাদী—

(২৬) **যাদবপ্রকাশ**—ব্রহ্মসূত্রের উপর ভাষ্য রচনা করিয়া এক-প্রকার অদ্বৈতবাদেরই প্রচার করিতেছিলেন। যামুনাচার্য্য যাদব-প্রকাশের সহিত কখনই বিচারে প্রবৃত্ত হন নাই।

ওদিকে মীমাংসক পার্থসারথীর মত অদ্বৈতবিরোধী হইলেও অদ্বৈত-বাদিগণ ব্যবহারে মীমাংসামতাবলম্বীই বটে, এবং বাচস্পতিমিশ্র ন্যায়-ভাষ্যতাৎপর্য্যটীকা লিখিয়াও অদ্বৈতবাদী বলিয়া বল্লভাচার্য্যের বাধাও বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। এজন্য এই বাধাকে প্রকৃত বাধা বলা যাইতে পারে না। ইহাকে দ্বিতীয় বাধার সূচনামাত্রই বলা যাইতে পারে।

● অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে দ্বিতীয় বাধা।

এই দ্বিতীয় বাধার সূচনাটী রামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈতমতের ভিতর দিয়া এবং শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীকণ্ঠাচার্য্য ও শ্রীকরাচার্য্য, শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদী অভিনবগুপ্ত, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী নিম্বার্কাচার্য্য এবং

শ্রীনিবাসাচার্য্যের ভিতর দিয়া অতি ভীষণভাবে আত্মপ্রকাশ করিল। ইহাদের পরিচয়, যথা—

(২৭) **রামানুজাচার্য্য**—(১০১৭-১১৩৭খৃষ্টাব্দ) অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে যে দ্বিতীয় বাধা উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই অতি ভীষণ। এ পর্য্যন্ত অদ্বৈতবাদ এরূপ বাধার সম্মুখীন হয় নাই। তিনি একদিকে দিগ্বিজয় এবং অন্যদিকে গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতবাদখণ্ডনে প্রবৃত্ত হন। ব্যাসের ব্রহ্মসূত্রের উপর শ্রীভাষ্য নামক ভাষ্য, বেদান্তদীপ নামক টীকা, এবং বেদান্তসার নামক বৃত্তি, উপনিষদের তাৎপর্য্যনির্ণয়জন্য বেদার্থসারসংগ্রহ নামক গ্রন্থ, গীতাভাষ্য, ভগবদারাধন এবং গদ্যত্রয় নামক গ্রন্থ রচনা করেন। অদ্যাবধি রামানুজ সম্প্রদায় যথেষ্ট প্রবল।

(২৮) **শ্রীকণ্ঠাচার্য্য**—শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। ইঁহার সময় রামানুজের অব্যবহিত পরে বোধ হয়। ইনি ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের উপর এক ভাষ্য রচনা করেন। ইনিও অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়াছেন, কিন্তু, তাহা রামানুজের মত অত ভীষণভাব ধারণ করে নাই। এই মতবাদ অনেকটা রামানুজাচার্য্যেরই অনুরূপ।

(২৯) **শ্রীকরাচার্য্য**—ঐরূপ মতবাদী। ইনিও ব্রহ্মসূত্রের উপর একখানি ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। শৈব লিঙ্গায়েৎগণের মধ্যে একোরাম সম্প্রদায়ের ইনি এক জন আচার্য্য।

(৩০) **অভিনবগুপ্ত**—(৯৫০—১০১৫ খৃঃ) শৈব প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের বা শৈব অদ্বৈতবাদের একজন প্রধান আচার্য্য। অভিনবগুপ্ত ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই, কিন্তু তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। যথা—পরমার্থসার, বোধপঞ্চদশিকা, তন্ত্রসার, তন্ত্রালোক, পরাত্রিংশিকা ভাষ্য তন্ত্রবটধানিক ইত্যাদি। ইনি গীতার উপর ভাষ্য করিয়াছেন বলিয়া ইঁহাকে বৈদান্তিক বলা যাইতে পারে। জীব ও শিব অভিন্ন বলিলেও শিবশক্তিকে সম্পূর্ণ অভিন্ন ইনি বলেন নাই।

(৩১) **নিম্বার্কাচার্য্য**—দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ও বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত। তৈলঙ্গদেশে নিম্বনামক গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ব্রহ্মসূত্রের উপর বেদান্তপারিজাতসৌরভনামক ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অদ্বৈতমতখণ্ডন না করিলেও ইঁহার ভাষ্যাবলম্বনে ইঁহার শিষ্য-সম্প্রদায় অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়াছেন। ইঁহার সময়, রামানুজাচার্য্যের সন্নিকটবর্ত্তী বলিয়াই বোধ হয়।

(৩২) **শ্রীনিবাসাচার্য্য**—নিম্বার্কাচার্য্যের শিষ্য। ইনি ব্রহ্মসূত্রের উপর "বেদান্তকৌস্তুভ" নামক ভাষ্য রচনা করিয়া গুরুমতেরই অনুসরণ করিয়াছেন।

যাহা হউক, এই সকল আচার্য্য অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে দ্বিতীয় বাধার সৃষ্টিতে অগ্রণী বলা যাইতে পারে। শত্রুবিজয়ের পর যেমন গৃহ বিবাদ আরম্ভ হয়, তদ্রূপ কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধাদি বিজয় করিবার পর শঙ্করাচার্য্য বেদান্তসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিলে এই সকল আচার্য্যের মধ্য দিয়া গৃহবিবাদ আরম্ভ হইল।

দ্বিতীয় বাধার প্রতীকার।

অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে এই দ্বিতীয় বাধার প্রতীকারকল্পে অদ্বৈত-সম্প্রদায়ের তিন জন আচার্য্যের নাম করা যাইতে পারে। যথা—শ্রীহর্ষাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণমিশ্র যতি এবং চিৎসুখ। ইঁহাদের পরিচয়, যথা—

(৩৩) **শ্রীহর্ষাচার্য্য**—প্রায় ১১৫০ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জে আবির্ভূত হন। ইনি শঙ্করাচার্য্যের প্রকরণ গ্রন্থের ধারা ধরিয়া খণ্ডনখণ্ডখাদ্য নামক গ্রন্থ লিখিয়া যাবতীয় মতবাদীর মত এমনভাবে খণ্ডন করেন যে, প্রতিপক্ষগণের মত একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ইঁহার অপর গ্রন্থ যথা—অর্ণববর্ণন, শিবশক্তিসিদ্ধি, সাহসাঙ্কচরিত, ছন্দঃপ্রশস্তি, বিজয়প্রশস্তি, গৌড়োর্বীশকুলপ্রশস্তি, ঈশ্বরাভিসন্ধি, স্থৈর্য্যবিচারণপ্রকরণ, নৈষধচরিত ইত্যাদি। একা শ্রীহর্ষই এই দ্বিতীয় বাধার প্রতীকারে যথেষ্ট হন।

(৩৪) **শ্রীকৃষ্ণমিশ্র যতি**—ইনি প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক নামক একখানি অদ্বৈতসিদ্ধান্তানুকূল গ্রন্থ রচনা করিয়া এই সময় অদ্বৈতবাদ-প্রচারের বিশেষ সহায়তা করেন। ইনি এই নাটক রচনা করিবার পর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অদ্বৈতবাদীর আদর্শস্থানীয় হন।

(৩৫) **চিদ্বিলাস** বা **অদ্বৈতানন্দ**—শ্রীহর্ষের বৃদ্ধ বয়সে প্রবল হইয়া উঠেন। অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ দেশে ইহার আবির্ভাব হয়। প্রবাদ আছে—ইনি না কি শ্রীহর্ষকেও বিচারে পরাজিত করিয়াছিলেন। পরমতখণ্ডনে যেমন শ্রীহর্ষ, স্বমতস্থাপনে তদ্রূপ অদ্বৈতানন্দ অদ্বিতীয় হন। ইনি শাঙ্করভাষ্যের উপর ব্রহ্মবিদ্যাভরণ নামক এক অতি অপূর্ব্ব টীকা রচনা করিয়া শঙ্করের ভাষ্যধারার বিশেষ পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত শান্তিবিবরণ ও গুরুপ্রদীপ গ্রন্থও ইনি রচনা করিয়াছিলেন। ১১৬৬—১১৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহার গ্রন্থকর্ত্তৃজীবন বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, দ্বিতীয় বাধার প্রতীকারে এক্ষণে এই প্রধান তিন জনের নাম পাওয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ, ইহাদের দ্বারা অদ্বৈতমতবিরোধের যে কেবল যথেষ্ট প্রতীকার হয়, তাহা নহে, কিন্তু অদ্বৈতমত আরও অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

তৃতীয় বাধা। (১২শ শতাব্দী)

এক্ষণে দ্বিতীয় বাধা প্রশমিত হইতে না হইতেই ন্যায়শাস্ত্রের দিক্ দিয়া তৃতীয় বাধার সূচনা হইল। মহামতি গঙ্গেশোপাধ্যায় এবং তৎপুত্র বর্দ্ধমানোপাধ্যায় ইহার হেতু হইলেন। অন্যদিক্ দিয়া নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের পুরুষোত্তমাচার্য্য, দেবাচার্য্য এবং সুন্দরভট্ট, রামানুজসম্প্রদায়ের দেবরাজাচার্য্য এবং বরদাচার্য্য বা বরদার্য্য অদ্বৈতমতখণ্ডনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাদের বিবরণ এইরূপ—

(৩৬) **গঙ্গেশোপাধ্যায়**—১১৭৮—১২৩৮ খৃষ্টাব্দ। ইনি নব্যন্যায়ের প্রাকস্বরূপ তত্ত্বচিন্তামণি নামক গ্রন্থ লিখিয়া ন্যায়ের দ্বৈতসিদ্ধান্ত

প্রচার করেন। ইহাতে তিনি শ্রীহর্ষের খণ্ডনখণ্ডখাদ্যেরও মধ্যে মধ্যে প্রতিবাদ করিতে ত্রুটী করেন নাই।

(৩৭) **বৰ্দ্ধমানোপাধ্যায়**—১১৯৮—১২৫৮ খৃষ্টাব্দ। ইনি গঙ্গেশোপাধ্যায়ের উপযুক্ত পুত্র। ইনি পিতার চিন্তামণির টীকা করিয়া এবং উদয়নাচার্য্যের কুসুমাঞ্জলি প্রভৃতি গ্রন্থের টীকা করিয়া ন্যায়মতের বিশেষ প্রচার করেন। সুতরাং ইনিও দ্বৈতবাদেরই প্রচার করেন।

(৩৮) **পুরুষোত্তমাচার্য্য**—দ্বৈতাদ্বৈতবাদী নিম্বার্কসম্প্রদায়ভুক্ত। ইনি নিম্বার্কাচার্য্যের শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্যের অনুসরণ করিয়া বেদান্তরত্নমঞ্জুষা নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়া স্বমতের পুষ্টি ও অদ্বৈতমত খণ্ডন করেন।

(৩৯) **দেবাচার্য্য**—এই নিম্বর্কাচার্য্য প্রবর্ত্তিত দ্বৈতাদ্বৈতসম্প্রদায়ভুক্ত। ইঁহার জন্ম সময় ১০৫৫ খৃষ্টাব্দ। ইনি নিম্বার্কভাষ্যের চতুঃসূত্রীর উপর বেদান্তজাহ্নবী নামক এক বৃত্তি রচনা করিয়া অদ্বৈতমত বিশেষভাবে খণ্ডন করেন। ইঁহার গুরু কৃপাচার্য্য। ইঁহার শিষ্য—

(৪০) **সুন্দরভট্ট**—সিদ্ধান্তজাহ্নবীর উপর সিদ্ধান্তসেতুক নামক টীকা রচনা করিয়া গুরুর কার্য্যের বিশেষভাবে পুষ্টিসাধন করেন।

(৪১) **দেবরাজাচার্য্য**—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজাচার্য্যসম্প্রদায়ের আচার্য্য। ইনি বরদাচার্য্যের পিতা, এবং শ্রুতপ্রকাশিকাকার সুদর্শনাচার্য্যের গুরু। ইনি বিম্বতত্ত্বপ্রকাশিকা নামক গ্রন্থ লিখিয়া অদ্বৈতমতের প্রতিবিম্ববাদ খণ্ডন করেন।

(৪২) **বরদার্য্য বা বরদাচার্য্য**—ইনিও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজসম্প্রদায়ভুক্ত। ইনি রামানুজাচার্য্যের ভাগিনেয় ও শিষ্য। ইঁহার পিতা দেবরাজাচার্য্য। দেবরাজাচার্য্য শ্রুতপ্রকাশিকাকার সুদর্শনাচার্য্যের গুরু। সুদর্শনাচার্য্য ইঁহার নিকট শ্রীভাষ্যের ব্যাখ্যা শুনিয়া শ্রুতপ্রকাশিকা রচনা করিয়াছিলেন। ইনি তত্ত্বনির্ণয় গ্রন্থ লিখিয়া বিস্তৃত পরপক্ষ প্রতিক্ষেপ করেন ও অদ্বৈতমত খণ্ডন করেন।

যাহা হউক অদ্বৈতবেদান্তচিন্তাস্রোতে তৃতীয় বাধায় এই কয়জনকে অগ্রণী বলা যাইতে পারে। তথাপি এই বাধায় নৈয়ায়িকগণ যেরূপ প্রবল হইয়াছিলেন নিম্বার্ক বা রামানুজসম্প্রদায় সেরূপ প্রবল হন নাই।

তৃতীয় বাধার প্রতীকার।

এক্ষণে অদ্বৈতবেদান্তচিন্তাস্রোতে এই তৃতীয় বাধার প্রতীকারকল্পে আমরা মহামতি বাদীন্দ্রাচার্য্য, আনন্দবোধেন্দ্র ভট্টারক এবং জ্ঞানোত্তমাচার্য্যকে প্রধান বলিয়া মনে করিতে পারি। ইঁহাদের পরিচয় এই—

(৪৩) **বাদীন্দ্র বা বাগীশ্বরাচার্য্য** বা সর্ব্বজ্ঞ বা মহাদেব—এই সময় (১৩—১৪শ শতাব্দী) নব্যন্যায়ে একজন অতি ধুরন্ধর পণ্ডিত হইয়া অদ্বৈতবেদান্তমতসমর্থনে প্রবৃত্ত হন। ইনি মহাবিদ্যাবিড়ম্বন নামক এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ লিখিয়া ন্যায়মতের বিরুদ্ধে অখণ্ডনীয়ভাবে অদ্বৈতমতের পুষ্টি করেন। ইঁহার গুরু—যোগীশ্বর বা শঙ্কর। ইনি কিরণাবলীর উপর রসসার টীকা করিয়াছিলেন। হরিভদ্রসূরির ষড়্দর্শনের টীকাকার গুণরত্নের নিকট ইনি ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন। ইঁহার শিষ্য ভট্টরাঘব ভাসর্ব্বজ্ঞের ন্যায়সারের উপর ন্যায়সারবিচার নামক এক টীকা লিখিয়াছেন। জৈন ভুবনসুন্দর মহাবিদ্যাবিড়ম্বনের উপর ব্যাখ্যানদীপিকা নামক এক টীকা লিখিয়াছেন। ইঁহার মধ্যজীবন ১২১০—১২৪৭ খৃষ্টাব্দ। চিৎসুখাচার্য্যও ইঁহার নাম করিয়াছেন।

(৪৪) **আনন্দবোধেন্দ্র ভট্টারক**—ইনি ১২২৮ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণদেশে বিখ্যাত হন। ইনি নব্যন্যায়ের সূক্ষ্মতা লইয়া ন্যায়মকরন্দ, প্রমাণমালা এবং ন্যায়দীপাবলী প্রভৃতি কয়েকখানি অদ্বৈতমতের গ্রন্থ লিখিয়া এই সময় অদ্বৈতমতের বিশেষ পুষ্টিসাধন করেন এবং যোগবাশিষ্ঠের টীকা করিয়া অদ্বৈতমতের যথেষ্ট প্রচার করেন।

(৪৫) **আনন্দপূর্ণবিদ্যাসাগর**—ইঁহার সময় ১২৫২-১৪০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বলা হয়। ইঁহার বিদ্যাগুরু বেদগিরি এবং দীক্ষাগুরু অভয়ানন্দ।

ইনি শ্রীহর্ষের খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের উপর ফক্কিকাবিভঞ্জন নামক টীকা রচনা করিয়া এবং বাদীন্দ্রের মহাবিদ্যাবিড়ম্বনের উপর এক টীকা রচনা করিয়া ন্যায়মতের বিরুদ্ধে অদ্বৈতমতের দৃঢ়তায় বিশেষ সহায়তা করেন। এতদ্ভিন্ন ইনি পদ্মপাদের পঞ্চপাদিকার উপর এক টীকা, সুরেশ্বরের ব্রহ্মসিদ্ধির উপর ভাবশুদ্ধি নামে এক টীকা, প্রকাশাত্মযতিকৃত পঞ্চপাদিকাবিবরণের উপর সমন্বয়সূত্রবিবৃতি নামে এক টীকা, মহাভারতের মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়ের উপর টীকারত্ন নামক এক টীকা, সুরেশ্বরের বৃহদারণ্যকবার্ত্তিকের উপর ন্যায়কল্পলতিকা নামে এক টীকা, বৈশেষিকমতে ন্যায়চন্দ্রিকা নামক এক গ্রন্থ রচনা করিয়া শঙ্করের ভাষ্যধারা এবং প্রকরণ গ্রন্থধারার বিশেষ পুষ্টিসাধন করিয়াছেন।

(৪৬) **জ্ঞানোত্তমাচার্য্য**—ইনি মহামতি চিৎসুখাচার্য্যের গুরু। ইনি এই সময় এই ১২শ ও ১৩শশতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত হইয়া অদ্বৈতমতের বিশেষ পুষ্টি বিধান করেন। ইঁহার অপর নাম গৌড়েশ্বরাচার্য্য ছিল। ইনি সুরেশ্বরাচার্য্যের নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির উপর চন্দ্রিকা টীকা, ব্রহ্মসিদ্ধির উপর বেদান্তন্যায়সুধা টীকা, এবং জ্ঞানসিদ্ধি নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের বিশেষ সহায়তা করেন। সম্ভবতঃ, ইনি পূর্ব্বাশ্রমে চোল দেশের মঙ্গল গ্রামনিবাসী মিশ্রকুলসম্ভূত একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন।

যাহা হউক বাদীন্দ্র ও আনন্দবোধ যেমন অদ্বৈতমতকে পরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন, আনন্দপূর্ণ ও জ্ঞানোত্তম তদ্রূপ শঙ্করের ভাষ্যধারা ও প্রকরণ গ্রন্থের ধারার পুষ্টি বিধান করেন। এইরূপে এই তৃতীয় বাধার প্রতীকারে আমরা এই চারি ব্যক্তিকে প্রধানরূপে প্রাপ্ত হই।

চতুর্থ বাধা।

কিন্তু এইভাব অধিকদিন স্থায়ী হইবার পূর্ব্বেই অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে চতুর্থ বাধা দেখা দিল। এই বাধায় অগ্রণী হইলেন—দ্বৈতবাদী শ্রীমন্

(৪৮) **ত্রিবিক্রমাচার্য্য**—মধ্বাচার্য্যের নিকট বিচারে পরাজিত হইয়া অদ্বৈতমত ত্যাগ করিয়া দ্বৈতমত গ্রহণ করেন। ইনি পূর্ব্বাশ্রমে উষাহরণকাব্য এবং পরে মধ্বাচার্য্যকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের উপর পদার্থপ্রদীপিকা নামে এক টীকা রচনা করেন। ইহার এই গ্রন্থ সুতরাং অদ্বৈতমতের বাধার পুষ্টি সাধন করে। ইঁহার অদ্বৈতমতের কোন গ্রন্থ নাই।

(৪৯) **পদ্মনাভাচার্য্য**—পূর্ব্বে অদ্বৈতবাদী ছিলেন পরে মধ্বাচার্য্যের নিকট বিচারে পরাজিত হইয়া দ্বৈতবাদী হন। ইনি মাধ্বমতে পদার্থসংগ্রহ ও তাহার টীকা মধ্বসিদ্ধান্তসার রচনা করিয়া মধ্বমতের প্রচার করেন। ইঁহারও অদ্বৈতমতের কোন গ্রন্থ নাই।

(৫০) **বরদাচার্য্যনড়াতুম্মল**—ইনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য্য। ইনি সুদর্শনাচার্য্যের গুরু নবরাচার্য্যের পৌত্র ও শিষ্য। ইহার গ্রন্থ তত্ত্বসার এবং সারার্থচতুষ্টয়। ইঁহারও কীর্ত্তি অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে বাধাস্বরূপ হয়।

(৫১) **বীররাঘবাচার্য্য**—ইনিও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী এবং সুদর্শনাচার্য্যের গুরু বরদাচার্য্যের অন্য এক শিষ্য। ইনি উক্ত তত্ত্বসার গ্রন্থের উপর রত্নপ্রসারিণী নামক টীকা রচনা করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের পুষ্টি করেন এবং অদ্বৈতমতে বাধাস্বরূপ হন।

(৫২) **গৌড় পূর্ণানন্দ কবিচক্রবর্ত্তী**—ইনি ন্যায়মতানুসরণ করিয়া বঙ্গদেশে এই সময় মায়াবাদ শতদূষণী বা তত্ত্বমুক্তাবলী নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। মাধবাচার্য্য ইঁহার নাম করিয়াছেন। এজন্য ইনি সম্ভবতঃ এই সময়ই আবির্ভূত বলিয়া বোধ হয়।

এইরূপে এই সময় এই কয় মহাত্মার চেষ্টা, অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে চতুর্থ বাধাস্থানীয় হয়। তবে মধ্বাচার্য্যের বাধাই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণাকার হয়।

চতুর্থ বাধার প্রতীকার।

এই চতুর্থ বাধার প্রতীকারকল্পে আমরা অদ্বৈতবেদান্তমতের পক্ষ হইতে পাঁচজন মহাপণ্ডিত সাধকের নাম পাই, যথা—চিৎসুখাচার্য্য, শঙ্করানন্দ বা বিদ্যাশঙ্কর, শ্রীধরস্বামী, প্রত্যক্‌স্বরূপভগবান্ এবং অমলানন্দযতি। ইঁহাদের পরিচয় এই—

(৫৩) **চিৎসুখাচার্য্য**—১৩শ শতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত হন। ইঁহার গুরু জ্ঞানোত্তমাচার্য্য। ইনি দক্ষিণভারতে কামকোটি মঠে অধ্যক্ষরূপে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। ইনি নব্যন্যায়ে অতি অসাধারণ পণ্ডিত হন এবং নৈয়ায়িক প্রভৃতি যাবতীয় প্রতিপক্ষের মত খণ্ডবিখণ্ডিত করিয়া প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা বা চিৎসুখী নামক এক অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন শঙ্করভাষ্যের উপর ভাবপ্রকাশিকা-টীকা, বিষ্ণুপুরাণের টীকা, আনন্দবোধেন্দ্রভট্টারকের ন্যায়মকরন্দের উপর টীকা, খণ্ডনখণ্ডখাদ্যটীকা, বিবরণতাৎপর্য্যদীপিকা, ব্রহ্মসিদ্ধিটীকা, প্রমাণমালাব্যাখ্যা, শঙ্করচরিত এবং অধিকরণমঞ্জরীসঙ্গতি নামক বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া একাধারে অদ্বৈতশত্রুবিনাশ এবং শঙ্করের ভাষ্যাধ্যবার প্রচার ও পুষ্টি সাধন করেন। মধ্বাচার্য্য দিগ্বিজয়কালে ইঁহার সঙ্গে বিচার করেন নাই। শ্রীহর্ষ ও আনন্দবোধেন্দ্রের ন্যায় ইনি অদ্বৈত-বেদান্তের একটী স্তম্ভবিশেষ।

(৫৫) **শ্রীধরস্বামী**—গুর্জ্জর দেশবাসী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। ইনি এই সময়ে সন্ন্যাসী হইয়া ভাগবতের টীকা, গীতার টীকা, বিষ্ণুপুরাণের টীকা প্রভৃতি রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের বিশেষ পুষ্টিসাধন করেন। ইঁহার কীর্ত্তি এই চতুর্থ বাধার প্রতীকারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। ইঁহার পুত্র, কেহ কেহ বলেন বিখ্যাত ভট্টিগ্রন্থের রচয়িতা। ইঁহার গুরু—মাধব ও পরমানন্দপুরী।

(৫৬) **প্রত্যক্স্বরূপভগবান্**—ইনি প্রত্যক্প্রকাশ পূজ্যপাদের শিষ্য। ইনি চিৎসুখীর উপর মানসনয়নপ্রসাদিনী টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। ইনি নিজ গ্রন্থে শিবাদিত্য, উদয়ন, বাচস্পতি, ভবনাথ, বল্লভ, ভাসর্ব্বজ্ঞ, শ্রীহর্ষ, উম্বেক বা ভবভূতির নাম করিয়াছেন। চিৎসুখের এক শিষ্য সুখপ্রকাশ থাকায় এবং ইঁহার গুরু প্রত্যক্প্রকাশ বলিয়া এবং চিৎসুখের পরবর্ত্তী কাহারও নাম না করায় ইহাকে ১৪শ শতাব্দীতে আবির্ভূত মনে করা হয়। কিন্তু ভবনাথের নাম করায় মনে হয় ইনি শঙ্কর মিশ্রের সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী ষষ্ঠ বাধার প্রতীকারে ইঁহার নাম গ্রহণযোগ্য।

(৫৭) **অমলানন্দযতি**—ইঁহার গুরু অনুভবানন্দ এবং বিদ্যাগুরু সুখপ্রকাশ। এই সুখপ্রকাশ চিৎসুখের শিষ্য, সুতরাং ইনি চিৎসুখের প্রশিষ্য। ইঁহার অপর নাম ব্যাসাশ্রম। ইনি দেবগিরির কৃষ্ণরাজার সময় ১২৪৭—১২৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গ্রন্থকাররূপে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি ভামতীর উপর কল্পতরু টীকা, শাস্ত্রদর্পণ নামে ব্রহ্মসূত্রের অধিকরণমালা, পঞ্চপাদিকার উপর দর্পণটীকা প্রভৃতি রচনা করিয়া শঙ্করের ভাষ্য ধারার বিশেষ পুষ্টিসাধন করেন এবং এই জন্য এই চতুর্থ বাধার প্রতীকারে ইনি একজন প্রধান বলিয়া বিবেচিত হন।

যাহা হউক মণ্ডনাচার্য্যপ্রভৃতিকর্ত্তৃক উপস্থাপিত এই চতুর্থ বাধার প্রতীকারকল্পে অদ্বৈতবেদান্তের পক্ষে এই পাঁচজনের নাম উল্লেখযোগ্য।

পঞ্চম বাধা।

কিন্তু এই বাধা প্রশমিত হইতে না হইতেই আবার অদ্বৈতবিরোধী মতসমূহ মস্তক উত্তোলন করে, আর এজন্য মাধ্বমতে অক্ষোভ্য মুনি, রামানুজমতে সুদর্শনাচার্য্য, বাদিহংসাম্বুবাচার্য্য, বরদবিষ্ণু আচার্য্য, বেদান্তমহাদেশিক, বরদ গুরু আচার্য্য এবং লোকাচার্য্য পিল্লাই এর আবির্ভাব হয়। ইঁহাদের পরিচয় যথা—

(৫৮) **অক্ষোভ্য মুনি**—দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য্যের শিষ্য অক্ষোভ্য মুনি এই সময় (১৩৫০খৃষ্টাব্দে) মাধ্বমতে এবং ন্যায়শাস্ত্রে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। ইনি শৃঙ্গেরীর বিদ্যারণ্যস্বামীকে (১৩০১—১৩৮৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) সভামধ্যে বিচারে আহ্বান করেন এবং রামানুজ-সম্প্রদায়ের মহামতি বেদান্তমহাদেশিককে মধ্যস্থ মানেন। বিদ্যারণ্য বিরুদ্ধমতাবলম্বীকে মধ্যস্থ স্বীকার করিতে আপত্তি না করিয়া বিচার করেন। বিচারে মধ্যস্থ যাহা বলেন তাহাতে উভয়পক্ষ নিজ নিজ আচার্য্যকেই জয়ী বলেন। ফলতঃ বিদ্যারণ্যের ইহাতে কোন ক্ষতিই হয় নাই। ইঁহার রচিত গ্রন্থের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

(৫৯) **বাদিহংসাম্বুবাচার্য্য বা ২য় রামানুজাচার্য্য**—ইনি বেঙ্কটনাথের মাতুল ও গুরু। ইঁহার পিতার নাম পদ্মনাভাচার্য্য। ইনি "ন্যায়কুলিশ" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতমত খণ্ডন ও স্বমতের পুষ্টি করেন।

বৎসর) ইনি জীবিত ছিলেন। ইঁহার মত পণ্ডিত রামানুজসম্প্রদায়ের মধ্যে আর জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ। ইনি তত্ত্বমুক্তাকলাপ, ন্যায়-পরিশুদ্ধি, যাদবাভ্যুদয় কাব্য, সর্ব্বার্থসিদ্ধি সটীক, সেশ্বরমীমাংসা, মীমাংসা-পাদুকা, ঈশোপনিষদ্‌ভাষ্য, গীতার্থসংগ্রহ, শতদূষণী, অধিকরণসারাবলী, ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন, তত্ত্বটীকা, গীতাভাষ্যটীকা, গদ্যত্রয়টীকা, বাদিত্রয়খণ্ডন, সংকল্পসূর্য্যোদয়, তিরুবাইমুড়ি প্রভৃতি অতি অপূর্ব্ব বহুগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া স্বমতের পুষ্টি ও অদ্বৈতমতের বিশেষভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। ইনি রামানুজাচার্য্যের প্রশিষ্যের শিষ্য। অদ্বৈতবেদান্তে ইঁহার বাধা এই সম্প্রদায়ের চরম বাধা বলা যায়।

(৬২) **বরদগুরু আচার্য্য**—ইনি বেদান্তদেশিকের পুত্র ও নৃসিংহাচার্য্যের শিষ্য। ইঁহার অপর নাম প্রতিবাদিভয়ঙ্কর অন্নন ছিল। ইনি তর্কশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত হন। ইনি দেশিকের প্রশংসা করিয়া সপ্ততিরত্নমালিকা গ্রন্থ রচনা করেন এবং দেশিকের অধিকরণসারাবলীর উপর টীকা রচনা করিয়া স্বমতের পুষ্টি ও অদ্বৈতমতের উপর বিশেষ আঘাত করেন। ইঁহার সময় সুতরাং ১৪শ শতাব্দী।

(৬৩) **লোকাচার্য্যপিল্লাই**—১৪শ শতাব্দীতে ইঁহার স্থিতি-কাল। ইনি তত্ত্বনির্ণয় ও তত্ত্বশেখর রচনা করিয়া স্বমতের পুষ্টি ও অদ্বৈতমত খণ্ডন করেন। ইনি রামানুজ হইতে ৪র্থ পুরুষ।

(৬৪) **সুদর্শনাচার্য্য**—ইনি রামানুজের শিষ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে পঞ্চম পুরুষ। ইঁহার সময় খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী। ইনি রামানুজের শ্রীভাষ্যের উপর শ্রুতপ্রকাশিকা নামক টীকা রচনা করিয়াছেন। সুদর্শনসূরি ও ইনি অভিন্ন হইলে ইনি রামানুজের বেদার্থসংগ্রহের উপর তাৎপর্য্যদীপিকা টীকাও রচনা করিয়াছেন। উপরি উক্ত বরদবিষ্ণু সূরি ইঁহার শ্রুতপ্রকাশিকার উপর ভাবপ্রকাশিকা টীকা রচনা করিয়াছেন। প্রবাদ এই যে, ইনি ১৩১০ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীনের কর্ণাট বিজয় করিবার

সময় নিহত হন। ইঁহার কীর্ত্তি অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে একটী যে অতি প্রবল বাধা তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, অদ্বৈতবেদান্তচিন্তাস্রোতে এই সাতজন ব্যক্তি যে সর্ব্বপ্রধান প্রতিবন্ধকস্বরূপ হন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে এ সময় মাধ্বসম্প্রদায় অপেক্ষা রামানুজসম্প্রদায়েরই প্রভাব অধিক হইয়াছিল মনে হয়।

পঞ্চমবাধার প্রতীকার।

এই পঞ্চম বাধার প্রতীকারকল্পে অদ্বৈতসম্প্রদায়ের মধ্যে তিনজন মহাপুরুষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে, যথা—ভারতীতীর্থ, সায়নাচার্য্য এবং বিদ্যারণ্য মুনি। ইঁহাদের পরিচয় এই—

(৬৫) **ভারতীতীর্থ**—শৃঙ্গেরীতে মঠাধীশ ছিলেন। ইঁহার সময় ১৩২৮—১৩৮০ খৃষ্টাব্দ। মহামতি বিদ্যারণ্য (১৩৩১—১৩৮৬ মধ্যে) ইঁহাকে গুরুজ্ঞান করিতেন। ইনি বেদান্তদর্শনের যে সটীক অধিকরণমালা রচনা করিয়াছেন, তাহাতেই ইঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার কীর্ত্তি এই বাধাপ্রশমনে একটী প্রধান সহায় হয়।

(৬৬) **সায়নাচার্য্য**—বিদ্যারণ্যের ভ্রাতা। ইনি বিদ্যারণ্যের অনুরোধে ও বিজয়নগররাজ বুক্ক ভূপতির উৎসাহে সমগ্র বেদের ভাষ্য রচনা করিয়া একাধারে বেদরক্ষা ও অদ্বৈতমতের বিশেষ পুষ্টিসাধন করেন। ইঁহার সময় ইঁহার মত বৈদিক পণ্ডিত আর কেহই ছিলেন না।

(৬৭) **বিদ্যারণ্য**—ইঁহাকে শঙ্করাচার্য্যের অবতার বা ২য় শঙ্করাচার্য্য বলা হয়। ইঁহার মত সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ভারতবর্ষে আর কেহ জন্মিয়াছেন কি না বলা যায় না। জ্যোতিষ, স্মৃতি, দর্শন, ব্যাকরণ প্রভৃতি প্রায় সর্ব্ববিষয়েই ইঁহার অতুলনীয় গ্রন্থ দেখা যায়। বেদান্তে—পঞ্চদশী, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ, অনুভূতিপ্রকাশ, জীবন্মুক্তিবিবেক, অপরোক্ষানুভূতির টীকা, ১০৮ উপনিষদের টীকা,

সূতসংহিতার টীকা, ঐতরেয় উপনিষদ্দীপিকা, তৈত্তিরীয় উপনিষদ্দীপিকা, ছান্দোগ্য উপনিষদ্দীপিকা, বৃহদারণ্যকবার্ত্তিকসার ও শঙ্করবিজয় ইঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি। মীমাংসায়—জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর, ব্যাকরণে—মাধবীয় ধাতুবৃত্তি, স্মৃতিতে—পরাশরমাধব, ও কালমাধব ইত্যাদি ইঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তি। ইনি বিদ্যাশঙ্করের যে সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, তাহা ইহার জ্যোতিষশাস্ত্রের অগাধপাণ্ডিত্যের পরিচয়। মন্দিরে প্রভাতসূর্য্যালোকদ্বারা মাস তিথি প্রভৃতি সবই নির্ণীত হয়। ইহা একটী দেখিবার বস্তু।

যাহা হউক, এই পঞ্চম বাধার প্রতীকারকল্পে এই তিন মহাত্মার নাম করা যাইতে পারে, আর তন্মধ্যে বিদ্যারণ্যই সর্ব্বপ্রধান। বস্তুতঃ একা বিদ্যারণ্যই তাঁহার সময় সকল মতবাদের প্রভাবই ক্ষুণ্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ বাধা।

পঞ্চম বাধা প্রশমিত হইতে না হইতেই মাধ্ব ও রামানুজসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ আবার মস্তকোত্তলন করিলেন। মাধ্বসম্প্রদায়ের জয়তীর্থাচার্য্য এবং রামানুজসম্প্রদায়ের রঙ্গরামানুজাচার্য্য এবং অনন্তাচার্য্য এইবার অদ্বৈতমতখণ্ডনে বদ্ধপরিকর হইলেন। ইঁহাদের পরিচয় এই—

(৯৮) **জয়তীর্থাচার্য্য**—অক্ষোভ্যমুনির শিষ্য। ইনি মাধ্বমতে এবং নব্যন্যায়শাস্ত্রে ক্রমে একজন অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। গ্রন্থরচনাদ্বারা ইনি নিজ গুরু অক্ষোভ্যমুনিকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। ইঁহার জন্ম ১৩১৭ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে এবং দেহান্ত ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে হইবে বোধ হয়। বিদ্যারণ্যস্বামী সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে মাধ্বমতবর্ণনপ্রসঙ্গে ইঁহার নাম করিয়াছেন। ইনি মধ্বাচার্য্যের কৃত সূত্রভাষ্যের উপর তত্ত্বপ্রকাশিকাটীকা এবং ব্রহ্মসূত্রের অণুভাষ্যের উপর ন্যায়সুধা নামক অতি অপূর্ব্ব টীকা রচনা করিয়া উত্তরকালে দ্বৈতমতের পুষ্টি এবং অদ্বৈত-

মত খণ্ডন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তত্ত্বোদ্দ্যোতটীকা, তত্ত্বসংখ্যানটীকা, তত্ত্ববিবেকটীকা, প্রমাণলক্ষণটীকা, ঋগ্‌ভাষ্যটীকা, প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমানটীকা, গীতাতাৎপর্য্যনির্ণয়টীকা, মায়াবাদখণ্ডনটীকা, বিষ্ণুতত্ত্ববিনির্ণয়টীকা, উপাধিখণ্ডনটীকা, ঈশোপনিষদ্‌ভাষ্যটীকা, প্রশ্নোপনিষদ্‌ভাষ্যটীকা, প্রমাণপদ্ধতি গ্রন্থ এবং বাদাবলী প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া অতি উত্তমরূপে স্বমতপোষণ এবং অদ্বৈতমতখণ্ডন করিয়াছেন। ইঁহার একার কীর্ত্তিই একটী বাধা নামের যোগ্য।

(৬৯) **রঙ্গরামানুজাচার্য্য**—রামানুজসম্প্রদায়ের দশোপনিষদ্‌ভাষ্য ছিল না। রঙ্গরামানুজ এই দশোপনিষদ্‌ভাষ্য রচনা করিয়া সে অভাব মোচন করিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈতমতের উপর বিষম আঘাতও করিলেন। এজন্য ইঁহার কীর্ত্তি এই ষষ্ঠ বাধার বিশেষ পুষ্টিসাধন করিল। ইঁহাকে ১৪শ শতাব্দীতে আবির্ভূত বলিয়া অনুমান করা হয়।

(৭০) **অনন্তাচার্য্য**—এই সময় যাদবগিরিপ্রদেশে মেলকোটে অনন্তাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। ইনি ব্রহ্মলক্ষণনিরূপণগ্রন্থে শ্রুতপ্রকাশিকার উল্লেখ করায় সুদর্শনাচার্য্যের পরবর্ত্তী। ইনি রামানুজসম্প্রদায়ের গ্রন্থরচনাদ্বারা বিশেষভাবে পুষ্টিসাধন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈতমতের খণ্ডন করেন। ইঁহার গ্রন্থ, যথা—১। জ্ঞানযাথার্থ্যবাদ, ২। প্রতিজ্ঞাবাদার্থ, ৩। ব্রহ্মপদশক্তিবাদ, ৪। ব্রহ্মলক্ষণনিরূপণ, ৫। বিষয়তাবাদ, ৬। মোক্ষকারণতাবাদ, ৭। শরীরবাদ, ৮। শাস্ত্রারম্ভসমর্থন, ৯। শাস্ত্রৈক্যবাদ, ১০। সংবিদেকত্বানুমাননিরাসবাদার্থ, ১১। সমাসবাদ, ১২। সামানাধিকরণ্যবাদ, ১৩। সিদ্ধান্তসিদ্ধাঞ্জন।

যাহা হউক, এই তিন জনের কীর্ত্তি অদ্বৈতমতে এই ষষ্ঠ বাধাকে অতি প্রবলাকার করিয়া তুলিল। অবশ্য এ সময় বিদ্যারণ্যস্বামী জীবিত থাকায় ইঁহারা বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারেন নাই, তথাপি অদ্বৈতমতের অপর আচার্য্যগণ ইঁহাদের এই বাধার প্রতীকার করেন।

ষষ্ঠ বাধার প্রতীকার।

এই ষষ্ঠ বাধার প্রতীকারকল্পে বিদ্যারণ্য প্রভৃতি ব্যতীত যে সকল আচার্য্য প্রযত্ন করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনুভূতিস্বরূপাচার্য্য, আনন্দজ্ঞান বা আনন্দগিরি, নরেন্দ্রগিরি, প্রজ্ঞানানন্দ, প্রকাশানন্দ সরস্বতী, অখণ্ডানন্দ, রঙ্গরাজাধ্বরিই এবং নানাদীক্ষিত, প্রধান বলিয়া বোধ হয়। ইঁহাদের পরিচয় এই—

(১১) **অনুভূতিস্বরূপাচার্য্য**—আনন্দজ্ঞানের বিদ্যাগুরু। ইনি প্রথমে সারস্বতসূত্রের উপর সারস্বতপ্রক্রিয়া নামক এক ব্যাকরণ রচনা করেন। বেদান্তে গৌড়পাদীয় মাণ্ডুক্যভাষ্যের টীকা, আনন্দবোধের ন্যায়মকরন্দের উপর সংগ্রহটীকা এবং ন্যায়দীপাবলীর উপর চন্দ্রিকাটীকা এবং প্রমাণমালার উপর নিবন্ধটীকা—ইঁহার প্রধান কতিপয় গ্রন্থ। ন্যায়ের সাহায্যে চিৎসুখের পর অদ্বৈতমতসংরক্ষণে ইঁহার যত্ন এই বাধার প্রতীকারস্বরূপ হয়। ইঁহার সময় ১৩ হইতে ১৪শ শতাব্দীর মধ্যে।

(১২) **আনন্দজ্ঞান বা আনন্দগিরি**—ইঁহার দীক্ষাগুরু শুদ্ধানন্দ এবং বিদ্যাগুরু অনুভূতিস্বরূপাচার্য্য। এই শুদ্ধানন্দ ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত অদ্বৈতমকরন্দের টীকাকার স্বয়ংপ্রকাশের গুরু শুদ্ধানন্দ হইতে পৃথক্ ব্যক্তি। ইনি সম্ভবতঃ গুজরাটদেশবাসী ও দ্বারকাপীঠের অধীশ্বর ছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বনাম ছিল জনার্দ্দন। সেই সময় ইনি তত্ত্বালোক নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। রঘুবংশ ও মেঘদূতের টীকাকার জনার্দ্দন পণ্ডিত পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হন। তত্ত্বালোকের উপর প্রজ্ঞানানন্দের টীকা ১৩৩৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছে পাওয়া গিয়াছে, এবং প্রজ্ঞানানন্দ অনুভূতিস্বরূপাচার্য্যের শিষ্য ও আনন্দজ্ঞানের গুরুভাই বলিয়া এবং আনন্দজ্ঞান, প্রশ্ন ও ঐতরেয়ভাষ্যটীকামধ্যে শঙ্করানন্দ ও বিদ্যারণ্যের কথা উদ্ধৃত করায় ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৪শ শতাব্দীতে আনন্দজ্ঞানের আবির্ভাব হয়, মনে হয়। কেহ কেহ ইঁহাকে

(১৪) **প্রজ্ঞানানন্দ**—অনুভূতিস্বরূপের অপর শিষ্য, আনন্দজ্ঞানের সতীর্থ। ইনি আনন্দজ্ঞানের তত্ত্বালোকের উপর তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের পুষ্টিবিধান করিয়াছেন।

(১৫) **অখণ্ডানন্দ**—ইনি আনন্দগিরির শিষ্য। ইঁহার দীক্ষাগুরু অখণ্ডানুভূতি। ইনি পঞ্চপাদিকার উপর তত্ত্বদীপন নামক টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের পুষ্টিসাধন করেন।

(১৬) **প্রকাশানন্দ সরস্বতী**—ইনি কাশীধামে থাকিয়া বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলী নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতবেদান্তের যথেষ্ট দৃঢ়তা সম্পাদন করেন। ইঁহার গুরু জ্ঞানানন্দ। ইঁহার সময় ১৪০০-১৫০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বোধ হয়। ইঁহার বাক্য রামতীর্থ এবং অপ্পয় দীক্ষিত উদ্ধৃত করায় ইঁহাকে তাঁহাদিগের অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। অপ্পয়ের সময় ১৫২০-১৫৯৩ এবং রামতীর্থের সময় ১৪৯০ হইতে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। এজন্য প্রকাশানন্দ ১৪০০ হইতে ১৫০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আবির্ভূত মনে হয়। যাহা হউক, ইঁহার কীর্ত্তিও এই ষষ্ঠবাধার বিশেষ প্রতীকার করে। বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলীর উপর নানা দীক্ষিতের সিদ্ধান্তদীপিকা নামে এক টীকা আছে। অনেকে মনে করেন, ইঁহাকে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব স্বমতে আনয়ন করেন। কিন্তু তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। মহাপ্রভু পরবর্ত্তী ব্যক্তি।

(১৭) **রঙ্গরাজ অধ্বরী**—ইনি আচার্যদীক্ষিতের পুত্র। ইঁহার অপর নাম বক্ষঃস্থলাচার্য। ইঁহারই পুত্র প্রসিদ্ধ অপ্পয় দীক্ষিত। এজন্য ইঁহার সময় ১৪৯০ হইতে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। ইনি বিজয়নগররাজ কৃষ্ণদেবের সমসাময়িক। ইনি অদ্বৈতবিদ্যামুকুর ও পঞ্চপাদিকা-বিবরণের উপর দর্পণ নামক টীকা রচনা করিয়া এই সময় অদ্বৈতমতের পুষ্টি ও বিরুদ্ধমতের শাসন করেন।

(১৮) **নানাদীক্ষিত**—ইনি প্রকাশানন্দ সরস্বতীর বেদান্ত-

সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর উপর সিদ্ধান্তদীপিকা নামক এক টীকা লিখিয়া এই সময় এই ষষ্ঠবাধার প্রতীকারে সহায়তা করেন।

যাহা হউক, এই ষষ্ঠবাধার প্রতীকারকল্পে এই আট জন মহাত্মার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ষষ্ঠবাধা প্রতীকারের ফল।

এখন এই ষষ্ঠবাধাপ্রতীকারের ফলে দেখা যায়, নব্যনৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের শিরোমণিপণ্ডিতগণও অদ্বৈতমতের উপর অনুরাগী হইয়াছেন। কারণ, নব্যনৈয়ায়িকশ্রেষ্ঠ—

(১১) **রঘুনাথ শিরোমণি** এবং মিথিলার মহেশঠক্কুর প্রভৃতি নৈয়ায়িক ধুরন্ধরগণও অদ্বৈতবেদান্তের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীহর্ষের খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের টীকাই রচনা করিলেন, তৎপরে পদার্থতত্ত্ববিবেচনগ্রন্থে বৈশেষিকের সপ্তপদার্থ অস্বীকার করিলেন। তাঁহার দীধিতির মঙ্গলাচরণে "অখণ্ডানন্দবোধায়" পদ দেখিয়া তাঁহাকে অনেকেই অদ্বৈতবাদী বলিতে ইচ্ছা করেন।

সপ্তম বাধা।

কিন্তু এই ভাব স্থায়ী হইল না। নৈয়ায়িকপ্রবর শঙ্করমিশ্র, দ্বিতীয় বাচস্পতিমিশ্র, বঙ্গীয়ভক্তকুলের আরাধ্যদেব মহাপ্রভু চৈতন্য-দেব, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, নিম্বার্কসম্প্রদায়ের কেশব কাশ্মীরী, শুদ্ধাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের বল্লভাচার্য্য, ও তৎপুত্র বিট্‌ঠলনাথ, সাংখ্যমতাবলম্বী বিজ্ঞানভিক্ষু এবং লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের নীলকণ্ঠ শিবাচার্য্য প্রভৃতি অদ্বৈতমতখণ্ডনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইঁহাদের পরিচয় এই—

লিখনকাল ১৪৭২ খৃষ্টাব্দ হওয়ায় ১৪৪২ হইতে ১৫৪২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি জীবিত ছিলেন বলা যায়। ভেদরত্নপ্রকাশে তিনি শ্রীহর্ষের মতখণ্ডন করিয়াছেন। বৈশেষিকদর্শনের উপস্কার টীকা লিখিয়া দ্বৈতমত প্রচার করিয়াছেন, বাদিবিনোদ লিখিয়া বিচারশাস্ত্রের প্রচার করিয়াছেন। ইঁহার কীর্তি এই সময় অদ্বৈতবেদান্তে সপ্তমবাধা উপস্থাপিত করিল বলা যায়।

(৮১) **বাচস্পতিমিশ্র ২য়**—ইনিও এই সময় মিথিলাদেশে ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠেন এবং খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের প্রতিবাদ করিয়া খণ্ডনোদ্ধার নামক এক গ্রন্থ লেখেন। এজন্য ইঁহারও কীর্তি এই সপ্তম বাধার অঙ্গপুষ্টি করিল বলা যায়।

(৮২) **মহাপ্রভুচৈতন্যদেব**—এই সময় নবদ্বীপে ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, এবং শ্রীক্ষেত্রে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। ইঁহার কোন গ্রন্থ নাই, কিন্তু ইঁহার মত ইঁহার শিষ্যবর্গ যেরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ইনিও অদ্বৈতবাদের বিরোধী ছিলেন বোধ হয়। কেহ কেহ বলেন—ইনি মাধ্বমতাবলম্বী, কাহারও মতে ইনি নিম্বার্কমতাবলম্বী এবং অপরের মতে ইনি অদ্বৈতবাদী। ইঁহার প্রশিষ্য মহাদার্শনিক পণ্ডিত শ্রীজীবগোস্বামীর মতে ইঁহার মত অচিন্ত্যভেদাভেদ। বলদেবের মতে ইনি দ্বৈতবাদী। ইনি শ্রীক্ষেত্রে বেদান্তী সার্বভৌমকে এবং কাশীতে অদ্বৈতবাদী প্রকাশানন্দকে স্বমতে আনিয়াছিলেন। তবে এই প্রকাশানন্দ বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলীকার প্রকাশানন্দ নহেন বলিয়াই বোধ হয়। যাহা হউক, ইঁহার আবির্ভাবে অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে এই সপ্তমবাধাটী প্রবলাকারই ধারণ করে।

(৮৩) **বাসুদেব সার্বভৌম**—মহাপ্রভু চৈতন্যদেব কর্তৃক বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত হন। ইনি পূর্বে অদ্বৈতবাদী ছিলেন। ইনি বৈষ্ণবমতে আসিয়া তত্ত্বদীপিকা নামক গ্রন্থ লিখিয়া অদ্বৈতমতের বিরোধিতাচরণ করিয়াছিলেন। ইনি নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌম নহেন।

(৮৪) **কেশব কাশ্মীরী**—নিম্বার্কসম্প্রদায়ের একজন প্রধান পণ্ডিত এই সময় বৃন্দাবনে আবির্ভূত হন। ইনি নিম্বার্কশিষ্য শ্রীনিবাস-কৃত বেদান্তকৌস্তভ নামক বেদান্তভাষ্যের উপর দ্বৈতাদ্বৈতমতে এক অপূর্ব্ব টীকা রচনা করিয়া স্বমতের পুষ্টি ও অদ্বৈতমতের খণ্ডন করেন। ইনি মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। এজন্য এ সময়ে ইঁহার এই কীর্ত্তি এই সপ্তমবাধার বিশেষ পুষ্টিসাধন করিল।

(৮৫) **বল্লভাচার্য্য**—এই সময় শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে তৈলঙ্গদেশে ইঁহার জন্ম হয় এবং ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশে ইঁহার মৃত্যু হয়। বিষ্ণুস্বামীর শিষ্য—জ্ঞানদেব, তাঁহার শিষ্য—নামদেব ও ত্রিলোচন আর তাঁহাদের শিষ্য—বল্লভাচার্য্য। পিতা—লক্ষণভট্ট, মাতা—যল্লমমগরু। কাশীতে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া সন্ন্যাসী হন, তৎপরে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন। ইনি বিজয়নগররাজ কৃষ্ণ-রাজের সময় ব্যাসরাজের সমক্ষে এক অদ্বৈতবাদীকে বিচারে পরাজিত করেন এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য, পূর্ব্বমীমাংসাভাষ্য, গীতাভাষ্য, ভাগবতের সূক্ষ্ম টীকা ও সুবোধিনী টীকা, সটীক তত্ত্বদীপনিবন্ধ, সিদ্ধান্তরহস্য, ভাগবতলীলারহস্য, ও হিন্দিভাষায় বিষ্ণুপদ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া নিজমত প্রচার করেন এবং অদ্বৈতমত খণ্ডন করেন। কাশীতে উপেন্দ্রসরস্বতীর সহিত ইঁহার বিচার হয়, তাহাতে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হয় ও ইনি কাশী ত্যাগ করেন। ইঁহার প্রকরণগ্রন্থের সংখ্যা ১৬ খানি শুনা যায়। ইঁহার কীর্ত্তি অদ্বৈতবেদান্তের স্রোতে বিশেষ বাধা উপস্থাপিত করে।

করেন। ইঁহার কীর্ত্তিও এজন্য অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে এই সপ্তম বাধার পুষ্টিসাধন করিল।

(৮৭) **বিজ্ঞানভিক্ষু**—সাংখ্যসম্মত দ্বৈতাদ্বৈতবাদানুসারে এই সময় অদ্বৈতমতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হন। ইনি সাংখ্যসূত্রের উপর প্রবচনভাষ্য, পাতঞ্জলসূত্রের উপর যোগবার্ত্তিক, ঈশ্বরগীতা, উপনিষদ্ ও বেদান্তদর্শনের উপর বিজ্ঞানামৃতনামক ভাষ্য রচনা করিয়া এবং সাংখ্যসার, যোগসারসংগ্রহ, ব্রহ্মাদর্শ এবং দুর্জ্জনমুখচপেটিকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতমতে বিশেষ আঘাত করেন। সর্ব্বদর্শনসমন্বয়ের জন্য ইঁহার চেষ্টা দৃষ্ট হয়। ফলতঃ বিজ্ঞানভিক্ষুর চেষ্টাও এই সপ্তম বাধার অঙ্গপুষ্টি করিল।

(৮৮) **নীলকণ্ঠ শিবাচার্য্য**। এই সময় অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমপাদে নিম্বার্কে সম্প্রদায়ের আচার্য্য নীলকণ্ঠ শিবাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। ইনি শঙ্করের সমসাময়িক প্রাচীন নীলকণ্ঠের রচিত বেদান্তভাষ্যের সারসংগ্রহ করিয়া ক্রিয়াসার নামক এক ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন, এবং তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়ভুক্ত নির্ব্বাণমন্ত্রী "সর্ব্বস্বভূষণ" নামে তাহার উপর এক টীকা রচনা করেন। এই গ্রন্থে নীলকণ্ঠ শিবাচার্য্য স্বমতপ্রকাশ ও অদ্বৈতমতের অল্পবিস্তর খণ্ডন করায় ইঁহার চেষ্টাও অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে এই সপ্তম বাধার পুষ্টিসাধন করিল। ইঁহার পূর্ব্বে ও প্রাচীন নীলকণ্ঠের পর বসবাচার্য্য প্রভৃতি কয়েকজন আচার্য্য বসবপুরাণাদিতে অদ্বৈতমতের বিরুদ্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন, এক্ষণে এই নীলকণ্ঠ শিবাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যদ্বারা তাহাই করিলেন।

যাহা হউক, এই সপ্তম বাধায়, পূর্ব্বের অদ্বৈতবিরোধী সম্প্রদায় ভিন্ন কয়েকটী নূতন সম্প্রদায় দেখা দিল। তাঁহারা বল্লভসম্প্রদায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়, বিজ্ঞানভিক্ষুসম্প্রদায় এবং নিম্বার্কেসম্প্রদায়। এ সময় রামানুজ ও মধ্বসম্প্রদায়ের চেষ্টা পৃথক্‌ভাবে অষ্টমবাধামধ্যে বর্ণিত হইল।

সপ্তমবাধার প্রতীকার।

এক্ষণে এই সপ্তম বাধার প্রতীকারকল্পে যে সমুদয় অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতধুরন্ধর লেখনী ধারণ করেন, তাঁহারা মল্লনারাধ্যাচার্য্য, নৃসিংহ আশ্রম, নারায়ণ আশ্রম, অপ্পয়দীক্ষিত, সদানন্দ যোগীন্দ্র, রামতীর্থ, ভট্টোজীদীক্ষিত, নীলকণ্ঠসূরি ও সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্রকে প্রধান বলা যায়। ইঁহাদের পরিচয় এইরূপ—

(৮১) **মল্লনারাধ্যাচার্য্য**—দক্ষিণ ভারতে কোটীশবংশে ইঁহার এই সময় আবির্ভাব হয়। ইনি অদ্বৈতরত্ন বা অভেদরত্ন নামক গ্রন্থ লিখিয়া দ্বৈতমতখণ্ডন ও অদ্বৈতমত স্থাপন করেন করেন। ইহা শঙ্কর মিশ্রের ভেদরত্নগ্রন্থের খণ্ডন। জগন্নাথ আশ্রমের শিষ্য নৃসিংহ আশ্রম (১৬শ শতাব্দী) অভেদরত্নের উপর তত্ত্বদীপন নামে এক টীকা লিখিয়াছেন। এজন্ত ইঁহার কীর্ত্তিও এই সপ্তম বাধার প্রতীকারস্বরূপ বলা যায়। ইঁহার সময় নৃসিংহ আশ্রমের পূর্ব্বে বলিয়া ১৫শ হইতে ১৬শ শতাব্দী বলা যায়।

(২১) **নারায়ণ আশ্রম**—নৃসিংহ আশ্রমের শিষ্য। ইনি স্বীয় গুরু নৃসিংহ আশ্রমের অদ্বৈতদীপিকার উপর বিবরণটীকা এবং ভেদধিক্কারের উপর সংক্রিয়া নামক টীকা রচনা করিয়া এই সপ্তমবাধার প্রতীকারে বিশেষ সহায়তা করেন। এই ভেদধিক্কার সংক্রিয়ার উপর শুদ্ধানন্দশিষ্য ভেদধিক্কারসংক্রিয়োজ্জ্বলী নামক এক টীকা রচনা করেন। নারায়ণ আশ্রম নাকি মীমাংসক নারায়ণ ভট্টের নিকট বিচারে পরাজিত হইয়াছিলেন। এই নারায়ণ ভট্ট বৃত্তরত্নাকরের টীকা ও শাস্ত্রদীপিকার টীকা করিয়াছেন এবং ইনিই বর্ত্তমানে বিশ্বনাথের মন্দিরনির্ম্মাতা। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম এবং ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে ইনি গ্রন্থকার হন। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত বৃত্তরত্নাকরটীকা পাওয়া গিয়াছে।

(২২) **অপ্পয়দীক্ষিত**—রঙ্গরাজ অধ্বরীর পুত্র। ইনি কাঞ্চীর নিকট অড়য়প্পলম্ নামক গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। ইঁহার সময় ১৫২০ হইতে ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দ স্থির হইয়াছে। ইঁহার মত সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত বিরল। ইনি ১০৮ খানি গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে যেগুলি প্রধান তাহা এই,—অদ্বৈতবেদান্তে—ন্যায়রক্ষামণি, সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ, বেদান্তকল্পতরুপরিমল ও ন্যায়মঞ্জরী, বৈষ্ণববিশিষ্টাদ্বৈতমতে—ন্যায়ময়ূখমালিকা, শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদে—শিবার্কমণিদীপিকা, রত্নত্রয়প্রকাশিকা ও তাহার ভাষ্য ও মণিমালিকা, দ্বৈতবেদান্তে—ন্যায়মুক্তাবলী ও তাহার ভাষ্য; অলঙ্কারে—চিত্রমীমাংসা, বৃত্তিবার্ত্তিক, জয়দেবের চন্দ্রালোকটীকা ও কুবলয়ানন্দ; মীমাংসায়—বিধিরসায়ন, তাহার ভাষ্য সুখোপযোজনি, উপক্রমপরাক্রম, বাদনক্ষত্রাবলী এবং চিত্রকূট, ব্যাকরণে—বাদনক্ষত্রাবলী; কাব্যে—মহাভারততাৎপর্য্যনির্ণয় ও রামায়ণতাৎপর্য্যনির্ণয়; প্রাকৃতব্যাকরণে—প্রাকৃতচন্দ্রিকা ও তাহার ভাষ্য; দর্শনে—মতসারার্থসংগ্রহ; খণ্ডনে—মধ্বতন্ত্রমুখমর্দ্দন; স্তোত্রাদি—(বিষ্ণুপক্ষে) বরদরাজস্তব, শ্রীকৃষ্ণধ্যানপদ্ধতি, (শিবপক্ষে) শিবানন্দলহরী, শিখরিণীমালা,

শিবতত্ত্ববিবেক (শিখরিণী ভাষ্য); (শক্তিপক্ষে)—দুর্গাচন্দ্রকলাস্তুতি, (সূর্য্যপক্ষে) আদিত্যস্তোত্ররত্ন। অপ্পয়ের কীর্ত্তি একাই এই সমস্ত বাধার প্রতীকারে যথেষ্ট বলিতে পারা যায়। পিতার নিকট ইনি শিক্ষালাভ করেন ও নৃসিংহ আশ্রমের নিকট পরাজিত হইয়া অদ্বৈতমতে দীক্ষিত হন। নারায়ণ আশ্রম ইঁহার সতীর্থ। ইনি প্রথমে শৈব-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন, পরে অদ্বৈতবাদী হন। কাশীতেই ইনি বাস করিয়াছিলেন।

(২০) **সদানন্দ যোগীন্দ্র**—ইঁহার গুরু অদ্বয়ানন্দসরস্বতী। বেদান্তসার ইঁহার গ্রন্থ। ইহার উপর রামতীর্থ, নৃসিংহসরস্বতী ও আপোদেব টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থদ্বারা অদ্বৈতবেদান্ত-মতের যথেষ্ট প্রচার হয়, এজন্য এই সপ্তমবাধার প্রতীকারে ইঁহাকেও গ্রহণ করা যায়। ইনি রামতীর্থের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া ইঁহার জীবনের মধ্যসময় ১৫০০ খৃষ্টাব্দ বলা যায়, অর্থাৎ ১৫শ হইতে ১৬শ শতাব্দীর মধ্যে বলা যায়। ইঁহারও কর্ম্মক্ষেত্র কাশী।

১৯। **ভট্টোজী দীক্ষিত**—পাণিনি ব্যাকরণের উপর শব্দকৌস্তুভ ও সিদ্ধান্তকৌমুদির জন্য ইনি অতিবিখ্যাত। ব্যাকরণে ইহার গুরু কৃষ্ণদীক্ষিত বা শেষপণ্ডিত। বেদান্তে—ইহার গুরু অপ্পয় দীক্ষিত। বেদান্তে তত্ত্বকৌস্তুভ গ্রন্থ এবং নৃসিংহাশ্রমের বেদান্ততত্ত্ববিবেকের উপর বিবরণ নামক টীকা রচনা করিয়া ইনি এই সময় এই সপ্তম বাধার যথেষ্ট প্রতীকার করেন। ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে নীলকণ্ঠ সুধন পণ্ডিত ভট্টোজীকে গুরু বলিয়াছেন, অতএব ১৫৫০ হইতে ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইহার জীবনকাল বোধ হয়। ইহারও কর্মক্ষেত্র কাশী।

২০। **রঙ্গোজী ভট্ট**—ভট্টোজী দীক্ষিতের ভ্রাতা রঙ্গোজী ভট্ট নৃসিংহ আশ্রমের শিষ্য। ইনি অদ্বৈতচিন্তামণি নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া এই সময় এই সপ্তম বাধার প্রতীকারে সহায়তা করেন। ইনিও কাশীবাসী ছিলেন।

২১। **নীলকণ্ঠ সূরি**—মহাভারতের অদ্বৈতমতে টীকা করিয়া, ও বেদান্তকতক গ্রন্থ লিখিয়া এবং শিবতাণ্ডব তন্ত্রের টীকা প্রণয়ন করিয়া এই সময় অদ্বৈতমতের বিশেষ পুষ্টিসাধন করিলেন। ইহার জন্মস্থান মহারাষ্ট্রদেশে গোদাবরী তীরে কর্পূর নামক স্থানে। ইহারও আবির্ভাব-কাল এই সময়। কারণ, ইনি শঙ্কর ও শ্রীধর স্বামীকে মঙ্গলাচরণে প্রণাম করিয়াছেন। ইহারও স্থান কাশী ছিল।

২৮। **সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র**—অপ্পয় দীক্ষিতের সমসাময়িক। ইনি কাঞ্চী মঠের অধিপতি বা তৎসংলগ্ন কেহ ছিলেন। ইঁহার গ্রন্থ অদ্বৈতবিদ্যাবিলাস, বোধার্য্যাত্মনির্বেদ, গুরুরত্নমালিকা ও ব্রহ্মকীর্তন-তরঙ্গিণী প্রভৃতি। ইহার দ্বারা দক্ষিণ দেশে এই সময় অদ্বৈতমতের প্রাধান্য সংরক্ষিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, এইরূপে এই সপ্তমবাধার প্রতীকারোদ্দেশে যে সমস্ত অদ্বৈতমতের পণ্ডিতবর্গ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কতিপয়ের পরিচয় প্রদত্ত হইল।

অষ্টম বাধা। (চরম বাধা)

কিন্তু ইহার প্রায় অব্যবহিত পরেই আবার অন্যদিক্ দিয়া অদ্বৈত-চিন্তাস্রোতে বাধা দেখা দিল। বল্লভসম্প্রদায়ের গিরিধর রায়জী, বালকৃষ্ণজী এবং ব্রজনাথজী এবং মাধ্বসম্প্রদায়ের ব্যাসরামাচার্য্য, এই বাধার সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেন। ইঁহাদের পরিচয় এই—

৯৯। **গিরিধর রায়জী**—শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভাচার্য্যের পৌত্র এবং বিট্‌ঠলনাথের পুত্র। ইনি শুদ্ধাদ্বৈতমার্ত্তণ্ড নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া এই মতে স্বমতস্থাপন ও অদ্বৈতবেদান্তের খণ্ডনে প্রবৃত্ত হন। বল্লভাচার্য্যের সময়—১৪৭৯ হইতে ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ; সুতরাং ইনি ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত বলা যায়। বোম্বাই প্রদেশে নাথদ্বারা বোধ হয় ইঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র ছিল।

১০০। **বালকৃষ্ণজী**—ইনিও শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভাচার্য্যের পৌত্র এবং বিট্‌ঠলনাথের পুত্র। ইনি প্রমেয়রত্নার্ণব গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বমতের পোষণ ও অদ্বৈতমতের খণ্ডন করেন। ইনি গিরিধর রায়জীর ভ্রাতা। সুতরাং ইঁহারও কর্ম্মক্ষেত্র বোম্বাই প্রদেশ মনে হয়।

১০১। **ব্রজনাথজী**—ইনি শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বালকৃষ্ণের শিষ্য। ইনি শঙ্করকৃত বেদান্তভাষ্যের উপর মরীচিকা নামে এক অপূর্ব্ব বৃত্তি রচনা করেন। ইহাতে স্বমতের পুষ্টি ও অদ্বৈতমতের খণ্ডন বিশেষ-ভাবেই দৃষ্ট হয়। ইঁহারও কর্ম্মক্ষেত্র সুতরাং বোম্বাই প্রদেশই হইবে।

উত্তরবাড়ী মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইতি স্বমতের সমুদায় গ্রন্থ আলোচনা করিয়া এবং অদ্বৈতমতের যাবতীয় গ্রন্থ মন্থন করিয়া ন্যায়ামৃত নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে অদ্বৈতমত এমন ভাবে খণ্ডিত হইয়াছে যে, ইহার আর তুলনা হয় না। এতদ্ব্যতীত তিনি জয়তীর্থকৃত তত্ত্বপ্রকাশিকার উপর তাৎপর্য্যচন্দ্রিকা নামক এক বৃত্তি রচনা করেন। ইঁহারই অপর নাম মাধ্বচন্দ্রিকা। তৎপরে ভেদোজ্জীবন নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়া দ্বৈতমত সমর্থন করেন। ইহার পর ইনি আনন্দতারতম্যবাদ নামক এক গ্রন্থ রচনা করিয়া মুক্তিতেও বিশেষ সিদ্ধি করেন। মন্দারমঞ্জরী গ্রন্থে ইনি মধ্বচার্য্যকৃত উপাধিখণ্ডন, মায়াবাদখণ্ডন, প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমান এবং তত্ত্বোদ্দ্যোত নামক গ্রন্থের উপর টিপ্পনী সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তর্কতাণ্ডব গ্রন্থে ইতি ন্যায়মত খণ্ডন করিয়াছেন। ফলতঃ ব্যাসরায়ের এই কীর্ত্তি অদ্বৈতচিন্তাস্রোতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল বাধা উৎপাদন করিল। এ পর্য্যন্ত অদ্বৈতমতের বিরুদ্ধে যত আপত্তি হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যত উঠিতে পারে, ব্যাসাচার্য্যের ন্যায়ামৃতে সে সমস্ত অতি অপূর্ব্বভাবে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

যাহা হউক, এই অষ্টম বাধাটী অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল বাধাই হইল; অধিক কি, ইহার পর যে সব বাধা হইয়াছে, তাহা ইহা অপেক্ষা নিতান্তই দুর্ব্বল—ইহার ছায়া মাত্র।

অষ্টম বাধার প্রতীকার। (চরম প্রতীকার)

এই অষ্টম বাধার প্রতীকারার্থ অদ্বৈতসম্প্রদায়ে একমাত্র মধুসূদনের নাম করা যাইতে পারে। যদিও এসময় অপ্পয়দীক্ষিত প্রভৃতিও এই কার্য্যই করিয়াছেন, তথাপি ইহার প্রকৃত প্রতীকার করিতে পারে নাই। এ প্রতীকার মধুসূদনের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। যথা—

১০০। মধুসূদন সরস্বতী—ইনি বঙ্গদেশের ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ার অন্তর্গত উনসিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার

পিতার ন্যায় পুরোহিত পুরন্দরাচার্য্য। মধুসূদনের গ্রন্থের টীকাকারগণের মতে ইঁহার দীক্ষাগুরু বিশ্বেশ্বরসরস্বতী, বিদ্যাগুরু মাধবসরস্বতী এবং পরমগুরু শ্রীরামসরস্বতী। কিন্তু মধুসূদন স্বকৃতমঙ্গলাচরণে যে শ্রীরামের নাম করিয়াছেন, তিনি শ্রীরামতীর্থ কি না, তাহাও ভাবিবার বিষয়। কারণ, বিশ্বেশ্বরসরস্বতী ও শ্রীরামসরস্বতীর কোন কীর্ত্তিই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। পক্ষান্তরে মাধবসরস্বতীরও কোন গ্রন্থাদি নাই, কিন্তু শ্রীরামতীর্থ একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। শ্রীরামতীর্থের নিকট তিনি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন এরূপ প্রবাদও আছে। এজন্য শ্রীরাম নামদ্বারা দুইজনকেই তিনি প্রণাম করিয়াছেন, বলা যাইতে পারে। আর তাহা হইলে মধুসূদনের বিদ্যাগুরু মীমাংসায় মাধবসরস্বতী, বেদান্ত শ্রীরামতীর্থস্বামী এবং ন্যায়শাস্ত্রে মথুরানাথ তর্কবাগীশ, আর আশ্রমগুরু বিশ্বেশ্বরসরস্বতী এবং পরমগুরু শ্রীরামসরস্বতী বলা যায়।

মধুসূদন বাল্যবয়সেই পণ্ডিত হন। চন্দ্রদ্বীপের রাজার নিকট উপেক্ষিত হইয়া বৈরাগ্যসম্পন্ন হন এবং চৈতন্যদেবের শরণাপন্ন হইয়া জীবনযাপনের সংকল্প করিয়া নবদ্বীপে গমন করেন, কিন্তু চৈতন্যদেবের দর্শন না পাইয়া মথুরানাথ তর্কবাগীশের নিকট যাইয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন এবং চৈতন্যদেবের মতে একখানি অকাট্য দার্শনিক গ্রন্থ-রচনায় অভিলাষী হন, আর তজ্জন্য কাশী যাইয়া অদ্বৈতমত শিক্ষা করিয়া তাহার খণ্ডন আবশ্যক বিবেচনা করেন। কিন্তু মধুসূদন কাশীতে রামতীর্থের নিকট অদ্বৈতমত অধ্যয়নকালে অদ্বৈতমতে অনুরাগী হন, এবং সন্ন্যাসী হইয়া অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থ রচনা করিয়া ব্যাসরায়ের ন্যায়ামৃতগ্রন্থের প্রতি-অক্ষর খণ্ডন করেন। এ সময় মধুসূদন দণ্ডায়মান না হইলে অদ্বৈত-বাদের স্থিতি অসম্ভব হইয়া উঠিত। এইরূপে মধুসূদন অদ্বৈতবাদের রক্ষাসাধন করিয়া গীতাটীকা, সংক্ষেপশারীরকটীকা, মহিম্নস্তোত্রটীকা, ভাগবতের টীকা, রামপঞ্চাধ্যায়টীকা, ভক্তিরসায়ন, বেদান্তকল্পলতিকা,

অদ্বৈতরত্নরক্ষণ, নির্ব্বাণদশকটীকা সিদ্ধান্তবিন্দু, ঈশ্বরপ্রতিপত্তিপ্রকাশ, আনন্দমন্দাকিনীস্তোত্র কৃষ্ণকুতূহল নাটক, প্রস্থানভেদ, রাজ্ঞাম্প্রতিবোধ(?), শাণ্ডিল্যসূত্রটীকা, বেদস্তুতিটীকা, জটাপাঠবিকৃতিবিবৃতি (?), আত্মবোধটীকা, হরিলীলাবিবেক, সিদ্ধান্তলেশটীকা (?), এবং সর্ব্ববিদ্যাসিদ্ধান্তবর্ণন প্রভৃতি লিখিয়া অদ্বৈতমতের বিশেষ পুষ্টিসাধন করেন। ফলতঃ, এই অষ্টম বাধার প্রতীকার একাই মধুসূদন সম্পূর্ণরূপে করিলেন, অধিক কি, অদ্বৈতবেদান্ত মধুসূদনের সহায়তায় অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। **ইহাই হইল বেদান্তচিন্তাস্রোতে অদ্বৈতসিদ্ধির স্থান।** অতঃপর বেদান্তমতে যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সে সমস্তই এই অদ্বৈতসিদ্ধির অন্তর্ভুক্ত বা প্রতিকূলতা করিয়া। সুতরাং অদ্বৈতসিদ্ধি, এক কথায়, বেদান্তচিন্তার চরম অবস্থা, বেদান্তচিন্তার সর্ব্বশেষ ফল। ইহার সময় ১৫২৫ হইতে ১৬৩২ খৃষ্টাব্দ ধরা যায়। এজন্য "মধুসূদনের সময় ও জীবনচরিত" অংশ দ্রষ্টব্য।

নবম বাধা।

কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গেই নবম বাধা উপস্থিত হইল। মাধ্বমতে—ব্যাসরায়ের শিষ্যবিশেষ ব্যাসরামস্বামী, শ্রীনিবাসতীর্থ ও বেদেশতীর্থ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে—অদ্বৈতনারায়ণ শিরোমণি এবং শ্রীজীবগোস্বামী, নৈয়ায়িকমতে—বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, রামানুজমতে—দোদয় মহাচার্য্য, সুদর্শন গুরু ও বরদনায়ক সূরি, এবং বল্লভমতে—পুরুষোত্তমাচার্য্য, প্রভৃতি মস্তক উত্তোলন করিলেন। ইহাদের পরিচয় এই—

১০৪। **ব্যাসরামস্বামী**—দ্বৈতবাদী মাধ্বসম্প্রদায়ের ব্যাসরায়ের শিষ্যবিশেষ। ব্যাসরামস্বামী ব্যাসরায়ের আদেশে কাশীধামে মধুসূদনের নিকট ছদ্মবেশে আসিয়া অদ্বৈতসিদ্ধি পাঠপূর্ব্বক ন্যায়ামৃতের উপর তরঙ্গিণী নামক এক টীকা রচনা করিয়া মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধি খণ্ডন করেন। এজন্য ইঁহার এই কীর্ত্তি একণে এই নবম বাধার সৃষ্টি করিল।

১০৫। **শ্রীনিবাসতীর্থ**—দ্বৈতবাদী মাধ্বসম্প্রদায়ের ব্যাসরায়ের অপর শিষ্য ও যাদবাচার্য্যের দীক্ষাশিষ্য। শ্রীনিবাসতীর্থ ন্যায়ামৃতের উপর "প্রকাশ" নামক এক টীকা রচনা করিয়া মাধ্বমতের পুষ্টি এবং অদ্বৈত-মতের খণ্ডন করিলেন। ইঁহার অপর গ্রন্থ—শ্রীমদ্‌ব্যাসবিজয়, জয়তীর্থের ন্যায়সুধার বিবৃতি ও তত্ত্বোদ্যোতটীকাবৃত্তি, কৃষ্ণামৃতমহার্ণবের টীকা, তৈত্তিরীয় ও মাণ্ডুক্য উপনিষদ্‌বৃত্তি। ইনি মঙ্গলাচরণে বেদেশতীর্থের নাম করায় বেদেশতীর্থ ইঁহার প্রায় সমসাময়িক।

১০৬। **বেদেশতীর্থ**—ইনিও দ্বৈতবাদী মাধ্বসম্প্রদায়ের একজন আচার্য্য। শ্রীনিবাস নিজগ্রন্থে মঙ্গলাচরণে ইঁহার নাম করায় ইনি তাঁহার সমসাময়িক। ইনিও জয়তীর্থের তত্ত্বোদ্যোতটীকার উপর বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। ইঁহার অপর গ্রন্থ—পদার্থকৌমুদি, কঠ এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের বৃত্তি।

১০৭। **অনুপনারায়ণ শিরোমণি**—ইনি চৈতন্যদেবের মতানুসরণ করিয়া ব্রহ্মসূত্রের উপর সমন্বয়সারবৃত্তি নামক এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এজন্য ইঁহাকেও অদ্বৈতমতের বিরোধী বলিয়া গণ্য করা যায়।

১০৮। **শ্রীজীবগোস্বামী**—গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের প্রধান আচার্য্য। ইঁহার মত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ। ইনি চৈতন্যদেবের প্রশিষ্য ও শ্রীরূপগোস্বামীর শিষ্য। ইনি এই সময় ভাগবতের উপর ক্রমসন্দর্ভ টীকা রচনা করিয়া এবং তত্ত্বসন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ, প্রীতিসন্দর্ভ, সর্ব্বসম্বাদিনী, শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, শ্রীগোপালচম্পূ, ব্রহ্মসংহিতা পঞ্চম অধ্যায়ের টীকা, উজ্জ্বলনীলমণির টীকা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুটীকা, লঘুভাগবতামৃতের টীকা, সংকল্পকল্পবৃক্ষ, সূত্রমালিকা, ধাতুসংগ্রহ, কৃষ্ণার্চ্চাদীপিকা, গোপালবিরুদাবলী, রসামৃত-শেষ, মাধবমহোৎসব, গোপালতাপনীর টীকা, যোগসারস্তবের টীকা, অগ্নিপুরাণস্থ গায়ত্রীভাষ্য, ভাবার্থসূচকচম্পূ, শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্ন, শ্রীরাধিকাকর-

পদচিহ্ন, লঘুতোষণী প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া অদ্বৈতমতের উপর বিশেষভাবে আক্রমণ এবং বিশেষভাবে স্বমতের পুষ্টিসাধন করেন। যাহা হউক, ইনিও এই নবম বাধায় একজন অগ্রণী। প্রবাদ আছে—ইনিও মধুসূদনের নিকট অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকরের মতে মহাপ্রভুর রামকেলি গমনের সময়, অর্থাৎ ১৫১৪ খৃষ্টাব্দের ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার জন্ম হয়। ইহার গোপালচম্পূ ১৫১২ শকে অর্থাৎ ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে রচিত। ইনি নাকি ৮০ বৎসর জীবিত ছিলেন। সুতরাং অনুমান ১৫১২ হইতে ১৫৯২ খৃষ্টাব্দ ইঁহার জীবিতকাল।

১০৯। **বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন**—ইনি ন্যায়মতে ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, এবং গৌতমসূত্রবৃত্তির জন্য বিখ্যাত। ইনি শেষ-জীবনে বৈষ্ণবমতে প্রবিষ্ট হইয়া বৃন্দাবনে বাস করেন এবং ভেদসিদ্ধি নামক গ্রন্থ লিখিয়া অদ্বৈতসিদ্ধিরই এক প্রকার খণ্ডন করেন। এজন্য ইনিও এই নবম বাধার পুষ্টিসাধন করেন। ইঁহার সময় অনুমান ১৫৬৮ হইতে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। কারণ, গৌতমসূত্রবৃত্তির রচনাকাল তিনি "রসবাণতিথৌ-শকেন্দ্রকালে" অর্থাৎ ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছেন।

১১০। **দোদ্দয় মহাচার্য্য রামানুজদাস**—রামানুজমতে বেদান্তদেশিকের শতদূষণীর উপর চণ্ডমারুত টীকা লিখিয়া অদ্বৈতমতের খণ্ডন করেন এবং অদ্বৈতবিদ্যাবিজয় গ্রন্থে মাধ্বমত ও অদ্বৈতমতের খণ্ডন করেন। উপনিষদ্মঙ্গলদীপিকা গ্রন্থে উপনিষদ্বাক্যের ব্যাখ্যা করেন। পারাশর্য্যবিজয় গ্রন্থে অপ্পয়দীক্ষিতের ন্যায়মণিরক্ষাগ্রন্থ খণ্ডন করেন। শ্রীভাষ্যের উপর ভাষ্যোপন্যাস লিখিয়া ব্রহ্মসূত্রের অপর ব্যাখ্যার অসঙ্গতি ও রামানুজকৃত ব্যাখ্যার সঙ্গতি প্রদর্শন করেন। ইঁহার অপর গ্রন্থ—সর্ব্ববিদ্যাবিজয়, বেদান্তবিজয়, ব্রহ্মবিদ্যাবিজয় ও পরিকরবিজয়। এইরূপে ইঁহার কীর্ত্তিও অদ্বৈতবেদান্তে এই নবমবাধাকে বিশেষ পুষ্ট করিল। ইনি বাধুল সুদর্শনসূত শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য।

১১১। **সুদর্শনগুরু**—ইনি রামানুজমতের চোদ্দম মহাচার্য্যের শিষ্য। ইনি নিজ গুরুকৃত বেদান্তবিজয় বা অদ্বৈতবিজয় গ্রন্থের উপর মঙ্গলদীপিকা নামক ব্যাখ্যা রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের খণ্ডন করেন।

১১২। **বরদনায়ক সূরি**—ইনি চিদচিদীশ্বরতত্ত্বনিরূপণ নামক গ্রন্থ লিখিয়া স্বমতের পুষ্টি ও অদ্বৈতমতের খণ্ডন করেন। ইনি তত্ত্বচুলুকের নাম করায় তাহার গ্রন্থকার ১৪শ শতাব্দীর বরদগুরু আচার্য্যের পরবর্ত্তী বলিতে হইবে। ইহার চেষ্টা এজন্য অদ্বৈতমতে বাধাবিশেষ।

১১৩। **পুরুষোত্তমজী**—শুদ্ধাদ্বৈতসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বল্লভাচার্য্যের পৌত্র বালকৃষ্ণের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বল্লভকৃত অণুভাষ্যের উপর টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের খণ্ডন করিয়াছেন। এজন্য ইনিও এই নবমবাধার অঙ্গপুষ্টি করিয়াছেন বলিতে হইবে।

যাহা হউক, এইরূপে এই নবমবাধাতে মাধ্ব, রামানুজ ও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বাধাই বিশেষ প্রবলাকার ধারণ করিল।

নবমবাধার প্রতীকার।

এই নবমবাধার প্রতীকারকল্পে দেখা যায়—অদ্বৈতমতে বলভদ্র, পুরুষোত্তমসরস্বতী, শেষগোবিন্দ, বেঙ্কটনাথ, সদানন্দব্যাস, ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্র, নৃসিংহসরস্বতী এবং রাঘবেন্দ্রসরস্বতীর নাম গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইঁহাদের পরিচয় এই—

১১৪। **বলভদ্র**—মধুসূদন সরস্বতীর শিষ্য। ইঁহারই জন্য মধুসূদন শঙ্করকৃত নির্ব্বাণদশকের উপর সিদ্ধান্তবিন্দু টীকা লিখেন। মাধ্বমতাবলম্বী ব্যাসাচার্য্যের শিষ্য ব্যাসরাম ছদ্মবেশে মধুসূদনের নিকট অধ্যয়ন করিয়া ন্যায়ামৃততরঙ্গিণী রচনাপূর্ব্বক অদ্বৈতসিদ্ধি খণ্ডন করিয়া গুরুদক্ষিণা দিলে ইনি সিদ্ধিব্যাখ্যা রচনা করিয়া তরঙ্গিণীর উত্তর প্রদান করেন। ইহা কিন্তু সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। ইনি অতঃপর সিদ্ধিসিদ্ধান্তসংগ্রহ রচনা করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির একটী সারসংকলন করেন। ইনি

বাঙ্গালী বলিয়া বোধ হয়। ইহার সময় ১৫৫০ হইতে ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। ইহার কীর্ত্তি এই নবমবাধার প্রতীকার বলা যাইতে পারে।

১১৫। **পুরুষোত্তম সরস্বতী**—মধুসূদনের অপর শিষ্য। ইনি মধুসূদনের সিদ্ধান্তবিন্দুর উপর একটী টীকা রচনা করিয়া স্বমতের পুষ্টি ও পরকৃত আক্রমণ প্রতিহত করেন। ইহার চেষ্টাও এই নবমবাধার প্রতীকার বলা যায়।

১১৬। **শেষগোবিন্দ**—ইনি মধুসূদনের অপর শিষ্য এবং ভট্টোজী দীক্ষিতের গুরু কৃষ্ণদীক্ষিতের পুত্র। ইনি আচার্য্য শঙ্করকৃত সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহের উপর এক টীকা লিখিয়া এই নবমবাধার প্রতীকারে সহায়তা করেন।

১১৭। **বেঙ্কটনাথ**—নৃসিংহাশ্রমের শিষ্য। ইহার শিষ্য ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্র। বেঙ্কটনাথ গীতার উপর ব্রহ্মানন্দগিরি টীকা লিখিয়া শঙ্কর-মতভিন্ন অপর সকলমতেরই খণ্ডন করিয়াছেন। ইহার অপর গুরু রাম-ব্রহ্মানন্দতীর্থ। ইনি অভিনবশঙ্করাচার্য্য নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন। বেঙ্কটনাথের অপর গ্রন্থ—অদ্বৈতরত্নপঞ্জর, মন্ত্রসারসুধানিধি এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌ভাষ্য। গুরু বিভিন্ন দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন—এই বেঙ্কটনাথ নামে দুইজন ব্যক্তি ছিলেন। যাহা হউক, ইহার চেষ্টায় নবমবাধার যথেষ্ট প্রতীকার হয়।

১১৮। **সদানন্দব্যাস**—ইনি মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধির সার-সংগ্রহ করিয়া সরল পদ্যে অদ্বৈতসিদ্ধিসিদ্ধান্তসার নামক এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শঙ্করমন্দারসৌরভ নামক গ্রন্থে শঙ্করচরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার চেষ্টাও এই নবমবাধার প্রতীকার বলা যাইতে পারে।

১১৯। **ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্র**—ইহার পরমগুরু নৃসিংহাশ্রম এবং গুরু বেঙ্কটনাথ। মান্দ্রাজের অন্তর্গত বেলাঙ্গুডি নামক স্থানে ইহার

জন্ম হয়। বেদান্তপরিভাষা ও গঙ্গেশোপাধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণির উপর বিঘ্নমনোরমা নামক টীকা ইঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। বিঘ্নমনোরমা টীকাটী ইনি ১০টী টীকা খণ্ডন করিয়া রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইনি পদ্মপাদের পঞ্চপাদিকার উপর একটী টীকাও লিখিয়াছেন। বেদান্ত-পরিভাষা গ্রন্থে প্রথম শিক্ষার্থীর জন্য অদ্বৈতবেদান্তকে ইনি এরূপ অকাট্য এবং অপূর্ব্বভাবে ন্যায়পরিষ্কৃত করিয়াছেন যে তাহার তুলনা হয় না। যাহা হউক, এই নবমবাধার প্রতীকারে ধর্ম্মরাজের চেষ্টা বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলবতী হইয়াছিল। ইঁহার সময় মধুসূদন বয়োবৃদ্ধ, অর্থাৎ ১৫৭৫ হইতে ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দের ভিতর ইঁহার জীবনকাল বোধ হয়।

১২০। নৃসিংহ সরস্বতী—ইনি কৃষ্ণানন্দ সরস্বতীর শিষ্য। সদানন্দ যোগীন্দ্রের বেদান্তসারের উপর রামতীর্থের টীকা কঠিন বিবেচনা করিয়া ইনি সুবোধিনী নামে এক টীকা ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের প্রচারে বিশেষ সহায়তা করেন।

১২১। রাঘবেন্দ্র সরস্বতী—অপর নাম রাঘবানন্দ সরস্বতী। ইনি ১৬শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। ন্যায় ও মীমাংসায় ইঁহার পাণ্ডিত্য যথেষ্ট বিখ্যাতি লাভ করে। সংক্ষেপশারীরকের উপর বিদ্যামৃতবর্ষিণী নামে এক টীকা লিখিয়া ইনি এই সময় অদ্বৈতবেদান্তের যথেষ্ট পুষ্টিসাধন করেন। ইঁহার অপর গ্রন্থ—ন্যায়বলীদীধিতি বা মীমাংসাসূত্রদীধিতি, মীমাংসাতত্ত্বক, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর উপর তত্ত্বার্ণব টীকা, মনুসংহিতার টীকা এবং পাতঞ্জলরহস্য। ইনি মনুর টীকায় ১৫শ শতাব্দীর কুল্লুক-ভট্টের টীকার নাম করায় ইনি ১৬শ শতাব্দীতে আবির্ভূত মনে হয়।

যাহা হউক, অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে এই নবমবাধায় এই কয়জন মহাত্মা যাহা করিলেন, তাহাতে এই বাধা সম্পূর্ণরূপেই প্রশমিত হইয়া গেল।

দশম বাধা।

কিন্তু অচিরে আবার রামানুজ ও মাধ্বসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ প্রভৃতি

উত্তোলন করিলেন এবং তাহার ফলে এই দশম বাধার সৃষ্টি হইল বলা যায়। কারন, রামানুজসম্প্রদায়ের শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনিবাস তাতাচার্য্য, তাতাচার্য্যের পুত্র শ্রীনিবাসাচার্য্য এবং বুচ্চিবেঙ্কটাচার্য্য এবং মাধ্বসম্প্রদায়ের রাঘবেন্দ্রস্বামী প্রভৃতি অদ্বৈতমতখণ্ডনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইঁহাদের পরিচয় এই—

১২২। **শ্রীনিবাসাচার্য্য**—ইনি রামানুজসম্প্রদায়ে চণ্ডমারুতকার মহাচার্য্যের শিষ্য। ইঁহার পিতা গোবিন্দাচার্য্য। ইনি ধর্ম্মরাজের বেদান্তপরিভাষার খণ্ডনাভিপ্রায়ে তাহারই অনুকরণে রামানুজমতের সারসংক্ষেপ সংগ্রহ করিয়া যতীন্দ্রমতদীপিকা নামে একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার টীকা না থাকায় সম্প্রতি মঃ মঃ পণ্ডিত অভ্যঙ্কর শাস্ত্রী তাহা রচনা করিয়াছেন। ইনি ভরদ্বাজগোত্রীয় দেবরাজাচার্য্যের পুত্র। ইঁহার অপর গ্রন্থ—বেঙ্কটনাথের শতদূষণীর উপর পাদুকাসহস্র নামে টীকা। ইনি যতীন্দ্রমতদীপিকা রচনাকালে যে সব রামানুজসম্প্রদায়ের গ্রন্থের নাম করিয়াছেন, তাহা এই—

১। দ্রাবিড়ভাষ্য, ২। ন্যায়তত্ত্ব, ৩। সিদ্ধিত্রয়, ৪। শ্রীভাষ্য, ৫। বেদান্তদীপ, ৬। বেদান্তসার, ৭। বেদার্থসংগ্রহ, ৮। ভাষ্যবিবরণ, ৯। সঙ্গতিমালা, ১০। ষড়র্থসংক্ষেপ, ১১। শ্রুতপ্রকাশিকা, ১২। তত্ত্বরত্নাকর, ১৩। প্রজ্ঞাপরিত্রাণ, ১৪। প্রমেয়সংগ্রহ, ১৫। ন্যায়কুলিশ, ১৬। ন্যায়সুদর্শন, ১৭। মানযাথাত্ম্যনির্ণয়, ১৮। ন্যায়সার, ১৯। তত্ত্বদীপন, ২০। তত্ত্বনির্ণয়, ২১। সর্ব্বার্থসিদ্ধি, ২২। ন্যায়পরিশুদ্ধি, ২৩। ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন, ২৪। পরমতভঙ্গ, ২৫। তত্ত্বত্রয়চুলুক, ২৬। তত্ত্বত্রয়নিরূপণ, ২৭। তত্ত্বত্রয়, ২৮। চণ্ডমারুত, ২৯। বেদান্তবিজয়, এবং ৩০। পরাশর্য্যবিজয়।

ইঁহাদের মধ্যে সকল গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। ইতিপূর্ব্বে আমরা যে সকল গ্রন্থের নাম পাইয়াছি, তাহাদের মধ্যে ১, ২, ৮, ৯, ১০,

১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৩, ২৪, ২৬ গ্রন্থগুলি বোধ হয় নাই। যাহা হউক, এই শ্রীনিবাসের চেষ্টাও এই দশম বাধার একটী যে অঙ্গ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

১২৩। **শ্রীনিবাস তাতাচার্য্য**—ইনি রামানুজসম্প্রদায়মধ্যে শ্রীশৈল বা শঠমর্ষণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মাধ্বমতের বিরুদ্ধে আনন্দতারতম্যবাদখণ্ডন নামে এক গ্রন্থ লেখেন। ইঁহার অপর গ্রন্থের সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক, ইঁহার চেষ্টাও এই দশম বাধার পোষক হয়। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। ইঁহার দুই পুত্র জন্মে, যথা—শ্রীনিবাসাচার্য্য ও অন্নয়াচার্য্য। উভয়েই বিশেষ পণ্ডিত হন।

১২৪। **তাতাচার্য্যের পুত্র শ্রীনিবাসাচার্য্য**—এই শ্রীনিবাস উক্ত তাতাচার্য্যের পুত্র। ইহার গুরু কৌণ্ডিণ্য গোত্রজ শ্রীনিবাস-দীক্ষিত। ইনি মহাচার্য্যের শিষ্য যতীন্দ্রমতদীপিকাকার কি না জানা যায় নাই। যাহা হউক, ইনি একজন মহা পণ্ডিত হন এবং রামানুজ-মতের বিশেষ পুষ্টিসাধন করেন। ইতি তত্ত্বমার্ত্তণ্ড গ্রন্থে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করেন ও ব্যাসতীর্থের ন্যায়চন্দ্রিকা খণ্ডন করেন। "শক্ত্যধি-করণসরণিবিবরণীতে" শঙ্করের আনন্দময়াধিকরণের ব্যাখ্যা খণ্ডন করেন। "ওঙ্কারবাদার্থ" ও "প্রণবদর্পণ" গ্রন্থে ব্যাসতীর্থের উক্ত চন্দ্রিকার ওঙ্কারসংক্রান্তমত খণ্ডন করেন, "জিজ্ঞাসাদর্পণে" রামানুজ-মতের সমর্থন করেন, "জ্ঞানরত্নপ্রকাশিকা" গ্রন্থে উপাসনা ও ধ্যান-বলে মুক্তি হয় বলিয়া শঙ্করমতের খণ্ডন করেন। "বিরোধনিরোধভাষ্য-পাদুকা" গ্রন্থে শ্রীভাষ্যের ব্যাখ্যাকালে অদ্বৈতবাদিগণের আক্ষেপের উত্তর দেন। "নয়দ্যুমণি" গ্রন্থে যতীন্দ্রমতদীপিকার অনুকরণে স্বমত বর্ণন করিয়াছেন। "সিদ্ধান্তচিন্তামণি" গ্রন্থে রামানুজসিদ্ধান্তের সংগ্রহ আছে। "ভেদদর্পণ" গ্রন্থে জীবব্রহ্মের ভেদ সিদ্ধ করা হইয়াছে। "সহস্র-

কিরণী" নামে শতদূষণীর উপর ইনি এক টীকা লিখিয়াছেন। এইরূপে ইনি এই দশম বাধার একজন প্রধান পুরুষ বলা যাইতে পারে।

১২৫। **বুচ্চি বেঙ্কটাচার্য্য**—ইনি তাতাচার্য্যের পুত্র শ্রীনিবাসাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র। ইনি বেদান্তকারিকাবলী গ্রন্থ লিখিয়া স্বমতের পুষ্টি এবং অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়াছেন। এজন্য ইনিও এই দশম বাধার পোষক বলা যায়।

১২৬। **রাঘবেন্দ্র স্বামী**—ইনি মাধ্বমতাবলম্বী একজন মহাধুরন্ধর পণ্ডিত। ইনি ব্যাসাচার্য্যের ন্যায়ামৃতের পুষ্টি না করিয়া জয়তীর্থচার্য্যের গ্রন্থের উপর বৃত্তি করিয়া তাহার পুষ্টিবিধান করেন। ইঁহার গ্রন্থ—মধ্বাচার্য্যের তত্ত্বোদ্যোতের উপর জয়তীর্থের টীকার বৃত্তি; মধ্বাচার্য্যের প্রমাণলক্ষণের উপর জয়তীর্থের ন্যায়কল্পলতাটীকার বৃত্তি, মধ্বভাষ্যের উপর জয়তীর্থের তত্ত্বপ্রকাশিকাটীকার উপর ভাবদীপিকা নামে বৃত্তি; জয়তীর্থের বাদাবলীর উপর টীকা, মধ্বাচার্য্যের অনুভাষ্যের উপর জয়তীর্থের ন্যায়সুধার উপর তত্ত্বমঞ্জরী নামে বৃত্তি, এবং গীতা, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, ছান্দোগ্য এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্যাখ্যা। রাঘবেন্দ্রের এই কীর্ত্তি মাধ্বমতের যেমন পুষ্টিসাধন করিল তদ্রূপ অদ্বৈতমতেরও বিশেষ খণ্ডন করিল। এজন্য ইঁহার এই চেষ্টা অদ্বৈতচিন্তাস্রোতে একটী প্রধান বাধা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ফলতঃ এই দশম বাধাটী বড় কম বাধা হইল না।

দশম বাধার প্রতীকার।

এক্ষণে এই দশম বাধার প্রতীকারকল্পে যাঁহাদের নাম করা যাইতে পারে, তাঁহারা এই—রামকৃষ্ণাধ্বরী, পেড্ডা দীক্ষিত, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী, নারায়ণ তীর্থ, শিবরামাচার্য্য, জগদীশতর্কালঙ্কার, অচ্যুত কৃষ্ণানন্দতীর্থ, আপোদেব, রামানন্দ সরস্বতী, কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী, সদানন্দ কাশ্মীরী, রঙ্গনাথাচার্য্য, নরহরি এবং দিবাকর প্রভৃতি। ইঁহাদের পরিচয় এই—

১২৭। **রামকৃষ্ণাধ্বরী**—ইনি ধর্মরাজ অধ্বরীন্দ্রের পুত্র। ইনি পিতার বেদান্তপরিভাষার উপর শিখামণি টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈত-মতের পুষ্টি ও বিরোধী মতের খণ্ডন করেন। এজন্য ইঁহার চেষ্টা এই দশম বাধার প্রতীকার স্বরূপ বলা যায়। ইঁহার সময় ১৬৭৫ হইতে ১৭২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হইবে বোধ হয়।

১২৮। **পেড্ডা দীক্ষিত**—ইঁহার অপর নাম হৃষীকেশ দীক্ষিত। ইনি কৌশিকগোত্রীয় রঘনাথ অধ্বরীর পৌত্র ও শিষ্য। ইঁহার পিতার নাম নারায়ণ দীক্ষিত। ইনি তাঞ্জোর দেশে কন্দরমাণিক্যগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বিদ্যাগুরু ধর্মরাজ অধ্বরীন্দ্র। ইনি ধর্ম-রাজের বেদান্তপরিভাষার উপর "প্রকাশিকা" নামে অতি উত্তম একটী টীকা করিয়াছেন। ইঁহার অপর গ্রন্থ ছন্দোবিচিতিবৃত্তি। ইঁহার কীর্ত্তিও এই দশম বাধার প্রতীকার স্বরূপ বলা যায়।

১২৯। **ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী**—ইঁহার বিদ্যাগুরু শিবরামাচার্য্য এবং নারায়ণ তীর্থ এবং আশ্রমগুরু পরমানন্দ সরস্বতী। ন্যায়শাস্ত্রে ইঁহার গুরু নবদ্বীপের হরিরাম সিদ্ধান্তবাগীশ। ইঁহার সহপাঠী মহা-নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্য। ইনি অদ্বৈতসিদ্ধির চন্দ্রিকা টীকা করিয়া মাধ্বমতাবলম্বী ব্যাসরামকৃত ন্যায়ামৃততরঙ্গিণীর অকাট্য খণ্ডন করেন। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থে তিনি মীমাংসক খণ্ডদেবের মত এবং গদাধর প্রভৃতি নৈয়ায়িকের মতও বিশেষভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। ইঁহার এই খণ্ডন এমনই অকাট্য খণ্ডন যে, ইঁহার আর উত্তর হয় না। ব্রহ্মানন্দের চিন্তামধ্যে অপূর্ব্বতা নিতান্ত অসাধারণ বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া থাকেন।

অদ্বৈতসিদ্ধির উপর ইনি দুই টীকা করেন, একটী লঘুচন্দ্রিকা, অপরটী বৃহচ্চন্দ্রিকা। কেহ বলেন বৃহচ্চন্দ্রিকা শিবরামের কৃত। তন্মধ্যে লঘুচন্দ্রিকাই এখন সুলভ। ইঁহার অপর গ্রন্থ—শঙ্করের

কিরণী” নামে শতদূষণীর উপর ইনি এক টীকা লিখিয়াছেন। এইরূপে ইনি এই দশম বাধার একজন প্রধান পুরুষ বলা যাইতে পারে।

১২৫। **বুচ্চি বেঙ্কটাচার্য্য**—ইনি তাতাচার্য্যের পুত্র শ্রীনিবাসাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র। ইনি বেদান্তকারিকাবলী গ্রন্থ লিখিয়া স্বমতের পুষ্টি এবং অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়াছেন। এজন্য ইনিও এই দশম বাধার পোষক বলা যায়।

১২৬। **রাঘবেন্দ্র স্বামী**—ইনি মাধ্বমতাবলম্বী একজন মহাধুরন্ধর পণ্ডিত। ইনি ব্যাসাচার্য্যের ন্যায়ামৃতের পুষ্টি না করিয়া জয়তীর্থাচার্য্যের গ্রন্থের উপর বৃত্তি করিয়া তাহার পুষ্টিবিধান করেন। ইঁহার গ্রন্থ—মধ্বাচার্য্যের তত্ত্বোদ্যোতের উপর জয়তীর্থের টীকার বৃত্তি; মধ্বাচার্য্যের প্রমাণলক্ষণের উপর জয়তীর্থের ন্যায়কল্পলতাটীকার বৃত্তি, মধ্বভাষ্যের উপর জয়তীর্থের তত্ত্বপ্রকাশিকাটীকার উপর ভাবদীপিকা নামে বৃত্তি; জয়তীর্থের বাদাবলীর উপর টীকা, মধ্বাচার্য্যের অনুভাষ্যের উপর জয়তীর্থের ন্যায়সুধার উপর তত্ত্বমঞ্জরী নামে বৃত্তি, এবং গীতা, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, ছান্দোগ্য এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্যাখ্যা। রাঘবেন্দ্রের এই কীর্ত্তি মাধ্বমতের যেমন পুষ্টিসাধন করিল তদ্রূপ অদ্বৈতমতেরও বিশেষ খণ্ডন করিল। এজন্য ইঁহার এই চেষ্টা অদ্বৈতচিন্তাস্রোতে একটী প্রধান বাধা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ফলতঃ এই দশম বাধাটী বড় কম বাধা হইল না।

দশম বাধার প্রতীকার।

এক্ষণে এই দশম বাধার প্রতীকারকল্পে যাঁহাদের নাম করা যাইতে পারে, তাঁহারা এই—রামকৃষ্ণাধ্বরী, পেড্ডা দীক্ষিত, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী, নারায়ণ তীর্থ, শিবরামাচার্য্য, জগদীশতর্কালঙ্কার, অচ্যুত কৃষ্ণানন্দতীর্থ, আপোদেব, রামানন্দ সরস্বতী, কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী, সদানন্দ কাশ্মীরী, রঙ্গনাথাচার্য্য, নরহরি এবং দিবাকর প্রভৃতি। ইঁহাদের পরিচয় এই—

১২৭। রামকৃষ্ণাধ্বরী—ইনি ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্রের পুত্র। ইনি পিতার বেদান্তপরিভাষার উপর শিখামণি টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈত-মতের পুষ্টি ও বিরোধী মতের খণ্ডন করেন। এজন্য ইঁহার চেষ্টা এই দশম বাধার প্রতীকার স্বরূপ বলা যায়। ইঁহার সময় ১৬৭৫ হইতে ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হইবে বোধ হয়।

১২৮। পেড্ডা দীক্ষিত—ইঁহার অপর নাম হৃষীকেশ দীক্ষিত। ইনি কৌশিকগোত্রীয় রঙ্গনাথ অধ্বরীর পৌত্র ও শিষ্য। ইঁহার পিতার নাম নারায়ণ দীক্ষিত। ইনি তাঞ্জোর দেশে কন্দরমাণিক্যগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বিদ্যাগুরু ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্র। ইনি ধর্ম্ম-রাজের বেদান্তপরিভাষার উপর "প্রকাশিকা" নামে অতি উত্তম একটী টীকা করিয়াছেন। ইঁহার অপর গ্রন্থ ছন্দোবিচিত্তিবৃত্তি। ইঁহার কীর্ত্তি এই দশম বাধার প্রতীকার স্বরূপ বলা যায়।

১২৯। ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী—ইঁহার বিদ্যাগুরু শিবরামাচার্য্য এবং নারায়ণ তীর্থ এবং আশ্রমগুরু পরমানন্দ সরস্বতী। ন্যায়শাস্ত্রে ইঁহার গুরু নবদ্বীপের হরিরাম সিদ্ধান্তবাগীশ। ইঁহার সহপাঠী মহা-নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্য। ইনি অদ্বৈতসিদ্ধির চন্দ্রিকা টীকা করিয়া মাধ্বমতাবলম্বী ব্যাসরামকৃত ন্যায়ামৃততরঙ্গিণীর অকাট্য খণ্ডন করেন। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থে তিনি মীমাংসক খণ্ডদেবের মত এবং গদাধর প্রভৃতি নৈয়ায়িকের মতও বিশেষভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। ইঁহার এই খণ্ডন এমনই অকাট্য খণ্ডন যে, ইহার আর উত্তর হয় না। ব্রহ্মানন্দের চিন্তামধ্যে অপূর্ব্বতা নিতান্ত অসাধারণ বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া থাকেন।

অদ্বৈতসিদ্ধির উপর ইনি দুই টীকা করেন; একটী লঘুচন্দ্রিকা, অপরটী বৃহচ্চন্দ্রিকা। কেহ বলেন বৃহচ্চন্দ্রিকা শিবরামের কৃত। তন্মধ্যে লঘুচন্দ্রিকাই এখন সুলভ। ইঁহার অপর গ্রন্থ—শঙ্করের নির্দ্দি-

উপর মধুসূদনের সিদ্ধান্তবিন্দুটীকার উপর ন্যায়রত্নাবলী। ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি—সূত্রমুক্তাবলী, অদ্বৈতচন্দ্রিকা, অদ্বৈতসিদ্ধান্তবিদ্যোতন ও মীমাংসাচন্দ্রিকা প্রভৃতি। মধুসূদনের বার্দ্ধক্যে ইনি যুবক। সুতরাং ইঁহার সময় ১৫৭৫ হইতে ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দ হইবে। ব্রহ্মানন্দের একার চেষ্টাই এই দশম বাধা প্রতীকারের পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল।

১৩০। **নারায়ণ তীর্থ**—ইনি ব্রহ্মানন্দের বিদ্যাগুরু। ইঁহার গুরু শিবরাম তীর্থ, বাসুদেব তীর্থ এবং রামগোবিন্দ তীর্থ। চিৎলে ভট্টের প্রকরণ গ্রন্থপাঠে জানা যায়—ইনি ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। ইনি বহু গ্রন্থের উপর টীকা করিয়াছেন, যথা—১০৮ উপনিষদের টীকা, জগদীশতর্কালঙ্কারের শব্দশক্তিপ্রকাশিকার উপর টীকা, উদয়নের কুসুমাঞ্জলীর উপর টীকা, রঘুনাথের চিন্তামণিদীধিতির উপর টীকা, বিশ্বনাথের ভাষাপরিচ্ছেদের উপর টীকা, ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকার উপর টীকা, পাতঞ্জল যোগসূত্রের উপর টীকা, মধুসূদনের সিদ্ধান্তবিন্দুর উপর টীকা, বেদান্তবিভাবনা নামক গ্রন্থ, শাণ্ডিল্যসূত্রের উপর ভক্তিচন্দ্রিকা টীকা, কুমারিলের মতে ভাট্টভাষাপ্রকাশিকা টীকা, ইত্যাদি। ইঁহার কীর্ত্তিও অদ্বৈতমতকে এ সময় খুব সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। এজন্য এই দশম বাধার প্রতীকারে ইঁহার চেষ্টাও প্রধান।

১৩১। **শিবরাম আশ্রম**—ইনিও ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর গুরু। লঘুচন্দ্রিকায় ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন—এই গ্রন্থের কর্ত্তা শিবরামবর্ণী আমরা কেবল লেখক। রত্নপ্রভা টীকাকার রামানন্দ সরস্বতী শিবরামকে গুরু বলিয়া মান্য করিয়াছেন। কেহ বলেন—অদ্বৈতসিদ্ধির বৃহচ্চন্দ্রিকা টীকা শিবরামই করিয়াছেন। ইঁহারও সময় সুতরাং নারায়ণতীর্থেরই সময়। যাহা হউক, ইঁহার কীর্ত্তিও এই দশম বাধার যথেষ্ট প্রতীকার করিল।

১৩২। **জগদীশ তর্কালঙ্কার**—মহামতি জগদীশ ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয়—ইহা পণ্ডিত মাত্রেই জানেন। ইনিও অদ্বৈতমতে গীতার

টীকা রচনা করায় ইঁহার কীর্ত্তিও এই দশম বাধার প্রতীকারস্বরূপ বলা যায়। ইঁহার সময় সপ্তদশ শতাব্দী। যেহেতু গদাধর ভট্টাচার্য্যের যুবক অবস্থায় ইনি বৃদ্ধ। গদাধরের সময় ১৬০৪ হইতে ১৭০৮ খৃষ্টাব্দ। অতএব ১৫৬০ হইতে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইঁহার জীবন হইবে।

১৩৩। **অচ্যুতকৃষ্ণানন্দ তীর্থ**—ইঁহার বিদ্যাগুরু স্বয়ংজ্যোতিঃ সরস্বতী। স্বয়ংজ্যোতির গুরু অদ্বৈতানন্দ। অচ্যুতকৃষ্ণানন্দতীর্থ কাবেরী তীরে নীলকণ্ঠেশ্বর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অপ্পয়দীক্ষিতের সিদ্ধান্তলেশের উপর কৃষ্ণালঙ্কার নামক এক অপূর্ব্ব টীকা করিয়াছেন। ইহার অন্য গ্রন্থ—তৈত্তিরীয় উপনিষদের শাঙ্করভাষ্যের উপর বনমালা টীকা। ইঁহার কীর্ত্তি এই দশম বাধার প্রতীকার বলা যাইতে পারে।

১৩৪। **আপোদেব**—ইনি মীমাংসায় বিখ্যাত পণ্ডিত। মীমাংসান্যায়প্রকাশ গ্রন্থ ইঁহার বিখ্যাত। ইঁহার পিতা অনন্তদেব, পিতামহ ১ম আপোদেব, এবং প্রপিতামহ একনাথ। ইঁহার অপর গ্রন্থ—সদানন্দের বেদান্তসারের উপর বালবোধিনী টীকা। ইনি তত্ত্বদীপনকার অখণ্ডানন্দের নাম করায় এবং বেদান্তসারের টীকা করায় ইনিও এইরূপ সময়েই আবির্ভূত বলিয়া বোধ হয়। ইঁহার কীর্ত্তিও এই বাধার প্রতীকার স্বরূপ হয়।

১৩৫। **রামানন্দ সরস্বতী**—ইনি গোবিন্দানন্দ সরস্বতীর শিষ্য। ইনিই ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যের উপর রত্নপ্রভা টীকা রচনা করিয়াছেন। ইঁহার অপর গ্রন্থ পঞ্চপাদিকাবিবরণোপন্যাস, ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী, রত্নপ্রভার উপর কৃষ্ণানন্দের এক টীকা আছে। ইঁহার কীর্ত্তি এই বাধার নিবারণে একটী বিশেষ সহায় হয়। অনেকের ধারণা ইঁহার গুরু গোবিন্দানন্দই রত্নপ্রভা লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহা ভুল। রামানন্দ গুরুরূপে শিবরামের এবং নৃসিংহাশ্রমের নাম করিয়াছেন। শিবরামের সময় ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং ইঁহারও সময় ঐ সপ্তদশ শতাব্দী।

রত্নপ্রভামধ্যে আনন্দজ্ঞানের উল্লেখ আছে। সরলভাবে সংক্ষেপে সকল কথা বর্ণন করিয়া সকলের সকল আক্রমণের উত্তর দিয়া এরূপ টীকা আর কেহই বোধ হয় করেন নাই। মাধ্ব ও রামানুজ প্রভৃতির সূত্রব্যাখ্যার যথার্থতা কত, তাহা এই রত্নপ্রভা দেখিলে বেশ বুঝা যায়।

১৩৬। **কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী**—ইঁহার গুরু—বাসুদেব যতীন্দ্র ও পরম গুরু—রামভদ্র সরস্বতী। ইনি শ্রীভাষ্য খণ্ডন করিয়া সিদ্ধান্তসিদ্ধাঞ্জন যে ভাবে লিখিয়াছেন, তাহাতে ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে। সম্ভবতঃ ইনিই রত্নপ্রভার উপর টীকা করিয়াছেন।

১৩৭। **কাশ্মীরী সদানন্দ স্বামী**—ইতি অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থ রচনা করিয়া পরমতসমূহের উপর দশটী মুদ্গর প্রহার করিয়াছেন। ইনি আনন্দজ্ঞানের ভাষ্যটীকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইঁহার কীর্ত্তি এই বাধার বিশেষ প্রতীকারস্বরূপ বলা যায়। ইঁহারও সময় ১৭শ শতাব্দী বলিয়াই অনুমিত হয়।

১৩৮। **রঙ্গনাথাচার্য্য**—ইনি ব্রহ্মসূত্রের উপর একখানি বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। বৃত্তির প্রারম্ভে বিদ্যারণ্য ও নৃসিংহাশ্রমের নাম করায় ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দের পর ইঁহার সময় হইবে। নৃসিংহাশ্রমের তত্ত্ববিবেকের রচনা কাল ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দ। ইঁহার কীর্ত্তিও এই বাধার প্রতীকার করে।

১৩৯। **নরহরি**—ইনি বোধসার নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া এই সময় অদ্বৈতমতের বিশেষ পুষ্টিসাধন করেন। এজন্ত ইঁহার কীর্ত্তিও এই বাধার প্রতীকারবিশেষ বলা যায়। ইঁহার শিষ্য—পণ্ডিত দিবাকর ইঁহার উপর টীকা রচনা করিয়াছেন। নরহরি মধুসূদনের ভক্তিরসায়নের শ্লোকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এজন্ত ইঁহার সময়ও এই সপ্তদশ শতাব্দী হইবে, মনে হয়।

১৪০। **দিবাকর**—ইনি নরহরির শিষ্য এবং নরহরির বোধ-

সারের উপর টীকা লিখিয়া ইঁহার প্রচারে সহায়তা করিয়াছেন। এজন্য ইঁহার দ্বারাও এই দশম বাধার প্রতীকার সাধিত হয়।

যাহা হউক, এইরূপে এই সব মহাত্মগণের যত্নে অদ্বৈতবেদান্ত-স্রোতের এই দশম বাধার সম্পূর্ণ প্রতীকার হয় বলিতে হইবে।

একাদশ বাধা।

এইরূপে দশম বাধা প্রশমিত হইতে না হইতেই অপর বাধার আবির্ভাব হইল। ইহাতে মাধ্বসম্প্রদায়ের বনমালী মিশ্র, গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বলদেব বিদ্যাভূষণ, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, রাধামোহন গোস্বামী প্রভৃতির আবির্ভাব হয়। ইঁহাদের পরিচয় এইরূপ—

১৪১। **বনমালী মিশ্র**—ইনি মাধ্বসম্প্রদায়ের আচার্য। প্রায় এই সময় ইঁহার আবির্ভাব হয়। ইনি বনমালা বা পঞ্চভঙ্গী নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বমতের সিদ্ধান্ত অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করেন। ইহাতে ন্যায়ামৃত, তাহার প্রতিবাদ অদ্বৈতসিদ্ধি, তাহার প্রতিবাদ তরঙ্গিণী ও তাহার প্রতিবাদ লঘুচন্দ্রিকার বক্তব্য সংক্ষেপে বলিয়া পরিশেষে পঞ্চম নিজ বক্তব্য বলিয়াছেন। এজন্য ইহা একপ্রে অদ্বৈত-মতে একটী বাধা বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। ইঁহার সময় ব্রহ্মানন্দের পর বলিয়া খৃষ্টীয় সপ্তদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী বলা হয়।

১৪২। **বলদেব বিদ্যাভূষণ**—বালেশ্বর জেলায় খাণ্ডায়ত কুলে ইঁহার জন্ম হয়। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের শিষ্য গৌরীদাস, তৎশিষ্য হৃদয়ানন্দ, তৎশিষ্য শ্যামানন্দ, তৎশিষ্য রসিকমুরারী, তৎশিষ্য নয়নানন্দ, তৎশিষ্য রাধাদামোদর, তৎশিষ্য বলদেব। কেহ বলেন—ইনি ব্রাহ্মণ, কেহ বলেন—ইনি বৈশ্য। ইঁহারও সময় সপ্তদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী। ইনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে ব্রহ্মসূত্রের উপর গোবিন্দভাষ্য, দশখানি উপনিষদের ভাষ্য, গীতাভাষ্য, বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য রচনা করিয়া গৌড়ীয় মতে আচার্যপদবী প্রাপ্ত হন। ইঁহার অপর গ্রন্থ—গোবিন্দভাষ্যের

উপর বিবৃতি—সিদ্ধান্তরত্ন ও তাহার টীকা, প্রমেয়রত্নাবলী, বেদান্তস্যমন্তকটীকা, শ্রীজীবগোস্বামীর ষট্সন্দর্ভগ্রন্থের টীকা, ভাগবতটীকা, স্তবমালাভাষ্য, লঘুভাগবতামৃতটীকা, গোপালতাপনীয়ভাষ্য, ছন্দঃকৌস্তুভভাষ্য, সাহিত্যকৌমুদী, ব্যাকরণকৌমুদী, নাটকচন্দ্রিকাটীকা, চন্দ্রালোকটীকা, কাব্যকৌস্তুভ, সিদ্ধান্তদর্পণ প্রভৃতি। ইঁহার শিক্ষাগুরু বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। ইনি ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে স্তবমালার টীকা করেন। জয়পুরে গলতার গাদিতে দ্বিতীয় জয়সিংহের সমক্ষে এক অদ্বৈতবাদীর সহিত বিচারে ইনি জয়ী হন এবং স্বমতের বেদান্তভাষ্য দেখাইবার জন্য এক রাত্রে উহা রচনা করেন। এই জয়সিংহ ১৭২১ হইতে ১৭২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লির মহম্মদ শার অধীনে প্রথমে মথুরার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সুতরাং ইঁহার সময় অষ্টাদশ শতাব্দী। মাধ্বসম্প্রদায়ের পীতাম্বরের নিকট ইনি মাধ্বদর্শন পড়েন। গৌড়ীয় মতের প্রধান আচার্য্য শ্রীজীবগোস্বামীর মতের সহিত ইঁহার মতের কিছু ভেদ আছে। শ্রীজীবের মত অপেক্ষা ইঁহার মতে মাধ্বমতের দ্বৈতগন্ধ অধিক। যাহা হউক, অদ্বৈতমতের ইনি বিশেষ শত্রুতাই করেন।

১৪৩। **বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী**—ইনি বলদেব বিদ্যাভূষণের শিক্ষাগুরু। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের শিষ্য লোকনাথ, তৎশিষ্য নরোত্তম, তৎশিষ্য গঙ্গানারায়ণ, তৎশিষ্য কৃষ্ণচরণ, তৎশিষ্য রাধারমণ এবং তৎশিষ্য বিশ্বনাথ। নদীয়া দেবগ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার গ্রন্থ—১। ব্রজরীতিচিন্তামণি, ২। চমৎকারচন্দ্রিকা, ৩। প্রেমসম্পুটন (খণ্ডকাব্য) ৪। গীতাবলী, ৫। অলঙ্কারকৌস্তুভ টীকা, ৬। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু টীকা, ৭। উজ্জ্বলনীলমণি টীকা, ৮। ললিতমাধব টীকা, ৯। বিদগ্ধমাধবনাটক টীকা, ১০। দানকেলিকৌমুদী টীকা, ১১। চৈতন্যচরিতামৃত টীকা, ১২। ব্রহ্মসংহিতা টীকা, ১৩। গীতা টীকা, ১৪। ভাগবত টীকা, ১৫। কৃষ্ণভাবনামৃত (মহাকাব্য) ১৬। গৌরগণ

যাহা হউক, এই একাদশ বাধায় ইঁহাদিগকে প্রধানরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। রামানুজসম্প্রদায়ে যে কেহ ছিলেন না, তাহা নহে; তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় দশম ও কতক দ্বাদশ বাধার মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

একাদশ বাধার প্রতীকার।

এক্ষণে এই একাদশ বাধার প্রতীকারকল্পে বহু আচার্য্যেরই আবির্ভাব হয়, তন্মধ্যে যাঁহারা প্রধান তাঁহারা—বিট্‌ঠলেশোপাধ্যায়, অমরদাস উদাসীন, মহাদেবেন্দ্র সরস্বতী, ধনপতি সুরি, শিবদাস, সদাশিবেন্দ্র সরস্বতী, ভাস্কর দীক্ষিত, হরি দীক্ষিত এবং আয়ন্ন দীক্ষিত প্রভৃতি। ইঁহাদের পরিচয় এই—

১৪৫। বিট্‌ঠলেশোপাধ্যায়—ইনি গুর্জ্জর ব্রাহ্মণ। ইনি নব্যন্যায়ে অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠেন এবং অদ্বৈতসিদ্ধির পক্ষপ্রতিপক্ষের কথা সবিশেষ খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মানন্দের লঘুচন্দ্রিকার উপর বিট্‌ঠলেশী নামক এক অতি অপূর্ব্ব টীকা রচনা করেন। এ পর্য্যন্ত অদ্বৈতসিদ্ধি ও তাঁহার টীকা প্রভৃতির যত প্রতিবাদ হইয়াছে, ইনি সে সকলের সমাধান করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধিকে অকাট্য সত্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইঁহার একার এই চেষ্টাই এই বাধার সম্যক্ প্রতীকার করিল। ইনি রত্নগিরির নিকট, রাজাপুরের অন্তর্গত কশলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ পটবর্দ্ধনোপাধি গোবিন্দ ভট্ট। বিট্‌ঠল তাঁহার নবম বা দশম পুরুষ। মুগ্ধ বনমালী মিশ্রের বনমালা গ্রন্থের আক্রমণ ইনি নিরাশ করিয়াছেন। ইঁহার সূক্ষ্মদর্শন, বিচারপটুতা ও সত্যনিষ্ঠা মনে হয় পূর্ব্ববর্ত্তী সকলকেই অতিক্রম করিয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধির চরম অভিব্যক্তি বোধ হয় এই স্থলেই শেষ হইয়াছে। ইঁহার পর যাঁহারা অদ্বৈতসিদ্ধি অবলম্বনে খণ্ডনমণ্ডন করিয়াছেন, তাঁহারা, পরম্পর পরম্পরকে কতকটা না বুঝিয়াই করিয়াছেন—ইহাই দেখা যায়।

১৪৬। **উদাসীনস্বামী অমরদাস**—ইনি বেদান্তপরিভাষার টীকা শিখামণির উপর মণিপ্রভা টীকা রচনা করেন। এইরূপে ইঁহার চেষ্টা এই বাধার প্রতীকারবিশেষ হইল।

১৪৭। **মহাদেবেন্দ্র সরস্বতী**—ইঁহার গুরু স্বয়ংপ্রকাশানন্দ। ইনি তত্ত্বানুসন্ধান ও তাহার টীকা অদ্বৈতচিন্তাকৌস্তুভ রচনা করেন। ইঁহার এই কীর্ত্তিও এই বাধার প্রতীকারে সহায় হয়।

১৪৮। **ধনপতি সুরি**—ইনি "রামেষহীন্দুসংবৎসরে" অর্থাৎ ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে গীতার ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকা নামক টীকা রচনা করিয়া শঙ্করমতেরই উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মাধবীয় শঙ্করবিজয়ের টীকা রচনা করিয়া এবং পদ্মপাদবিরচিত প্রাচীন শঙ্করবিজয়ের মুখ্য-বলিষ্ঠ অংশ সেই টীকামধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া, এবং ভাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায়ের টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের যথেষ্ট পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। ইঁহার মতও এই একাদশবাধার প্রতীকারস্বরূপ বলা যাইতে পারে। ধনপতির পিতা—রামকৃষ্ণ, মা রামকুমার এবং গুরু—বালগোপাল তীর্থ।

ছিলেন বলিয়া ১৬৭৫—১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ মধ্যে ইঁহার জীবিতকাল বলিতে হইবে। ইনি সিদ্ধযোগী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। ইঁহার গ্রন্থ ব্রহ্মসূত্রের উপর ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিকা নামক বৃত্তি, আত্মবিদ্যাবিলাস, ১২খানি উপনিষদের দীপিকা টীকা, সিদ্ধান্তকল্পবল্লী, অদ্বৈতরসমঞ্জরী, যোগসূত্রের উপর যোগসুধাকার নামক বৃত্তি, সিদ্ধান্তলেশসার—কবিতাকল্পবল্লী প্রভৃতি। ইঁহার কীর্ত্তি এই বাধার প্রতীকারে বিশেষ হেতু হইয়াছিল।

১৫১। **ভাস্কর দীক্ষিত**—১৮৮৪ হইতে ১৭১১ খৃষ্টাব্দে ইনি প্রসিদ্ধ। ইঁহার গুরু সম্ভবতঃ সিদ্ধান্তসিদ্ধাঞ্জনকার কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী। ইনি সিদ্ধান্তসিদ্ধাঞ্জনের উপর রত্নতুলিকা টীকা রচনা করেন। ইনিও এই বাধার প্রতীকারে যথেষ্ট সহায়তা করেন।

১৫২। **আয়ন্ন দীক্ষিত**—ইনি ব্যাসতাৎপর্য্যনির্ণয় গ্রন্থ লিখিয়া ব্যাসের মত যে অদ্বৈতবাদ তাহাই প্রতিপন্ন করেন। এজন্য ইঁহার কীর্ত্তিও এই বাধার প্রতীকাররূপ হয়।

১৫৩। **হরি দীক্ষিত**—ইনি ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে রামরায়ের অনুরোধে ব্রহ্মসূত্রের উপর শঙ্করমতে অতি সরল এক বৃত্তি রচনা করিয়া অদ্বৈতমত-প্রচারে বিশেষ সহায়তা করেন। এজন্য এই বাধার প্রতীকারকল্পে ইঁহার চেষ্টাও উল্লেখযোগ্য।

যাহা হউক, এইরূপে এই কয়জন মহাত্মার চেষ্টায় এই একাদশ বাধা নির্ম্মূল হইল বলা যায়।

দ্বাদশ বাধা।

ইহার কিছুদিন পরে অদ্বৈতবেদান্তস্রোতে এইবার দ্বাদশ বাধা উপস্থিত হইল। ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা ক্ষীণ বাধা হইলেও ইহাতে উভয় পক্ষে বহু মহাত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—রামানুজমতে—মহীশূর অনন্তাচার্য্য, মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রী, কাঞ্চীর প্রতিবাদিভয়ঙ্কর অনন্তাচার্য্য, মাধ্বমতে—সত্যধ্যানতীর্থ ও গৌড়গিরি বেঙ্কট-

রমণাচার্য্য, ন্যায়মতে—মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন, আর্য্যসমাজী দয়ানন্দ সরস্বতী, শাক্তমতে মঃ মঃ পঞ্চানন তর্করত্ন, ইত্যাদি। ইঁহাদের পরিচয় এইরূপ—

১৫৪। **মহীশূর অনন্তাচার্য্য**—ইনি রামানুজসম্প্রদায়ের মধ্যে এই সময় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত হন। ইনি ন্যায়শাস্ত্রে একজন প্রগাঢ় পণ্ডিত হইয়া "ন্যায়ভাস্কর" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধি ও লঘুচন্দ্রিকাদি খণ্ডন করেন। ভূতপূর্ব্ব শৃঙ্গেরীর স্বামী সচ্চিদানন্দ শিবাভিনব নৃসিংহভারতীর পিতা শতকোটী রামশাস্ত্রীর সহিত ইঁহার বিচার হওয়ায় ইনি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ ১৯শ শতাব্দীর লোক বলিতে হয়। ইঁহার চেষ্টায় এই দ্বাদশ বাধার সৃষ্টি হইল।

১৫৫। **মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রী**—ইনি কাশীধামে রামানুজমতের একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। ইনি রামানুজের বেদার্থসারসংগ্রহের উপর স্নেহপূর্ত্তি নামক টীকা করিয়া অপ্পয় দীক্ষিতের সিদ্ধান্তলেশ খণ্ডন করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীভাষ্য ও রামানুজীয় বেদান্তসার প্রভৃতির ভূমিকামধ্যেও অদ্বৈতমতের খণ্ডনচেষ্টা করেন। ইঁহার চেষ্টাও এই দ্বাদশবাধার পুষ্টি করে। ইনিও ১৯।২০শ শতাব্দীর লোক।

১৫৬। **কাঞ্চীর প্রতিবাদিভয়ঙ্কর অনন্তাচার্য্য**—ইনি এই সময় দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া কাশীতে রাজেশ্বর শাস্ত্রী ও বিশ্বেশ্বর শাস্ত্রী প্রভৃতির সহিত লিখিত বিচার করেন। বেদান্ত ও মীমাংসার একশাস্ত্রত্বমীমাংসা নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া মহামহোপাধ্যায় অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রীর শাস্ত্রদীপিকার ভূমিকোক্ত বেদান্ত ও মীমাংসার একশাস্ত্রত্বখণ্ডনের খণ্ডন করেন। এজন্য ইঁহার চেষ্টাও এই বাধার পুষ্টি করিল।

১৫৭। **মাধ্বস্বামী সত্যধ্যানতীর্থ**—ইনি উদীপির উত্তরবাড়ী মঠের অধীশ্বর। ইনি বাচস্পতিমিশ্রের ভামতী, রামসুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রীর মাধ্বচন্দ্রিকাখণ্ডনের খণ্ডন "চন্দ্রিকাখণ্ডন" নামক গ্রন্থ লিখিয়া অদ্বৈতমত

খণ্ডন করেন। ইনিও ন্যায়াদি শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন এবং দিগ্বিজয় করিয়াও কাশীতে অদ্বৈতমতখণ্ডনের চেষ্টা করেন, এজন্য ইঁহার কীর্ত্তিও অদ্বৈতচিন্তাস্রোতে এই দ্বাদশ বাধাস্বরূপ বলা যায়।

১৫৮। **গৌড়গিরি বেঙ্কটরমণাচার্য্য**—ইনি মহীশূর ব্যাসরায় মঠের অধীশ্বর ছিলেন। ইনি রামসুব্বাশাস্ত্রীর মাধ্বচন্দ্রিকাখণ্ডনের খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়া চন্দ্রিকাপ্রকাশপ্রসর নামক গ্রন্থ লেখেন। এজন্য ইঁহার চেষ্টাও এই বাধায় যোগদান করে।

১৫৯। **মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন**—ভট্টপল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কাশীবাসকালে ইনি ন্যায়মতে "অদ্বৈতবাদখণ্ডন" এবং "মায়াবাদনিরাস" গ্রন্থ লেখেন। ইনি ন্যায়মতে গদাধর ও শিরোমণিরও ন্যূনতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এজন্য ইঁহার চেষ্টাও এই দ্বাদশ বাধা নামে অভিহিত হইবার যোগ্য।

১৬০। **দয়ানন্দ স্বামী**—ইনি আর্য্যসমাজের নেতা। ইনি বহু স্থানে বহু বিচার করিয়া কলিকাতায় ও চুঁচুড়ায় তারানাথ তর্কবাচস্পতির সহিত লিখিয়া বিচার করেন, এবং কাশীতে বিশুদ্ধানন্দের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। বেদভাষ্যাদি নানা গ্রন্থ লিখিয়া ইনি অদ্বৈতমতের বিরোধিতা করেন। এজন্য ইঁহার চেষ্টাও এই দ্বাদশ বাধার মধ্যে গণ্য হইতে পারে। কাটিয়াবাড়, মার্ভিতে ১৮২৪ খৃঃ তে ইঁহার জন্ম এবং আজমীরে ১৮৮৩ খৃঃ তে বিপক্ষকর্ত্তৃক বিষপ্রয়োগের ফলে মৃত্যু হয়।

যাহা হউক, এইরূপে এই উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে উপরি উক্ত মহাত্মাগণ অদ্বৈতচিন্তাস্রোতে এই দ্বাদশ বাধার সৃষ্টি করিলেন বলা যায়।

দ্বাদশ বাধার প্রতীকার।

এই দ্বাদশ বাধার প্রতীকারকল্পে যে সব অদ্বৈতবাদিগণ লেখনী ধারণ করেন, তাঁহারা মঃ মঃ রামসুব্বাশাস্ত্রী, মঃ মঃ রাজুশাস্ত্রী, পণ্ডিতপ্রবর তারানাথ তর্কবাচস্পতি, মঃ মঃ কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, পণ্ডিতপ্রবর তারাচরণ তর্করত্ন, পণ্ডিতপ্রবর রঘুনাথ শাস্ত্রী, পণ্ডিতপ্রবর দক্ষিণামূর্তি-স্বামী, মঃ মঃ সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রী, মঃ মঃ লক্ষ্মণশাস্ত্রী, মঃ মঃ অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী, কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী, শান্তানন্দ সরস্বতী, মঃ মঃ পঞ্চাপগেশ শাস্ত্রী, কাকারাম শাস্ত্রী, পণ্ডিতপ্রবর রাজেশ্বর শাস্ত্রী, মঃ মঃ ধর্মদত্ত ঝা, পণ্ডিত চন্দ্রধর ভট্ট বেদান্ততীর্থ, পণ্ডিত রমেশচন্দ্র তর্কতীর্থ, কেশবানন্দ ভারতী এবং পণ্ডিতপ্রবর যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ, ইত্যাদি।

১৬২। মহামহোপাধ্যায় রামসুব্বাশাস্ত্রী—ইনি দক্ষিণ-ভারতে কুম্ভকোণমের নিকট তিরুবিশলুর সাহাজী মাহারাজ পুরম্ গ্রামে আবির্ভূত হন। ইনি ন্যায়, মীমাংসা ও বেদান্তে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হন। ইনি রামানুজী মহীশূর অনন্তাচার্যাকৃত অদ্বৈতসিদ্ধির খণ্ডন ন্যায়ভাস্করের খণ্ডন করেন এবং ব্যাসতীর্থের মান্দচন্দ্রিকার খণ্ডন করেন। ইনি এই বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে বৃদ্ধ বয়সে দেহত্যাগ করেন। ইনি এই দ্বাদশ বাধার বিশেষ প্রতীকার করেন।

১৬৪। **তারানাথ তর্কবাচস্পতি**—ইনি কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজে প্রধান অধ্যাপক ছিলেন, এবং দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত লিখিয়া বিচার করেন। ইঁহার জন্য দয়ানন্দ বঙ্গদেশে প্রাধান্য লাভ করেন নাই। এজন্য ইনিও এই দ্বাদশ বাধার প্রতীকারে সহায়তা করেন। ইনিও ১৯শ ও ২০শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন।

১৬৫। **মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন**—ইনি বর্দ্ধমান জেলায় পূর্ব্বস্থলীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিও সর্ব্বশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হন। ইঁহার কৃত বেদান্তপরিভাষার আশুবোধিনী টীকা এই বাধার প্রতীকারস্বরূপ বলা যায়। এতদ্ব্যতীত ইনি স্মৃতি ও মীমাংসা প্রভৃতি বহু গ্রন্থের টীকা করিয়াছেন। ইনিও ১০।১৫ বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করেন।

১৬৬। **তারাচরণ তর্করত্ন**—ভট্টপল্লীনিবাসী তারাচরণ তর্করত্ন মঃ মঃ রাখালদাস ন্যায়রত্নের ভ্রাতা। ইনি ন্যায় ও বেদান্তাদি শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত হন। ইঁহার পিতা সীতানাথ এবং পুত্র মঃ মঃ প্রমথনাথ তর্কভূষণ। ইনিও দয়ানন্দকে কাশীতে ও চুচুড়ায় দুইবার পরাজিত করেন। ইঁহার গ্রন্থ—কাননশতকম্, রামজন্মভানম্, শৃঙ্গাররত্নাকরম্, মুক্তিমীমাংসা ও ঈশোপনিষদের বিমলভাষ্য। খণ্ডনপরিশিষ্টম্ গ্রন্থে ইনি ন্যায়মত খণ্ডন করেন এবং পরমাণুবাদখণ্ডনেও তাহাই দৃঢ় করেন। এতদ্ব্যতীত সাকারোপাসনাবিচার, নীতিদীপিকা, কলাতত্ত্বম্ এবং বৈদ্যনাথ বোধম্—গ্রন্থেরও ইনিই প্রণেতা। ইঁহার কীর্ত্তিও এজন্য এই দ্বাদশ বাধার প্রতীকারস্বরূপ বলা যায়।

১৬৭। **রঘুনাথ শাস্ত্রী**—ইনি বোম্বাই অঞ্চলে কোল্হাপুর নগরে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি ন্যায় ও বেদান্তে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হন এবং শঙ্করপাদভূষণ নামক শাঙ্কর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের উপর টীকা করিয়া রামানুজ ও মাধ্বমতের খণ্ডন করেন। ইনি অসাধারণ তার্কিক ছিলেন

এবং সকলকেই বিচারে আহ্বান করিতেন। ইনি কখনও কাহারও নিকট পরাজিত হন নাই। ইনি ৪০ বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করেন। ইহার কীর্ত্তি এই দ্বাদশ বাধার বিশেষ প্রতীকার করে।

১৬৮। **দক্ষিণামূর্ত্তি স্বামী**—ইনি কাশীধামে হনুমানঘাটে বাস করিতেন। ইনি অদ্বৈতসিদ্ধাঞ্জন নামক একখানি অতি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধ যাবতীয় মত অতি সুন্দরভাবে খণ্ডন করেন। ইনি ২০।২১ বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইহার কীর্ত্তিও এই দ্বাদশ বাধার বিশেষ প্রতীকার করে।

১৬৯। **মহামহোপাধ্যায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী**—ইনি মহীশূরের নঞ্জনগুড গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং কাশীধামেই বাস করিয়াছিলেন। নীলদেও পন্থের নিকট ইনি বেদান্ত অধ্যয়ন করেন এবং শৃঙ্গেরীর ভূতপূর্ব্বস্বামী অভিনবসচ্চিদানন্দ নৃসিংহভারতীর ভ্রাতা এবং শতকোটী রামশাস্ত্রীর পুত্র লক্ষ্মীনৃসিংহ শাস্ত্রী এবং তারাচরণ তর্করত্নের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইনি পূর্ব্বোত্তরমীমাংসার সম্বন্ধ, অধ্যাসবাদ এবং ব্রহ্মবিদ্যাধিকারবিচার প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া অদ্বৈতমতের পুষ্টি এবং মাধ্ব ও রামানুজমতের খণ্ডন করেন। ইহারই জামাতা মঃ মঃ লক্ষ্মণশাস্ত্রী দ্রাবিড়। ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে ইহার দেহান্ত হয়।

১৭০। **মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণশাস্ত্রী দ্রাবিড়**—রামসুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী ইহার পিতা। ইনি ন্যায়, বেদান্ত ও মীমাংসায় এই সময় সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত। কাশীধামেই ইহার বাস। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইহার জন্ম হয়। অদ্বৈতসিদ্ধিসিদ্ধান্তসারভূমিকা, খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের বিদ্যাসাগরী-টীকার ভূমিকা রচনা করিয়া রামানুজাদিমতের খণ্ডন করেন ও অদ্বৈতমতের পুষ্টি করেন। বঙ্গদেশে ইনিই অদ্বৈতসিদ্ধির প্রচার করেন। ইনি মঃ মঃ কৈলাসশিরোমণির নিকট ন্যায়শাস্ত্র এবং মঃ মঃ সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। ইনিও এই দ্বাদশ বাধার যথেষ্ট

প্রতীকার করেন। ইনি স্বেচ্ছায় কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ ত্যাগ করেন।

১১১। **মহামহোপাধ্যায় অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী**—ইনি মালাবার দেশীয় ব্রাহ্মণ। সুরনি পালঘাট তালুকে ১৮০৯ শকে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম সুব্রহ্মণ্য উপাধ্যায়। ইঁহার গুরু মঃ মঃ পঞ্চাবগেশ শাস্ত্রী এবং রামসুব্বাশাস্ত্রীর শিষ্য বেঙ্কটসুব্বা শাস্ত্রী। ইনি অদ্বৈতসিদ্ধির চতুর্থতসংগ্রহ মধ্যে মাধ্বমত খণ্ডন করেন। অদ্বৈতদীপিকাগ্রন্থে মাধ্ব-সত্যধ্যানমূর্ত্তি এবং গৌড়গিরি বেঙ্কটরমণাচার্য্যকৃত রামসুব্বাশাস্ত্রীর ও রাজুশাস্ত্রীর মধ্বচন্দ্রিকাখণ্ডনমণ্ডনের খণ্ডন করেন। রামানুজী প্রতি-বাদিভয়ঙ্কর অনন্তাচার্য্যকৃত একশাস্ত্রত্বসমর্থনের খণ্ডন করেন। অদ্বৈত-সিদ্ধি, বেদান্তদর্শন, ভাট্টদীপিকা, শাস্ত্রদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থের ভূমিকায় রামানুজাদিমতের খণ্ডন করেন। বেদান্তপরিভাষার টীকা করিয়া ও তাহার ভূমিকার মধ্যে রামানুজ ও মাধ্বমতের খণ্ডন করেন। ইঁহার অপর গ্রন্থ—বিবাহসময়মীমাংসা, অন্তিমানির্ণয়, কর্ম্মপ্রদীপব্যাখ্যা, মীমাংসা-শাস্ত্রসার ও ধর্ম্মপ্রদীপ। ইঁহার কীর্ত্তিও এই দ্বাদশ বাধার যথেষ্ট প্রতীকার করে। মীমাংসা ও বেদান্তে ইনি একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত।

১১২। **কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী**—ইনি কাশীধামে ব্রহ্মঘাটে বাস করিতেন। ইনি বহু গ্রন্থ লিখিয়া এই বাধার প্রতীকার করেন। ইঁহার গ্রন্থ—ব্রহ্মবিচার, ধর্ম্মবিচার ও নীতিবিচার। ইনি মাধ্ব ও রামানুজমতই বিশেষভাবে খণ্ডন করেন।

১১৩। **শান্ত্যানন্দ সরস্বতী**—ইনি মাদ্রাজ প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন ও দ্বারকা মঠের শঙ্করাচার্য্য হন। ইনি পঞ্চীকরণটীকা ও বেদান্তপরিভাষার টীকা করিয়া অদ্বৈতমতের পুষ্টি করেন এবং বিরোধী মতের নিরাস করেন। ইঁহার কীর্ত্তিও এই বাধার প্রতীকারস্বরূপ বলা যায়। ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে ইনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

১৭৪। মহামহোপাধ্যায় পঞ্চাবগেশ শাস্ত্রী—ইনি তাঞ্জোরের নিকট পড়রানরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার গুরু রাজুশাস্ত্রী ও সুন্দর শাস্ত্রী। ইনিও মহীশূর অনন্তাচার্য্যকৃত অদ্বৈতসিদ্ধিব্রহ্মানন্দীর খণ্ডন ন্যায়ভাস্করের খণ্ডন করিয়াছেন। শতকোটী নামক গ্রন্থে "অস্বস্থত্বধর্ম্মাধিকরণে" এক শত পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া বিরুদ্ধমত খণ্ডন করেন। ইনি ৭০ বৎসর বয়সে ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করেন। ইহার কীর্ত্তিও এই বাধার যথেষ্ট প্রতীকার করে।

১৭৫। কাকারাম শাস্ত্রী—ইনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। ইনি শঙ্করানন্দের আত্মপুরাণের উপর এক অপূর্ব্ব টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈত-মতের পুষ্টিসাধন ও এই দ্বাদশ বাধার যথেষ্ট প্রতীকার করেন। ইনিও কাশীবাসী ছিলেন এবং এই ১৯শ শতাব্দীতেই আবির্ভূত হন।

১৭৬। রাজেশ্বর শাস্ত্রী—ইনি মঃ মঃ লক্ষ্মণশাস্ত্রীর পুত্র। ইনি ন্যায়াচার্য্য ও বেদান্তাদি বহু শাস্ত্রের পারদর্শী। ইনি প্রতিবাদি-ভয়ঙ্কর অনন্তাচার্য্যের সহিত কাশীতে লিখিয়া বিচার করিয়াছিলেন। ইনি সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর দিনকরীর উপর রামরুদ্রীর অবশিষ্টাংশ পূর্ণ করিয়াছেন। ইনি এখন কাশীর উদীয়মান পণ্ডিত। ন্যায়শাস্ত্রে ইঁহার গুরু মঃ মঃ বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য।

লঙ্কাবের শিল্প ও শেবপুরগ্রামে ইহার নিবাস। ইনি মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্নের মায়াবাদখণ্ডন ও অদ্বৈতবাদনিরাসের প্রতিবাদ করিয়াছেন। এজন্য ইহার কীর্ত্তিও এই দ্বাদশবাধার প্রতীকারবিশেষ।

১৭৯। **রমেশচন্দ্র তর্কতীর্থ**—ইনি বর্দ্ধমানরাজের সংস্কৃত-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ইনি মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্নের দ্বৈতোক্তিরত্নমালার প্রতিবাদ করেন। এজন্য ইহাকেও এই দ্বাদশ বাধার প্রতীকারকারকের মধ্যে গ্রহণ করা যায়।

১৮০। **কেশবানন্দ ভারতী**—ইনি কনখল মুনিমণ্ডল মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি ন্যায় ও বেদান্ত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইনি দিগ্বিজয়াদি করিয়া এবং শঙ্করের বিবেকচূড়ামণির উপর একখানি উপাদেয় টীকা লিখিয়া এই দ্বাদশবাধার প্রতীকার করেন। ইনি ৪।৫ বৎসর হইল দেহত্যাগ করিয়াছেন।

১৮১। **পণ্ডিতপ্রবর যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ**—ময়মনসিংহ জেলার মুসব দুর্গাপুর নামক স্থানে ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতা পণ্ডিত শ্রীজগচ্চন্দ্র বাগ্চী। বিদ্যাগুরু মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণশাস্ত্রী দ্রাবিড়। ইনি এই অদ্বৈতসিদ্ধির উপর এক বালবোধিনী টীকা রচনা করিয়া এই দ্বাদশবাধার প্রতীকার করিতেছেন। ইনি এক্ষণে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বেদান্তের অধ্যাপক।

ইহাই হইল অদ্বৈতচিন্তাস্রোতের অতিসংক্ষিপ্ত আংশিক ইতিহাস। ইহাতে যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থাদি লিখিয়া অদ্বৈতমতের পুষ্টি বা খণ্ডন করিয়াছেন এবং যাঁহাদের গ্রন্থাদি এখনও সহজপ্রাপ্য বা প্রসিদ্ধ তাঁহাদেরই নামাদি উল্লিখিত হইল। নচেৎ হিন্দি, বাঙ্গালা, মহারাষ্ট্রী, তেলিগু, তামিল ও ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় এই বিষয়ে যাঁহারা গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের উল্লেখ করা হইল না। অথবা যাঁহারা গ্রন্থ রচনা না করিয়া অধ্যাপনা ও বিচারাদি দ্বারা বেদান্তচিন্তার পুষ্টি

করিয়াছেন, তাঁহাদেরও উল্লেখ করা হইল না। আমাদের দেশ যেরূপ উৎপাত-উৎপীড়নের মধ্য দিয়া বহুকাল হইতে আত্মরক্ষামাত্র করিয়া আসিতেছে, তাহাতে ইহার কোন সম্পদের সমগ্র ইতিহাস সংগ্রহ করা এক প্রকার অসম্ভব। আজকাল প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়াছে, আর তাহার ফলে অনেক পুস্তকাদির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, আর তাহারই উপর নির্ভর করিয়া ইহা সংকলিত হইল। এই ইতিহাস রচনায় পথপ্রদর্শক অবশ্য স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী, তিনি এত ব্যক্তির পরিচয় না দিতে পারিলেও তিনি আচার্য্য-গণের মতবাদ অনেকটা দিয়া গিয়াছেন। মনে হয় অতঃপর যদি কোন মনীষী চেষ্টা করেন, তবে ইহার পূর্ণতাসাধন ও ত্রুটী সংশোধিত হইতে পারিবে। অদ্বৈতসিদ্ধির স্থান নির্দ্দেশ করিবার জন্য দিঙ্মাত্র প্রদর্শন করাই আমার উদ্দেশ্য।

বেদান্তসাহিত্যে অদ্বৈতসিদ্ধির স্থান।

যাহা হউক, অদ্বৈতসিদ্ধিরচনার বিশেষত্ব আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা এই ইতিহাস আলোচনা করিয়াছি, এক্ষণে সেই বিশেষত্বটী কি তাহাই চিন্তা করা আবশ্যক। বস্তুতঃ, এই আলোচনার ফলে আমরা দেখিতে পাই, অদ্বৈতসিদ্ধির স্থান অদ্বৈতচিন্তার পথে সর্ব্বোচ্চে প্রতিষ্ঠিত—অদ্বৈতচিন্তার স্রোতে অদ্বৈতসিদ্ধির স্থান সর্ব্বা-পেক্ষা সুগভীর, সুপ্রশস্ত ও প্রশান্ত। কারণ, অদ্বৈতবস্তু সিদ্ধ করিতে হইলে তাহা যতদূর উত্তমরূপে, অভ্রান্ত ও অকাট্যভাবে বলিতে পারা যায়, তাহাই ইহাতে বর্ণিত আছে। সহস্র বৎসর ধরিয়া সহস্র সহস্র সিদ্ধ বা সিদ্ধকল্প অদ্বৈত আচার্য্যগণ যাহা স্থির করিয়া গিয়াছেন, তাহার পরিষ্কার ইহাতে আছে। সহস্র বৎসর ধরিয়া সহস্র সহস্র পণ্ডিতগণ ইহার বিরুদ্ধে যত কথা বলিতে পারেন, তাহার সারসংক্ষেপ ইহাতে আছে। অদ্বৈততত্ত্ব সিদ্ধ করিতে হইলে যাহা আবশ্যক তাহা, এতদপেক্ষা

আর উত্তররূপে বলিতে বা ভাবিতেও পারা যায় না। এজন্য অদ্বৈতসিদ্ধি ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী যাবতীয় বিরোধী ও অবিরোধী গ্রন্থের সারসংগ্রহস্বরূপ, যাবতীয় অনুকূল ও প্রতিকূল চিন্তার ভাণ্ডার বিশেষ। কেবল তাহাই নহে—অদ্বৈতসিদ্ধির পরবর্ত্তী যত অনুকূল ও প্রতিকূল গ্রন্থ হইয়াছে, আর তাহা যখনই প্রকৃত পণ্ডিতোচিত হইয়াছে, তখনই সেই সব গ্রন্থ অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থের সম্পর্কিত গ্রন্থবিশেষ হইয়াছে। তাহা অদ্বৈতসিদ্ধির টীকা-টিপ্পনী বা তাহাদের খণ্ডনগ্রন্থ হইয়াছে। অতএব অদ্বৈতসিদ্ধিতে সে সব কথাও বর্ত্তমান। অদ্বৈতসিদ্ধি যেন ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের অদ্বৈতসংক্রান্ত অনুকূল ও প্রতিকূল যাবতীয় বিচারের ভাণ্ডার বা আকর বিশেষ।

অদ্বৈতসিদ্ধির প্রচারে স্তরভেদ।

প্রথম স্তরে আমরা দেখিতে পাই মাধ্বমতাবলম্বী অদ্বিতীয় পণ্ডিত ব্যাসরাজস্বামী শঙ্করভাষ্য, পঞ্চপাদিকা, বিবরণ, ভামতী, কল্পতরু, খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, ন্যায়মকরন্দ ও চিৎসুখী প্রমুখ যাবতীয় অদ্বৈতবাদের গ্রন্থরাশি মন্থন করিয়া ন্যায়ামৃত গ্রন্থ রচনা করেন, আর মধুসূদন তদপেক্ষা অধিক পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়া সেই ন্যায়ামৃতের প্রত্যেক কথারই খণ্ডন করিলেন।

দ্বিতীয় স্তরে আমরা দেখিতে পাই ব্যাসাচার্য্যের শিষ্য শ্রীনিবাস ন্যায়ামৃতের বিবৃতি করিয়া ন্যায়ামৃত প্রচারার্থ "প্রকাশ" নামক এক অতি উত্তম টীকা করিলেন, ওদিকে ব্যাসরাজের অপর শিষ্য ব্যাসরাম, মধুসূদনের নিকট ছদ্মবেশে যাইয়া অদ্বৈতসিদ্ধি পড়িয়া অদ্বৈতসিদ্ধি খণ্ডন করিয়া তরঙ্গিণী নামক টীকা লিখিলেন।

তৃতীয় স্তরে আমরা দেখিতে পাই মধুসূদনের শিষ্য বলভদ্র সিদ্ধি-ব্যাখ্যা রচনা করিয়া এবং প্রশিষ্যস্থানীয় ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী ও শিবরাম বর্ণী অদ্বৈতসিদ্ধির উপর যথাক্রমে লঘুচন্দ্রিকা ও বৃহচ্চন্দ্রিকা নামক টীকা

রচনা করিয়া ন্যায়ামৃতের "প্রকাশ" ও "তরঙ্গিণী" এই উভয় টীকার খণ্ডনকার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন।

চতুর্থ স্তরে আমরা দেখিতে পাই ইহার কিছু পরে বনমালী মিশ্র মাধ্বমতে এবং মহীশূর অনন্তাচার্য্য রামানুজমতে, যথাক্রমে ন্যায়ামৃত-সৌগন্ধ্য বা বনমালা ও ন্যায়ভাস্কর রচনা করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির উক্ত চন্দ্রিকাটীকা খণ্ডন করিলেন।

পঞ্চম স্তরে আমরা দেখিতে পাই বিট্‌ঠলেশ উপাধ্যায় লঘুচন্দ্রিকার উপর বিট্‌ঠলেশী নামক এক টীকা করিয়া, রামসুব্বা শাস্ত্রী ন্যায়ভাস্কর-খণ্ডন নামক গ্রন্থ লিখিয়া, এবং রাজুশাস্ত্রী ন্যায়েন্দুশেখর নামক গ্রন্থ লিখিয়া এবং পঞ্চাবগেশ শাস্ত্রী ন্যায়ভাস্করখণ্ডন নামক গ্রন্থ লিখিয়া বনমালী মিশ্রের এবং অনন্তাচার্য্যের চেষ্টা ব্যর্থ করিলেন।

পরিশেষে **ষষ্ঠ স্তরে** দেখা যাইতেছে—মাধ্বস্বামী সত্যধ্যানতীর্থ ও রামানুজী প্রতিবাদিভয়ঙ্কর অনন্তাচার্য্য বাধাপক্ষে, এবং মহামহোপাধ্যায় অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী ও পণ্ডিতপ্রবর রাজেশ্বর শাস্ত্রী এবং যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ প্রভৃতি প্রতীকারপক্ষে এখনও প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত। সুতরাং অদ্বৈতসিদ্ধি লইয়াই এখনও বেদান্তবিচার চলিতেছে।

অদ্বৈতসিদ্ধি পাঠের আবশ্যকতা।

যাহা হউক আচার্য্য শঙ্করপ্রবর্ত্তিত অদ্বৈতবেদান্তের ভাষ্যধারার মধ্যে যেমন অপ্পয়দীক্ষিতের পরিমলটীকা এবং রামানন্দসরস্বতীর রত্নপ্রভাটীকা শেষ গ্রন্থ, তদ্রূপ প্রকরণগ্রন্থের ধারার মধ্যে অদ্বৈতসিদ্ধি শেষ প্রধান গ্রন্থ। প্রকরণগ্রন্থের ধারার মধ্যে এতদপেক্ষা সম্পূর্ণাবয়ব ও অকাট্য গ্রন্থ আর হয় নাই। স্বাধীনভাবে অদ্বৈততত্ত্বনির্ণয়ের জন্য ন্যায়ের সূক্ষ্মতাসহকারে এখন যিনি যাহা লিখিতেছেন, তাহা এই অদ্বৈতসিদ্ধির টীকাটিপ্পনী প্রভৃতিই হইতেছে এবং বিরুদ্ধে যিনি যাহা লিখিতেছেন, তাহা এই অদ্বৈতসিদ্ধিরই খণ্ডনগ্রন্থের কোন টীকাটিপ্পনী প্রভৃতিই

হইতেছে। অদ্বৈতসিদ্ধিই এখন অদ্বৈততত্ত্ববিচারের সর্ব্বপ্রধান উপকরণ ও চরম অবলম্বন। অদ্বৈতসিদ্ধি ও তাহার টীকাপ্রভৃতি আলোচনা করিলে অদ্বৈতমতের অনুকূল ও প্রতিকূল কোন কথাই অজ্ঞাত থাকে না, এবং নূতন কল্পনারও অবকাশ থাকে না। উপরে যে ইতিহাস সংকলিত হইল, উহা আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীত হইবে। —অদ্বৈতসিদ্ধির ইহাই বিশেষত্ব। বেদান্তশাস্ত্রে চরম অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে, ন্যায়ের সূক্ষ্মতাসহকারে বেদান্তসিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে অদ্বৈতসিদ্ধি পাঠ করা একান্ত আবশ্যক।

বর্ত্তমানে অদ্বৈতসিদ্ধির জ্ঞানভিন্ন পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব কি না।

এখন যদি কেহ মনে করেন—অদ্বৈতসিদ্ধি রচিত হইবার পূর্ব্বে কি তাহা হইলে কাহারও বেদান্তজ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই? তাঁহাদের কি মুক্তিও সুতরাং হয় নাই? অতএব অদ্বৈতসিদ্ধির এই উপযোগিতা-কথন কেবল প্রশংসামাত্র। বস্তুতঃ, এরূপ কথা মধ্যে মধ্যে অনেকেরই মুখে শুনা যায়।

কিন্তু চিন্তা করিলে দেখা যায়—দুই শ্রেণীর ব্যক্তি এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন। যাঁহারা অদ্বৈতসিদ্ধি বুঝিবার জন্য যেরূপ শ্রম স্বীকার আবশ্যক, তাহা করিতে অসমর্থ বা অন্য কারণে অনিচ্ছুক, তাঁহারা এক শ্রেণী, এবং বিরুদ্ধসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ অপর শ্রেণী। কিন্তু, চর্চা করিলে সামর্থ্য জন্মে বলিয়া অসমর্থগণের জন্য এবং অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত যাঁহারা অনিচ্ছুক, তাঁহারা জানিতে পারিলে তাঁহাদের অনিচ্ছা দূর হইতে পারে বলিয়া তাঁহাদের জন্য—ইহার উত্তরদান আবশ্যক। যাঁহারা ভাবপ্রবণ-স্বভাব বা স্বমতে দুরাগ্রহসম্পন্ন অথবা বিরুদ্ধসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া অনিচ্ছুক কিংবা গুরুপদিষ্ট সাধনবিশেষে নিষ্ঠাধিক্যবশতঃ অনিচ্ছুক, তাঁহাদের এরূপ আপত্তির উত্তর দান অনাবশ্যক।

যাহা হউক, এক কথায় ইহার উত্তর এই যে, যে ব্যক্তি যে সময়ে অদ্ব-

গ্রহণ করেন, তিনি সেই সময়ের প্রভাব কখনই অতিক্রম করিতে পারেন না। তৎকালোচিত ভ্রম ও সংশয় তাঁহার চিত্ত অবশ্যই অধিকার করিবে, আর তজ্জন্য তাদৃশভ্রমসংশয়ের নাশের জন্য তদুপযুক্ত যুক্তিবিচারের আবশ্যকতা অনিবার্য্যই হইবে। যেমন রোগ তাহার তেমনি ঔষধই আবশ্যক হয়।

পূর্ব্বে লোকের মন সরল ও শুদ্ধ ছিল, সুতরাং উপনিষদাদি ও তাহাদের ভাষ্যাদি গ্রন্থই তাঁহাদের মনের সংশয় ও ভ্রম দূর করিতে যথেষ্ট সমর্থ ছিল। যত দিন যাইতেছে, কলির প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছে, ততই আমাদের ভ্রম ও সংশয় এবং ততই তজ্জন্য তাহার সংস্কার দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে এবং ততই সাম্প্রদায়িকতা ও দুরাগ্রহ বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং সেই দৃঢ়তর সংশয় ও ভ্রমপ্রবণতাপ্রভৃতি নিবারণের জন্য ন্যায়-পরিষ্কৃত দৃঢ়তর যুক্তির শরণ গ্রহণ করা আবশ্যক হইতেছে, আর তাহারই ফলে অদ্বৈতসিদ্ধির উদ্ভব হইয়াছে। আর তাহাতেও যখন যথেষ্ট হয় নাই, তখন তাহারই টীকাটিপ্পনীপ্রভৃতির আবশ্যক হইতেছে। তবে এই টুকুই অদ্বৈতসিদ্ধির বিশেষত্ব যে, কালপ্রভাবে চিত্তমলের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈতসিদ্ধিরই টীকাটিপ্পনীর জন্ম হইতেছে, অন্য গ্রন্থের আবশ্যকতা হইতেছে না, বা অপর এতদপেক্ষা উপযোগী গ্রন্থও রচিত হয় নাই। অদ্বৈতসিদ্ধির সম্মানই—অদ্বৈতসিদ্ধির বিস্তারই, সেই রোগের ঔষধ হইতেছে। বস্তুতঃ, এই জন্যই এই সময়ে যে সমস্ত বিচারপ্রিয় ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে অদ্বৈতসিদ্ধির অনিবার্য্য উপযোগিতাই আছে। অদ্বৈতসিদ্ধির বহু পূর্ব্বকালে বেদান্তজ্ঞানের পূর্ণতার জন্য বা মুক্তির জন্য অদ্বৈতসিদ্ধির আবশ্যকতা ছিল না বটে, কিন্তু বর্ত্তমানকালে অদ্বৈতসিদ্ধির জ্ঞান বেদান্তজ্ঞানের পূর্ণতার জন্য এবং সেই জ্ঞানপ্রযুক্ত মুক্তির জন্য জ্ঞানমার্গিগণের পক্ষে বিশেষভাবেই প্রয়োজন—ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে।

বস্তুতঃ, যে সমস্ত অদ্বৈতজ্ঞানমার্গী, অদ্বৈতসিদ্ধির যুক্তিবিচার অবগত না হইয়া প্রাচীন ভাষ্যাদি অবলম্বনে মনন নিদিধ্যাসন করিতে থাকেন, তাঁহারা অদ্বৈতসিদ্ধির দ্বারা খণ্ডিত পূর্ব্বপক্ষসমূহ শুনিলে এবং সেই সকল পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবনকারিগণের সঙ্গে পড়িলে যে নিজ অবলম্বিত মার্গে সংশয়ান্বিত হইয়া ক্রমে অনাস্থাসম্পন্ন হইয়া থাকেন, এবং কখন কখন সম্প্রদায়ত্যাগ পর্য্যন্তও করেন, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। আবার তাঁহারাই উক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন শ্রবণ করিলে, স্ব-মার্গে উৎসাহসম্পন্ন হন এবং বিপরীত সঙ্গ ত্যাগ করেন, ইহাও সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ, আমরা এই মধুসূদনেরই জীবনচরিতমধ্যে দেখিতে পাইব যে, তিনি প্রথমে দ্বৈতবাদী থাকিয়া পরে অদ্বৈতবাদ আলোচনার ফলে অদ্বৈতবাদী হইয়াছেন। অতএব বর্ত্তমানে যে সব সত্যপ্রিয় বিচারপ্রবণ ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহার আবশ্যকতা অনিবার্য্য— ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহাদের বেদান্তজ্ঞানের পূর্ণতার জন্য, আর তজ্জন্য তাঁহাদের মুক্তির নিমিত্ত অদ্বৈতসিদ্ধিপাঠ যে অত্যাবশ্যক—ইহাতে কোন সন্দেহই নাই বলিতে হইবে।

বিচারশীল ব্যক্তির অদ্বৈতসিদ্ধি পাঠে প্রবৃত্তি স্বাভাবিক।

তবে দুঃখের বিষয় এই যে, গ্রন্থখানি এতই ন্যায়বিচারবহুল যে, ন্যায়াদি শাস্ত্রে বিশেষ প্রবেশ না থাকিলে ইহা বুঝিয়া উঠা যায় না। কিন্তু সে দোষ আমাদেরই, সে দোষ গ্রন্থের নহে। আর পরিশ্রম করিলে সে দোষ নিবারণ করা যায় বলিয়া হতাশ হইবারও কোন কারণ দেখা যায় না। সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি কখন পরিশ্রমকাতর হইতে পারেন না। অতএব এরূপ অদ্বৈতসিদ্ধিপাঠে কোন্ সত্যানুরাগী বিচারশীল ব্যক্তির প্রবৃত্তি না জন্মিবে? সত্যপ্রিয় বিচারপরায়ণ ব্যক্তির এ গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি স্বাভাবিক।

অদ্বৈতসিদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—অদ্বৈতসিদ্ধিরই এইরূপ স্তরে স্তরে বিস্তার হইতেছে, অন্য গ্রন্থের এরূপ বিস্তার হইতেছে না কেন? ইহার এরূপ বিশেষত্বের হেতু কি?

ইহার উত্তর এই যে, যে সময়ে ন্যায়ের ভাবগত ও ভাষাগত সূক্ষ্মতা তাহার চরমসীমায় উঠিয়াছে, সেই সময়ে সেই ন্যায়ের সূক্ষ্মতার সাহায্যে সম্পূর্ণ ন্যায়ানুমোদিত পথে ইহা রচিত হইয়াছে, অতএব বেদান্ত-বিচারের জন্য ইহাকেই মুখ্যভাবে অবলম্বন করা হইতেছে। অপর কোন গ্রন্থই 'এরূপ' ন্যায়ানুমোদিত পথে রচিত নহে। ইহার এত আদর এই জন্যই হইয়াছে এবং হইতেছে। ন্যায়ের উপযোগিতা, মানবমনের যতই পরিবর্তন হউক না কেন, কোন কালেই উপেক্ষিত হইতে পারে না। অদ্বৈতসিদ্ধির এই বিশেষত্বের ইহাই হেতু। ইতিপূর্ব্বে ন্যায়াচার্য্য মহামতি উদয়নাদির সময় ন্যায়ের যে সূক্ষ্মতা, তাহাতে ভাবগত সূক্ষ্মতাই অধিক হইয়া গিয়াছে। ভাষা ও ভাবগত—উভয়গত সূক্ষ্মতার চরমসীমা মহামতি গঙ্গেশ উপাধ্যায় হইতে রঘুনাথ শিরোমণি ও মথুরানাথ তর্কবাগীশের সময়ের মধ্যেই হইয়া গিয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধি সেই সময়ের অব্যবহিত পরেই রচিত। এজন্য ইহাতে ন্যায়ের ভাবগত ও ভাষাগত সূক্ষ্মতার চরম অবস্থা পূর্ণমাত্রায় স্থানলাভ করিয়াছে। তাহার পর সেই সূক্ষ্মতাসহকারে সম্পূর্ণ ন্যায়ানুমোদিত পথে বিচার, অদ্বৈতসিদ্ধিতে যে ভাবে আছে, এমন আর কোন গ্রন্থেই নাই। বিচারে পক্ষপ্রতিপক্ষ-প্রভৃতি নির্ণয় করিয়া যেরূপ যথাবিধি বিচার করিতে হয়, ইহাতে ঠিক্ সেইরূপেই বিচার করা হইয়াছে। এই উভয় কারণে অদ্বৈতসিদ্ধি অতীত গ্রন্থরাজি হইতে শ্রেষ্ঠস্থানে অধিকার করিয়াছে, আর পরবর্ত্তী কোন গ্রন্থও ইহাকে অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। ইহাই অদ্বৈত-সিদ্ধির উক্ত বিশেষত্বের হেতু।

গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তির জন্য গ্রন্থকারপরিচয়।

গ্রন্থকারের আবির্ভাবকাল।

গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তির জন্য গ্রন্থপরিচয়ের পর গ্রন্থকারের পরিচয়লাভ আবশ্যক। কিন্তু এই গ্রন্থকারের পরিচয়লাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ গ্রন্থকারের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করা আবশ্যক এবং তৎপরে তাঁহার জীবনচরিত্র আলোচ্য হওয়াই উচিত।

কিন্তু এ পর্য্যন্ত এমন কিছুই পাওয়া যায় নাই, যাহাতে গ্রন্থকারের আবির্ভাবকাল ও তিরোভাবকাল ঠিক ঠিক জানিতে পারা যায়। গ্রন্থকার নিজ কোন গ্রন্থে নিজের পরিচয় বা তাঁহার আবির্ভাবকালের কোন নির্দ্দেশই করেন নাই। এজন্য অন্য উপায়ে তাঁহার আবির্ভাবকাল ও তিরোভাবকাল নির্ণয় করিতে হইবে।

প্রথমতঃ দেখা যায়—গ্রন্থকার যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে "সিদ্ধান্তবিন্দু" নামক একখানি গ্রন্থ আছে। পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় যে সকল সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে সিদ্ধান্তবিন্দুর একখানি পুঁথি আছে। উহাতে উহার লিপিকাল সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"নবাগ্নিবাণেন্দুমিতে শকাব্দে" ইত্যাদি।

ইহা হইতে সিদ্ধান্ত হয় যে, আচার্য্য মধুসূদনসরস্বতী মহাশয় ১৬১৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, এই সময়ে বা ইহার পূর্ব্বেই তিনি একজন প্রবীণ গ্রন্থকার। কারণ, এই গ্রন্থখানি তিনি তাঁহার "বলভদ্র" নামক এক শিষ্যের হিতার্থে রচনা করিতেছেন—ইহা তিনিই লিখিয়াছেন। অতএব বলা যাইতে পারে, ১৬১৭ খৃষ্টাব্দ তাঁহার জীবনের অন্ততঃপক্ষে শেষভাগ, অথবা ইহার পূর্ব্বে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। আর তাহা হইলে অন্ততঃপক্ষে ৮০।৯০ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৫২৭-১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম বলিতে

হয়। যেহেতু শিষ্যের জন্য পুস্তকরচনা নবীন পণ্ডিতবয়সে ততটা সম্ভবপর হয় না, এবং অপরকর্তৃক ইহার অনুলিপিও ইহার অগ্রে প্রায় এক প্রকার অসম্ভব হয়। আর দেহান্তের পর অনুলিপি হইলে, প্রবাদানুসারে তাঁহার ১০৭ বৎসর জীবন হওয়ায় ১৬১৭ – ১০৭ = ১৫০৭ **হইতে ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দের সন্নিহিত সময়ে** তিনি জন্মিয়াছিলেন—বলা যায়।

দ্বিতীয়তঃ দেখা যায়—শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় একটী প্রবন্ধে লিখিতেছেন—নারায়ণ ভট্ট মধুসূদনকে ও ভেদধিক্কারকার নৃসিংহাশ্রমকে (মীমাংসাশাস্ত্রীয়?) কোন বিচারে পরাজিত করিতেছেন, এইরূপ একটী প্রবল প্রবাদ আছে। এই নারায়ণের রচিত বৃত্তরত্নাকর-ভাষ্য ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে রচিত এবং নৃসিংহাশ্রমের "বেদান্ততত্ত্ববিবেক" ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে রচিত। এই নৃসিংহাশ্রম মহামতি অপ্পয় দীক্ষিতকে শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদ হইতে অদ্বৈতবাদে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই অপ্পয় দীক্ষিত ১৫২০-১৫৯৩ খৃষ্টাব্দ (মতান্তরে ১৫৫০-১৬২২ খৃষ্টাব্দ) পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইহা মায়লাপুরনিবাসী মহালিঙ্গ শাস্ত্রীর মত। ওদিকে অপ্পয় দীক্ষিতকে মধুসূদন "সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রাচার্য্য" বলিয়া সম্মান করিতেছেন। সুতরাং মধুসূদন, অপ্পয়দীক্ষিত হইতে অন্ততঃ পক্ষে ১০ বৎসর কনিষ্ঠ হইবেন, অর্থাৎ তাহা হইলে প্রায় **১৫৩০ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের জন্মসময় হয়।** আর তাহা হইলে বৃদ্ধ নারায়ণ ভট্টের নিকট যুবক মধুসূদনেরও পরাজয় অসম্ভব হয় না। নারায়ণ ভট্ট ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে বৃত্তরত্নাকরভাষ্য লিখিলে ৫০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জন্ম ও ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দের ৩০ বৎসর পরে ৮০ বৎসরে মৃত্যু ধরা যায়। অর্থাৎ নারায়ণ ভট্টের জীবন ১৪৯৫-১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ বলা যাইতে পারে। আর উক্ত বিচার ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে হইলে, অর্থাৎ নারায়ণ ভট্টের প্রায় ৬৫ বৎসরে উহা হইলে মধুসূদনের প্রায় ৩০ বৎসর বয়সে উক্ত বিচার ঘটে। এ সময় অপ্পয়ের বয়স তাহা হইলে প্রায় ৪০ বৎসর ও নৃসিংহাশ্রমের বয়স প্রায় ৫০ বৎসর

ধরিয়া নৃসিংহাশ্রমের জন্ম ১৫৪৭—৫০=১৪৯৭ খৃষ্টাব্দ ধরা যায়। আর মধুসূদন ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে ৯০ বৎসরের অধিক বয়স্ক হইলে তিনি ১৫২০তে মৃত ও প্রায় ১০ বৎসরের প্রবীণ অপ্পয়কে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রাচার্য্য বলিতে পারেন। অতএব এতদনুসারে **মধুসূদনের জন্ম** ১৬১৭—৯০=১৫২৭ **খৃষ্টাব্দের** সন্নিহিতকালে ধরা যাইতে পারে। অর্থাৎ—

মধুসূদনের জন্ম ১৫৩০ মৃত্যু ১৬৩৭ (বা ১৫২৭—১৬৩৪)
অপ্পয়ের " ১৫২০ " ১৫৯৩
নারায়ণভট্টের " ১৪৯৫ " ১৫৭৫
নৃসিংহাশ্রমের " ১৪৯৭ " ১৫৭৭

আর ১৫৬০ খৃঃতে নৃসিংহাশ্রম ও নারায়ণের বিচার হওয়ায়—বিচারকালে

মধুসূদনের বয়স—৩০ বৎসর
অপ্পয়ের " —৪০ "
নারায়ণের " —৬৫ "
নৃসিংহাশ্রমের " —৬৩ "

আর সিদ্ধান্তবিন্দুর লিখনকাল ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে—

মধুসূদনের বয়স—৮৭ বা ৯০ বৎসর
অপ্পয়ের " —৯৭ বা ১০০ "

অর্থাৎ অপ্পয় ইহার ২৪ বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন—এইরূপই হয়। আর এরূপ হইলে **১৫২৭-১৫৩০ খৃষ্টাব্দের সন্নিহিতকালে মধুসূদনের জন্ম** ধরা অসঙ্গত হয় না।

আর বেদান্তী নৃসিংহাশ্রম মীমাংসক অপ্পয়কে পরাজিত করেন বলিয়া তাহার পরিশোধ, মীমাংসক নারায়ণভট্ট, যদি নৃসিংহাশ্রমকে পরাজিত করিয়া লয়েন, তাহাও অসঙ্গত হয় না। সুতরাং ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে নৃসিংহাশ্রমের পরাজয় ধরিলে অপ্পয়ের পরাজয় ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে ধরা যায়, তখন অপ্পয় ৩৫ বৎসর বয়স্ক হন। বস্তুতঃ, ইহাও অসঙ্গত হয় না।

তৃতীয়তঃ দেখা যায়—একটী প্রবাদ আছে যে, কাশীধামে তুলসীদাস হিন্দি ভাষায় শাস্ত্রোপদেশ দিতেন। তাহাতে কাশীর পণ্ডিতগণ তুলসীদাসের নিকট অনুযোগ করিয়া বলিতেন—"আপনি সংস্কৃত ভাষায় উপদেশ দেন না কেন"? তাহাতে তুলসীদাস একটী কবিতা রচনা করিয়া বলিলেন—

"হরহরিযশসুরনরগিরা, বরণহি সন্ত সুজ্ঞান।
হাণ্ডীহাটকচারু চীর রান্ধে স্বাদ সমান।"

অর্থাৎ হর ও হরির যশঃ, সাধুগণ দেবভাষা বা মানবীয় ভাষায় বর্ণন করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই; কারণ, সুবর্ণের হাঁড়িতে বা মাটীর হাঁড়িতে রাঁধিলে আস্বাদ সমানই হয়।

তুলসীদাসের কথায় পণ্ডিতগণ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তাঁহারা এই কবিতাটী তৎকালে কাশীর প্রধান পণ্ডিত মধুসূদনকে দেখাইয়া দুঃখিতভাবে বলিলেন—"তুলসীদাস সংস্কৃত ভাষায় উপদেশ দান করিতে অনিচ্ছুক"। ইহাতে মধুসূদন একটী কবিতা করিয়া বলেন—

"পরমানন্দপত্রোঽয়ং জঙ্গমস্তুলসী তরুঃ।
কবিতামঞ্জরী যস্য রামভ্রমরচুম্বিতা।"

অর্থাৎ তুলসীদাসরূপ জঙ্গম তুলসী বৃক্ষের পত্র পরমানন্দই। তাহার কবিতামঞ্জরী রামরূপ ভ্রমরদ্বারা চুম্বিত হইয়াছে। অতএব বুঝা যাইতেছে—**তুলসীদাস ও মধুসূদন সমসাময়িক।**

এখন তুলসীদাসের দেহান্তকাল তাঁহার সমাধিস্তম্ভে লিখিত আছে—

"সম্বৎ ষোলহসৌ অসিগঙ্গাকে তীর।
শ্রাবণ শুক্লা সপ্তমী তুলসী তজো শরীর।"

অর্থাৎ ১৬৮০ সম্বতে অসি গঙ্গাতীরে শ্রাবণ শুক্লা সপ্তমীতে তুলসীদাস দেহত্যাগ করেন, অর্থাৎ ১৬৮০—৫৭=১৬২৩ খৃষ্টাব্দে তুলসীদাসের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

এতদ্ব্যতীত তুলসীদাসের রামায়ণের ভূমিকায় দেখা যায়, তাঁহার জন্মসময় ১৫৮৯ সংবৎ অর্থাৎ ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং ১৬২৩—১৫৩৩= ৯০ বৎসর তাঁহার জীবিতকাল। তিনি ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৪১ হইতে ৫১ বৎসরে রামায়ণরচনা শেষ করেন। ইঁহার হস্তলিখিত পুথি কাশীর সরস্বতীভবনে এখনও আছে। এখন মধুসূদনকে যদি তুলসীদাসের সমবয়স্ক ধরা যায়, তাহা হইলে মধুসূদনেরও জীবনকাল ঐ সময়ই হইবে। আর মধুসূদনকে বয়ঃকনিষ্ঠ বলা যায় না, কারণ, বয়ঃকনিষ্ঠ হইলে তাঁহার নিকট কাশীর পণ্ডিতগণ তুলসীদাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবেন কেন? অতএব এতদ্দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, মধুসূদন ১৫৩৩ হইতে ১৬২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন, এবং মধুসূদন যদি তুলসীদাস হইতে ৮।১০ বৎসরের অধিক বয়স্ক হন, তাহা হইলে ১৫২৩—২৫ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের জন্ম হয়। আর এরূপ হইলে পূর্ব্বসিদ্ধান্তের সহিত কোন বিরোধও হয় না। অর্থাৎ অপ্পয় দীক্ষিতের তিনি বয়ঃকনিষ্ঠই থাকেন, যেহেতু অপ্পয়ের জন্ম ১৫২০ খৃষ্টাব্দই বলা হইয়াছে। **সুতরাং ১৫২৩ হইতে ১৫২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মধুসূদনের জন্মসময়** ধরা যায়।

চতুর্থতঃ দেখা যায়—"খানখানা" নামক এক মুসলমান, আকবরের পারিষদ ছিলেন। তিনি তুলসীদাসের নিকট ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতেন। প্রবাদ আছে—তুলসীদাস এক সময় খানখানাকে বলিয়াছিলেন—"আর কেন, খানখানা! সংসার আশ্রমে রহিয়াছ, বয়স ত হইয়াছে?" তাহাতে খানখানা বলেন—"হাঁ, সত্য, তবে আমি সেই সংসারেই আছি যে সংসারে তুলসীদাসের মত সন্তান জন্মগ্রহণ করে।" এতদ্দ্বারা বুঝা যায়—**খানখানা, তুলসীদাস, ও আকবর সমসাময়িক।** এই আকবরের রাজত্বকাল ১৫৫৬ হইতে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দ। অতএব এই সময় মধুসূদনেরও সময়। আর তাহা হইলে **আকবরের রাজত্বারম্ভকালে**

১৫৫৬-১৫২৫ = ৩১ বৎসর মধুসূদনের বয়স ; এবং ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে আকবরের জন্ম হওয়ায় মধুসূদন আকবর হইতে ১৫৪২-১৫২৫ = ১৭ বৎসর বয়োজ্যেষ্ঠ। বস্তুতঃ, এরূপ হইলে কোন অসামঞ্জস্যও হয় না।

পঞ্চমতঃ দেখা যায়—মুসলমানরাজত্বে মোল্লাগণের রাজদ্বারে বিচার হইত না। তাহারা এক সময় কাশীতে সন্ন্যাসী দেখিলেই বধ করিত। রাজদ্বারে অনুযোগের কোন ফল হইত না। কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণ নিরুপায় হইয়া তৎকালের প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী মধুসূদনের শরণাপন্ন হইলেন। মধুসূদন আকবরের মন্ত্রী টোডর মল্লকে ইহার প্রতীকার করিতে বলেন। টোডরমল্ল আকবরকে বলেন। আকবর সব শুনিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, সন্ন্যাসিদিগেরও রাজদ্বারে বিচার হইবে না"। ইহাতে সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে নাগা সন্ন্যাসিগণ অস্ত্রবিদ্যার চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হন ও মোল্লাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। এই বৃত্তান্তটী "কাইটীং সেক্টস্ অব ইণ্ডিয়া" প্রবন্ধে ফারকুহার সাহেবও লিখিয়াছেন। (John Ryland's Library Buletin Vol 9. No 2. July 1925.) অতএব মধুসূদন আকবরের রাজত্বকালে অর্থাৎ ১৫৫৬-১৬০৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী। আর তজ্জন্য পূর্ব্বোক্ত **১৫২৩ হইতে** ১৫২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে **মধুসূদনের জন্ম** স্বীকার করিতে কোন বাধা হয় না।

ষষ্ঠতঃ দেখা যায়—টোডর মল্লকে আকবরের রাজসভার পণ্ডিতগণ শূদ্র বলিয়া এক সময় অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। যেহেতু তাঁহারা বলেন—"রাজসভায় আসিয়াই শূদ্রের মুখদর্শন বাঞ্ছনীয় নহে" ইত্যাদি। টোডরমল্ল কায়স্থবংশসম্ভূত ছিলেন। তিনি নিজেকে ক্ষত্রিয় জ্ঞান করিতেন, শূদ্রজ্ঞান করিতেন না। তিনি পণ্ডিতগণের কথায় দুঃখিত হইয়া প্রতীকারবাসনায় রাজসভায় যাওয়া কয়েক দিন বন্ধ রাখেন। আকবর তাঁহার এই অনুপস্থিতি দেখিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। টোডরমল্ল

বলিলেন—"আপনি যদি দেশের যাবতীয় পণ্ডিত ডাকিয়া মধ্যস্থ হইয়া সভা করিয়া আমার জাতিনির্ণয় করিয়া দেন, এবং তাহাতে যদি আমি ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন হই, তাহা হইলে আমি পূর্ব্ববৎ রাজসভায় আসিব, নচেৎ আমি অন্য কর্ম করিব"। এই সভায় কাশীধাম হইতে মধুসূদনকে আহ্বান করা হয়। বিচারে টোডরমল্লের ক্ষত্রিয়ত্ব সিদ্ধ হয় এবং তাহাতে মধুসূদন স্বাক্ষর প্রদান করেন। এই কথা "কায়স্থবয়ান্" নামক এক ফার্সি পুস্তকে আছে, উহা ৺রাধাকান্তদেব সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেখিয়াছিলেন। ইহা "কায়স্থ পত্রিকায়" প্রকাশিত হইয়াছিল। অতএব মধুসূদন আকবরের রাজত্বকালে প্রবীণ পণ্ডিত। আকবরের রাজত্ব ১৫৫৬—১৬০৫ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং **মধুসূদনের জন্ম ১৫২৩—২৫ খৃষ্টাব্দে** অসম্ভব হয় না।

সপ্তমতঃ দেখা যায়—শঙ্করমিশ্র শ্রীহর্ষের "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া "ভেদরত্ন" নামক এক গ্রন্থ লিখিয়া অদ্বৈতমত খণ্ডন করেন। আর মধুসূদন তাঁহার "অদ্বৈতরত্নরক্ষণ" নামক গ্রন্থে সেই ভেদরত্নের খণ্ডন করেন। শঙ্করমিশ্র লিখিয়াছেন—

"ভেদরত্নপরিত্রাণে তার্কিকা এব যামিকাঃ।
অতো বেদান্তিনঃ স্তেয়ান্ নিরস্ত্যেষ শঙ্করঃ॥"

অর্থাৎ ভেদরূপ রত্নের রক্ষার জন্য তার্কিকগণই প্রহরীর স্বরূপ। এই হেতু বেদান্তিরূপ চোর সকলের নিরাস শঙ্করমিশ্র করিতেছেন।

ওদিকে মধুসূদন অদ্বৈতরত্নরক্ষণের প্রারম্ভে লিখিতেছেন—

"অদ্বৈতরত্নরক্ষায়াং তাত্ত্বিকা এব যামিকাঃ।
অতো ন্যায়বিদঃ স্তেয়ান্ নিরস্তামঃ স্বযুক্তিভিঃ॥"

অর্থাৎ অদ্বৈতরত্নের রক্ষার্থে তাত্ত্বিকগণই প্রহরীর স্বরূপ। এই হেতু নৈয়ায়িকরূপ চোরগণকে নিজ যুক্তিদ্বারা নিরস্ত করা যাইতেছে। অতএব মধুসূদন শঙ্করমিশ্রের পরবর্ত্তী।

এই শঙ্করমিশ্রের সময়, মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝাঁ মহাশয় বাদিবিনোদের ভূমিকায় সম্বৎ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ বলিয়াছেন। কিন্তু পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় বলিতেছেন যে, শঙ্করের ভেদরত্ন গ্রন্থের এক প্রতীকের লিপিকাল ১৪৬২ খৃষ্টাব্দ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং শঙ্করমিশ্র খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত বলা যায়। আর তাহা হইলে মধুসূদন আর খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে হইতে পারেন না। আর ঝাঁ মহোদয়ের মতে শঙ্করমিশ্রের দশম পুরুষ ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান থাকায় শঙ্করমিশ্র ১৪৬২ খৃষ্টাব্দের বহু পূর্ব্বেও হইতে পারেন না। অতএব মধুসূদনের জীবনকালের পূর্ব্বসীমা খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী নিঃসন্দেহে বলা যায়। সুতরাং **১৫২৩—২৫ খৃষ্টাব্দেতে মধুসূদনের জন্ম** হইতে বাধা হয় না।

অষ্টমতঃ দেখা যায়—মধুসূদন অদ্বৈতসিদ্ধি লিখিবার পর ন্যায়-সিদ্ধান্তমুক্তাবলীকার নৈয়ায়িকপ্রবর বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন অদ্বৈতসিদ্ধির উত্তরস্বরূপ "ভেদসিদ্ধি" নামক এক গ্রন্থ লেখেন। ইহাও এক্ষণে কাশী সরস্বতীভবনে রক্ষিত আছে। এই বিশ্বনাথের সময় তাঁহার রচিত গৌতমসূত্রবৃত্তি হইতে জানা যায়। যেহেতু তাহাতে আছে—

"রসবাণতিথৌ শকেন্দ্রকালে বহুলে কামতিথৌ শুচৌ সিতাহে।
অকরোন্মুনিসূত্রবৃত্তিমেতাং ননু বৃন্দাবিপিনে স এব বিশ্বনাথঃ॥"

সুতরাং ১৫৫৬ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে গৌতমসূত্রবৃত্তি রচিত হয়, আর তাহারই নিকটবর্ত্তী কালে ভেদসিদ্ধিও রচিত হয়। আর তাহা হইলে মধুসূদন খুব সম্ভব ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন, বলা যায়। কোন কোন গ্রন্থে "রসবাণ" শব্দের পরিবর্ত্তে "রসবার" পাঠ থাকায় বার শব্দে ৭ ধরা যায় বলিয়া ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দের পরিবর্ত্তে ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দ ধরা যায়। যাহা হউক, এ সময়েও মধুসূদন থাকিলে **মধুসূদনের জন্ম ১৫২৩—২৫ খৃষ্টাব্দে** হইতে বাধা হয় না।

নবমতঃ দেখা যায়—মধুসূদন দ্বৈতবাদী মাধ্বমতাবলম্বী ব্যাসরায়ের গ্রন্থ ন্যায়ামৃতের খণ্ডন অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থে করিয়াছেন। এই ব্যাসরায়ের সময় "আর, কে, শাস্ত্রী" মতে ১৪৪৬-১৫৩৯ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু উদীপির ম'ঠ ইনি ১৫৪৮ হইতে ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মঠাধীশত্ব করিয়াছিলেন, ইহা মঠতালিকা হইতে জানা যায়। এখন ব্যাসরায়কে যদি মধুসূদন হইতে কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ ধরা যায়, তাহা হইলে মধুসূদনের পূর্ব্বোক্ত সময় সঙ্গতই হয়। ন্যায়ামৃতের টীকাকার ব্যাসরাম ব্যাসরায়ের কথায় মধুসূদনের নিকট আসিয়া ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়া তরঙ্গিণী রচনা করিয়াছিলেন। অতএব ব্যাসরায় মধুসূদনের সমসাময়িক ও বয়োজ্যেষ্ঠই হইবেন। ব্যাসরায় ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে ন্যায়ামৃত লিখিলে এবং মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধি ব্যাসরায় ইহার কিছু পরে দেখিলে উক্ত ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কালে অর্থাৎ **১৫২৩—২৫ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের জন্ম** স্বীকার করিতে বাধা হয় না।

দশমতঃ দেখা যায়—একটী প্রবাদ শ্লোক আছে, যাহাতে বুঝা যায়, মধুসূদন ও গদাধর সমসাময়িক, যথা—

"নবদ্বীপে সমায়াতে মধুসূদনবাক্‌পতৌ।
চকম্পে তর্কবাগীশঃ কাতরোঽভূদ্ গদাধরঃ॥"

অর্থাৎ মধুসূদন বাক্‌পতি বা সরস্বতী নবদ্বীপে আসিলে তর্কবাগীশ কম্পিত হন এবং গদাধর কাতর হন। শুনা যায়—মধুসূদন গৃহত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়া কাশী যাইয়া বেদান্ত পড়িয়া যখন নবদ্বীপে পুনরায় আসেন, তখন নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের উক্তরূপ অবস্থা হইয়াছিল। কাশীবাসী ভট্টপল্লীর ৺মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ও এই প্রবাদটী বলিতেন। তিনি আরও বলিতেন—মধুসূদন গদাধরের নিকট পরাজিতও হইয়াছিলেন।

ইঁহাদের বিচারের উপলক্ষটী এইরূপ—মধুসূদন, গদাধরের গৃহেই

অতিথি হন এবং জিজ্ঞাসা করেন—"কিং ভোঃ! ছাত্রাবস্থায়ামেব সংকলিতানি টীপ্পন্যাদীনি পাঠ্যন্তে" গদাধর বলিলেন—"কা নাম তত্র অনুপপত্তিঃ"। এইরূপে উভয়ের মধ্যে বিচার আরম্ভ হয়। যাহা হউক, ইহা হইতে বুঝা যায় গদাধর ও মধুসূদন সমসাময়িক।

তবে গদাধর এ সময় বালক এবং মধুসূদন অতিবৃদ্ধ। কারণ, গদাধর অতি অল্প বয়সে (২০ বৎসরে ?) সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন, তাহা জগদীশ তর্কালঙ্কারের কথা হইতে জানা যায়। তিনি গদাধরকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন "ছেলেটা বেশ বুদ্ধিমান বটে, তবে লেখাপড়া ভাল করে করিলে ভাল হইত"। অতএব বালকপণ্ডিত গদাধরের বাটীতে মধুসূদনের আতিথ্য ও ঐরূপ কথাবার্ত্তা সম্ভব হয়। তবে গদাধরের নিকট মধুসূদনের পরাজয়কথা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ন্যায়মতানুরাগের ফল বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, মধুসূদন ও গদাধর সমসাময়িক হইলেও **মধুসূদন যখন অতিবৃদ্ধ তখন গদাধর যুবক।**

আর **গদাধর যে বালকপণ্ডিত ও মধুসূদন যে অতিবৃদ্ধ, তাহার অন্য প্রমাণও আছে।** কারণ, প্রবাদ এই যে, গদাধরের সহপাঠী ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী। ইনি মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধির উপর "চন্দ্রিকা" নামক টীকাকার। নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণের নিকট শুনা গিয়াছে—বালক গদাধর ও ব্রহ্মানন্দ নবদ্বীপের হরিরাম সিদ্ধান্তবাগীশের নিকট পড়িতেন। এই সময় গদাধরের সহিত ব্রহ্মানন্দের প্রায়ই বিচার হইত এবং হরিরাম মধ্যস্থ হইয়া গদাধরকেই জয়ী বলিতেন। ইহাতে ব্রহ্মানন্দ দুঃখিত হইয়া পুরী গমন করেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন—গদাধর পাঠ শেষ করিয়া অধ্যাপনায় নিযুক্ত।

যাহা হউক, আবার বিচার হয়। ব্রহ্মানন্দ গদাধরকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। তখন তিনি দেবীমন্ত্রের পুরশ্চরণ করিয়া দৈববলে গদাধরকে পরাজিত করিবার ইচ্ছা করেন। দেবী স্বপ্নে

বলেন—"ব্রহ্মানন্দ তুমি ন্যায়শাস্ত্রে গদাধরকে পরাজিত করিতে পারিবে না, তাহার পূর্ব্বজন্মার্জিত পুণ্য অধিক আছে। তুমি সন্ন্যাসী, তুমি বেদান্তমতে তাহাকে পরাজিত করিতে পারিবে"। ইহাতে ব্রহ্মানন্দ অদ্বৈতসিদ্ধির টীকা করিয়া ন্যায়মত উত্তমরূপে খণ্ডন করেন, ইত্যাদি। এই প্রবাদ হইতে বুঝা যায়, **গদাধর মধুসূদনের টীকাকার ব্রহ্মানন্দের সহপাঠী বলিয়া বহু বয়ঃকনিষ্ঠ।**

ইহাতে অপর প্রমাণও আছে। কারণ, লঘুচন্দ্রিকার শেষ হইতে জানা যায়—ব্রহ্মানন্দের একজন গুরু—নারায়ণ তীর্থ। যথা—

"ভজে শ্রীপরমানন্দসরস্বত্যঙ্ঘ্রিপঙ্কজম্।
যৎকৃপাদৃষ্টিলেশেন তীর্ণঃ সংসারার্ণবঃ॥
শ্রীনারায়ণতীর্থানাং গুরূণাং চরণস্মৃতিঃ।
ভূয়ান্মে সাধিকেষ্টানামনিষ্টানাং চ বাধকঃ।
শ্রীনারায়ণতীর্থানাং ষট্শাস্ত্রীপারদৃশ্বনাম্।
চরণৌ শরণীকৃত্য তীর্ণঃ সারস্বতার্ণবঃ॥"

এই নারায়ণতীর্থ মধুসূদনের সিদ্ধান্তবিন্দুর আবার টীকাকার। চিৎলে ভট্টের প্রকরণগ্রন্থে নারায়ণের সময় ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দ আছে। অতএব যে গদাধর ব্রহ্মানন্দের সহপাঠী, সেই ব্রহ্মানন্দের গুরু মধুসূদনের টীকাকার হওয়ায়, **গদাধর মধুসূদন হইতে যথেষ্টই বয়ঃকনিষ্ঠ বলিতে হইবে।**

এখন এই গদাধরের সময়, তাঁহার বর্ত্তমান অষ্টম পুরুষ শ্রীযুক্ত রামকমল তর্কতীর্থের নিকট হইতে যাহা জানা গিয়াছে, তাহাতে ১০১১ সালের পৌষ মাসে গদাধরের জন্ম এবং ১১১৫ সালের ফাল্গুন মাসে ১০৪ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়—বুঝা যায়। অর্থাৎ গদাধর ১৬০৪—১৭০৮ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। এখন ২০বৎসরে অর্থাৎ ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে গদাধর যদি নৈয়ায়িক অধ্যাপক পরিণত হন, আর সেই সময় মধুসূদনের সহিত যদি

তাঁহার দেখা হয়, তাহা হইলে ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন অতিবৃদ্ধ বলিতে হয়। ওদিকে মধুসূদনকে ১৫২৫ বা ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে জাত বলা হইয়াছে, তাহা হইলে মধুসূদনের ৯৪ বা ৯৯ বৎসর বয়সে এই ঘটনা অসঙ্গত হয় না, অর্থাৎ প্রবাদানুসারে মধুসূদনের ১০৭ বৎসর জীবন ধরিলে ইহা সম্ভবই হয়। যেহেতু ১৬২৪—১৫২৫ = ৯৯ ও ১৬২৪—১৫৩০ = ৯৪ বৎসর হয়। **অতএব মধুসূদনের জন্ম ১৫২৫—১৫৩০ খৃষ্টাব্দ।**

একাদশতঃ দেখা যায়—জগদীশ যখন প্রবীণ পণ্ডিত তখন গদাধর বালক পণ্ডিত। কারণ, গদাধর পাঠ শেষ করিয়া অধ্যাপনা করিবার জন্য প্রবীণ পণ্ডিতগণের আদেশ গ্রহণকালে, শুনা যায়, জগদীশেরও অনুমতি লইয়াছিলেন। এই জগদীশের স্বহস্তলিখিত জ্যোতিষতত্ত্ব-গ্রন্থে তাহার লিপিকাল একটী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"বস্বাস্তবাণেন্দুগতে শকাব্দে সিংহে রবৌ মন্দদিনে দশম্যাম্।
প্রযত্নতঃ শ্রীজগদীশশর্ম্মণা, কৃতং সমাপ্তং নিজ পুস্তকং চ॥"

অর্থাৎ ১৫৮৮ শকাব্দে জগদীশ জ্যোতিষতত্ত্ব গ্রন্থখানি নকল করেন। এই পুথি মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্নের নিকট শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত তর্কবাগীশ মহাশয় দেখিয়াছেন। সুতরাং ১৫৮৮+৭৮=১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে জগদীশ জীবিত ছিলেন। এখন ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে যদি গদাধরের জন্ম হয়, এবং ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে ২০ বৎসর বয়সে মধুসূদনের সহিত তাঁহার দেখা হয়, আর জগদীশের লিখিত পুথির সময় যদি ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দ হয়, তাহা হইলে ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে জগদীশের জন্ম, ৮০ বৎসর বয়সে পুথির নকল এবং ৩৮ বৎসর বয়সে তাঁহার সহিত মধুসূদনের দেখা হয়—বলিতে হয়। আর তাহা হইলে গদাধর হইতে জগদীশ ১৮ বৎসর বয়োজ্যেষ্ঠ ইহাও বলিতে হয়। সুতরাং **মধুসূদনের জন্ম ১৫২৫ বা ১৫৩০ খৃষ্টাব্দ** হইতে কোন বাধা হয় না।

দ্বাদশতঃ দেখা যায়—এই জগদীশের শব্দশক্তিপ্রকাশিকার উপর

ব্রহ্মানন্দের গুরু নারায়ণ তীর্থের এক টীকা আছে। সুতরাং ব্রহ্মানন্দ গদাধরের সমসাময়িক বলা যায় এবং ব্রহ্মানন্দ ও গদাধর মধুসূদনের বার্দ্ধক্যে নিতান্ত বালক। সাক্ষাৎ গুরুশিষ্যভাবের সম্বন্ধ সম্ভাবিত থাকিলে ব্রহ্মানন্দ আর তদপেক্ষা হীনের নিকট কেন বিদ্যাভ্যাস করিবেন। যাহা হউক, এতদ্দ্বারা **মধুসূদনকে ১৫২৩—১৬৩০ বা ১৫২৫—১৬৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত** ধরিতে কোন বাধা হয় না।

ত্রয়োদশতঃ দেখা যায়—মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় উক্ত "নবদ্বীপে সমায়াতে" শ্লোকটী অন্যরূপে পাঠ করেন, যথা—

"মথুরায়াঃ সমায়াতে মধুসূদনপণ্ডিতে।
অনীশো জগদীশোঽভূৎ ন জগর্জ্জ গদাধরঃ॥"

অর্থাৎ মধুসূদন মথুরা হইতে আসিলে জগদীশ অপ্রতিভ হন এবং গদাধর গর্ব্ব বর্জ্জন করেন। সুতরাং মধুসূদন, জগদীশ ও গদাধরের সমসাময়িক। জগদীশের সময় ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্ব ও পরে হওয়ায় মধুসূদনের উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়টী অসঙ্গত হয় না।

চতুর্দ্দশতঃ দেখা যায়—পূর্ব্বোক্ত "নবদ্বীপে সমায়াতে" শ্লোকে যে তর্কবাগীশের কথা আছে, তিনি কে? এই শ্লোকদ্বারা গদাধরের বালক বয়সে বৃদ্ধ মধুসূদনের জীবিত থাকা সম্ভব বলিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু তর্কবাগীশ কে? ইহার দ্বারা কিছু নির্ণয় হয় কি না? আমাদের বোধ হয়, এই তর্কবাগীশ যদি গদাধরের গুরু "হরিরাম" হন, তাহা হইলে তাহা অসম্ভব হয় না। তবে শুনা যায়, হরিরামের উপাধি সিদ্ধান্তবাগীশ, তর্কবাগীশ নহে। এখন তাহা হইলে এই তর্কবাগীশ কে? বোধ হয়, ইনি মথুরানাথ হইতে বাধা নাই। কারণ, একটী প্রবাদ আছে—মধুসূদন নাকি নবদ্বীপে আসিয়া মথুরানাথকে বলিয়াছেন—

"তর্ককর্কশবিচারচাতুরী, কিং তুরীয়বয়সা বিচারতে।
আহৃদী ভবতি দ্বয় মানসম্।" • • • •

আর তদুত্তরে মধুসূদনের শ্লোকের শেষচরণ পূরণ করিয়া মথুরানাথ বলিয়াছিলেন—

"ধাতুরীপ্সিতমপাকরোতি কঃ।

এদিকে মথুরানাথ বালক-বয়সে বৃদ্ধ রঘুনাথের নিকট বিদ্যালাভ করিতেন—ইহাও প্রবাদ হইতে জানা যায়।

সেই প্রবাদটী এই যে, মথুরানাথ বালক বলিয়া দূরে বসিয়া রঘুনাথের অধ্যাপনাকালে নিজ পাঠ জানিয়া লইতেন। রঘুনাথ এজন্য মথুরানাথকে চিনিতেন না। একদিন মথুরানাথ একটী পাঠ জিজ্ঞাসা করায় রঘুনাথ বলিলেন—"তুমি কে? তোমায় ত কখন দেখি নাই"। তাহাতে মথুরানাথ দুঃখিত হইয়াই বলেন "আমি দূরে বসিয়া আপনার নিকট হইতে পাঠ লইয়া থাকি, আমি আপনার শিষ্যই।" ইহাতে মথুরানাথ সমগ্র চিন্তামণির উপর টীকা করিয়া আত্মপরিচয় দিবার সংকল্প করেন। বস্তুতঃ, রঘুনাথ সমগ্র চিন্তামণির টীকা করেন নাই। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, মধুসূদন রঘুনাথের কিছু পরবর্ত্তী ও মথুরানাথের সমসাময়িক হইতে পারেন।

কিন্তু মথুরানাথের সময় রঘুনাথের সময় ভিন্ন অন্য উপায়ে এখনও ঠিক জানিতে পারা যায় নাই। রঘুনাথের সময়, পক্ষধর মিশ্রের সময় ও চৈতন্যদেবের সময়দ্বারা কতকটা জানিতে পারা যায়। "অদ্বৈতপ্রকাশ" নামক একখানি বৈষ্ণবগ্রন্থের মতে রঘুনাথ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। কারণ, একদিন এক নৌকার উপরে রঘুনাথ চৈতন্যদেবকৃত ন্যায়ের টীকা দেখিয়া দুঃখিত হওয়ায় চৈতন্যদেব নিজ টীকা গঙ্গায় ফেলিয়া দেন—এইরূপ একটী বর্ণনা তাহাতে আছে। এখন চৈতন্যদেব ১৪৮৫—১৫৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। আর এই সময়ের শেষভাগে অর্থাৎ ১৫৩২ খৃষ্টাব্দের সন্নিহিত পরবর্ত্তীকালে মথুরানাথও জীবিত থাকিলে ১৫২৫।৩০ খৃষ্টাব্দের সন্নিহিতকালে মধুসূদনের জন্ম হইতে পারে এবং

১৬২৪ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ মধুসূদনের সহিত অতিবৃদ্ধ মথুরানাথ তর্কবাগীশের কথাবার্ত্তা হওয়া অথবা "চকম্পে তর্কবাগীশঃ" এরূপ উক্তি অসম্ভব হয় না। আর তাহা হইলে প্রাচীন সীমায় মথুরানাথ ও অধুনিক সীমায় গদাধরকে রাখিয়া উক্ত "নবদ্বীপে সমায়াতে" শ্লোকের মর্য্যাদারক্ষাপূর্ব্বক মধুসূদনকে ১৫২৫।৩০ হইতে ১৬৩২।৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১০৭ বৎসর জীবিত বলা অসঙ্গত হয় না। এখন দেখা যাউক ইহা সম্ভব কি না?

বস্তুতঃ এরূপ হইলে চৈতন্যদেবের ২০ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৪৮৫+২০ =১৫০৫ খৃষ্টাব্দে চৈতন্যদেবকর্ত্তৃক ন্যায়টীকাবর্জ্জন বলিতে হয়। আর এ সময় রঘুনাথকে ৬০ বৎসর বয়স্ক ধরিলে ১৫০৫−৬০=১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথের জন্ম হয়। আর রঘুনাথ ৯০ বৎসর জীবিত থাকিলে ১৪৪৫ +৯০=১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথের মৃত্যু হয়। ইহার ১০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৫৩৫−১০=১৫২৫ খৃষ্টাব্দে, ১২ বৎসরের মথুরানাথ রঘুনাথের নিকট অধ্যয়ন করিতে থাকিলে ১৫২৫−১২=১৫১৩ খৃষ্টাব্দে মথুরানাথের জন্ম স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং ১৫২৫।৩০ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের জন্ম হইলে তাঁহার ১২ বৎসরে অর্থাৎ ১৫৩৭।৪২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নবদ্বীপে প্রথম আগমন হয়। এ সময় মথুরানাথের বয়স ২৪ বা ২৯ বৎসর হয়। আর ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে ৯৪ বৎসর বয়সে মধুসূদন পুনরায় নবদ্বীপে আসিলে সে সময় তুরীয়বয়স্ক মথুরানাথ ১৬২৪−১৫১৩=১১১ বৎসর বয়স্ক হন। পূর্ব্বকালের পণ্ডিতগণ যেরূপ অল্প বয়সে পণ্ডিত হইতেন এবং প্রায়শঃই অতি দীর্ঘজীবী হইতেন, তাহাতে এরূপ ঘটনা অসম্ভব হয় না। অতএব মধুসূদনের জীবন ১৫২৫।৩০ হইতে ১৬৩২।৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ১০৭ বৎসর ধরিতে বিশেষ বাধা হয় না।

অবশ্য ভাববিভোর চৈতন্যদেবের কর্ত্তৃক ন্যায়ের টীকা রচনা বিশ্বাসের যোগ্য কথা নহে। এক শিক্ষাষ্টক ভিন্ন চৈতন্যদেবের কোন রচনাই নাই। যাহাই হউক, ইহা হইতে চৈতন্যদেবের সহিত রঘুনাথের সমকালীনতা

যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উক্তরূপ ফললাভ হয়। আর পক্ষধর মিশ্রেরও সময় এই নির্দ্ধারণের অনুকূলও হয়। কারণ, পক্ষধরের শিষ্য রুচিদত্তের একখানি গ্রন্থের লিপিকাল ১৩৭০ খৃষ্টাব্দ পাওয়া গিয়াছে।

ব্যাপ্তিপঞ্চকের ভূমিকায় আমি রঘুনাথকে চৈতন্যদেব হইতে অসমসাময়িক প্রাচীন বলিয়াছি। কিন্তু ৪০।৫০ বৎসর পর্য্যন্ত রঘুনাথকে চৈতন্যদেব হইতে প্রাচীন বলিলেও রঘুনাথের বৃদ্ধ বয়সে মথুরানাথকে বালক বিবেচনা করিয়া এবং মথুরানাথের অতিবৃদ্ধ বয়সে মধুসূদনকে বৃদ্ধ বলিতে বোধ হয়, বাধা ঘটিতে পারে না। অতএব "চকম্পে৲ তর্কবাগীশঃ" এই বাক্যোক্ত তর্কবাগীশকে যদি মথুরানাথ তর্কবাগীশ জ্ঞান করা যায়, তাহা হইলে মধুসূদনের ৮০।৯০ বৎসর বয়সের সময় চৈতন্যদেবের তিরোধান সম্ভবপর হয়, অর্থাৎ **মধুসূদনের জন্ম তাহা হইলে ১৫২৫ খৃষ্টাব্দ** ধরিতে কোন বাধা হয় না।

পঞ্চদশতঃ দেখা যায়—মধুসূদন তিন জন গুরুকে প্রণাম করিয়াছেন, যথা, অদ্বৈতসিদ্ধির প্রারম্ভে—

"শ্রীরামবিশ্বেশ্বরমাধবানাম্ ঐক্যেন সাক্ষাৎকৃতমাধবানাম্।
স্পর্শেন নির্ধূততমোরজোভ্যঃ পাদোত্থিতেভ্যোঽস্তু নমো রজোভ্যঃ॥"

এতদ্দ্বারা জানা যায়—তাঁহার গুরু শ্রীরাম, বিশ্বেশ্বর ও মাধব। তৎপরে অদ্বৈতসিদ্ধির শেষে আছে—

১ম পুত্র শ্রীনাথচূড়ামণি, ২য় পুত্র যাদবানন্দ ন্যায়াচার্য্য, ৩য় পুত্র মধুসূদনসরস্বতী এবং ৪র্থ পুত্র বাগীশ গোস্বামী।

এই যাদবানন্দ ন্যায়াচার্য্যের পুত্র অবিলম্ব সরস্বতী বা মাধব সরস্বতী। বাঙ্গালা দেশের যশোহরের মহারাজা প্রতাপাদিত্যের ইনি গুরু ও সভাপণ্ডিতচূড়ামণি ছিলেন। ইনি অতিশীঘ্র কবিতা রচনা করিতে পারিতেন বলিয়া ইঁহার নাম 'অবিলম্ব সরস্বতী' হয়। এই প্রতাপাদিত্যের জন্মসময় ১৫৬০।১ খৃষ্টাব্দ, রাজ্যাভিষেক সময় ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দ, এবং মৃত্যু ১৬১১ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং মাধব ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে ৫০ বৎসর বয়স্ক, ১৫২০ খৃষ্টাব্দে জাত, আর তাঁহার খুল্লতাত মধুসূদন তাহা অপেক্ষা যদি ২৫ বৎসরের বৃদ্ধ হন, তাহা হইলে **মধুসূদনের জন্ম ১৫২৫ খৃষ্টাব্দ** হয়—এরূপ বলা যায়।

ষোড়শতঃ—মাধব সরস্বতী দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত মাধব সরস্বতী হইলে মধুসূদনের সময় ঐরূপই হইবে। ইহার বিবরণ "ইণ্ডিয়ান্ এণ্টিকোয়েরি" ৯ম ভাগ ১৯১২ খৃষ্টাব্দে "দাক্ষিণাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী" শীর্ষক প্রবন্ধে আছে। ইহার সার এই—

কাশীতে কোন রাজা, রামেশ্বর ভট্ট নামে এক পণ্ডিতকে বহু হস্তী ও অশ্বাদি দান করেন। তিনি সে দান গ্রহণ না করিয়া দ্বারকায় চলিয়া যান। পরে ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে (চৈত্রমাস ১৪৩৫ শাকে) তাঁহার এক পুত্র হয়। ইনি পরে নারায়ণভট্ট নামে প্রসিদ্ধ হন। এই নারায়ণভট্টই, বোধ হয়, বিশ্বেশ্বরমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি এক মীমাংসার বিচারে মধুসূদন, উপেন্দ্রসরস্বতী ও নৃসিংহাশ্রমকে পরাজিত করেন, এবং ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে "বৃত্তরত্নাকর" নামক গ্রন্থের টীকারচনা করেন। রামেশ্বর দ্বারকায় "মহাভাষ্য" "সুরেশ্বরবার্ত্তিক" প্রভৃতি অধ্যাপনা করিয়া "প্রতিষ্ঠান" পুরীতে আসেন। সেখানে চারিবৎসর অধ্যাপনা করিয়া আবার কাশী আসেন। পরে তাঁহার দুই পুত্র হয়। এক জনের নাম—শ্রীধর এবং অপরের নাম

আমাদের অজ্ঞাত। এই রামেশ্বরের কাশীতে তিন জন শিষ্য হয়েন। প্রথম—অনন্তভট্ট, দ্বিতীয়—দামোদর সরস্বতী, এবং তৃতীয়—মাধব সরস্বতী। এখন রামেশ্বরের পুত্র নারায়ণ ভট্টের জন্ম যদি ১৫১৪ খৃষ্টাব্দ হয়, আর রামেশ্বরের শিষ্য যদি মাধব সরস্বতী হন, তবে মাধব ও নারায়ণ উভয়ে সমবয়স্ক মনে করা যাইতে পারে, আর তাহা হইলে মধুসূদন ১৫১৪ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে জন্মিয়াছিলেন মনে করা যাইতে পারে। অর্থাৎ অস্মন্নির্দিষ্ট **১৫২৫ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের জন্ম** হইতে বাধা নাই। কারণ, ১১।১২ বৎসরের অধিক বয়স্কের নিকট বিদ্যাভ্যাস অসম্ভব নহে।

সপ্তদশতঃ দেখা যায়—শ্রীজীবগোস্বামী বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য কাশীতে মধুসূদন পণ্ডিতের নিকট গিয়াছিলেন—এ কথা বৈষ্ণবগ্রন্থ মধ্যেও উক্ত হইয়াছে। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মধুসূদন শ্রীজীবগোস্বামীর সমসাময়িক হন। ইতি পূর্ব্বে ৫২ পৃষ্ঠায় আমরা শ্রীজীবের সময় ১৫১২ হইতে ১৫৯২ খৃষ্টাব্দ ধরিয়াছি। বস্তুতঃ, শ্রীজীবের জ্যেষ্ঠতাত: শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর মহাপ্রভুর নিকট সাক্ষাৎ উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন—ইহা বৈষ্ণবগ্রন্থেই ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীজীব, মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ পান নাই—অর্থাৎ শ্রীজীব যখন বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, তখন মহাপ্রভু লীলাসম্বরণ করিয়াছেন, ইহাও প্রসিদ্ধ কথা। এখন ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভুর তিরোধান হওয়ায় শ্রীজীব এ সময় নিতান্ত বালক—ইহাই সম্ভব হয়। আর তাহা হইলে **১২।১৩ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রীজীব, মধুসূদনের ৩০ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের নিকট অদ্বৈতবাদ শিক্ষা** করিয়াছিলেন—বলিতে হয়। মধুসূদন এ বয়সে কাশীতে বিখ্যাত পণ্ডিত এবং শ্রীজীবের অদ্বৈতবাদ-খণ্ডনের ইচ্ছা, তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিবার যোগ্য বয়সে অর্থাৎ ৪০।৫১ বৎসর বয়সে হইবে—ইহাই সম্ভব। সুতরাং ১৫৫২।৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে

শ্রীজীব মধুসূদনের নিকট অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন—এরূপ কল্পনা করিলে অসম্ভব হয় না।

অষ্টাদশতঃ দেখা যায়—শেষগোবিন্দ মধুসূদনের শিষ্য। যেহেতু তিনি শঙ্করকৃত সর্ব্বসিদ্ধান্তরহস্য গ্রন্থের টীকার শেষে লিখিয়াছেন—

"যৎপ্রসাদাধীনসিদ্ধিপুরুষার্থচতুষ্টয়ম্।
সরস্বত্যবতারং তং বন্দে শ্রীমধুসূদনম্॥"

"ইতি শ্রীশেষপণ্ডিতসুতশেষগোবিন্দবিরচিতসর্ব্বসিদ্ধান্তরহস্যবিবরণে ভাট্টপক্ষঃ সমাপ্তঃ" তাহার পর আছে—

"গুরুণা মধুসূদনেন যদ্‌যৎ করুণাপূরিতচেতসোপদিষ্টম্।
তদিদং প্রকটীকৃতং ময়াঽস্মিন্ ভগবচ্ছংকরপূজ্যপাদমূলে॥"

সুতরাং শেষগোবিন্দ মধুসূদনের শিষ্য, এবং তাঁহার পিতার নাম শেষপণ্ডিত। এই শেষপণ্ডিত, ভট্টোজীদীক্ষিতের গুরু কৃষ্ণপণ্ডিত। শেষবংশে পণ্ডিত উপাধি প্রসিদ্ধ ছিল। অতএব কৃষ্ণপণ্ডিত ও মধুসূদন সমসাময়িক এবং শেষগোবিন্দ ও ভট্টোজীদীক্ষিত সমসাময়িক, আর কৃষ্ণপণ্ডিত ও মধুসূদন শেষগোবিন্দ ও ভট্টোজীদীক্ষিত হইতে প্রবীণ—ইহাও বলা যায়।

তাহার পর দেখা যায়—

(ক) ভট্টোজীর ভ্রাতা ও শিষ্য অদ্বৈতচিন্তামণিকার রঙ্গোজীভট্ট। তাঁহার স্থিতিকাল ১৬৩০ খৃষ্টাব্দ। রঙ্গোজীভট্ট বেদান্তগ্রন্থপ্রণেতা নৃসিংহাশ্রমের শিষ্য।

(খ) এই নৃসিংহাশ্রম, উপেন্দ্রসরস্বতী এবং মধুসূদন দীনাংশক নারায়ণ ভট্টের নিকট বিচারে পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

(গ) অপ্পয়দীক্ষিত আবার এই নৃসিংহাশ্রমের নিকট বেদান্তবিষয়ক বিচারে পরাজিত হইয়া শৈববিশিষ্টাদ্বৈত মত পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈতমত গ্রহণ করেন।

(ঘ) এই নৃসিংহাশ্রমের শিষ্য বেঙ্কটনাথ এবং বেঙ্কটনাথের শিষ্য ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্র। ইনিই বেদান্তপরিভাষা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

(ঙ) ভট্টোজী দীক্ষিত অপ্পয় দীক্ষিতকে বেদান্তসম্বন্ধে গুরুপদে বরণ করেন। ভট্টোজী তৎপ্রণীত শব্দকৌস্তভে অপ্পয় দীক্ষিতের "মধ্বতন্ত্র-মুখমর্দ্দন" গ্রন্থ হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ভট্টোজী কৃষ্ণ দীক্ষিতের নিকট ব্যাকরণ পড়েন। কৃষ্ণ দীক্ষিতের পুত্র—বীরেশ্বর দীক্ষিত। বীরেশ্বরের নিকট রসগঙ্গাধরপ্রণেতা জগন্নাথ পণ্ডিত ব্যাকরণ পড়েন। ভট্টোজী নিজ গ্রন্থ "প্রৌঢমনোরমায়" স্বীয় গুরু কৃষ্ণ দীক্ষিতের মতখণ্ডন করায় জগন্নাথ পণ্ডিত ভট্টোজীর উপর ক্রুদ্ধ হন। তিনি "মনোরমাকুচমর্দ্দন" গ্রন্থ লিখিয়া ভট্টোজীর মত খণ্ডন করেন। ইহাতে ভট্টোজী ও জগন্নাথের মধ্যে বিচার হয়। অপ্পয় দীক্ষিত মধ্যস্থ হইয়া ভট্টোজীর জয় ঘোষণা করায় জগন্নাথ অপ্পয়ের উপর ক্রুদ্ধ হন এবং "শব্দকৌস্তভশাণোত্তেজন" নামক গ্রন্থে অপ্পয় দীক্ষিতের নিন্দা করেন, যথা—

"অপ্পয্যদুর্গ্রহবিচেষ্টিতচেতনানাম্।
আর্য্যাদ্রোহাময়সহং শময়াবলেপান্॥" ইত্যাদি।

অন্যত্র স্বকৃত "শশিসেনা" গ্রন্থেও তিনি যে অপ্পয়ের নিন্দা করিয়াছেন—

"অপ্পয্যদীক্ষিতদাবানলদগ্ধশেষম্।
সাহিত্যমস্কুরয়তে সরসৈ নির্বচৈঃ॥"

নাগেশভট্ট "কাব্যপ্রকাশভাষ্যের" প্রারম্ভে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেও জানা যায়—জগন্নাথ অপ্পয়ের সমসাময়িক, যথা—

"দৃপ্যদ্দ্রাবিড়দুষ্টদুর্গ্রহবশান্ ম্লিষ্টং গুরুদ্রোহিণা,
যন্ম্লেচ্ছেতিবচোঽবিচিন্ত্য সদসি প্রৌঢেঽপি ভট্টোজিনা।
তৎ সত্যাপিতমেব ধৈর্য্যনিধিনা যৎ স বা মৃদ্গাৎ কুচম্,
নির্ব্বধ্যাস্ত মনোরমামবশয়ন্নপ্যয়্যমুখ্যান্ স্থিতান্॥"

এই জগন্নাথ পণ্ডিত জাহাঙ্গীরের সভায় (১৬০৫-১৬২৭ খৃষ্টাব্দে) রাজকবি ছিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরের পুত্র সাজাহান ও তাহার এক ভগ্নীকে পড়াইতেন। সাজাহান ১৬২৭—১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহাকে পণ্ডিতরাজ উপাধি দেন। অপ্পয় ১৫২০-১৫৯৩ বা মতান্তরে ১৫৫০-১৬২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৭২ বৎসর জীবিত ছিলেন। আর তিনি যে ৭২ বৎসর জীবিত ছিলেন, তাহার প্রমাণ একটী শ্লোকেই আছে—

"চিদম্বরমিদং পুরং প্রথিতমেব পুণ্যস্থলম্,
সুতাশ্চ বিনয়োজ্জ্বলা সুকৃতয়শ্চ কাশ্চিৎ কৃতাঃ।
বয়াংসি মম সপ্ততেরুপরি নৈব ভোগে স্পৃহা,
ন কিঞ্চিদহমর্থয়ে শিবপদং দিদৃক্ষে পরম্॥
অভাতি হাটকসভানটপাদপদ্ম-
জ্যোতির্ম্ময়ো মনসি মে তরুণারুণোঽয়ম্॥"

অতএব অপ্পয়ের বৃদ্ধবয়সে জগন্নাথের মধ্যবয়স বা যৌবন স্বীকার করিতে পারা যায়। আর তাহা হইলে **মধুসূদনের ১৫২৫ হইতে ১৬৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবন অসমঞ্জস হয় না।**

ঊনবিংশতঃ দেখা যায়—বল্লভাচার্য্যের সময় ১৪৭৯—১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ। ইঁহার সহিত কাশীতে উপেন্দ্র সরস্বতীর বিচার হয় ও হাতাহাতি হইবার উপক্রম হওয়ায় বল্লভ কাশী ত্যাগ করেন। এই উপেন্দ্র, নৃসিংহাশ্রম ও মধুসূদনের সহিত নারায়ণভট্টের বিচারে নারায়ণভট্ট জয়ী হন। মধুসূদনের ২৫।৩০ বৎসর বয়সে যদি অতিবৃদ্ধ উপেন্দ্রের সহিত নরায়ণের এবং বল্লভের বিচার হয়, তাহা হইলে অসম্ভব হয় না। কারণ, মধুসূদনের ৩০ বৎসরে অর্থাৎ ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে উপেন্দ্রকে যদি ৮০ বৎসর বয়স্ক ধরা যায়, তবে উপেন্দ্রের জন্ম ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দ হয়। আর তাহা হইলে তিনি বল্লভ হইতে ৪ বৎসরের জ্যেষ্ঠ হন। সুতরাং **মধুসূদন ১৫২৫—১৬৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত** ছিলেন বলিলে বাধা হয় না।

"ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীবিশ্বেশ্বরসরস্বতীশ্রীচরণশিষ্য-শ্রীমধুসূদনসরস্বতীবিরচিতায়াম্ অদ্বৈতসিদ্ধৌ মুক্তিনিরূপণং নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ"।

এবং লঘুচন্দ্রিকা হইতেও জানা যায়, যথা—

"গুরূণাং—শ্রীবিশ্বেশ্বরসরস্বতীনাম্" ইত্যাদি।

সুতরাং অবশিষ্ট রহিলেন—শ্রীরাম। ইনি পরমগুরু কি না এবং "সরস্বতী" উপাধিধারী কি না, অথবা বিদ্যাগুরু কি না, তাহা কেহই বলিলেন না। তবে অদ্বৈতসিদ্ধির প্রারম্ভে গুরুনমস্কারস্থলের ব্যাখ্যায় লঘুচন্দ্রিকায় দেখা যায়—ব্রহ্মানন্দ বলিতেছেন—

"পরমগুরু-গুরু বিদ্যাগুরূন্ প্রণমতি—শ্রীরামেত্যাদি।"

অতএব শ্রীরাম—পরমগুরু, বিশ্বেশ্বর সরস্বতী—গুরু এবং মাধব সরস্বতী—বিদ্যাগুরু। আর তাহা হইলে শ্রীরাম "সরস্বতী" উপাধিধারীই হইবেন। কারণ, গুরু ও পরম এক সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়াই রীতি।

কিন্তু তিন জনই যদি সরস্বতী হন, তাহা হইলে ইঁহাদের কাহারও কোন গ্রন্থাদিদ্বারা প্রসিদ্ধিলাভ ঘটে নাই—বলিতে হইবে। অথচ প্রবাদ এই যে, মধুসূদন শ্রীরামতীর্থের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক রামতীর্থ তাঁহার সময় একজন কাশীর প্রধান পণ্ডিত। প্রবাদানুসারে রামতীর্থের কথানুযায়ীই তিনি অদ্বৈতসিদ্ধিরচনা করিয়াছিলেন এবং বিশ্বেশ্বরের নিকট সন্ন্যাস লইয়াছিলেন। এ কথা তাঁহার জীবনচরিতের মধ্যে কথিত হইয়াছে। অবশ্য মধুসূদন যখন শ্রীরামকে পরমগুরু ও মাধবকে বিদ্যাগুরু বলিতেছেন, তখন রামতীর্থকে আর বিদ্যাগুরু বলা চলে না। তবে এই রামতীর্থের নাম না করিলেও যে মধুসূদন তাঁহার নিকট শিক্ষা করেন নাই, তাহাও বলা যায় না। যেহেতু যাঁহারই নিকট শিক্ষা করা হয়, তাঁহাদের সকলেরই যে নাম করিতে হইবে—এমন কোন বাধ্যবাধকতা বা প্রথাও নাই। এজন্য

মনে হয়—মধুসূদন "শ্রীরাম"পদদ্বারা শ্রীরামসরস্বতী এবং শ্রীরামতীর্থ—উভয়কেই প্রণাম করিয়াছেন।

কিন্তু রামতীর্থ মধুসূদনের গুরু না হইলেও রামতীর্থ যে মধুসূদনের নিকট প্রবীণ সমসাময়িক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, আর রামতীর্থের সময়দ্বারা মধুসূদনের সময়ের একটু আভাসও যে পাওয়া যায় না, তাহাও নহে, যথা—

রামতীর্থ বহু গ্রন্থের প্রণেতা। বেদান্তসারের বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী টীকা, সংক্ষেপশারীরক টীকা, উপদেশসাহস্রী টীকা প্রভৃতি বহু গ্রন্থই রামতীর্থের আছে। আর মধুসূদন এই রামতীর্থের সংক্ষেপশারীরকের টীকার একস্থলে প্রতিবাদও করিয়াছেন। ইহা গোপীনাথ কবিরাজ লিখিয়াছেন। তাহার পর রামতীর্থ, নৃসিংহাশ্রমের গুরু জগন্নাথ আশ্রমের নাম অদ্বৈতদীপিকার শেষে উল্লেখ করিয়াছেন। এই রামতীর্থ আনন্দগিরিবিরচিত পঞ্চীকরণবিবরণের উপর তত্ত্বচন্দ্রিকা টীকায়—"শ্রীকৃষ্ণতীর্থগুরুপাদযুগং নমামি" এবং "জগন্নাথাশ্রমাখ্যা যে গুরবো মে ইশালবঃ" বলিয়া নমস্কার করায় বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণতীর্থ তাঁহার গুরু এবং জগন্নাথাশ্রম তাঁহার বিদ্যাগুরু।

"জাতে পঞ্চশতাধিকে দশশতে সংবৎসরাণাং পুনঃ,
সঞ্জাতে দশবৎসরে (১৫১০) প্রভুবরশ্রীশালিবাহে শকে।
প্রাপ্তে দুর্ম্মুখবৎসরে শুভশুচৌ মাসেঽনুমত্যাং তিথৌ,
প্রাপ্তে ভার্গববাসরে নরহরি টীকাং চকারোজ্জ্বলাম্ ॥"

যাহা হউক, এতদ্দ্বারা বলা যায় যে, যদি রামতীর্থ মধুসূদনের একজন বিদ্যাগুরু হন, তাহা হইলে ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দের ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৫৭৬।৭৮ খৃষ্টাব্দে অন্ততঃপক্ষে রামতীর্থের বিদ্বন্মনোরঞ্জনী রচিত হয়, আর রামতীর্থের বয়স এই সময় অন্ততঃপক্ষে ৪০।৫০ বৎসর হয়; সুতরাং রামতীর্থের জন্ম ১৫১৬।২৬ খৃষ্টাব্দ হয়। কিন্তু যে নৃসিংহাশ্রম অপ্পয়দীক্ষিতকে পরাজিত করেন, সেই নৃসিংহাশ্রমের গুরু জগন্নাথাশ্রম হওয়ায় এবং তাঁহার শিষ্য রামতীর্থ হওয়ায় রামতীর্থ আরও প্রাচীন হইবেন। সুতরাং ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দের সুবোধিনীর ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে ১৫৬৩।৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্বন্মনোরঞ্জনী রচিত বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে রামতীর্থের জন্ম ১৫১৫।২৩ খৃষ্টাব্দ হয়, আর মধুসূদন তাঁহার শিষ্য হওয়ায় তাঁহার অপেক্ষা ১০।১২ বৎসরের কনিষ্ঠ বলা যাইতে পারে। **অর্থাৎ মধুসূদনের জন্ম ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে হইতে পারে।**

ওদিকে নৃসিংহাশ্রম অপ্পয়দীক্ষিতকে অদ্বৈতবাদী করেন, ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে বৃত্তরত্নাকরের টীকাকার নারায়ণভট্টের সহিত উপেন্দ্র সরস্বতী ও মধুসূদনের বিচারে উপেন্দ্র ও মধুসূদন পরাজিত হয়েন, সুতরাং **রামতীর্থ নৃসিংহাশ্রম অপ্পয়দীক্ষিত ও মধুসূদন সমসাময়িকই** হইতেছেন। আর এ ক্ষেত্রে রামতীর্থসংক্রান্ত মধুসূদনের প্রবাদ অসম্ভবও হইতেছে না।

তাহার পর ভট্টোজীর ভ্রাতা ও শিষ্য রঙ্গোজী ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে "অদ্বৈত-চিন্তামণির" শেষে লিখিয়াছেন যে, তিনি জগন্নাথ আশ্রমকে গুরু জ্ঞান করেন, এবং জগন্নাথ আশ্রমের শিষ্য ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে রচিত তত্ত্ববিবেকের

গ্রন্থকার নৃসিংহ আশ্রমকে গুরু বলিতেছেন। সুতরাং ভট্টোজী, রঙ্গজী, মধুসূদন ও রামতীর্থ সমসাময়িকই হইতেছেন, এবং ভট্টোজীর প্রতিদ্বন্দ্বী জগন্নাথ পণ্ডিত এবং তাঁহার পর ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে নীলকণ্ঠ স্ববল পণ্ডিত ভট্টোজীকে গুরু বলায় ভট্টোজীর মধ্য বা শেষজীবন এইরূপ সময়ই হইবে—ইহাও কল্পনা করা যায়। সুতরাং মধুসূদনের শেষজীবন ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দের নিকট, তাহাও কল্পনা করিতে পারা যায়। আর তদনুসারে মধুসূদনকে যদি ১৫২৫—১৬৩২ খৃষ্টাব্দ—এই ১০৭ বৎসর জীবিত ধরা যায়, তাহা হইলে ভুল হইবে মনে হয় না।

ত্রয়োবিংশতঃ মধুসূদনের শিষ্যপ্রশিষ্যবর্গের দ্বারা মধুসূদনের সময় যাহা জানা যায়, তাহা এইবার আলোচ্য।

মধুসূদনের তিনজন শিষ্যের নাম পাওয়া যায় যথা—শেষগোবিন্দ, পুরুষোত্তম সরস্বতী এবং বলভদ্র। শেষগোবিন্দ শঙ্করের সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহের টীকার শেষে লিখিয়াছেন—

"গুরুণা মধুসূদনেন যদ্বৎ করুণাপূরিতচেতসোপদিষ্টম্" এবং

"যৎপ্রসাদাদধীনসিদ্ধিপুরুষার্থচতুষ্টয়ম্।
সরস্বত্যবতারং তং বন্দে শ্রীমধুসূদনম্।"

ইত্যাদি পূর্বেই বলা হইয়াছে।

পুরুষোত্তম সরস্বতী মধুসূদনের সিদ্ধান্তবিন্দুর টীকার শেষে লিখিয়াছেন—

পুরুষোত্তম সরস্বতী মধুসূদনের শিষ্য। তিনি মধুসূদনের সিদ্ধান্তবিন্দুর টীকায় বলভদ্রের বিষয় বলিয়াছেন—"বলভদ্রভট্টাচার্য্যঃ কশ্চন সম্যগ্ ভক্তশিষ্যঃ পরমবেদান্তশাস্ত্রনিষ্ণাতঃ।" ওদিকে ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন—"আচার্য্যাণাং সেবকব্রহ্মচারিণঃ"।

এদিকে ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধির উপর লঘুচন্দ্রিকা টীকা রচনা করিয়াছেন। তিনি কিন্তু মধুসূদনকে গুরু বলেন নাই। তাঁহার গুরু পরমানন্দ সরস্বতী, ও গুরুস্থানীয় নারায়ণতীর্থ এবং শিবরামবর্ণী। যথা, লঘুচন্দ্রিকার প্রথমে—

"শ্রীনারায়ণতীর্থানাং গুরূণাং চরণস্মৃতিঃ।
ভূয়ান্ মে সাধিকেষ্টানামনিষ্টানাং চ বাধিকা॥
অদ্বৈতসিদ্ধিব্যাখ্যানং ব্রহ্মানন্দেন ভিক্ষুণা।
সংক্ষিপ্তচন্দ্রিকার্থেন ক্রিয়তে লঘুচন্দ্রিকা॥"

শেষে আছে—

"মহানুভাবধৌরেয়শিবরামাখ্যবর্ণিনঃ।
এতদ্গ্রন্থস্য কর্ত্তারো লেখকাঃ কেবলং বয়ম্॥
শ্রীনারায়ণতীর্থানাং ষট্‌ছাস্ত্রীপারদৃশ্বনাম্।
চরণৌ শরণীকৃত্য তীর্ণঃ সারস্বতার্ণবঃ॥
ভজে শ্রীপরমানন্দসরস্বত্যঙ্ঘ্রিপঙ্কজম্।
যৎকৃপাদৃষ্টিলেশেন তীর্ণঃ সংসারসাগরঃ॥

"ইতি শ্রীপরমানন্দসরস্বতীপূজ্যপাদশিষ্যশ্রীব্রহ্মানন্দসরস্বতীবিরচিতায়াম্ অদ্বৈতসিদ্ধিটীকায়াম্ অদ্বৈতলঘুচন্দ্রিকায়াং চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ"।

এখন এই শিবরামের নাম ব্রহ্মসূত্রশঙ্করভাষ্যরত্নপ্রভাকার গোবিন্দানন্দশিষ্য রামানন্দ করিয়াছেন, যথা—

"শ্রীমদ্গোবিন্দবাণীচরণকমলগো নির্দ্বন্দোঽহং যথাঽলিঃ।"
"শ্রীগৌরীনায়কভিঃপ্রকটনশিবরামার্য্যলব্ধাত্মবোধৈঃ।"

আর **শিবরাম ও নারায়ণতীর্থ** যে **সমসাময়িক** তাহা চিৎলে ভট্টের প্রকরণগ্রন্থে আছে। তন্মতে **তাঁহাদের সময় ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দ।**

এদিকে নারায়ণ তীর্থ জগদীশের শব্দশক্তির টীকাকার। জগদীশের নিকট গদাধর বালকপণ্ডিত। গদাধরের সহপাঠী ব্রহ্মানন্দ, আবার গদাধর মধুসূদনের আগমনে কাতর হইতেছেন। অতএব মধুসূদনের বৃদ্ধবয়সে ব্রহ্মানন্দও বালকপণ্ডিত বলা যায়। ব্রহ্মানন্দের গুরু শিবরামও অদ্বৈতসিদ্ধির টীকা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন—ইনিই বৃহচ্চন্দ্রিকাকার। সুতরাং **ব্রহ্মানন্দও মধুসূদনের শেষ বয়সে বালক পণ্ডিত** ছিলেন—বলা যাইতে পারে। যেহেতু—

মধুসূদনের শিষ্য—বলভদ্র, পুরুষোত্তম ও শেষগোবিন্দ ; আর নারায়ণ-তীর্থ, পরমানন্দ সরস্বতী ও শিবরামের শিষ্য—ব্রহ্মানন্দ। আর এই নারায়ণতীর্থের গুরু আবার রামগোবিন্দ তীর্থ এবং বাসুদেব তীর্থ। কিন্তু পরমানন্দ সরস্বতী ও শিবরামের গুরু কে, তাহা জানা যাইতেছে না। ইঁহাদের সহিত মধুসূদনের বা তাঁহার শিষ্যের সম্বন্ধ জানিতে পারিলে ব্রহ্মানন্দের সহিত মধুসূদনের সম্বন্ধ ঠিক জানিতে পারা যাইত। কিন্তু তাহা হইলেও সময়ানুসারে ব্রহ্মানন্দ মধুসূদনের প্রশিষ্যস্থানীয় হইবেন বোধ হয়। অতএব **মধুসূদনের জীবন ১৫২৫।৩০—১৬৩২।৩৭ খৃষ্টাব্দ** বলা যাইতে পারে।

চতুর্বিংশতঃ দেখা যায়—যশোহরের মহারাজা প্রতাপাদিত্য কাশীতে চৌষট্টী যোগিনীর ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, এবং তাঁহার মৃত্যুও সেই ঘাটেই হয়—ইহা যশোহরের ইতিহাসে উক্ত হইয়াছে। এই ঘাটনির্ম্মাণ স্বদেশীয় মধুসূদনের উপর অনুরাগবশতঃ—এরূপ কল্পনা করা যায়। প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকাল ১৫৮৪ হইতে ১৬১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। সুতরাং তাঁহার অগ্রে মধুসূদন প্রবীণ পণ্ডিত হইবেন। অতএব **মধুসূদনের সময়** ১৫২৫।৩০ হইতে ১৬৩২।৩৭ খৃষ্টাব্দ ধরিতে কোন বাধা নাই।

উপসংহার।

এখন এই আলোচনা হইতে দুইটী বিষয় জানিতে পারা গেল, প্রথম—কতকগুলি ব্যক্তির সহিত কতকগুলি ব্যক্তির পারম্পর্য্য এবং কতকগুলি ব্যক্তির সহিত কতকগুলি ব্যক্তির সমসাময়িকতা এবং কতকগুলি ব্যক্তির সহিত কতকগুলি ব্যক্তির সমসাময়িকতা ও পারম্পর্য্য উভয়ই। সুতরাং তাঁহাদের সময় ও নামগুলি যদি একত্র করা যায়, তাহা হইলে মধুসূদনের একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপনীত হইতে পারা যায়। অতএব নিম্নে তাহা সংকলন করা গেল—

পারম্পর্য্য, যথা—

শ্রীরাম সরস্বতী বিশ্বেশ্বর মধুসূদন	মাধব সরস্বতী মধুসূদন	কৃষ্ণদীক্ষিত (শেষ) বীরেশ্বর জগন্নাথ পণ্ডিত সাজাহান	অপ্পয়দীক্ষিত মধুসূদন শেষগোবিন্দ
শেষকৃষ্ণ শেষ গোবিন্দ	জগন্নাথ আশ্রম নৃসিংহাশ্রম বেঙ্কট নাথ ধর্ম্মরাজ	নৃসিংহাশ্রম অপ্পয়দীক্ষিত ভট্টোজী	জগন্নাথাশ্রম নৃসিংহাশ্রম রঙ্গজী
জগন্নাথ নৃসিংহাশ্রম ভট্টোজী রঙ্গজী	জগদীশ গদাধর	জগদীশ নারায়ণতীর্থ ব্রহ্মানন্দ	রঘুনাথ শিরোমণি মথুরানাথ তর্কবাগীশ গদাধর
শিবরামবর্ণী ব্রহ্মানন্দ	পরমানন্দ ব্রহ্মানন্দ	রামেশ্বরভট্ট নারায়ণভট্ট	জগন্নাথাশ্রম রামতীর্থ
শিবরামবর্ণী রামানন্দ	গোবিন্দানন্দ রামানন্দ	মধুসূদন শ্রীজীব	মহাপ্রভু রূপ সনাতন শ্রীজীব

ব্যাসরাজ	মধুসূদন	কৃষ্ণদীক্ষিত	শেষকৃষ্ণ
ব্যাসরাম	ব্যাসরাম	ভট্টোজী	ভট্টোজী
শঙ্করমিশ্র	রামগোবিন্দ	বাসুদেবতীর্থ	মধুসূদন
মধুসূদন	নারায়ণতীর্থ	নারায়ণতীর্থ	বিশ্বনাথ ন্যায়পঃ
মধুসূদন	মধুসূদন	ভট্টোজী	রামেশ্বরভট্ট
বলভদ্র	পুরুষোত্তম	নীলকণ্ঠ সুবল	মাধব সরস্বতী

সমসাময়িকতা, যথা—

১। আকবর, জাহাঙ্গীর, সাজাহান, জগন্নাথ পণ্ডিত, মধুসূদন সরস্বতী, টোডরমল্ল, তুলসীদাস, খানখানা।

২। প্রতাপাদিত্য, যাদবানন্দ বা মাধব সরস্বতী, মধুসূদন, উপেন্দ্রসরস্বতী, বল্লভাচার্য্য।

৩। নারায়ণভট্ট, উপেন্দ্রসরস্বতী, মধুসূদন, নৃসিংহাশ্রম, অপ্পয়-দীক্ষিত, ভট্টোজী, বলভদ্র, পুরুষোত্তম, শেষগোবিন্দ, জগন্নাথ পণ্ডিত, ব্যাসরাজ, ব্যাসরাম, মধুসূদন।

৪। ব্রহ্মানন্দ, গদাধর, পরমানন্দ, নারায়ণতীর্থ, জগদীশ।

এখন **কতকগুলি নিৰ্দ্দিষ্টসময়ের** যদি তালিকা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায়—

১। মধুসূদনের সিদ্ধান্তবিন্দু ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে নকল হইয়াছে।

২। নারায়ণভট্টরচিত বৃত্তরত্নাকরভাষ্য ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে রচিত।

৩। নৃসিংহাশ্রমের বেদান্ততত্ত্ববিবেক ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে রচিত।

৪। তুলসীদাসের জীবন ১৫৩৩ হইতে ১৬২৩ খৃষ্টাব্দ।

৫। আকবরের রাজত্ব—১৫৫৬ হইতে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে।

৬। জাহাঙ্গীরের সময়—১৬০৫ হইতে ১৬২৭ খৃষ্টাব্দ।

৭। সাজাহানের সময়—১৬২৭ হইতে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ।

৮। শঙ্করমিশ্রের ভেদরত্নের লিপিকাল ১৪৬২ খৃষ্টাব্দ।
৯। ভেদসিদ্ধিকার বিশ্বনাথের গৌতমসূত্রবৃত্তির সময় ১৬৩৪ বা ১৬৫৪খৃ
১০। ব্যাসরাজের মঠাধীশত্বের সময়—১৫৪৮ হইতে ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দ।
১১। জগদীশের হস্তলিখিত পুঁথির সময়—১৬৬৬ খৃষ্টাব্দ।
১২। গদাধরের জীবন—১৬০৪ হইতে ১৭০৮ খৃষ্টাব্দ।
১৩। চৈতন্যদেবের সময়—১৪৮৫ হইতে ১৫৩২ খৃষ্টাব্দ।
১৪। পক্ষধরমিশ্রের শিষ্য রুচিদত্তের গ্রন্থের লিপিকাল—১৩৭০ খৃষ্টাব্দ।
১৫। রঙ্গোজীভট্টের স্থিতিকাল—১৬৩০ খৃষ্টাব্দ।
১৬। নীলকণ্ঠসুবল পণ্ডিত—১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে জীবিত।
১৭। অপ্পয়দীক্ষিতের সময় ১৫২০ হইতে ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দ।
১৮। বল্লভাচার্য্যের সময়—১৪৭৯ হইতে ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ।

সিদ্ধান্ত।

১। এখন ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থকার নারায়ণ ভট্টের সঙ্গে ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থকার নৃসিংহাশ্রমের সহিত বিচারে যদি মধুসূদন নৃসিংহাশ্রমের পক্ষে বিচার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ১৫৪৫।১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন অন্ততঃপক্ষে ২৫।৩০ বৎসরের পণ্ডিত হইবেন। অর্থাৎ তাহা হইলে মধুসূদনের জন্মসময় ১৫২০।২২ বা ১৫১৫।১৭ খৃষ্টাব্দ হয়।

২। ১৫৩৩ হইতে ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে তুলসীদাসের সময় মধুসূদন প্রবীণ পণ্ডিত হইলে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দেরও অন্ততঃপক্ষে ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে মধুসূদনের জন্ম স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ ১৫২১।১৫২৩ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের জন্ম হয়।

৩। ১৫৫৬ হইতে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আকবরের সময় মধুসূদন প্রবীণ পণ্ডিত হইলে ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে জাত আকবরের পূর্ব্বে মধুসূদনকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং ১৫২০ ২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মধুসূদনের জন্ম হইতে কোন বাধা হয় না।

৪। ১৫৪৮ হইতে ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ব্যাসরাজের ন্যায়ামৃতের প্রতিবাদ করিলে মধুসূদনের উক্ত সময়ে জন্মগ্রহণে কোন বাধা হয় না।

৫। ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে চৈতন্যদেবের দেহত্যাগ হইলে মধুসূদনের উক্ত সময়ে জন্ম স্বীকারে বাধা হয় না।

৬। ১৬০৪—১৬০৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বালক গদাধর পণ্ডিতের সহিত বৃদ্ধ মধুসূদনের দেখা হওয়ায় অসম্ভব হয় না। অতএব ২০ বৎসরের গদাধরের সহিত ৯৫ বৎসরের মধুসূদনের দেখা হইলে মধুসূদনের জন্ম ১৫২৯ খৃষ্টাব্দ হয়।

৭। ১৫২০—১৫৯৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অপ্পয় দীক্ষিতকে মধুসূদন প্রবীণ বলিয়া মান্য করিলে মধুসূদনের জন্মকাল ১৫২০ খৃষ্টাব্দের পর বলিতে হয়, আর তজ্জন্ত ১৫২৩।২৫ মধুসূদনের জন্ম ধরিলে কোন বাধা হয় না।

এক্ষেত্রে যদি ধরা যায় মধুসূদন ১৫২৫।৩০ হইতে ১৬৩২।৩৭ খৃষ্টাব্দ জীবিত ছিলেন, তাহা হইলে বিশেষ কোন বাধা ঘটে না। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সিদ্ধান্তবিন্দুর নকলও সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং মধুসূদন ১০৭ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। আর তাহা হইলে **১৫২৫।৩০ হইতে ১৬৩২।৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাহার জীবিতকাল।**

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে—মধুসূদনের সময় ভারতে প্রধানতঃ কাশীধামে ও নবদ্বীপে মহামান্য পণ্ডিতবর্গ চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। এ সময় সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা, ব্যাকরণ, তন্ত্র, জ্যোতিষ প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রের পূর্ণপ্রচার। দার্শনিকচিন্তার সাহায্যে সকল সম্প্রদায়ই নিজ নিজ মতের সূক্ষ্মতা ও উৎকর্ষসাধন করিতেছেন। ভারত মুসলমানের অধীন হইয়াও স্বধর্ম্মানুরাগের ফলে নিজের অক্ষয় বিশেষত্বে জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানই ছিল। এ সময় বেদান্ত সম্প্রদায়ের পণ্ডিতবর্গের নাম ও তাঁহাদের গ্রন্থাদি এই গ্রন্থের কিছু পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে।

গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তির জন্য গ্রন্থকার-পরিচয়।

মধুসূদনের জীবনচরিত।

গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তির জন্য গ্রন্থপরিচয়ের পর গ্রন্থকারের পরিচয় আবশ্যক। এজন্য গ্রন্থকারের আবির্ভাবকাল আলোচিত হইয়াছে, এক্ষণে গ্রন্থকারের জীবনচরিত আলোচিত হইতেছে।

কিন্তু গ্রন্থকারের আবির্ভাবকালের ন্যায় তাঁহার জীবন চরিত্রের বিষয়ও নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানিবার কোন উপায় নাই। কারণ, যাহা আছে তাহা প্রবাদ মাত্র। প্রবাদে সংশয়ের স্থান অধিকই হয়। বস্তুতঃ, এ পর্য্যন্ত গ্রন্থকারের সমসাময়িক কেহই গ্রন্থকারের কোন জীবনচরিত্র লেখেন নাই বা প্রসঙ্গক্রমে কোন গ্রন্থমধ্যেও কোন কথাবহ উল্লেখ করেন নাই। অগত্যা তাঁহার জীবনচরিত্র সঙ্কলন করিবার জন্য আমাদিগকে কতকগুলি প্রবাদেরই উপর নির্ভর করিতে হইবে।

জীবনচরিতের উপাদানবিচার।

অবশ্য প্রবাদ হইলেই যে সব ভুল হয়, তাহাও নহে, আর জীবনচরিত থাকিলেই যে তাহার সব কথাই ঠিক হয়, তাহাও নহে। প্রত্যেক ঐতিহাসিক ঘটনার সপক্ষকর্তৃক বিবরণ এবং বিপক্ষকর্তৃক বিবরণে পরস্পরবিরোধ বেশ স্পষ্টই লক্ষিত হয়। আর তজ্জন্য যে তাহা নির্ভুল নহে, তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হয়। অধিক কি, স্বরচিত আত্মচরিতেও যে এই দোষ থাকে না, তাহা নহে।

যাহা হউক, তাই বলিয়া যে প্রবাদ অপেক্ষা গ্রন্থের মূল্য কম, তাহাও বলা চলে না। আসল কথা—ঘটনার যথাযথ বর্ণনা অতি কঠিন কার্য্য, এবং অধিকাংশ স্থলেই বর্ণিত ঘটনাবলীর মধ্যে যথেষ্ট ভুলও থাকিয়া যায়। বিশেষতঃ, জীবনচরিতবর্ণনা তদপেক্ষা কঠিন কার্য্য। ইহাতে ভ্রম প্রমাদের সম্ভাবনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকই হয়। তবে, যে জীবনচরিতপাঠে পাঠকের উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়, আদর্শ উন্নত হয়, তাহাই

আদরণীয়, আর তাহা যদি সত্য ঘটনামূলক হয়, তাহা হইলে তাহা আরও ভাল। বোধ হয়—আমাদের মুনি ঋষি ও আচার্য্যগণ ঘটনার এইরূপ যথাযথ বর্ণনার কাঠিন্য বা অসম্ভাবনা অনুভব করিয়াই সে দিকে তত লক্ষ্যপ্রদান করেন নাই। তাঁহাদের লক্ষ্য সেই জীবনচরিত-সংক্রান্ত উপদেশের দিকে লক্ষ্য ছিল। এজন্য অনেকস্থলে উপাখ্যান সাহায্যে আদর্শপ্রদর্শনের চেষ্টা তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন।

আলোচ্য জীবনচরিতের উপাদান।

মধুসূদন দারপরিগ্রহ করেন নাই, বাল্যেই গৃহত্যাগ করেন এবং যৌবনেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁহার বংশধর কেহ নাই, এবং জ্ঞাতিগণও তাঁহার সংবাদ রাখিবার সুযোগ তত পান নাই। তবে তাঁহার ভ্রাতৃগণেরও বংশ বিদ্যমান এবং তাঁহাদের মধ্যে সুপণ্ডিতও আছেন। এস্থলে তাঁহাদের নিকট হইতে যাহা জানিতে পারা গেল এবং মধুসূদনের কর্ম্মক্ষেত্র কাশীধাম ও নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিত-বর্গের নিকট হইতে যাহা শুনা গেল, তাহাই লিপিবদ্ধ করা গেল। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়—কেহই এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ নহেন। যে সমস্ত প্রাচীন পণ্ডিতগণ অপেক্ষাকৃত অধিক সংবাদ রাখিতেন, তাঁহারা আর ইহ জগতে নাই, এবং তাঁহাদের নিকট যে সব বংশপরিচয় পত্রাদি ছিল, তাহাও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাঁহার জন্য বঙ্গদেশ গৌরবান্বিত, অধিক কি, সমগ্র ভারতবাসীরই মুখ উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার জীবনচরিত আজ বিলুপ্ত—ইহা মনে হইলে দুঃখের মাত্রা যারপরনাই বৰ্দ্ধিতই হয়। যাহা হউক, এক্ষণে তাঁহার জীবনবৃত্ত, তাঁহার জ্ঞাতিবংশধরগণের নিকট হইতে এবং তাঁহার শিষ্যসেবকসম্প্রদায়ের নিকট হইতে যাহা জানিতে পারা গেল, তাহাই এস্থলে সঙ্কলিত করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইল। *

* এই জীবনচরিতের প্রধান উপকরণ আমাকে প্রথমতঃ মধুসূদনের ভ্রাতৃবংশের-

মধুসূদনের জন্মভূমি।

কলিকলুষনাশিনী পুণ্যসলিলা ভাগীরথী সাগরসঙ্গমার্থ উদ্যত হইয়া বঙ্গদেশে আসিয়া যেখানে বহু বাহু বিস্তার করিয়া প্রবাহিতা, সেই ত্রিকোণাকার নদীবহুল বিস্তৃত সমতল ভূখণ্ডের মধ্যে প্রাচীন বিক্রমপুরের অংশবিশেষে, বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়া পরগণার অন্তঃপাতী উনসিয়া গ্রাম। এই উনসিয়া গ্রামেই মহাযতি ৺মধুসূদনের জন্ম হয়। ফরিদপুর জেলার উত্তরে গঙ্গার অংশবিশেষ পদ্মানদী। উহা দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে কিয়দ্দূর প্রবাহিতা হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গে মিশিয়া যমুনা নাম ধারণ করিয়াছে এবং তৎপরে সেই যমুনা দক্ষিণাভিমুখে কিয়দ্দূর গমন করিয়া ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া মেঘনা নদীর সহিত মিশিয়া মেঘনা নাম ধারণ করিয়া আরও দক্ষিণে যাইয়া সাগরে মিলিত হইয়াছে এবং ফরিদপুর ও তাহার দক্ষিণে অবস্থিত বাখরগঞ্জ জেলার পূর্ব্বসীমা হইয়াছে। আর এই বাখরগঞ্জ জেলার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জেলার পশ্চিমসীমা মধুমতী নদী। ইহা, পদ্মানদী যেখানে ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহার কিছু পশ্চিমে পদ্মানদী হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণবাহিনী হইয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে। মধুমতীর পশ্চিমে যশোহর ও খুলনা জেলা অবস্থিত। আর তাহার পশ্চিমে ২৪ পরগণা জেলা এবং ইংরাজ শাসিত ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী কলিকাতা। ফলতঃ, মধুসূদনের জন্মভূমি

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় একটী লিখিত প্রবন্ধাকারে প্রদান করেন। তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য, (কলিকাতা) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন, (কাশী) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এম, এ, (কলিকাতা) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী (কাশী) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রেশ চট্টোপাধ্যায় এম, এ (প্রয়াগ) আমাকে নানা বিষয়ে সাহায্য করেন। আবার অধ্যাপক স্বর্গীয় শ্রীধর শাস্ত্রী (কাশী) মহাশয় মধুসূদনের জীবনের কতকটী ঘটনা বলিয়াছিলেন।

যে ভূখণ্ডের অন্তর্গত, তাহার পশ্চিম, উত্তর এবং পূর্ব্বদিকে গঙ্গা ও তাহার শাখা বিভিন্ন নামে অবস্থিত এবং দক্ষিণে সাগর। এই স্থানটী পূর্ব্বে সাগর গর্ভে নিহিত ছিল, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি কয়েকটী নদ নদীর দ্বারা আনীত মৃত্তিকারাশি সঞ্চিত হইয়া ইহা কয়েক সহস্রবৎসর পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছে। এজন্য ইহাতে জমির উর্ব্বরতা শক্তি যেমনই অধিক, তেমনই দৃশ্যে নূতনত্বও যথেষ্ট।

কোটালিপাড়ার অন্তর্গত গ্রামগুলিতেও এই নূতনত্ব বর্ত্তমান। কারণ, এই গ্রামগুলি প্রায়ই বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রে পরিবেষ্টিত। এই ক্ষেত্রগুলি বর্ষার পরও কয়েক মাস পর্য্যন্ত জলমগ্ন থাকে। জল এতই অধিক হয় যে নৌকা ভিন্ন তথায় গমনাগমন অসম্ভব হয়। বর্ষার জল যতই সহসা বৃদ্ধি পাউক না, ধান্য বৃক্ষগুলি সেই জলের সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত হইয়া আত্মরক্ষা করে, অন্যদেশের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায় না। তাহার পর জলের শুভ্র বর্ণের সহিত ধান্য বৃক্ষের হরিদ্ বর্ণ মিলিত হইয়া প্রকৃতি দেবীর এক অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করে। গ্রামগুলি প্রায়ই ঘনসন্নিবিষ্ট সুদীর্ঘ বেত্র ও বংশ বৃক্ষের দ্বারা যেন সংগোপিত, দূর হইতে গ্রামের গৃহরাজি লক্ষিত হয়। বর্ষার সময় কৃষিক্ষেত্রগুলি জলমগ্ন হয় বলিয়া প্রত্যেক গ্রামটী একটী দ্বীপবিশেষে পরিণত হয়। এক বাটী হইতে অপর বাটীতে, যাইবার কালে নৌকা বা ডোঙ্গা প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক হয়। অনেক গ্রামে প্রধান পথই খাল। গ্রামমধ্যে আম, কাঁঠাল, গুপারি, নারিকেল, জাম, খেজুর, তাল, তেঁতুল ও আমড়া প্রভৃতি ফলবৃক্ষ প্রচুর। জবা, টগর, অপরাজিতা, পদ্ম, শেফালিকা, চাঁপা, কামিনী প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষ যথেষ্ট। প্রতিগ্রামে পুষ্করিণী ও তড়াগাদি প্রচুর। ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামে এই সব ফুল পুষ্করিণীতড়াগাদিতে পতিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। ঘনসন্নিবিষ্ট, সংলগ্নভাবে স্থাপিত বহুসংখ্যক বাটী ও তাহাদের পুষ্পোদ্যানাদি লইয়া

এক একটী পল্লী হয়। আর তাহার একদিকে খাল। কখন বা দুই তিন চারিদিকেই খাল। খাল হইতে একটী বাস্তুতে উঠিয়া অনেক সময় অপরের উদ্যানের ভিতর দিয়া অপরের বাটীতে যাইতে হয়। সাধারণ পথ প্রায়ই নাই। অনেকস্থলে খালের তীর রাজপথ। অনেক গ্রামে এই খাল প্রায় নিত্যই জোয়ারের জলে পরিপূর্ণ হইয়া প্রত্যেক পল্লীকে এক একবার এক একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে পরিণত করিতেছে এবং গ্রামের আবর্জ্জনারাশি ভাসাইয়া লইয়া যাইয়া পল্লীগুলিকে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দিতেছে। গোচারণভূমি বা বালকবালিকাগণের ক্রীড়াভূমি অতি অল্প। অনেক সময় অবস্থাপন্ন গৃহস্থের গৃহের সম্মুখে প্রশস্ত ভূমিই গ্রামে উন্মুক্ত আকাশের অভাব দূর করিয়া থাকে। পাকা কোঠাবাড়ী অতি অল্প। সুদৃশ্য প্রশস্ত চালা ঘরই প্রায় সব। এই সব ঘরের দেয়ালগুলি ছাঁচাবাঁশের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। মৃত্তিকার দেওয়াল নাই। প্রতি গৃহই কৃষিজাত দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ। ধানের গোলা, বিচুলির গাদা, গোশালা, সকল গৃহেই আসে পাশে বিদ্যমান। কোটালিপাড়া পরগণার মধ্যে এইরূপ গ্রামই প্রচুর। উনসিয়াগ্রাম তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

মধুসূদনচরিত্রে জন্মভূমির প্রভাব।

বাস্তবিকপক্ষে মধুসূদনের জন্মভূমির এইরূপ প্রকৃতি দেখিলে আমাদের অনেক কথাই মনে উদয় হয়। মনে হয়—এরূপ দেশ না হইলে মধুসূদনের মত ব্যক্তির জন্ম হইবে কেন? উর্ব্বরা নূতন ভূমি হইলে তাহাতে যেমন শস্যাদি অধিক ও উৎকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ সেখানকার মানব মনেরও অত্যধিক উৎকর্ষ হইবার কথা। মধুসূদনের মানসক্ষেত্রে বেদান্তবিদ্যা যে জ্ঞানফল প্রসব করিয়াছে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও অধিকই হইয়াছে। এদেশে মানবের জীবনধারণের প্রধান খাদ্য যে ধান্য, সেই ধান্য যতই কেন বৃষ্টির জল বৃদ্ধি হউক না, তাহা যেমন সেই

জলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত হইয়া জলের উপরে থাকিয়া আত্মরক্ষা করে, এবং দেশবাসীর জীবনধারণে সহায়তা করে, তদ্রূপ মানবের প্রধানতম অভীষ্ট যে অদ্বৈতবেদান্তসিদ্ধান্ত, তাহা মধুসূদনের সম্পর্কে আসিয়া দ্বৈতবাদী ও নাস্তিক প্রভৃতির সকল প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বাধার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও বর্দ্ধিত হইয়া আত্মরক্ষা করিতেছে এবং জগজ্জনের জীবন সার্থক করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছে। মধুসূদন বেদান্তসম্বন্ধে যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা যে অনেকটা এ দেশের প্রকৃতির আনুকূল্যেই হইয়াছে, এবং এদেশের ধান্যাদির অনুরূপ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এদেশে মধুসূদনের জন্ম না হইলে, বোধ হয় মধুসূদন বেদান্তসিদ্ধান্তকে এ ভাবে রক্ষা ও পুষ্ট করিতে পারিতেন না।

মধুসূদনের সময় ভারতের রাজকীয় অবস্থা।

মধুসূদনের সময় ভারতের অবস্থা কিরূপ, তাহা দিল্লীশ্বর আকবর বাদসাহের সময় ভারতের অবস্থা চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। এ সময় ভারতবর্ষের অধিকাংশ দেশই মুসলমান রাজার করতলগত। কেবল দক্ষিণভারতে কতিপয় হিন্দুরাজ্য অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করিতেছিল। পশ্চিমবঙ্গ গৌড়দেশও মুসলমানগণদ্বারা আক্রান্ত। পূর্ব্ববঙ্গে যশোহরের মহারাজা প্রতাপাদিত্যের জন্ম হয় নাই। চন্দ্রদ্বীপে অর্থাৎ বর্ত্তমান বরিশালের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে এ সময় তৃতীয় রাজা কন্দর্পনারায়ণ রাজোপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

ইঁহার পূর্ব্বে এস্থানে দনুজমর্দ্দন হইতে পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহাদের পর ইঁহাদের দৌহিত্রসম্পর্কে বসুবংশীয় পরমানন্দ রায় হইতে অষ্টমপুরুষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই আট জনের নাম—১। পরমানন্দ রায়, ২। জগদানন্দ রায় ৩। কন্দর্পনারায়ণ রায়, ৪। রামচন্দ্র রায়, ৫। কীর্ত্তিনারায়ণ রায়, ৬। বাসুদেব

নারায়ণ রায়, ৭। প্রতাপনারায়ণ রায়, ৮। প্রেমনারায়ণ রায়। ইঁহাদের পর ইঁহাদের দৌহিত্রসূত্রে মিত্রবংশীয় উদয়নারায়ণ রায় হইতে ৬।৭ পুরুষ বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন।

রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় পর্য্যন্ত চন্দ্রদ্বীপের রাজগণ "বাখরগঞ্জের" নিকটবর্ত্তী "কচুয়া" নামক স্থানে বাস করিতেন। এই স্থানটী বর্ত্তমান "বাউকল" থানার অন্তর্গত। ইহার পর রাজা কন্দর্পনারায়ণ "বাসুরীকাঠী" নামক স্থানে রাজধানী নির্ম্মাণ করেন। ইহার কিছুদিন পরে "পঞ্চকরণ" নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী "হোসেনপুর" নামক স্থানে রাজধানী নির্ম্মিত হয়। ইহার পর "ক্ষুদ্রকাঠী" ও তৎপরে "মাধবপাশা" নামক স্থানে রাজধানী হয়। বর্ত্তমান রাজবংশীয়গণ এই স্থানেই বাস করিতেছেন। এই স্থানগুলি সবই বরিশাল জেলার অন্তর্গত। ইঁহারা বসুবংশীয় কায়স্থ। ইঁহারই পুত্র রামচন্দ্র রায় পরে যশোহরাধিপতি মহারাজা প্রতাপাদিত্যের কন্যাকে বিবাহ করেন। দিল্লীর সম্রাট আকবরের সেনাপতি ও শ্যালক মানসিংহ সম্প্রতিবিজিত বঙ্গদেশের সুবেদার বা শাসনকর্ত্তা। তাঁহার অধীনে কয়েকজন জমীদার বা ক্ষুদ্র রাজা এ সময় পূর্ব্ববঙ্গ প্রকৃত প্রস্তাবে শাসন করিতেছেন। এ সময় "বারভূইয়া" এই শাসন কর্ত্তাদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন।

দেশে সমাজের অবস্থা।

জাতিধর্ম্মনাশভয়ে ভীত ব্রাহ্মণগণ কান্যকুব্জ ছাড়িয়া পূর্ব্বে যে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন, পরে সেখানেও সেই উৎপাতভয়ে এই পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়াছিলেন। আজ কিন্তু এখানেও সেই জাতিধর্ম্ম নাশভয় উপস্থিত। বিবাহাদি যথাশাস্ত্র সম্পন্ন হইত। বিধবাবিবাহ ছিল না। পুরুষের বহু বিবাহ ছিল। ব্রাহ্মণমধ্যেও অনেকে মৎস্য ভক্ষণ করিতেন। ব্রাহ্মণাচারই সদাচারের আদর্শ ছিল। বঙ্গদেশ এখন নিতান্ত অনিশ্চিত শাসনের অধীন। হিন্দু রাজশক্তি নিবাহাদির নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায়

মিট মিট করিতেছে। তথাপি ব্রাহ্মণগণ অপর বর্ণ অপেক্ষা দৃঢ়ভাবে স্বধর্ম ও সদাচার ধরিয়া বসিয়া আছেন। যে কয়দিন সদাচার ও স্বধর্ম্মাচরণ সম্ভব হয়, সেই কয়দিনই তাঁহারা তাহা পূর্ণমাত্রায় অনুষ্ঠান করিবার জন্য কৃতসংকল্প। ইহাই হইল মধুসূদনের সময় দেশে সমাজের অবস্থা।

দেশে ধর্ম্মের অবস্থা।

এই সব ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মাচরণ এখন যাগযজ্ঞপ্রধান বৈদিক অনুষ্ঠান হইলেও পৌরাণিক ও তান্ত্রিক প্রভাব বর্জ্জিত নহে। শত্রুবিজয়ের পর যেমন শত্রুর ধনরত্ন স্বতঃই সংগৃহীত হয়, তদ্রূপ বিজিত বৌদ্ধভাবের যুক্তি, বিচার ও সদাচারাদি সেই বৈদিক আচারমধ্যে কিছু কিছু প্রবেশ লাভ করিয়াছে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ভক্তির বন্যাও ইহার উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতমতাবলম্বী আচার্য্যগণ অদ্বৈতবেদান্তের অক্ষুণ্ণ প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য বিশেষ-ভাবে যত্নবান্। তান্ত্রিক সম্প্রদায় এ সময় খুব প্রবল। সকল ধর্ম্মেরই নামে বহু দুষ্ট লোক অন্যায় আচরণে প্রবৃত্ত। ইহাই হইল মধুসূদনের সময় দেশে ধর্ম্মের অবস্থা। ভারতের এইরূপ অবস্থায় মহামতি মধুসূদন বঙ্গদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন।

মধুসূদনের বংশপরিচয়।

কান্যকুব্জে ম্লেচ্ছাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে বহু ব্রাহ্মণ বংশ বহুদিন হইতে দলবদ্ধ হইয়া সপরিবারে দেশত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকে প্রস্থান করিতে-ছিলেন। এই সময় মহারাজ গৌড়াধিপতি ও মিথিলাধীশ্বর প্রভৃতি প্রাচ্য ভূখণ্ডের হিন্দু নৃপতিবর্গ তাঁহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়া স্বরাজ্যে ভূসম্পত্তি প্রদানপূর্ব্বক বসবাসের ব্যবস্থা করিতেছেন। ১১৯৪ মতান্তরে ১২৭৮ খৃষ্টাব্দে কাশ্যপগোত্রীয় শ্রীরামমিশ্র অগ্নিহোত্রী সাহাবুদ্দিন ঘোরীর অত্যাচারে স্বধর্ম্মনাশভয়ে বহু আত্মীয়স্বজন সঙ্গে লইয়া বঙ্গদেশের অন্তর্গত নবদ্বীপে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং

ক্রমে কোটালিপাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হন। কেহ বলেন—রামমিশ্রের বংশধরগণ বঙ্গদেশের বিভিন্নস্থানে কিছুদিন বাস করিয়া এই কোটালিপাড়ায় আসিয়া বাস করেন। যাহা হউক, ক্রমে এই স্থানটী বিভিন্ন গোত্রীয় বৈদিক ব্রাহ্মণগণের আবাসভূমিতে পরিণত হয় এবং কালক্রমে এইস্থানে বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর্গের আবির্ভাব হয়।

শ্রীরামমিশ্রের আগমন সম্বন্ধে লক্ষণ বাচস্পতিকৃত পাশ্চাত্যকুল সংহিতায় আছে—

অশেষষড়্দর্শনদর্শনাত্মা যশোদয়ালঙ্কৃতমূর্ত্তিরেকঃ।
জিতেন্দ্রিয়ঃ কাশ্যপবংশদীপঃ শ্রীরামমিশ্রেতি সমাখ্যবিপ্রঃ ॥৬০ পৃঃ
তৎ কান্যকুব্জং পরিহায় বিপ্রাঃ তদা নবদ্বীপসমীপদেশে।
গ্রামেষ্বনেকেষু পরম্পরং তে সম্বন্ধবদ্ধাঃ স্ম বসন্তি সর্ব্বে ॥৬৪ পৃঃ

এই শ্রীরামমিশ্রের বংশপরম্পরা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত "ব্রাহ্মণকাণ্ড ২য় ভাগ ১৫৮ পৃষ্ঠায় যেরূপ আছে তাহার উপর কিঞ্চিৎ সংযোজিত করিয়া যেরূপ হইয়াছে তাহাই নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

মধুসূদন প্রমোদন পুরন্দরের পুত্র নহেন কিন্তু ভ্রাতা এরূপ মতও আছে। একথা উক্ত ব্রাহ্মণকাণ্ড ৩য় অংশ ৬৯ পৃষ্ঠায় উক্ত হইতে দেখা যায়। কিন্তু ইহা মধুসূদনের জ্ঞাতিবংশসম্ভূত পণ্ডিতবর্গ স্বীকার করেন না। পণ্ডিত শ্রীসীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ ইহা লিখিয়া দিয়াছেন। পক্ষান্তরে মধুসূদন যে পুরন্দরের ভ্রাতা, তদ্বিষয়ে রাঘবেন্দ্র কবিশেখরকৃত কুলপঞ্জিকাতে কয়েকটী শ্লোক দেখা যায়—

শ্রীরামমিশ্রান্বয়সম্ভবো যঃ পুরন্দরাচার্য্য ইতি প্রসিদ্ধঃ।

• • • •

এই পুষ্করিণী ব্যতীত কোটালিপাড়া গ্রামে পুরন্দরকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক কালীমাতা বিরাজমানা। এখনও ইঁহার যথাবিধি পূজাদি চলিয়া আসিতেছে। দক্ষিণদেশীয় কতিপয় ব্যক্তি এই মধুসূদনকে দক্ষিণ-দেশীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই সব দেখিলে তাহা যে নিরতিশয় আগ্রহের ফল, তাহাতে কোন সন্দেহ হয় না। মধুসূদনের বংশে এখনও যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারা ন্যায়াদি শাস্ত্রে দেশের মধ্যে প্রধান পণ্ডিত বলিয়াই সম্মানিত হইতেছেন। মধুসূদন যেমন মহান্ তাঁহার বংশও তদুপযোগী যে মহান্ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মধুসূদনের জন্ম।

মধুসূদনের সময়নির্ণয় উপলক্ষে আমরা দেখিয়াছি তিনি ১৫২৫।৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৩২।৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। সুতরাং ১৫২৫ খৃষ্টাব্দের সন্নিহিত সময়ে পণ্ডিত শ্রীপ্রমোদন পুরন্দরাচার্য্যের তৃতীয় বা চতুর্থ পুত্ররূপে মধুসূদন জন্মগ্রহণ করেন—ইহাই বলিতে হইবে। তাঁহার জন্ম শকাব্দ মাস তিথি বার প্রভৃতি কিছুই আজ আর জানিবার উপায় নাই। তাঁহার জননী ও মাতুল প্রভৃতি কে ছিলেন, তাহারও কোন স্থানে কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং কল্পনাবলে বলিতে ইচ্ছা হয়—শুভগ্রহের শুভযোগে কোন শুভদিনে শুভলগ্নে মহামতি মধুসূদন কোটালিপাড়ার অন্তর্গত "উনশিয়া" গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মহাপুরুষ বা মহাত্মা ব্যক্তি কখনও কোন কুগ্রহযোগে অদিনে অসময়ে জন্মগ্রহণ করেন না। যেহেতু জ্যোতিষশাস্ত্র ইহার ভূরি ভূরি সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে।

মধুসূদনের শৈশব।

শুনা যায়—মধুসূদন শৈশব হইতেই অতি তীক্ষ্ণধী বলিয়া পরিচিত হন। তাঁহার ক্রীড়া ও কৌতুকাদি সকল কার্য্যেই তাঁহার অসাধারণ

অবসর কমিয়া যাইতে লাগিল। মধুসূদনের মহত্ত্বলাভের পথ প্রশস্ত হইতে লাগিল।

মধুসূদনের বৈরাগ্যের উপলক্ষ্য।

মধুসূদনের পিতা প্রমোদন পুরন্দরাচার্য্যের যাহা কিছু ভূসম্পত্তি ছিল, তাহা চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্পনারায়ণের রাজত্বের অন্তর্গত ছিল। সুতরাং ভূমির কর কন্দর্পনারায়ণকেই দিতে হইত। পুরন্দরের ভূমিতে অনেক আম্রবৃক্ষ ছিল। এজন্য পুরন্দরের সুবিধার জন্য রাজা কররূপে ধান্য বা অর্থ গ্রহণ না করিয়া আম্রফলই গ্রহণ করিতেন। আর তাহা রাজা পণ্ডিতসম্প্রদায়ানুরাগী ছিলেন বলিয়া পুরন্দরাচার্য্যকে স্বয়ং নৌকা-যোগে রাজসরকারে পঁহুছাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কারণ, এই উপলক্ষ্যে রাজার বিদ্বৎসঙ্গলাভ হইত। কিন্তু পুরন্দরের বয়সাধিক্যবশতঃ এবং গ্রামে অধ্যাপনাকার্য্য বৃদ্ধি পাইতে থাকায়, তাঁহার পক্ষে স্বয়ং যাইয়া কর প্রদান করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। পুরন্দর ভাবিতে লাগিলেন—এমন কি কৌশল করা যায়, যাহাতে রাজকরটী আর স্বয়ং না যাইয়া দিতে হয়।

এদিকে পুত্র মধুসূদন তখন প্রায় দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন, এবং কবিত্বের জন্য বেশ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। ওদিকে রাজা কন্দর্পনারায়ণও বেশ পণ্ডিতানুরাগী। কোন পণ্ডিত তাঁহার নিকট যাইয়া নিজের বিদ্যাবত্তা প্রকাশ করিলে তিনি পরম সন্তোষলাভ করেন এবং যথোচিত পুরস্কার-পারিতোষিকও প্রদান করেন। বিদ্যোৎসাহ দানে রাজা মুক্তহস্ত। পুরন্দর ভাবিলেন—এইবার রাজকর দিবার সময় মধুসূদনকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন। পুত্র রাজাকে কবিতা শুনাইয়া সন্তুষ্ট করিবেন, আর তিনি 'করদানকালে স্বয়ং না আসিয়া, স্থানীয় রাজপুরুষকে উহা অর্পণ করিবেন'—এইরূপ প্রার্থনা করিবেন। এরূপ হইলে রাজা আর বিমুখ হইতে পারিবেন না।

এই ভাবিয়া যথাসময়ে পুরন্দরাচার্য্য পুত্র মধুসূদনকে সঙ্গে লইয়া রাজকর দিতে চলিলেন। পুরন্দরাচার্য্য কয়েক নৌকা খাদ্র দ্রব্য-সম্ভারে পহুঁছাইয়া দিয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজাও যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। অতঃপর পরস্পর পরস্পরের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া নিজ নিজ আসন গ্রহণ করিলে পুরন্দর নিজ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন এবং পুত্রের কবিত্ব শুনিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

কি অশুভ মুহূর্ত্তেই পুরন্দর এই অনুরোধ করিলেন যে, রাজা কন্দর্প নারায়ণ, পুরন্দরের প্রার্থনা শুনিয়া মনে মনে কি ভাবিলেন। তিনি একেবারেই অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। পুরন্দর যতই অনুরোধ করেন, বিধাতার বিচিত্র বিধানে, রাজা ততই অসম্মতিপ্রকাশে দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে বলিলেন "এই সামান্য রাজকর দিবার উপলক্ষে বৎসরান্তে আপনার একবার দর্শন পাই, আপনি তাহাতেও বঞ্চিত করিতে চাহেন, তাহা কিন্তু হইবে না।"

পুরন্দর ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া সহাস্যবদনে রাজাকে পুত্রের কবিত্ব শুনিতে অনুরোধ করিলেন। রাজা ব্রাহ্মণের অনুরোধ উপেক্ষা করায় মলিনচিত্ত হইয়াছেন। তিনি বিপরীত ভাবিলেন। ভাবিলেন—পুরন্দর কৌশলে স্বকার্য্য উদ্ধার করিবেন—অতএব তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। তিনি বলিলেন—"আচ্ছা, সময়ান্তরে শুনিব"।

অগত্যা পুরন্দর পুত্রসহ রাজার অতিথিশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং পরদিন রাজার অবসর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ সময় এ দেশের রাজকীয় অবস্থাও অনুকূল নহে। মুসলমানগণ কন্দর্পনারায়ণের রাজ্য গ্রাস করিবার জন্য সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করিতেছেন। সুতরাং কন্দর্পনারায়ণের চিত্ত সর্ব্বদাই অপ্রসন্ন ও চিন্তাকুল থাকিত। আর তাহার ফলে রাজদর্শনের সুযোগ আর পুরন্দরের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না।

যাহা হউক, এইরূপে দুই একদিন অপেক্ষা করিয়া একদিন সুযোগ লাভ ঘটিল। মধুসূদন স্বরচিত কয়েকটী শ্লোক শুনাইলেন। রাজা বিক্ষিপ্তচিত্ত থাকায় কবিতার মাধুর্য্য পূর্ব্বের ন্যায় আর বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মৌখিক যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া আর একদিন দেখা করিতে বলিলেন।

পুরন্দর রাজার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া অতিথিশালায় আগমন-পূর্ব্বক অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যতই চেষ্টা করেন, রাজার সহিত সাক্ষাৎলাভ আর ঘটে না। কয়েক দিন পরে একবার সাক্ষাৎ পাইলেন, কিন্তু রাজার সহিত কথোপকথনের অবকাশ পাইলেন না।

মনস্বী মধুসূদন বালক হইলেও অন্তরে যথেষ্ট তেজস্বী ছিলেন। তিনি বিরক্ত হইয়া পিতাকে রাজপ্রসাদলাভচেষ্টায় বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। প্রবীণ পুরন্দর কিন্তু এখনও বিরক্তি-বোধ করেন নাই। তিনি রাজার সহিত পুনরায় দেখা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ভাগ্যক্রমে এ দিনও রাজার সময়াভাবে বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা হইল না। এইবার পুরন্দর দুঃখিত হইলেন, কিন্তু ক্ষমাগুণের আতি-শয্যবশতঃ ক্রুদ্ধ হইলেন না এবং গৃহে প্রত্যাগমনের সংকল্প করিলেন।

মধুসূদনের বৈরাগ্য।

পিতাপুত্র গৃহে ফিরিলেন। মধুসূদনের হৃদয়ে বিশেষ আঘাত লাগিল। তিনি ভাবিলেন—তিনি জীবনে আর কখন মনুষ্যের উপাসনা করিবেন না, এখন হইতে তিনি সর্ব্বান্তর্যামীর উপাসনা করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইবেন। পথিমধ্যেই মধুসূদন ধীরে ধীরে পিতাকে বলিলেন—"পিতঃ! আমি আর গৃহে ফিরিব না, আপনি গৃহে যাউন। আমি এবার ভগবানের উপাসনা করিব, আর মনুষ্যের উপাসনা করিব না। ইহা কেবল আমার অপমান নহে, ইহা আপনার

অপমান, ইহা ব্রাহ্মণপণ্ডিতের অপমান, ইহা বিদ্যাবত্তার অপমান, ইহা শাস্ত্রের অপমান, ইহা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অপমান। অপনার মুখে শুনিয়াছি ভক্তের ভার ভগবান বহন করেন, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন সেই ভক্ত হইতে পারি, আমি যেন ভগবানেরই উপাসনা করিতে সমর্থ হই।"

প্রবীণ পুরন্দর পুত্রের কথার কোন উত্তর দিলেন না। মধুসূদন বার বার সেই এক কথাই বলিতে লাগিলেন। তখন পুরন্দর বলিলেন —"বৎস! সত্যই বটে এক্ষেত্রে এইরূপই মনে হয়"।

মধুসূদন বলিলেন—"পিতঃ! আমি সত্য বলিতেছি, আমি আর গৃহে ফিরিব না। আপনি বাটী ফিরিয়া যাউন, আমি নবদ্বীপধামে সেই অবতারপুরুষের শরণ গ্রহণ করিব। আমি আর গৃহে থাকিব না।"

পুরন্দর পুত্রমুখে এই কথা বার বার শুনিয়া বলিলেন—"আচ্ছা! গৃহে চল, তোমার জননী রহিয়াছেন, সন্ন্যাস লইবার পূর্ব্বে তাঁহারও ত অনুমতি লওয়া আবশ্যক।" পুরন্দর রাজার নিকট বিফলমনোরথ হওয়ায় মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, সুতরাং পুত্রকে বুঝাইবার জন্য আর আগ্রহান্বিত হইলেন না। এই অবকাশে মধুসূদন পিতার চরণ ধরিয়া বলিলেন—"তবে পিতঃ! বলুন—আপনার সম্মতি আছে।" পুরন্দর ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন—"আচ্ছা তাহাই হইবে।"

পুত্রকে সন্ন্যাসে অনুমতি দিবার কালে পুরন্দরের অনেক কথাই মনে পড়িতেছিল। তিনি আরও কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন— "দেখ বৎস! প্রথমজীবনে আমার সন্ন্যাসী হইবার বড়ই বাসনা ছিল। কিন্তু এই বৃদ্ধবয়সেও আমার সে বাসনা পূর্ণ হইল না, আর তুমি এই অপগণ্ড বয়সে সন্ন্যাসী হইতে চলিলে। তা' তোমার শুভবাসনায় আমি বাধা দিতে চাহি না। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি—তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক।"

পিতার অনুমতি লাভ হইল, মধুসূদন মনে মনে সন্ন্যাসের জন্য এইবার দৃঢ়সংকল্প হইলেন এবং তাঁহার উদ্দেশ্য যাহাতে সিদ্ধ হয়, তজ্জন্য ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন।

কন্দর্পনারায়ণের রাজধানী হইতে উনসিয়া গ্রামে আসিতে দুই এক দিন সময় লাগে। যতই পথক্লেশ অনুভূত হয়, উদ্দেশ্যের বিফলতার দুঃখ তাহার সঙ্গে বিজড়িত হইয়া মধুসূদনের সন্ন্যাসসংকল্পকে ততই দৃঢ় করিতে লাগিল এবং পুরন্দরের হৃদয়ে মধুসূদনকে বাধাদান করিবার ইচ্ছা ততই ক্ষীণ করিতে লাগিল। ঘটনাবলী ভবিতব্যতার অনুকূলই চিরদিন হইয়া থাকে।

মধুসূদনের গৃহত্যাগ।

পুরন্দর ও মধুসূদন গৃহে আসিলেন। পুরন্দরের পরিবারবর্গ পিতা-পুত্রের বিষণ্ণভাব দেখিয়া প্রফুল্ল হইতে পারিলেন না। পরে পুরন্দরের মুখে সমুদায় বৃত্তান্ত শুনিয়া সকলেই দুঃখিত হইলেন।

মধুসূদন পিতার কথা শেষ হইতে না হইতেই জননীর চরণ ধরিয়া বলিলেন—"মা! আপনার চরণে আমার একটী ভিক্ষা আছে। আপনাকে উহা দিতেই হইবে।"

মধুসূদনের জননী মধুসূদনের মনোভাব বুঝিতে পারিলেন না। তিনি পুত্রের মিনতি দেখিয়া বলিলেন—"আচ্ছা দিব, বল কি হইয়াছে।"

তখন মধুসূদন বলিলেন—"মাত! আমি ভগবৎসেবা করিয়া জীবন ক্ষয় করিব—স্থির করিয়াছি। আমি শুনিয়াছি—নবদ্বীপে ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব হইয়াছে, আমি তাঁহারই শরণ গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া জীবনক্ষয় করিব। অতএব আপনি আমায় সন্ন্যাসে অনুমতি দিন। পিতৃদেব অনুমতি দিয়াছেন, এখন আপনার অনুমতি হইলেই আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারি।"

জননী পুত্রের কথা শুনিয়া অবাক্। পিতা অনুমতি দিয়াছেন শুনিয়া আরও বিস্মিত। কি বলিবেন—কিছুই ভাবিয়া পান না। দেখিতে দেখিতে অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল। তিনি গদ গদ কণ্ঠে পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"বৎস! কি হইয়াছে? কেন তোমার সহসা এই ভাবান্তর হইল?" এই বলিয়া জননী মধুসূদনকে বহু বুঝাইতে লাগিলেন।

কিন্তু মধুসূদন দৃঢ়সংকল্প, তিনি জননীকে সংসারের দুঃখময়তা এবং ভগবৎসেবাতেই সুখ—ইহা নানারূপে বুঝাইতে লাগিলেন এবং পরিশেষে বলিলেন—"মা! আপনার তিন জন কৃতি পুত্র বর্ত্তমান, আপনি আমার মায়া ত্যাগ করুন।" জননী পুত্রকে বুঝাইতে অসমর্থ হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

তখন পিতা পুরন্দর মধুসূদনের জননীকে সান্ত্বনা করিয়া পুত্রকে বলিলেন—"বৎস মধুসূদন! দেখ, জ্ঞান না হইলে সন্ন্যাস বৃথা। আচ্ছা, তুমি নবদ্বীপে যাও, সেখানে যথারীতি শাস্ত্রজ্ঞান অর্জ্জন কর, তৎপরে যদি উচিত বিবেচনা কর, যদি নিজেকে যোগ্য বিবেচনা কর ত সন্ন্যাস লইও। কিন্তু এখনই সন্ন্যাস লইও না। এখনও তুমি সন্ন্যাসের যোগ্য হও নাই"।

মধুসূদন বলিলেন—"আচ্ছা, তাহাই হইবে। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন—আমার যেন মনস্কামনা পূর্ণ হয়"।

জনক জননী উভয়েই মধুসূদনের মস্তকে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মধুসূদন পিতামাতার পদধূলি লইয়া অগ্রজগণের পদধূলি গ্রহণ করিলেন এবং সকলের আশীর্ব্বাদ লইয়া এক শুভদিনে নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন। *

---

* এস্থলে কেহ বলেন—মধুসূদন নবদ্বীপে পাঠ সমাপন করিয়া গৃহে যাইয়া চন্দ্রদ্বীপের রাজার নিকট প্রত্যাখ্যাত হন এবং তৎপরে কাশী যাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কিন্তু

মধুমতী নদী অতিক্রমে দৈবানুগ্রহ।

দ্বাদশবর্ষীয় বালক-মধুসূদন বাটী হইতে বহির্গত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। কয়েক দিনের পথ অতিক্রম করিবার পর তিনি প্রসিদ্ধ মধুমতী নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে পথে মধুসূদন আসিয়াছেন এ পথে মধুমতী অতিক্রমের কোন ব্যবস্থা নাই। মনের আবেগে বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছেন, কাহাকেও প্রসিদ্ধ পথের কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। নদীও স্রোতস্বতী মকরকুম্ভীরাদিসমাকুলা এবং অতীব দুস্তরা। যতদূর দৃষ্টি যাইল দেখিলেন নিকটে কোন লোকালয়ও নাই—কোন পারাপারের ব্যবস্থাও নাই। এইবার তিনি নিজেকে নিরুপায় ভাবিলেন। অগত্যা ভগবতী জাহ্নবীদেবীর শরণাপন্ন হইলেন। ভাবিলেন—যিনি ভবপারের কাণ্ডারী, তিনি কি শরণাগতকে এই ক্ষুদ্র নদী পার করিয়া দিবেন না ?

এই ভাবিয়া মধুসূদন অন্য চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া ভগবতী জাহ্নবী দেবীর মন্ত্রজপে প্রবৃত্ত হইলেন। "শরীর পতন কিংবা মন্ত্রের সাধন" এইভাবে মধুসূদন আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ভগবতীর ধ্যানজপে নিবিষ্টচিত্ত হইলেন। বালকের সরল প্রাণের কাতর ক্রন্দন বিশ্বজননী কতক্ষণ উপেক্ষা করিতে পারেন ? ধ্যাননিমীলিত মধুসূদনের মানসচক্ষে ভগবতী মধুসূদনকে দর্শনদান করিলেন। ভগবতী মধুসূদনকে বলিলেন—"বৎস ! বরগ্রহণ কর, আমি প্রসন্না হইয়াছি।",

মধুসূদন বলিলেন—"জননি। যদি সন্তুষ্টা হইয়া থাকেন, তবে কেবল এই ক্ষুদ্র নদী পার করিয়া দিলে কি হইবে ? যাহাতে এই ভবনদী পার হইতে পারি, আমাকে সেই পথে পরিচালিত করিতে হইবে। আর আপনি যে আপনার সন্তানের উপর প্রসন্না হইয়াছেন, তাহার নিদর্শন-

---

[illegible] বলিয়া ফেলিল [illegible]—ইহা স্বরূপত নহে। তিনি পিতার নিকট পাঠ- [illegible] তাহার নিকট উপস্থিত হন—ইহাই স্বরূপত।

স্বরূপ এই বর দিন, যেন আমাদের জ্ঞাতিকুলের কেহ এই নদীতে বিপন্ন না হয়"। বস্তুতঃ, আজ পর্য্যন্ত মধুসূদনের জ্ঞাতিকুলের কেহই এ নদীতে বিপন্ন হয় নাই বলিয়া শ্রুত হয়।

ভগবতী "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। মধুসূদনের যেন স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি তখন ভক্তির আবেগে গলদশ্রুনেত্রে ভগবতীর স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন।

দৈবানুগ্রহের অপার মাহাত্ম্য। দেখিতে দেখিতে একটী মৎস্যজীবী একটী নৌকা লইয়া মধুসূদনের সমীপে নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। মধুসূদনকে যোগাসনে একাকী উপবিষ্ট দেখিয়া ধীবর মধুসূদনকে জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁ গা, তুমি একাকী এই জনমানবহীন স্থানে বসিয়া আছ কেন? তুমি কি পারে যাইতে চাও"?

মধুসূদন তখন সাশ্রুনয়নে ভগবতীচরণে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন —"হাঁ, আমি নৌকার জন্য আজ কয়েক দিন এই স্থানেই বসিয়া রহিয়াছি। তুমি কি আমায় পার করিয়া দিবে? আমার কিন্তু এক কপর্দকও নাই"।

ভগবতীর কৃপায় মধুসূদনের আর কোথাও কোন কষ্ট নাই। নির্মল জলাশয়ের নিকটই মধুসূদনের পিপাসা পায়। ছায়াশূন্য পথে মধ্যাহ্ন-কালে যখন গমন করেন, তখন মেঘের উদয় হয়। ঘর্ম্মোদ্‌গম হইলে মৃদু সমীরণ প্রবাহিত হয়। যেখানে দিবাবসান হয়, সেই খানেই উত্তম আশ্রয় পান। মধুসূদনের পক্ষে আজ পঞ্চভূতই অনুকূল, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, কীট, পতঙ্গ সবই অনুকূল; দেবতাগণও অনুকূল। হিন্দুরাজা যাইয়া ম্লেচ্ছরাজা আসিতেছে, অরাজকতায় দেশ প্লাবিত, দস্যুতস্করে পরিপূর্ণ, কিন্তু কেহই মধুসূদনের প্রতিকূল নহে। মধুসূদন যেন বিলাসিগণের উদ্যানমধ্যে পাদচরণসুখ অনুভব করিতে করিতে বিনা ক্লেশে নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দৈবানুগ্রহের এমনই প্রভাব! বৃন্দাবনের গোপিনীগণের কৃষ্ণলাভ কাত্যায়নীর বরেই ঘটিয়াছিল।

নবদ্বীপে মধুসূদন।

মধুসূদন নবদ্বীপে আসিয়া শুনিলেন—ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য জগন্নাথ-ধামে অবস্থিতি করিতেছেন। সুতরাং মধুসূদন বড় আশায় হতাশ হইলেন। তথাপি তিনি জিজ্ঞাসা করিতে করিতে মহাপ্রভুর বাস-ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মহাপ্রভুর চরিত্রকথা শুনিতে শুনিতে হতাশের দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

নবদ্বীপে মহাপ্রভুর ভক্তগণ বালকের পরিচয় লইয়া তাঁহার পথ-শ্রান্তিবিদূরণের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তাঁহার এখন ভাবনা—অতঃপর তিনি কি করিবেন? মধুসূদন এইবার তাঁহার কর্তব্যচিন্তায় ব্যাকুল। দ্বাদশ বৎসরের বালক পিতামাতা ছাড়িয়া এতদূরে এত ক্লেশ করিয়া আসিয়া অভীষ্টলাভে বঞ্চিত হইয়াছেন—তাঁহার মস্তকে যেন পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

কিন্তু পবিত্রবংশসম্ভূত বালকের হৃদয়ে বৈরাগ্য উদয় হইলে—পবিত্রব্যক্তির হৃদয়ে সংসারে বিতৃষ্ণা জন্মিলে, বিঘ্নের উপর তাঁহার

অনাস্থা জন্মে না। কুলগত শুভসংস্কার, বংশগত সৎপ্রবৃত্তি কখনও তাঁহার বিলুপ্ত হয় না। অধিকন্তু পিতৃবাক্য তাঁহার স্মরণ আছে। পিতারও আদেশ—বিদ্যার্জ্জনের পর সন্ন্যাস গ্রহণ করা; সুতরাং মধুসূদন সংসারসুখভোগবাঞ্ছা ত্যাগ করিলেও—ভগবদ্‌ভজনে জীবনক্ষয় করিবার সংকল্প করিলেও—জ্ঞানপিপাসা তাঁহার নিবৃত্ত হয় নাই। জ্ঞানার্জ্জনের প্রবৃত্তি তাঁহার বিলুপ্ত হয় নাই।

ওদিকে এই সময় নবদ্বীপে নব্যন্যায়ের নূতন চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের সকল স্থানের বিদ্যার্থিবৃন্দ এখন আর মিথিলায় গমন করেন না। এখন মিথিলাবাসী বিদ্যার্থিগণ ন্যায় পড়িবার জন্য নবদ্বীপেই আগমন করিতে আরম্ভ করিতেছেন। ন্যায়বিদ্যাচর্চ্চার উন্মাদনায় এখন নবদ্বীপ যেন প্লাবিত। ওদিকে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব জগন্নাথধামে অবস্থিতি করায় তাঁহার প্রবর্ত্তিত ভক্তির স্রোত এখন কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছে। সুতরাং মধুসূদনের ইচ্ছা হইল—যে-কোনরূপে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইবে।

মথুরানাথের শিষ্যত্বগ্রহণ।

মহত্তের আকর্ষণ মহত্তের প্রতিই হয়। কারণ, ব্যক্তিমাত্রই সজাতির সহিত মিলিতে চাহে। সুতরাং মধুসূদনের ইচ্ছা হইল—নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িকের নিকটে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন।

এখন নবদ্বীপে প্রধান নৈয়ায়িক কে—ইহা অন্বেষণ করিতে করিতে মধুসূদন শুনিলেন—পণ্ডিত মথুরানাথই এখন সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক। মহামতি রঘুনাথের পরই মথুরানাথ এখন নবদ্বীপ উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছেন। মথুরানাথের সমকক্ষ আর কেহ নাই।

মথুরানাথের বাসভবন খুঁজিয়া বাহির করিতে মধুসূদনের আর বিলম্ব হইল না। মথুরানাথকে জানে না নবদ্বীপে এমন কে আছে? যাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, সেই মথুরানাথের টোল দেখাইয়া দেয়।

মধুসূদন সেই দিনই মথুরানাথের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন—তেজঃপুঞ্জকলেবর তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রৌঢ়বয়স্ক একজন অধ্যাপক বহু ছাত্রবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়া পুস্তকস্তূপের মধ্যে বসিয়া গম্ভীর স্বরে শাস্ত্রোপদেশ করিতেছেন। সুতরাং মথুরানাথ কে, তাহা আর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল না।

মধুসূদন মথুরানাথের সমীপে আসিয়া চরণ স্পর্শপূর্ব্বক ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। মথুরানাথ, মধুরমূর্ত্তি কমনীয়কান্তি ভগবতীর কৃপা-প্রাপ্ত বালক-মধুসূদনকে দেখিয়া আকৃষ্ট হইলেন। তিনি মধুসূদনের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত হইলেন এবং অতি মিষ্টভাবে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

মধুসূদন নিজ বাসভূমির ও অতি সম্ভ্রমের সহিত পিতৃদেবের নাম-গ্রহণপূর্ব্বক আত্মপরিচয় দিলেন ও বিদ্যার্জ্জনের বাসনা জ্ঞাপন করিলেন। তখন মথুরানাথ মধুসূদনকে বসিতে আদেশ করিয়া, মধুসূদন কতদূর কি কি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন—জিজ্ঞাসা করিলেন।

মধুসূদন তখন সদ্যঃ সদ্যঃ কয়েকটী শ্লোক রচনা করিয়া অতি বিনীত-ভাবে নিজ অধীত গ্রন্থাদির নাম করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজ বুদ্ধি-কৌশলেরও পরিচয় দিলেন।

মথুরানাথ, একটী দশ বারো বৎসরের বালকের এই আশ্চর্য্য কবিত্ব-শক্তি ও বিনয়মিশ্রিত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন—"বেশ! তুমি থাক, আমার নিকটেই অধ্যয়ন করিবে"। অপর বিদ্যার্থিগণ, মথুরানাথ একটী নবাগত বালককে স্বয়ং পড়াইবেন শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বালকের মুখের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি করিলেন। কারণ, প্রায় সকল টোলের রীতিই এই যে, প্রথমশিক্ষার্থী বা বালককে শিক্ষা দিবার ভার প্রধান বিদ্যার্থিগণের উপরই ন্যস্ত করা হয়। সকলেই মধুসূদনের মধুরমূর্ত্তি দেখিয়া ঈর্ষা করা দূরে থাকুক,

নাই। এত সহজে মধুসূদনকে গৃহত্যাগে অনুমতি দেওয়ায় আত্মীয়স্বজন সকলেই মধুসূদনের পিতামাতাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন।

যতই দিন যাইতে লাগিল মধুসূদনের অদর্শন, মধুসূদনের জ্যেষ্ঠ যাদবানন্দের বড়ই অসহনীয় হইতে লাগিল। যাদবানন্দও পিতা পুরন্দরাচার্য্যের নিকট মধুসূদনের সঙ্গেই শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন। সুতরাং যাদবানন্দের কষ্ট অন্যদিক্ দিয়াও হইতে লাগিল। তিনি নবদ্বীপে যাইয়া মধুসূদনকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য পিতৃদেবের অনুমতি ভিক্ষা করিলেন।

পিতা পুরন্দরাচার্য্য বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিয়াছেন; ভাবিলেন—মধুসূদনের বৈরাগ্য যেরূপ দৃঢ় দেখিয়াছি, তাহাতে সে মধুসূদনকে ফিরাইয়া আনিতে কি পারিবে? শেষকালে সেও না মধুসূদনের অনুগামী হয়।

মধুসূদনের জননী ভাবিলেন—যাদব কিছু বড় হইয়াছে, তাহার কথা মধুসূদন খুব শুনিত, সে এতদূর হইতে গিয়া অনুরোধ করিলে মধুসূদন কিছুতেই অসম্মত হইতে পারিবে না। বৃদ্ধ পিতামাতা এইরূপ অনেক ভাবিয়া শেষকালে যাদবকে নবদ্বীপ যাইতে অনুমতি দিলেন।

যাদব ধীরে ধীরে সেই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অন্বেষণ করিতে করিতে ক্রমে মথুরানাথের নিকট কনিষ্ঠ মধুসূদনকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন—মধুসূদন সন্ন্যাসী হন নাই, কিন্তু মথুরানাথের নিকটে একটী কক্ষ মধ্যে পাঠচিন্তায় নিমগ্ন। ভ্রাতা আসিয়া পার্শ্বে দণ্ডায়মান, তাহা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

নিজ আসন পরিত্যাগ করিয়া তাহাতে তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন।

বহুদিনের পর ভ্রাতাকে দেখিয়া বঙ্কস্পাবিগলিতনেত্রে যাদব মধুসূদনকে আলিঙ্গন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদনের চক্ষেও যেন জল আসিল। অবশেষে ভ্রাতৃদ্বয়ে অনেক আলাপের পর যাদব পিতা মাতার কাতরতার উল্লেখ করিয়া মধুসূদনকে গৃহে ফিরিবার প্রস্তাব করিলেন। বুদ্ধিমান মধুসূদন জ্যেষ্ঠের এই ভাবের মুখে প্রত্যাখ্যান করা অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া মৌন হইয়া রহিলেন। যাদব 'মৌনই সম্মতিলক্ষণ' মনে করিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন।

আহারান্তে বিশ্রামের পর যাদব মধুসূদনের পাঠাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। দেখিলেন—এই অল্প দিনেই মধুসূদনের বিশেষ পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। মধুসূদন আর সেই বালক-কবি মধুসূদন নাই। তিনি এখন একজন স্থির ধীর গম্ভীর সাবধানী নৈয়ায়িক হইয়া উঠিয়াছেন। যাদব, মধুসূদনের এই অভাবনীয় উন্নতি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং অবশেষে দুই ভাই মিলিয়া মথুরানাথের নিকট ন্যায়শাস্ত্রাধ্যয়নের সংকল্প করিলেন। যাদবের গৃহে প্রত্যাগমনবাসনা বিলুপ্ত হইল। যাদব মধুসূদনের সঙ্গী হইলেন। যিনি ভবিষ্যতে নিজের ভাবে ভারতের পণ্ডিতকুলকে চমকিত ও পরিচালিত করিবেন —জ্ঞানী সন্ন্যাসিবৃন্দেরও আদর্শস্থানীয় হইবেন, তিনি কি বন্ধু মায়া-মমতায় অভিভূত হইতে পারেন?

মধুসূদনের কীর্ত্তিবাসনা।

মধুসূদন অতি অসামান্য প্রতিভাবলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ন্যায়-শাস্ত্রের বহু গ্রন্থপাঠই সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ভগবতী যাঁহার পরিচালনা ভার লইয়াছেন, তাঁহার কি কোন কার্য্যে বিলম্ব হয়? ভগবতীর কৃপায় মধুসূদনের ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞান অচিরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল।

এখন ন্যায়ের সিদ্ধান্ত 'দ্বৈত' বলিয়া অর্থাৎ জীব জগৎ ঈশ্বর প্রভৃতি সবই ন্যায়মতে পৃথক্ পৃথক্ বস্তু বলিয়া এবং মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ভক্তিভাবেও তাহাই অনুকূল বলিয়া, আর সেই মহাপ্রভুর অবতার-কথাই প্রথম হইতে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল বলিয়া মধুসূদনের ইচ্ছা হইল—অপর সকল মত খণ্ডন করিয়া মহাপ্রভুরই মতে এমন একখানি অকাট্য দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন যে, তাহাই পণ্ডিতসমাজে সমাদৃত হইবে—তাহাই যথার্থ সত্য মত বলিয়া সকলের নিকট পরিগৃহীত হইবে।

অদ্বৈতমতখণ্ডনে স্পৃহা।

কিন্তু এ কার্য্য করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে শঙ্করের অদ্বৈতমতকে খণ্ডন করিতে হয়। কারণ, তাঁহার অদ্বৈতমতই দ্বৈতবাদের মহাবিরোধী এবং ভক্তিবাদেরও প্রতিকূল। অদ্বৈতমতে দ্বৈতপ্রপঞ্চ মায়িক, ভগবদ্-বিগ্রহও মায়িক, সুতরাং তাঁহার উপাসনাও মায়িক জগতের কার্য্য; সকলই ভ্রম, ভ্রমভিন্ন আর কিছুই নহে। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহা মহা আচার্য্যগণ এই অদ্বৈতবাদকে এতই সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন যে, সে ভিত্তিকে বিচলিত করিতে না পারিলে—সেই মতের যুক্তিজাল খণ্ডন করিতে না পারিলে—ভক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়। যেহেতু পরমতখণ্ডন করিয়াই স্বমতস্থাপন করা পণ্ডিতগণের রীতি। পরমতখণ্ডন না করিয়া স্বমতস্থাপন করিলে সে মতের মূল্য হয় না। অতএব এ কার্য্য করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে অদ্বৈতমতখণ্ডন আবশ্যক, আর তজ্জন্য তাহার পূর্ব্বে তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়া আবশ্যক।

মহামতি রঘুনাথ শিরোমণি শ্রীহর্ষের খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের টীকা প্রভৃতি করিয়া অদ্বৈতমতের প্রচার করিলেও তাহার সম্যক্ প্রচার সাধিত হয় নাই। বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য অদ্বৈতমতানুরাগী হইলেও মহাপ্রভুর শাসনে নীরব। আর প্রতিপক্ষের নিকটে কোন মত শিক্ষা করাও সঙ্গত নহে। অতএব অদ্বৈতমতের অভিজ্ঞতালাভের জন্য কোথায় যাইবেন, কি করিবেন—আজ ইহারই চিন্তায় মধুসূদন ব্যাকুল।

কাশী যাইবার সংকল্প।

"যখন অন্যগতি না থাকে তখন বারাণসীই গতি" যেন এই বাক্যের সার্থকতা সাধিত করিয়া মহামতি মধুসূদন অদ্বৈতবেদান্তবিদ্যার জন্য কাশীধামে যাইবার সংকল্প করিলেন। ভারতে অদ্বৈতবাদের কেন্দ্রস্থল বারাণসী। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ভারতের চতুঃপ্রান্তে চারিটী মঠ স্থাপিত করিয়া তাহাতে চারিজন শিষ্যকে অধিষ্ঠিত করিয়া অদ্বৈতমত প্রচারের সুব্যবস্থা করিলেও কাশীধামটীকে যেন ইহার কেন্দ্রস্থল করিয়া গিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, তিনি ইহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না করিলেও তিনি যাঁহার অবতার সেই ভগবান্ বিশ্বনাথই তাহা অদ্যাবধি করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব মধুসূদন অদ্বৈতবেদান্ত-বিদ্যার্জ্জনের জন্য কাশীই যাইবেন—ইহাই স্থির হইল। এজন্য মধুসূদন জ্যেষ্ঠ যাদবানন্দকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন—"দাদা! আপনার পাঠ এখনও শেষ হয় নাই। আপনি এখানে থাকুন, আমি শীঘ্র কাশী হইতে ফিরিয়া আসিতেছি।"

কাশীর পথে।

সিদ্ধসঙ্কল্পের সঙ্কল্প কি কখন অসিদ্ধ থাকে? বৈরাগী মধুসূদন কাশী যাত্রা করিলেন। কবিতার্কিকচূড়ামণি মধুসূদন অদ্বৈতমত-খণ্ডনার্থ অদ্বৈতমত শিক্ষা করিবার জন্য কাশীধামের উদ্দেশ্যে প্রস্থিত হইলেন। এ সময় দিল্লীর পাঠানরাজ শেরসাহপ্রস্তুত সেই মহারাজপথ কাশীগমনের পক্ষে প্রশস্ত পথ। বোধ হয়, মধুসূদন ক্রমে সেই পথ

ধরিয়া কাশী চলিলেন। তিনি ধীরে ধীরে নানা নদনদী অতিক্রম করিয়া নানা গ্রাম নগরী ও অরণ্যাদির মধ্য দিয়া অতীত রাষ্ট্রবিপ্লবের চিহ্ন দেখিতে দেখিতে কাশী-ক্ষেত্রের পূর্ব্বপারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কাশী আগমন।

ভাগীরথীর পরপার হইতে কাশীধামের দৃশ্য দেখিয়া কাহার না চিত্ত বিমোহিত হয়? এ দৃশ্য দেখিয়া ভক্ত মধুসূদনের মনে কি হইল, তাহা একবার কল্পনার চক্ষে দেখিবার চেষ্টা করা যাউক। কাশীর সেই ধ্বজপতাকা-সুশোভিত অভ্রভেদী মন্দিরচূড়াবাজি, সেই ঘনসন্নিবিষ্ট সুবৃহৎ অট্টালিকাসমূহ, সেই সুপ্রশস্ত অগণ্য প্রস্তরময় অতূর্দ্ধগামিনী সোপানশ্রেণী, সেই শুক্লাদ্বিতীয়ার চন্দ্রমার ন্যায় বক্রাকৃতি দিগন্তব্যাপী উন্নততীর কাশীক্ষেত্র, পুত্রকে ক্রোড়ে করিবার জন্য বাহুদ্বয়প্রসারণশীলা জননীর ন্যায়, মধুসূদনকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। কাশীক্ষেত্রের এই ভাবটী ভক্ত মধুসূদনকে খুব সম্ভবতঃ ভগবচ্চরণে নিমগ্নচিত্ত করিয়া তুলিল। বৃন্দাবনবিহারীর বংশীনূপুরধ্বনি বোধ হয় তাঁহার মানস-কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তাঁহার নবজলধর কান্তি তাঁহার মানস নয়নে প্রতিভাত হইল।

নৌকার পুল দিয়া, অথবা নৌকাযোগে, জানি না, কোনরূপে মধুসূদন পরপারে আসিলেন। মধুসূদন নিজবোধরূপ কাশীক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন। দেখিলেন—নির্ম্মলগঙ্গাসলিলগর্ভ হইতে সুপ্রশস্ত প্রস্তরময় সোপানশ্রেণী ক্রমাগত উচ্চ হইতে উচ্চে চলিয়া গিয়াছে। দলে দলে আবালবৃদ্ধবনিতা ভক্তিসহকারে গঙ্গাস্নান দান ও পূজাদি করিতেছে। কেহ বা মধুরকণ্ঠে দেবদেবীর স্তব পাঠ করিতেছে। কেহ বা যোগাসনে বসিয়া ধ্যাননিমগ্নচিত্ত। কোথায় বা শ্রাদ্ধাদি ও শান্তি স্বস্ত্যয়ন হইতেছে। কাশীমধ্যে প্রবেশ করিয়া দণ্ডীসন্ন্যাসীর দৃশ্য,

গৈরিকপতাকামণ্ডিত মঠ ও মন্দিরের দৃশ্য, মুহুর্মুহু গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল।

কথাপ্রসঙ্গে লোকমুখে সঙ্গে সঙ্গে ম্লেচ্ছ মোল্লাদিগের সন্ন্যাসিনিধন-কথাও শ্রবণ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসিগণের ভয়ব্যাকুল চিত্তভাবও পরিচয় লাভ করিলেন। কারণ, মুসলমানধর্ম্মে, মোল্লাগণের রাজদ্বারে বিচারের ব্যবস্থা নাই বলিয়া মোল্লাগণ এই সময় স্বধর্ম্মপ্রচারার্থ সন্ন্যাসিগণকে দেখিতে পাইলেই ঘাতককর্ত্তৃক ইতরজীবজন্তুবধের ন্যায় নিষ্ঠুরভাবে নিধন করিত। মধুসূদন শুনিলেন—গঙ্গাস্নানকালে প্রায়ই এই নিধনকার্য্য এতই ভীষণভাবে অনুষ্ঠিত হয় যে, অনেক সময় বহুদূর পর্য্যন্ত গঙ্গার জল রক্তবর্ণ ধারণ করে। ইহা শুনিয়া—মধুসূদন সাবহিত ব্যাকুলভাবে কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

কাশীর পণ্ডিতসমাজ।

কাশী এ সময় বহু ভুবনবিখ্যাত সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিতমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ। যাহাকে কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলীর কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহারই মুখে অগণ্য নাম শুনিতে পান। রামতীর্থ, উপেন্দ্রতীর্থ, নারায়ণভট্ট, মাধবসরস্বতী, নৃসিংহাশ্রম, অপ্পয়দীক্ষিত, জগন্নাথ আশ্রম, কৃষ্ণতীর্থ, বিশ্বেশ্বর সরস্বতী ইত্যাদি বহু নামই লোকমুখে শুনিতে লাগিলেন। সুতরাং মধুসূদনের চিন্তা হইল—তিনি কাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন, কাহাকে ছাড়িয়া কাহার নিকট গমন করিবেন। মধুসূদন একে একে প্রায় সকলের সঙ্গেই দেখা করিলেন। দেখিলেন—তাঁহার পক্ষে রামতীর্থই সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিবে। অগত্যা তিনি রামতীর্থের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্বগ্রহণের প্রস্তাব করিলেন।

রামতীর্থের শিষ্যত্বগ্রহণ।

মধুসূদনের অভিপ্রায় ছিল—অদ্বৈতসিদ্ধান্ত অবগত হইয়া তাঁহার

খণ্ডন করিয়া মহাপ্রভু চৈতন্যদেবপ্রবর্ত্তিত দ্বৈতবাদানুকূল ভক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য মধুসূদন রামতীর্থের নিকট যে আত্মপরিচয় প্রদান করেন, তাহাতে তাঁহার এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন না। কারণ, ঘরের সন্ধান দিয়া শত্রুর বলবৃদ্ধি করা কাহার ইচ্ছা হয়? রামতীর্থ মধুসূদনের সৌম্যমূর্ত্তি ও বিনীতভাব দেখিয়া যারপরনাই আকৃষ্ট হইলেন, এবং তাঁহার ন্যায়শাস্ত্রের অভিজ্ঞতা, কবিত্বশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া যারপরনাই সন্তুষ্টও হইলেন। রামতীর্থ বলিলেন—"বেশ হইয়াছে, তুমি আমার নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন কর, আমি তোমার মত বিদ্যার্থীই চাই।"

রামতীর্থের নিকট বেদান্তবিদ্যাভ্যাস।

সুসংযত, সদাচারী মধুসূদন বেদান্তাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। বুদ্ধিমান্, ভক্তিমান্ মধুসূদন বেদান্তানুশীলনে নিবিষ্টচিত্ত হইলেন। তৃষিত চাতকের জলপানের ন্যায়, ক্ষুৎপ্রপীড়িতের অন্নভক্ষণের ন্যায়, মধুসূদন বেদান্তবিদ্যা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠানভিন্ন, জীবনধারণার্থে ভিক্ষাগ্রহণাদিভিন্ন মধুসূদনের শাস্ত্রানুশীলন বন্ধ হয় না। আহারে, বিহারে, বিশ্রামে সকল অবস্থায় মধুসূদনের বেদান্তচিন্তা। বেদান্তচিন্তা আজ মধুসূদনের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। যাহার অনুশীলনে অপরের যত সময় লাগে, মধুসূদনের পক্ষে তাহার অর্দ্ধেক সময়ও লাগে না। অতি দুরূহ গ্রন্থও মধুসূদন অনায়াসে আয়ত্ত করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। প্রাচীন অপ্রচলিত গ্রন্থও মধুসূদন সাগ্রহে দেখিতে লাগিলেন। এক ন্যায়শাস্ত্র ভিন্ন মধুসূদন সকল শাস্ত্রই আলোচনা করিতে লাগিলেন। মধুসূদনের বিদ্যাভ্যাস দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইতে লাগিলেন। রামতীর্থ, মধুসূদনকে বিদ্যার্থিরূপে পাইয়া অপার আনন্দে বিভোর হইলেন।

মীমাংসক ও বেদান্তীর মধ্যে বিচার।

এই সময় কাশীধামে পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রায়ই মহা আড়ম্বরে শাস্ত্র-বিচার হইত। বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজ নিজ প্রাধান্যলাভের জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। পণ্ডিতসমাজ কাহারও কোন মত গ্রহণ না করিলে কেহ কোন নূতন মত প্রচারও করিতে পারিতেন না। অদ্বৈতবেদান্তিগণের মধ্যে নৃসিংহাশ্রম ও উপেন্দ্র সরস্বতীপ্রমুখ পণ্ডিতগণ খুব প্রবলপরাক্রান্ত বিচারমল্ল পণ্ডিত ছিলেন।

বেদান্তের শুদ্ধাদ্বৈতমতের প্রবর্ত্তক শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্য কিছু পূর্ব্বে এ সময় নিজ মতপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলে, উপেন্দ্র সরস্বতীপ্রমুখ পণ্ডিত-বর্গের নিকট বিশেষভাবে লাঞ্ছিত হইয়া কাশীধাম পরিত্যাগ করেন।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব এই সময়েই নিজমত প্রচার করিতে যাইলে অনেকেরই নিকট উপহসিত হইয়াছিলেন। পরে প্রকাশানন্দ নামক একজন দণ্ডীকে স্বদলভুক্ত করিয়া কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

এইরূপ সময়েই মীমাংসকপ্রধান শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী অপ্পয়দীক্ষিত নিজমত প্রচার করিতে যাইয়া অদ্বৈতবেদান্তী ভেদাধিক্কার-প্রণেতা নৃসিংহাশ্রমের নিকট বিচারে পরাজিত হইয়া অদ্বৈতমত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিছু করিতে পারিলেন না। উপেন্দ্র সরস্বতী ও নৃসিংহাশ্রম নিরুত্তর হইলেন। কাশীধামে এইরূপ বিচার প্রায়ই হইত, কিন্তু এই বিচারটী মধুসূদনের দৃষ্টি আরও প্রসারিত করিয়া দিল।

মাধবসরস্বতীর নিকট মীমাংসাবিদ্যাভ্যাস।

নব্যনৈয়ায়িকগণ মীমাংসকমতখণ্ডনে বিশেষ যত্নবান্। আর এই যত্নই তাঁহাদের প্রাধান্যের একটী হেতুও হইয়াছে। সাধারণ নব্যনৈয়ায়িকগণ এজন্য সুযোগ পাইলেই মীমাংসকমতের প্রতি উপেক্ষা ও কটাক্ষও প্রদর্শন করেন। কিন্তু এই ব্যাপারে মধুসূদন দেখিলেন—মীমাংসাশাস্ত্রজ্ঞান ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞানদ্বারা চরিতার্থ হইতে পারে না। তিনি ভাবিলেন—বেদান্তে রামতীর্থের ন্যায় মীমাংসাশাস্ত্রের জন্য কোন এক ধুরন্ধর পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করা আবশ্যক। কেবল ন্যায় ও বেদান্তদ্বারা মীমাংসাশাস্ত্রের রহস্য ও তাহার বিশেষত্ব অবগত হওয়া যায় না। অগত্যা তাঁহার ইচ্ছা হইল—এই নারায়ণ ভট্টের নিকট মীমাংসাশাস্ত্র আলোচনা করেন।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া মধুসূদন একদিন রামতীর্থের নিকট তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। রামতীর্থ বলিলেন—"খুব ভাল প্রস্তাব, তুমি তাঁহার নিকট যাও, এবং তাঁহাকে তোমার অভিপ্রায় নিবেদন কর।"

গুরুর আজ্ঞা পাইয়া মধুসূদন একদিন নারায়ণ ভট্টের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নিজ অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। নারায়ণ ভট্ট মধুসূদনের এই সদভিপ্রায়ের প্রশংসা করিয়া বলিলেন—"মধুসূদন! তুমি মাধব সরস্বতীর নিকট অধ্যয়ন কর। তিনি আমার সতীর্থ, এবং আমার পিতৃদেবের শিষ্য। তিনি অতি বিচক্ষণ, তুমি যেমন নৈয়ায়িক তিনিও তদ্রূপ নৈয়ায়িক। মীমাংসায় তিনি আমা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন। তোমরা উভয়ে নৈয়ায়িক বলিয়া তাঁহার নিকট

তোমার সুবিধা অধিক হইবে।" মধুসূদন ভাবিলেন—"মন্দ কথা নয়। ন্যায় ও মীমাংসা উভয় শাস্ত্রে পারদর্শী হইলে আমার পক্ষে সুবিধা।" যাহা হউক, মধুসূদন এখন হইতে মাধব সরস্বতীর নিকট মীমাংসা শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। মধুমক্ষিকার ন্যায় মধুসূদন নানা বিদ্বৎকুসুমের মধু সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

মাধবও মধুসূদনের আগ্রহ ও বিচারকুশলতা দেখিয়া মধুসূদনের জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ, এই মাধবের যত্নে মধুসূদন মীমাংসাসাম্রাজ্যের সকল ধনরত্নের সন্ধানই পাইলেন। আর ইহাতে তাঁহার এতই উপকার বোধ হইল যে, তিনি তাঁহার বহু স্বরচিত গ্রন্থে ইঁহাকে বিদ্যাগুরু বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন।

মধুসূদনের বিদ্যার্জ্জন।

মধুসূদন গুরুগণের নিকট হইতে বিদ্যাগ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না। তিনি তাঁহার ন্যায়শাস্ত্রপরিমার্জিত বুদ্ধির দ্বারা প্রথমতঃ পঠিত বিষয় পরিষ্কার করিয়া লইতেন, তৎপরে তাহার অনুভবের জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। আর এই জন্য তিনি সময় সময় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যাইতেন। ইহাতে ব্রহ্মবিদ্যার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সাধন—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তিনটীই উত্তমরূপে অভ্যস্ত হইতে লাগিল। রামতীর্থের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়নদ্বারা তাঁহার শ্রবণের কার্য্য পূর্ণ হইতে লাগিল, ন্যায়পরিমার্জ্জিত বুদ্ধিসহায়ে অধীতবিষয়ের পরিষ্কার-সাধনদ্বারা তাঁহার মননের কার্য্য পূর্ণ হইতে লাগিল, এবং সেই ন্যায়-পরিষ্কৃততত্ত্বের অনুভবের জন্য যত্ন করায় তাঁহার নিদিধ্যাসনের কার্য্য—সিদ্ধ হইতে লাগিল। এইরূপে মধুসূদন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের নিতান্ত অন্তরতম সাধনে নিবিষ্টচিত্ত হইলেন।

যাহার কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে, তাহার প্রবৃত্তিও থাকে। ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়দেশে থাকিয়া সকলকে সকল কার্য্য করাইলেও—জীবের

যথার্থ স্বাধীনতা না থাকিলেও—জীব মনে করে যে, তাহার স্বাধীনতা আছে। আর জীব এইরূপ মনে করে বলিয়াই—শাস্ত্র তাহাকে কর্ত্তব্য-কর্ম্মে বিধি দেয়, আর নিষিদ্ধকর্ম্মে নিষেধ করে; আর সেই জন্য তাহার প্রবৃত্তিনিবৃত্তিও হয়। দয়ার আধার ভগবান্ সকলকেই সর্ব্বদা পূর্ণ দয়াই করিতেছেন, তথাপি উক্ত কর্ত্তৃত্বাভিমানের জন্য আমাদিগকে প্রার্থী হইতে হয়। আর সেইজন্য প্রার্থী হইলেই তিনি তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন। ভগবান্ এইজন্য জীবের প্রার্থনার মধ্য দিয়া—প্রবৃত্তির মধ্য দিয়া—তাঁহার দয়া প্রকাশ করেন। নচেৎ তাঁহার দয়ায় কেহই বঞ্চিত নহে। মধুসূদন পূর্ব্বে মধুমতী নদী পার হইবার সময় ভগবতীর নিকট ভবপারের বর লইয়াছিলেন, আর আজ সেই বরানুযায়ী তিনি ব্রহ্মবিদ্যার প্রার্থী হইয়াছেন। সুতরাং মধুসূদনের ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সাধন আজ অক্ষুণ্ণভাবে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল, আজ তাঁহার এই সাধন প্রতিপদে সকল সাধনে পর্য্যবসিত হইতে লাগিল। কারণ, মধুসূদনের সাধনায় ভগবৎকৃপাও সহায় হইল। আর সাধনার সঙ্গে ভগবৎকৃপা সহায় থাকিলে সিদ্ধির কি বিলম্ব থাকে? মধুসূদনের ব্রহ্মবিদ্যা পূর্ণরূপেই অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।

গুরুশিষ্যের বিদ্যানন্দ।

রামতীর্থ অধ্যাপনাকালে মধুসূদনের সাধনলব্ধ এই ফল অনুভব করিলেন। গুরুশিষ্য এখন নিজ নিজ অনুভব মিলাইয়া শাস্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়েই উভয়ের দ্বারা উপকৃত হইতে লাগিলেন। গীতায়—

> মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
> কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥১০।৯॥
> তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
> দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥১০।১০॥

এই শ্লোকার্থ গুরুশিষ্যে সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্ত হইতে লাগিল। উভয়েই ভগবদ্ভাবে বিভোর।

নব্যন্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থ পাঠ করিয়া মধুসূদনের তত্ত্বজ্ঞানের কোন ত্রুটীই ছিল না। যাহা কিছু অল্পতা ছিল, তাহা আত্মজ্ঞানে, এবং তৎপরে সাধনসহায়ে তাহার প্রত্যক্ষীকরণে। তত্ত্বচিন্তামণি বাস্তবিকই চিন্তামণিসদৃশ! চিন্তামণি হস্তে ধারণ করিয়া যাহা চিন্তা করা যায়, তাহাই যেমন সিদ্ধ হয়, পূর্ণ হয়, আত্মা মহাবিদ্যার কৃপাপাত্র মহাশক্তি গঙ্গেশোপাধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থ পাঠ করিলেও তাহাই হয়। পাঠকের কিছুই আর জ্ঞাতব্য থাকে না। মধুসূদন এই তত্ত্বচিন্তামণিতে সমলঙ্কৃত হইয়া আজ আত্মতত্ত্বজ্ঞানের জন্য প্রয়াসী; সুতরাং তাঁহার নিকট আজ নির্মল আকাশে স্বয়ংজ্যোতিঃ সহস্রাংশুর উদয়।

মাত্রায় ভালবাসা হয় না। সে শরণাগতিতে, সে ভালবাসাতে কিছু না কিছু স্বার্থপরতা থাকিবে ইথাকিবে। "ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ঃ ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ঃ ভবতি।" এই শ্রুতিবাক্যের অর্থ—পতির জন্য পতি প্রিয় হয় না, কিন্তু নিজের জন্য পতি প্রিয় হয়। অতএব ভালবাসা আত্মাতেই হয়, আর সেই আত্মার সম্বন্ধে অপরেও হয়। সুতরাং প্রকৃত পূর্ণ ভালবাসা—ভগবান্‌কেই আত্মা বলিয়া জানিলে হয়, ভগবানের সহিত জীবের পূর্ণ অভেদজ্ঞানেই হয়। দ্বৈত সত্য হইলে অদ্বৈতব্রহ্মই সিদ্ধ হয় না। আর অদ্বৈতব্রহ্মই শ্রুতির উপদেশ। যুক্তিতর্ক অপেক্ষা শ্রুতিরই প্রামাণ্যই অধিক। ভগবদ্-বিগ্রহ মায়িক হইলে উপাসনা হয় না, একথা ভুল। মায়িক ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সবই, পিতামাতাও মায়িক, তাই বলিয়া কি তাঁহাদের প্রতি ভক্তি হয় না? যাহা হউক সকল দিক্ দেখিয়া এখন দেখিতেছি অদ্বৈতবাদই ঠিক্, দ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ কেহই ঠিক্ নহে। এইরূপে অদ্বৈতবাদের প্রকৃত রহস্য আজ মধুসূদনের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইল।

মধুসূদনের অনুতাপ।

পূর্ণজ্ঞানী মধুসূদন, অমিতবুদ্ধি মধুসূদন এই বিষয়টী কত সুন্দর রূপেই বুঝিয়াছিলেন, কত নিগূঢ়ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাহা অপরে আর কত বুঝিবে। তিনি তাঁহার পূর্ব্বসঙ্কল্প স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইলেন; অর্থাৎ মধুসূদন অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়া ভক্তিবাদ স্থাপন করিবেন—এই সঙ্কল্প স্মরণ করিয়া তাঁহার গুরু রামতীর্থের নিকট এই সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ না করায় যে কথঞ্চিৎ কপটতা হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া আজ হৃদয়ে অনুতপ্ত হইলেন। অদ্বৈত-সিদ্ধান্তই সত্য, অকাট্য অখণ্ডনীয় সত্য; অথচ তাহাই খণ্ডন করিতে আমি উদ্যত হইয়াছিলাম, ইহা তিনি যতই ভাবেন, ততই তাঁহার হৃদয়ে অনুতাপানল বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আবার তিনি এই অজ্ঞানকৃত

পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন—সঙ্কল্প করিলেন। আর এজন্ত যাঁহার নিকট তিনি অপরাধী, তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি একদিন মহামতি রামতীর্থের নিকট আসিয়া বলিলেন—"ভগবন্! আমি আপনার চরণে মহান্ অপরাধ করিয়াছি, ইহাতে যে আমার পাপ হইয়াছে, আপনিই তাহার প্রায়শ্চিত্তের বিধান করুন।"

রামতীর্থ অবাক্! তিনি নিতান্ত বিস্ময়সহকারে বলিলেন—"কৈ! তুমি ত আমার নিকট কোন অপরাধই কর নাই! আমি ত একদিনও তোমায় কোনরূপ অন্যায় বা অপ্রিয় আচরণ করিতে দেখি নাই। কি হইয়াছে? মধুসূদন! আমায় সব বল"।

মধুসূদন বলিলেন—"ভগবন্! আমি আপনার নিকট কপটতা করিয়াছি। আমি আপনাকে বলি নাই—আমি কি উদ্দেশ্যে আপনার নিকট বেদান্তশিক্ষা করিতেছি। সে কথা বলিলে হয় ত আপনি আমায় কখনই এত যত্ন করিয়া বেদান্তশিক্ষা দিতেন না। গৃহে থাকিতে সংসারে বিরক্ত হইয়া ভগবদ্ভজনার্থ আমি নবদ্বীপে আসি। কারণ, শুনিয়াছিলাম—নবদ্বীপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতার হইয়াছে। কিন্তু আসিয়া দেখিলাম—তিনি শ্রীক্ষেত্রে চলিয়া গিয়াছেন। অগত্যা আমি নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করি। এই সময় আমার সংকল্প হয়, আমি অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের মতানুকূল দ্বৈতসিদ্ধান্তানুসারে ভক্তিবাদের একখানি অকাট্য দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করিব। আর তজ্জন্য অদ্বৈতমত শিক্ষা আবশ্যক বলিয়া আমি কাশীধামে আগমন করি এবং আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করি। এখন এই কয়বৎসর বেদান্তশাস্ত্র আলোচনার ফলে আমি দেখিলাম—অদ্বৈতসিদ্ধান্তই সত্য, আর এতদনুকূল সাধনভজনই প্রকৃষ্ট পথ। কিন্তু ইহাকেই খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে আমি আপনাকে আমার অভিপ্রায় গোপন করিয়াছি। অতএব আপনার শ্রীচরণে আমার মহান্ অপরাধ

এবং তজ্জন্য পাপও হইয়াছে। আপনি আমায় ক্ষমা করুন এবং এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করুন"।

যিনি ভবিষ্যতে সন্ন্যাসিগণের আদর্শস্বরূপ হইবেন, যিনি বেদান্তাচার্য্যগণের শিরোমণিস্থানীয় হইবেন, যাঁহার সিদ্ধান্ত অবলম্বনে বেদান্তমতের বিজয়বৈজয়ন্তী সর্ব্বোচ্চে উড্ডীন থাকিবে, যাঁহার জন্য বেদান্তমত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক মত বলিয়া পণ্ডিতসমাজে সমাদৃত হইবে, যাঁহার সিদ্ধান্ত চরম বলিয়া গৃহীত হইবে, তাহাতে কি কোন সদ্গুণের অল্পতা থাকিতে পারে? সত্যনিষ্ঠা, সরলতা, ভাবশুদ্ধি প্রভৃতি গুণরাশি কি তাহাতে অপূর্ণ থাকিতে পারে? তিনি কি কখন কোনও প্রকার পাপলেশ সহ্য করিতে পারেন? অগত্যা তিনি আজ গুরুর নিকট স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ব্যাকুল। তাই আজ তিনি দীনভাবে গুরুর নিকট উপস্থিত।

মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধিরচনা ও সন্ন্যাসের উপলক্ষ।

মহামতি রামতীর্থ মধুসূদনের কথা শুনিয়া যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন। তিনি প্রেমগদগদ চিত্তে বলিলেন—"মধুসূদন তোমাকে কোন পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। তুমি যাহা সত্য বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলে, সেই সত্যের অন্তরোধেই তাদৃশ কাপট্যের আশ্রয় লইয়াছিলে। অতএব ইহা তোমার অজ্ঞানকৃত পাপবিশেষ। তা' বেশ! সকল পাপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত সন্ন্যাসগ্রহণ। তুমি সেই সন্ন্যাস গ্রহণ কর।

বলিয়া বোধ হয়। উহার খণ্ডন ঠিক ন্যায়ানুমোদিত পথে আমিও করিতে অসমর্থ মনে করি। কাশীতে আরও অনেক ধুরন্ধর পণ্ডিত আছেন, কেহই উহার খণ্ডনে প্রবৃত্ত হন নাই, অথবা তাহারা উহার খণ্ডনে সমর্থই নহেন। তুমি যেরূপ নব্যন্যায়ে কৃতবিদ্য, তাহাতে বোধ হয়—এ কার্য্য তুমিই করিতে পারিবে। অতএব তুমি যদি আমার নিকট অপরাধ করিয়া থাক বলিয়া তোমার মনে হয়, তাহা হইলে আমার সন্তোষসম্পাদনার্থ তুমি অদ্বৈতসিদ্ধি নামক এক গ্রন্থ রচনা কর। ব্যাসাচার্য্যের আপত্তি প্রতিঅক্ষর খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধান্ত অচল অটল ভিত্তিতে স্থাপন কর।

জ্ঞান পূর্ণ হইলে সকল কর্ম্মে প্রবৃত্তির অভাব হয় বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যে জাতীয় কর্ম্মলেশ থাকে, তাহা কয়েকটী শুভ বিষয়েই দেখা যায়। তাহা প্রায়শঃ—গুরুভক্তি, উপাসনা, পরোপকার, শাস্ত্রানুরাগ ও সম্প্রদায়রক্ষা প্রভৃতি। মহামতি রামতীর্থের মনে স্বসম্প্রদায়রক্ষার বাসনা এখনও যায় নাই। তাই তিনি মধুসূদনকে 'অদ্বৈতসিদ্ধি' রচনা করিতে বলিলেন।

মধুসূদন অবনতমস্তকে গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন এবং বলিলেন—"আপনার যাহা আজ্ঞা তাহাই করিব। সন্ন্যাস, তবে আপনিই দিন।" কিন্তু রামতীর্থ বলিলেন—"দেখ, মধুসূদন! সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণতঃ নিয়ম এই যে, যিনি মণ্ডলেশ্বর থাকেন, তিনিই সাধারণতঃ সন্ন্যাস দান করিয়া থাকেন, সকলেই সন্ন্যাস দান করেন না। এ সময় সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীরাম সরস্বতীর শিষ্য শ্রীবিশ্বেশ্বর সরস্বতী একজন প্রবীণ ও প্রধান মণ্ডলেশ্বর। মধুসূদন! তুমি বিশ্বেশ্বরের নিকট সন্ন্যাস লও, তিনিই এখন সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য মণ্ডলেশ্বর"।

মধুসূদন সন্ন্যাসের প্রস্তাব লইয়া বিশ্বেশ্বরের নিকট গমন করিলেন।

বিশ্বেশ্বর অতিশয় বিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"অতি উত্তম কথা, তোমার মত পণ্ডিতই সন্ন্যাসের যথার্থ অধিকারী, কিন্তু তথাপি সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে কিছু পরীক্ষা করা প্রয়োজন। কারণ, পণ্ডিত হইলেই লোকে সন্ন্যাসের যোগ্য হয় না। অনেক সময় লোকে কোন একটা প্রবল মনোবেগে সন্ন্যাস লইতে যায়, কিন্তু তাহাদের বৈরাগ্য বা ভগবদ্‌ভক্তি সেরূপ প্রবল থাকে না। এরূপ হইলে প্রায়ই লোকের পতন হয়। আমি ইচ্ছা করি—তোমার ভাগ্যে সেরূপ কিছু যেন না ঘটে। সন্ন্যাসীর পতন হইলে আর আশ্রম নাই, সে জন্মে আর তাহার উদ্ধার নাই।"

মধুসূদন বলিলেন—"ভগবন্! আপনার যেরূপ আদেশ হইবে, আমি তাহাই করিব।"

গীতার টীকা প্রণয়নের উপলক্ষ।

বিশ্বেশ্বর মধুসূদনের বিনয় ও নম্রতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিলেন—"আমি কিছুদিনের জন্য তীর্থভ্রমণে যাইতেছি, তুমি ইতি মধ্যে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার একটী টীকা প্রণয়ন কর, আমি তাহা দেখিলে তোমার যোগ্যতা বুঝিতে পারিব—আশা করি"।

মধুসূদন বলিলেন—"আচ্ছা, তাহাই করিব।"

অতঃপর মধুসূদন, রামতীর্থসমীপে নিজ বাসস্থানে আসিলেন এবং সমুদায় রামতীর্থকে নিবেদন করিলেন। রামতীর্থ বিশ্বেশ্বরের প্রবীণতার কথা বলিয়া তাহার বহু সুখ্যাতি করিলেন এবং মধুসূদনকে গীতার টীকা লিখিতে উৎসাহিত করিলেন।

গীতার টীকারচনায় প্রবৃত্ত হইবেন বলিয়া মধুসূদন শাঙ্করভাষ্য, আনন্দগিরির টীকা ও শঙ্করানন্দের টীকা প্রভৃতি যাবতীয় সাম্প্রদায়িক-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং পূর্ণরূপে ভগবানের চরণে আত্ম-সমর্পণ করিলেন।

ভক্ত ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে ভক্তের কার্য্য ভগবান্‌ই সম্পন্ন করিয়া দেন। ভগবান্‌ই বলিয়াছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।

অনন্যকাম হইয়া যে সকল ব্যক্তি আমার চিন্তাকরতঃ ভজনা করে, নিত্য আমাতে যুক্ত তাহাদিগকে আমি যোগ অর্থাৎ ধনাদিলাভ এবং ক্ষেম অর্থাৎ ধনরক্ষা প্রভৃতি বহন করি। সুতরাং মধুসূদনের গীতার টীকারচনা ভগবান্ মধুসূদনই করিতে লাগিলেন। মধুসূদন তাহার উপলক্ষমাত্র হইলেন।

সম্বৎসরের মধ্যে মধুসূদনের গীতার গূঢ়ার্থদীপিকা টীকা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া গেল। ওদিকে গুরু বিশ্বেশ্বর সরস্বতীও কাশী ফিরিয়া আসিলেন। মধুসূদন সংবাদ পাইবামাত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং গীতার কিঞ্চিৎ অসম্পূর্ণ সেই টীকাখানি তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

বিশ্বেশ্বর সরস্বতী টীকাটী দেখিতে আরম্ভ করিলেন। যতই দেখেন, ততই দেখিতে আগ্রহ হয়। মিষ্টতা, ভাববাহুল্য, জ্ঞানভক্তির সামঞ্জস্য, তত্ত্বজ্ঞান, সাধনরহস্য প্রভৃতি যেন প্রতি পংক্তিতে মাখান রহিয়াছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যার সর্ব্বত্র সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাসহকারে অনুসরণ করা হইয়াছে। বিশ্বেশ্বর আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া সমগ্র গীতাব্যাখ্যাটী দেখিতে লাগিলেন, এবং স্থলে স্থলে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করেন এবং স্থলে স্থলে আত্মহারা হইয়া যেন সমাধিমগ্ন হন।

মধুসূদন টীকাটী সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই, বিশ্বেশ্বরও সমগ্র টীকাটী না পড়িয়াই বলিলেন "মধুসূদন আমার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে, তুমি যে কোন এক শুভদিনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পার। আমি তোমার মত অধিকারীকে সন্ন্যাস দিলে ধন্য হইব।"

সন্নিকটবর্ত্তী শুভদিনে যথাবিধি মধুসূদন সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। "সন্ন্যাসগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ।" এই শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতা করিয়া নররূপী মধুসূদন নারায়ণরূপী মধুসূদন হইলেন। আজ মধুসূদনের কুল পবিত্র হইল, জননী কৃতার্থা হইলেন, আর বসুন্ধরা পুণ্যবতী হইলেন।

"কুলং পবিত্রং, জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
যদৈব সন্ন্যাসপথে প্রবৃত্তং বিমুক্তিহেতোঃ পুরুষেণ নূনম্॥"

মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধি রচনার সঙ্কল্প।

সন্ন্যাসের পর মধুসূদন রামতীর্থের আজ্ঞানুসারে মাধ্বসম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি দেখিতে লাগিলেন, এবং গুরুশিষ্যে বসিয়া তাহার খণ্ডন চিন্তা করিতে লাগিলেন। মধুসূদন দেখিলেন—মাধ্বগণ সম্প্রদায়ক্রমে বহুপুরুষ যাবৎ অদ্বৈতমতখণ্ডনার্থ যত কিছু তর্কযুক্তির উদ্ভাবন করিয়াছেন, সকলই ব্যাসতীর্থ অতি অপূর্ব্ব কৌশলে, সুনিপুণভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া এবং স্বোদ্ভাবিত অভিনব আক্ষেপদ্বারা পরিপুষ্ট করিয়া যে ন্যায়ামৃত গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন, তাহার খণ্ডন করিলেই মাধ্বমতের সকল আক্রমণের উত্তরদান হইয়া যায়। গুরু রামতীর্থ ঠিক কথাই বলিয়াছেন। অতএব—ন্যায়ামৃতেরই প্রতি পঙ্‌ক্তি ধরিয়া খণ্ডন করিতে হইবে।

যাদবের কাশীযাত্রা।

এদিকে যাদব বহুদিন মধুসূদনের কোন সংবাদ না পাইয়া ভাবিলেন—মধুসূদন কি তবে আমাদের মায়া কাটাইয়াছে? এত বিদ্যার্থী যাতায়াত করে, কিন্তু কৈ কাহারও নিকট সে ত কোন পত্রাদি দেয় না। সে কি সন্ন্যাসী হইল? না জীবিত নাই? যাদব নানা চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া মধুসূদনের অন্বেষণে কাশী যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। ন্যায়শাস্ত্র ইতিমধ্যে তাঁহার প্রায় শেষই হইয়াছে। সুতরাং মথুরানাথের নিকট অধ্যয়নবিলাস সংক্ষেপই হইল। যাদব কাশী যাত্রা করিলেন।

যাদব কাশী আসিয়া অন্বেষণ করিতে করিতে শুনিলেন—তাঁহার প্রিয়, ভ্রাতা মধুসূদন সন্ন্যাস লইয়া রামতীর্থের নিকটে অবস্থিতি করিতেছেন। যাদব মধুসূদনের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন—মুণ্ডিতমস্তক গৈরিক বস্ত্রধারী যুবক মধুসূদনের এক অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। দেখিলেন—পবিত্রতা, একনিষ্ঠা, প্রসন্নতা এবং ত্যাগশীলতা যেন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সন্ন্যাসী মধুসূদন বেদান্তগ্রন্থ-বেষ্টিত হইয়া গ্রন্থরচনায় ব্যাপৃত।

এবার আর মধুসূদন পূর্ব্বের ন্যায় জ্যেষ্ঠকে আসন ছাড়িয়া দিয়া সম্ভাষণ করিলেন না, কিন্তু সন্ন্যাসী যে ভাবে গৃহস্থকে অভ্যর্থনা করেন, সেই ভাবেই পৃথক্ আসন নির্দ্দেশ করিয়া জ্যেষ্ঠকে অভ্যর্থনা করিলেন। যাদব কনিষ্ঠের এই ভাবান্তর দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অল্পকাল পরে আত্মসম্বরণ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন এবং ধীরভাবে মধুসূদনের ইতিবৃত্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর পূর্ব্বাশ্রমের কথা স্মরণ করিতে নাই। অগত্যা মধুসূদন সংক্ষেপে দাদার প্রশ্নের উত্তর দিয়া শাস্ত্রীয়প্রসঙ্গের অবতারণা করিলেন।

যাদব প্রমাদ গণিলেন। বুঝিলেন—কনিষ্ঠকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া আর সম্ভব হইবে না। তথাপি তিনি মধুসূদনকে তাঁহার নবদ্বীপের সঙ্কল্পকথা স্মরণ করাইয়া দিয়া নানা কৌশলে তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু যতই মধুসূদনের সহিত আলাপ করেন, ততই তাঁহার নিজের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে লাগিল। যাদব মধুসূদনের উদার মহনীয়ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। ইচ্ছা হইল—তিনিও কনিষ্ঠের অনুসরণ করিবেন।

সন্ন্যাস কিন্তু মহাভাগ্যের কথা। ইচ্ছা করিলেই হয় না। যখনই অপ্রসন্ন হন, যখনই সঙ্কল্প করেন, চিন স্থির হয়, তখনই বিঘ্ন ঘটে। এই ভাবে কিছুদিন কাশী অবস্থিতির পর মধুসূদন যাদবকে বলিলেন—

মধুসূদনকে বলিলেন—"মধুসূদন! এই স্থানটী বড় মনোরম ও নির্জ্জন, তুমি এখানে থাকিয়া সমাধিসাধনে মনোনিবেশ কর, আমরা যখন ফিরিব, তখন তোমায় সঙ্গে করিয়া কাশী লইয়া যাইব। তোমার এ অবস্থায় অধিক পথভ্রমণ অনুকূল নহে"।

মধুসূদন যমুনাতীরেই অবস্থান করিতে লাগিলেন, গ্রাম দূরে থাকিলেও ক্রমে গ্রামবাসিগণ তাঁহার প্রাণধারণের ব্যবস্থা করিল। মধুসূদন সমাধি অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুদিনের মধ্যেই মধুসূদন ভগবৎকৃপায় সমাধিলাভে সমর্থ হইলেন। অনেক সময়, দিনের পর দিন মধুসূদন সমাধিতে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

সম্রাট্ আকবর মহিষীর শূলরোগশান্তি।

এ দিকে দিল্লীতে তখন সম্রাট্ আকবর বাদসাহ অধিষ্ঠিত। তাঁহার এক প্রিয়মহিষী কিছুদিন হইতে শূলবেদনায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। সর্ব্ববিধ বহু চিকিৎসাতেও কোন ফলোদয় হয় নাই। বাদসাহ পর্য্যন্ত মহিষীর জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন।

যখন সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তখন লোকে ভগবানেরই শরণ গ্রহণ করে। এস্থলেও তাহাই হইল। রাজমহিষী ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। দিবারাত্র ভগবানের ধ্যানের ফলে তিনি এক রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন যমুনাতীরে কোন এক সাধু তাঁহাকে কি ঔষধ দিলেন এবং তাহা সেবন করিয়া রাজমহিষী রোগমুক্ত হইলেন।

প্রাতঃকালে রাজমহিষী সম্রাট্‌কে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। সম্রাট্ আকবর স্বভাবতঃই সাধুসন্ন্যাসীকে ভক্তি করিতেন। তিনি মহিষীর স্বপ্ন উপেক্ষা না করিয়া যমুনাতীরে সাধুর অন্বেষণে আদেশ দিলেন।

বিশ্বেশ্বরের শিষ্যগণ কর্ত্তৃক মধুসূদনের মহত্ত্বদর্শন।

কিছুদিন এইভাবে অতিবাহিত হইবার পর বিশ্বেশ্বর সরস্বতী শিষ্য-বর্গসহ তীর্থ ভ্রমণ করিয়া মধুসূদনের নিকট আসিলেন। দেখিলেন—বহুলোক মধুসূদনকে দেখিবার জন্য জনতা করিয়া রহিয়াছে। মধুসূদন পূর্ব্ববৎ সেই বালুকাময় তীরদেশে উপবিষ্ট। সম্মুখে সেই সব ধনরত্ন অরক্ষিতভাবে পতিত।

মধুসূদন গুরুদেবকে যথাবিধি পূজা করিলেন। বিশ্বেশ্বরও তাঁহার অপর শিষ্যগণ সেই সকল ধনরত্ন দেখিয়া অবাক্। সকলেই ইহার বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য ব্যগ্র। মধুসূদন তখন সম্রাট্ ও তাঁহার পত্নীর আগমনের কথা বলিলেন। বিশ্বেশ্বরের আনন্দ আর ধরিল না। শিষ্যগণ মধুসূদনকে চিনিতে পারিলেন এবং নিজ নিজ দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। বিশ্বেশ্বর শিষ্যগণকে যাহা শিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ হইল।

গীতার টীকার সমাপ্তি।

অতঃপর কাশী আসিয়া মধুসূদন গীতার টীকাটী সম্পূর্ণ করিয়া শ্রীবিশ্বেশ্বরপ্রমুখ গুরুগণের চরণে সমর্পণ করিলেন। আর গুরুর আদেশকে লক্ষ্য করিয়া শেষে এই শ্লোকটী লিখিয়া দিলেন—

"শ্রীরামবিশ্বেশ্বরমাধবানাং প্রসাদমাসাদ্য ময়া গুরূণাম্।
ব্যাখ্যানমেতদ্ বিহিতং সুবোধং সমর্পিতং তচ্চরণাম্বুজেষু॥"

অর্থাৎ শ্রীরাম, বিশ্বেশ্বর ও মাধব নামক গুরুগণের প্রসাদ লাভ করিয়া এই জ্ঞানপূর্ণ ব্যাখ্যা তাঁহাদের চরণপদ্মে সমর্পিত হইল।

মধুসূদন ও তুলসীদাস। মধুসূদনের গুরুপূজা।

মহাত্মা তুলসীদাস কাশীতে মধুসূদন সরস্বতীর আশ্রমের অদূরে বাস করিতেন। মধুসূদনসরস্বতী চৌষট্টিযোগিনী ঘাটে অবস্থিতি করিতেন এবং মহাত্মা তুলসীদাস হরিশ্চন্দ্র ঘাটের নিকটে থাকিতেন। এখানে

এখনও তাঁহার পাদুকা রক্ষিত আছে—দেখা যায়। তুলসীদাসের সাধনার স্থানটী একটু দূরে অসী-নদীর তীরে দুর্গাবাটীর দক্ষিণে বর্ত্তমান। তুলসীদাস শেষকালে উক্ত গঙ্গাতীরেই বাস করিয়াছিলেন।

এ সময় কাশীতে যোগী ও ভক্ত বলিয়া একদিকে মহাত্মা তুলসীদাস এবং অপর দিকে যোগী ও জ্ঞানী বলিয়া মহামতি মধুসূদন খুব বিখ্যাত হইয়া পড়েন। মধুসূদনের সমকক্ষ অপরাপর বহু পণ্ডিতসাধু এ সময় কাশীতে থাকিলেও জনসাধারণের নিকট সিদ্ধপুরুষ বলিয়া ইঁহারাই অধিক পূজিত ছিলেন। সাধারণ লোকে ত আর পাণ্ডিত্যের মহিমা বুঝে না, তাহারা অলৌকিক শক্তির দ্বারা লোকের মহত্ত্ব বুঝিয়া থাকে। মধুসূদন ও তুলসীদাসের যোগসিদ্ধি জন্য খ্যাতি বিশেষভাবে ছড়াইয়া পড়ে। আর তজ্জন্য বহুলোক ইঁহাদের সঙ্গ ও দর্শনাদি করিত।

তুলসীদাস এই সকল লোকদিগকে হিন্দি ভাষার সাহায্যেই উপদেশাদি দিতেন; শাস্ত্রের ব্যাখ্যাদি করিয়া সংস্কৃত ভাষায় উপদেশাদি দিতেন না। মধুসূদন কিন্তু শাস্ত্রের ব্যাখ্যাদির দ্বারা সংস্কৃত ভাষায় তাহা করিতেন। তুলসীদাস প্রায়ই স্বকৃত হিন্দি রামায়ণ শুনাইতেন এবং মধুসূদন সংস্কৃত ভাগবত ও গীতার ব্যাখ্যাদি করিতেন। উভয়ের মধ্যে এ বিষয়ে এই পার্থক্য ছিল। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রচর্চ্চার জন্য মধুসূদনের নিকট বহু পণ্ডিতেরই সমাগম হইত।

একদিন কতকগুলি সংস্কৃতানুরাগী ভক্ত তুলসীদাসকে বলেন—"মহাত্মন্! আপনি শাস্ত্রীয় কথা সবই হিন্দি ভাষার সাহায্যে বলেন কেন? কাশীর পণ্ডিতগণ ত সেরূপ করেন না, তাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্র-বচনের ব্যাখ্যামুখে সব কথাই বলেন, আপনি সেরূপ করেন না কেন?" ইহাতে তুলসীদাস একটু হাসিয়া একটী হিন্দি কবিতা করিয়া বলেন—

"হরি হর যশ সুর নর গিরা, বরণহি সন্ত সুজান।
হাণ্ডী হাটক চারুচীর, রান্ধে স্বাদ সমান॥"

অর্থাৎ হর ও হরির যশ, সাধুগণ, দেবভাষায় বা মানবীয় ভাষায়—যে ভাষায় বর্ণন করুন না কেন, সবই সমান। যেমন স্বর্ণের হাঁড়িতে বা মাটীর হাঁড়িতে বাধিলে আস্বাদ সমানই হয়।

এই সংস্কৃতানুরাগী ভক্তগণ মধুসূদনেরও অনুরাগী ছিলেন। তাঁহারা তুলসীদাসের এই কবিতাটী লইয়া মধুসূদনের নিকট আসিলেন এবং মধুসূদনের 'মত' কি জানিতে চাহিলেন। উদারহৃদয় ও গুণগ্রাহী মধুসূদন একটী কবিতা করিয়া বলিলেন—

"পরমানন্দপত্রোঽয়ং জঙ্গমস্তুলসীতরুঃ।
কবিতা মঞ্জরী যস্য রামভ্রমরচুম্বিতা॥"

অর্থাৎ তুলসীদাসরূপ জঙ্গম অর্থাৎ গমনশীল তুলসী বৃক্ষের পত্র পরমানন্দ, সেই তুলসী বৃক্ষের মঞ্জরী সেই তুলসীদাসের কবিতা, আর সেই কবিতা মঞ্জরী রামরূপ ভ্রমরদ্বারা চুম্বিত।

ইহা শুনিয়া সেই সংস্কৃতানুরাগী ভক্তবৃন্দের চৈতন্য হইল। তাঁহারা তুলসীদাসের উপর অধিকতর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেন। মধুসূদনের এই ব্যবহারটী তাঁহার যথেষ্ট গুণগ্রাহিতা ও উদারতার যে পরিচয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেবল তাহাই নহে; মধুসূদন যে ভক্তের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন, তাহাও বুঝা যায়।

মধুসূদন ও অপ্পয়দীক্ষিত। মধুসূদনের পণ্ডিতপূজা।

মধুসূদনের সময় কাশীধামে অপ্পয়দীক্ষিত নামে একজন মহামান্য ও সর্ব্বগণ্য পণ্ডিত ছিলেন। মীমাংসা ও বেদান্তে ইঁহাকে তৎকালে অনেকেই অদ্বিতীয় বলিয়া সম্মান করিতেন। অপ্পয়দীক্ষিতের রচিত গ্রন্থ সংখ্যা শুনা যায় ১০৮ খানি। মাধ্ব, শৈব, রামানুজ প্রভৃতি যাবতীয় বেদান্ত-মতে ইঁহার অধিকার এতই গভীর ছিল যে, উক্তসম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিত-গণও ইঁহাকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতেন। বয়সে মধুসূদন, অপ্পয়-দীক্ষিত অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কনিষ্ঠ ছিলেন। বিদ্যাবত্তায় কিন্তু মধুসূদনকে

অপ্পয়দীক্ষিত হইতে ন্যূন বলা যায় না এবং মধুসূদন তাঁহার শিষ্যও ছিলেন না। কিন্তু তাহা হইলেও মধুসূদন তাঁহাকে "সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রাচার্য্য" বলিয়া সম্মান করিতেন। সমকক্ষ পণ্ডিত সমসাময়িক হইলে একে প্রায়ই অপরকে প্রমাণ বলিয়া সম্মান করেন না—এইরূপই সাধারণতঃ দেখা যায়। অবশ্য বিরুদ্ধমতাবলম্বী হইলে একে অপরকে খণ্ডন করেন—ইহাও প্রায়ই দেখা যায়,, কিন্তু সম্মান করিয়া গ্রন্থমধ্যে তাঁহার উল্লেখ করা—ইহা প্রায়ই দেখা যায় না। মধুসূদন কিন্তু অপ্পয়দীক্ষিতকে যেরূপ অত্যধিক সম্মান করিয়া গ্রন্থমধ্যে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন,, তাহাতে মধুসূদনের এই আচরণটী তাঁহার যে অতি উদারস্বভাবের পরিচয়, তাঁহার যে অকপট মহাজনপূজাপ্রবৃত্তির পরিচয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহানকে উপেক্ষা করিয়া বা তাঁহার দোষ প্রদর্শন করিয়া নিজের মহত্ত্ব-খ্যাপনপ্রবৃত্তি মধুসূদনের যে ছিল না, তাহা ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়।

ব্যাসরাম ও মধুসূদন। বিপক্ষের প্রতিও অনুকম্পা।

মধুসূদন অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থ রচনা করিয়া মাধ্বসম্প্রদায়ের ব্যাসরাজ-প্রণীত ন্যায়ামৃত গ্রন্থের অক্ষরে অক্ষরে খণ্ডন করিলে ব্যাসরাজ দেখিলেন যে, অদ্বৈতমতখণ্ডনে তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে, তাঁহার ব্রহ্মাস্ত্র পর্য্যন্ত নিষ্ফল হইয়াছে। ইহাতে ব্যাসাচার্য্য তাঁহার অতি বুদ্ধিমান্ শিষ্য ব্যাসরামকে বলিলেন—"ব্যাসরাম! অদ্বৈতবাদী মধুসূদন আমার ন্যায়ামৃতের যেরূপ উত্তর দান করিয়াছেন, তাহাতে আমার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইল। ইহার সকল কথা বুঝিয়া ইহার খণ্ডনচেষ্টা করা এ বয়সে আর আমার পক্ষে সম্ভব নহে। তুমি ন্যায়শাস্ত্রে সম্পূর্ণ পারদর্শী হইয়াছ, তুমি যদি মধুসূদনের নিকট যাইয়া তাঁহার শিষ্য সাজিয়া তাঁহার আশয় বুঝিয়া, তাঁহার যুক্তিপরিপাটী আয়ত্ত করিয়া যদি ইহার প্রতিবাদ করিতে পার, তবেই আমার চেষ্টা কথঞ্চিৎ রক্ষা পাইতে পারে, নচেৎ ইহা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।"

ব্যাসরাম "তথাস্তু" বলিয়া কাশী অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং সেই সুদূর কর্ণাট দেশ হইতে কাশী আসিয়া নিজ অভিপ্রায় গোপনপূর্ব্বক মধুসূদনের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। ব্যাসরাম একেবারেই অদ্বৈতসিদ্ধি পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যুক্তিপারিপাট্য হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন।

মধুসূদনের ব্যাসরামকে চিনিতে আর বিলম্ব হইল না। মধুসূদন কোন কথাই না বলিয়া সহাস্যবদনে ব্যাসরামকে অদ্বৈতসিদ্ধির রহস্য সকলই বলিতে লাগিলেন। তিনি এতদ্দ্বারা শত্রুপক্ষকে পুষ্ট করিতেছেন বলিয়া তিলমাত্র কৃপণতা করিলেন না। ব্যাসরাম এদিকে রাত্রিকালে গোপনে ন্যায়ামৃতের উপর "তরঙ্গিণী" নামে এক টীকা রচনা করিয়া দুই খানি প্রতীকে লিখিতে লাগিলেন এবং মধুসূদনের মত খণ্ডন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে অদ্বৈতসিদ্ধির পাঠ শেষ হইয়া গেল। ব্যাসরামের "তরঙ্গিণী" লেখাও শেষ হইল। ব্যাসরাম তখন তরঙ্গিণীর অপর প্রতীকখানি মধুসূদনকে উপহার দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। মধুসূদন তখন হাসিয়া বলিলেন—"হাঁ, ইহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম। তা, তুমি যখন আমার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছ, তখন ইহার উত্তর আর আমার দেওয়া শোভা পায় না। ইহার উত্তর আমার কোন শিষ্যই দিবে জানিও।"

বস্তুতঃ, মধুসূদনের শিষ্য বলভদ্র "সিদ্ধিব্যাখ্যাতে" ইহার উত্তর দান করিলেন। বলভদ্র, ব্যাসরামের অপর শিষ্য শ্রীনিবাসকৃত "ন্যায়ামৃতপ্রকাশ" টীকা এবং এই "তরঙ্গিণী" টীকা সম্যক্ আলোচনা করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির ব্যাখ্যায় উভয়ের সকল আক্ষেপের উত্তর দান করিলেন।

বিপক্ষকে তাঁহার অসদ্ অভিপ্রায় জানিয়াও শিক্ষা দান করায় মধুসূদনের যে মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নিশ্চয়ই নিতান্ত অলোকসামান্য।

ইহার অর্থ গ্রন্থমধ্যে দ্রষ্টব্য। ইহাতে বুঝা যায় যে, এ গ্রন্থরচনায় তাঁহার উদ্দেশ্য—নিজের ও অপরের জ্ঞানলাভ, আর যদি কেহ বিবাদ করেন, তবে তাঁহাকে জয় করা এবং পণ্ডিতগণের আনন্দ উৎপাদন করা।

মধুসূদনের স্তুতিনিন্দায় সমভাব।

এই অদ্বৈতসিদ্ধির শেষে মধুসূদন লিখিয়াছেন—

"গ্রন্থস্যৈতস্য যঃ কর্তা স্তূয়তাং বা স নিন্দ্যতাম্।
ময়ি নাস্ত্যেব কর্তৃত্বমনন্তানুভবাত্মনি।"

অর্থাৎ এই গ্রন্থের যিনি কর্তা তিনি স্তুত হউন বা নিন্দিত হউন তাহাতে আমার ক্ষতি কি? যেহেতু অনন্তানুভবস্বরূপ আমাতে কর্তৃত্বই নাই। এস্থলে মধুসূদনের নিজ অন্তরের প্রকৃতভাবই প্রকাশ পাইতেছে। সকল আত্মস্বরূপাবস্থিতিপ্রযুক্ত তাঁহাতে কর্তৃত্বাভিমানই থাকিত না, সুতরাং তাঁহাতে সুখিদুঃখিভাব থাকা ত অতি দূরের কথা।

মধুসূদনের শাস্ত্ররসিকতা।

গীতার টীকামধ্যে দেখিতে পাই—

"এতৎ সর্বং ভগবতা গীতাশাস্ত্রে প্রকাশিতম্।
অতো ব্যাখ্যাতুমেতন্মে মন উৎসহতে ভৃশম্।"

অর্থাৎ এই সমস্ত তত্ত্বকথা গীতাশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, এই হেতু ইহার ব্যাখ্যা করিতে আমার মন অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছে। ইহা হইতেও বুঝা যায়—তিনি শাস্ত্ররসিকও ছিলেন।

অর্থাৎ ধ্যানবশীকৃতচিত্ত যোগিগণ সেই নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, পরম জ্যোতিঃ দেখেন, দেখুন—আমাদের মন কিন্তু সেই লোচনচমৎকার, কালিন্দীপুলিনে নীলরূপের জন্ম ধাবিত হইয়া থাকে।

ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, মধুসূদন সগুণ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন, এবং মধুরভাবেই সেই উপাসনা তিনি করিতেন। অন্য কোন ভাবে তিনি সে উপাসনা করিতেন না। তবে নির্গুণভাবই যে তাঁহার আত্মার স্বরূপ, এবং তাহা যে উপাসনানিরপেক্ষ, তাহাও তিনি বুঝিতেন—ইহা তাঁহার রচিত অন্য শ্লোক হইতে জানা যায়।

অন্যত্র দেখা যায়—

"অদ্বৈতসাম্রাজ্যপথাধিরূঢ়াস্তৃণীকৃতাখণ্ডলবৈভবাশ্চ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন, দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন।"

অর্থাৎ আমরা অদ্বৈতসাম্রাজ্যের পথে অধিরূঢ় হইলেও, ইন্দ্রের বৈভব তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিলেও কোন এক গোপবধূ-লম্পট, শঠকর্তৃক আমরা বলপূর্ব্বক দাসীকৃত হইয়াছি।

এস্থলেও দেখা যায়—মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় একটা বিশেষ সুখ অনুভব করিতেন। তাঁহার নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানসত্ত্বেও তিনি সংস্কারবশে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের উপসনাতেই কালাতিপাত করিতেন। কারণ, বলপূর্ব্বক দাসী করা, সংস্কারের বলবত্তরতাই সূচনা করিতেছে।

অন্যত্র আবার বলিয়াছেন—

অর্থাৎ হে নাথ! ভেদ অপগত হইলেও তোমারই আমি, কিন্তু তুমি আমার নহ, সমুদ্রেই তরঙ্গময় হয়, তরঙ্গ কখন সমুদ্রময় হয় না। এস্থলে "আমি তোমার" ভাবই স্পষ্ট।

মধ্যম ভক্তের ভাব—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ! কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥"

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! হাত ছাড়াইয়া বলপূর্ব্বক চলিয়া গেলে—ইহা আর কি আশ্চর্য্যের কথা, যদি হৃদয় হইতে যাইতে পার, তবে তোমার পৌরুষ বুঝিতে পারি। এস্থলে "তুমি আমার" ভাবই স্পষ্ট।

উত্তম ভক্তের ভাব—

"সকলমিদমহং চ বাসুদেবঃ পরমপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ।
ইতি মতি রচলা ভবত্যনন্তে হৃদয়গতে ব্রজ তান্ বিহায় দূরাৎ॥"

অর্থাৎ 'এই সকল' এবং 'আমি' আর সেই পরমপুমান্ পরমেশ্বর বাসুদেব এক বস্তু, হৃদয়গত অনন্তে এই অচলা মতি যেন আমার হয় ইত্যাদি। এস্থলে "আমি তুমি অভিন্ন" এই ভাবই স্পষ্ট।

মধুসূদনের জ্ঞান।

জ্ঞানের দিক্ যদি আবার দেখা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, তিনি নিজ আত্মাকে পরব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ অভিন্নই ভাবিতেন। তিনি নিজেকে এজন্য বিষ্ণুস্বরূপ বলিয়াছেন। অদ্বৈতবিরোধী বৈষ্ণবগণ অনেক সময় বলিয়া থাকেন যে, জীব "শিবোঽহং" চিন্তা করিতে পারে এবং হইতেও পারে, কারণ, তন্মতে শিব জীবকোটীর অন্তর্ভুক্ত। শিব শ্রীকৃষ্ণের একজন ভক্তমাত্র, কিন্তু জীব নিজেকে বিষ্ণু বলিয়া জ্ঞান করিতে পারে না; কারণ, বিষ্ণু ঈশ্বর। কিন্তু আমরা দেখিতেছি—মধুসূদন নিজেকে পূর্ণবিষ্ণুস্বরূপই জ্ঞান করিতেছেন; যথা—অদ্বৈতসিদ্ধিতে তিনি বলিতেছেন—

"অনাদিসুখরূপতা, নিখিলদুঃখনির্মুক্তা,
নিরন্তরঘনস্ফুতা, স্ফুরণরূপতা চ স্বতঃ।
ত্রিকালপরমার্থতা, ত্রিবিধভেদশূন্যাত্মতা,
মম শ্রুতিশতার্পিতা, তদহমস্মি পূর্ণো হরিঃ॥"

এস্থলে পূর্ণ হরিকে নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্মই বলা হইয়াছে, এবং সেই হরিকে নিজ আত্মার স্বরূপই বলা হইল। নিজেকে ঈশ্বর বলা, ব্রহ্ম দৃষ্টিতে বলা যাইতে পারে। কিন্তু জীবসমষ্টি ঈশ্বর, এই দৃষ্টিতে নিজেকে ঈশ্বর বলা সম্ভব হয় না। ব্যষ্টি কখন সমষ্টি বলিয়া নিজেকে জ্ঞান করিতে পারে না। দ্বৈতবিরোধিগণ এই ভাবটী লইয়া অদ্বৈত-মতখণ্ডনে বহু আড়ম্বর করেন, কিন্তু তাঁহারা অদ্বৈতীর অভিপ্রায় বুঝিতে চাহে না।

গীতামধ্যে ভক্তির প্রকারভেদ বা স্তরভেদবর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, প্রথম স্তরে জীব নিজেকে ভগবানের দাস মনে করে, দ্বিতীয় স্তরে ভগবান্‌কে নিজের অধীন মনে করে, এবং তৃতীয় স্তরে নিজেকে ভগবান্ হইতে অভিন্ন মনে করে। সুতরাং অভেদভাবে উপাসনাই ভক্তির শেষ সীমা—ইহা মধুসূদনের মত। গীতায় ১৮।৬৬ শ্লোকের টীকায় তিনি ইহাই বলিয়াছেন। তাহা এই—

"তস্যৈবাহং মমৈবাসৌ স এবাহমিতি ত্রিধা।
ভগবচ্ছরণত্বং স্যাৎ সাধনাভ্যাসপাকতঃ॥"

অর্থাৎ সাধনের অভ্যাসের পরিপাক অনুসারে প্রথম 'তাঁহার আমি' দ্বিতীয় 'আমার তিনি' এবং তৃতীয় 'তিনিই আমি' এই ত্রিবিধ ভগবানের শরণ হইয়া থাকে। অতঃপর পৌরাণিক কথার দ্বারা ইহার দৃষ্টান্তও উপরি উক্ত "সত্যাপি" ইত্যাদি শ্লোকে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

তাহার পর, জ্ঞানের পর ভক্তি, কি ভক্তির পর জ্ঞান—এই কথার মীমাংসায় তিনি গীতার ১৮।৫৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা, বিশতে তদনন্তরম্॥"

অর্থাৎ জীব ভক্তির দ্বারা তত্ত্বতঃ আমাকে 'আমি যাহা ও যেরূপ' তাহা জানিতে পারে, তাহার পর, তত্ত্বতঃ জানিয়া তদনন্তর আমাতে প্রবেশ করে। এই শ্লোকে দ্বৈতবাদিগণ বলেন যে, এই "জ্ঞাত্বা তদনন্তরং বিশতে" বলায় জ্ঞানের পর আবার পরাভক্তির আবশ্যকতা আছে বুঝা যায়। কিন্তু মধুসূদন বলিয়াছেন যে, এস্থলে "তদনন্তরম্" পদের অর্থ জ্ঞানের অনন্তর নহে, কিন্তু দেহপাতের অনন্তর, ইত্যাদি; যথা—

"তদনন্তরং—বলবৎপ্রারব্ধকর্ম্মভোগেন দেহপাতানন্তরং, ন তু জ্ঞানানন্তরমেব"। অতএব মধুসূদনের মতে জ্ঞানই সাধনপথের শেষ সীমা।

যাহা হউক, ইহা হইতে বুঝা যায়, মধুসূদন পূর্ণ অদ্বৈতবাদী হইয়াও পরমভক্ত ছিলেন। *ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় তাঁহাতে জ্ঞান ও ভক্তির* অপূর্ব্ব সমন্বয় ছিল। আর যোগবলে তাঁহার সিদ্ধিলাভও পূর্ণ হইয়াছিল।

৫. মধুসূদনে সাম্প্রদায়িকতার অভাব।

মধুসূদনের মনে, দেখা যায়, সাম্প্রদায়িকতা কোন স্থান পায় নাই। কারণ, গীতার টীকায় পঞ্চদশ অধ্যায়ের শেষে তিনি যে একটী শ্লোক লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয়—তিনি সকল উপাসকসম্প্রদায়কে এক দৃষ্টিতে দেখিতেন। সেই শ্লোকটী এই—

"শৈবাঃ সৌরাশ্চ গাণেশাঃ বৈষ্ণবাঃ শক্তিপূজকাঃ।
ভবন্তি যন্ময়াঃ সর্ব্বে সোঽহমস্মি পরঃ শিবঃ॥"

অর্থাৎ শৈব, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব ও শাক্তগণ যন্ময় হইয়া থাকে, আমি সেই পরম শিবস্বরূপ। এতদ্দ্বারা তিনি নিজ আত্মাকে শিবস্বরূপ বলিতেছেন এবং সকল উপাসকই যে শিবের উপাসনা করেন, তাহাও বলিলেন। কিন্তু বৈষ্ণবাদি কেহই বলিবেন না যে, তাঁহারা শিবের উপাসনা করেন। অতএব তাঁহার হৃদয়ে সাম্প্রদায়িকতা ছিল না—ইহা স্থির।

মধুসূদনের জীবনেও তাহাই মুখ্যভাবে লক্ষিত হয়। বলিতে কি, পরেচ্ছাজনিত প্রারব্ধভোগই জ্ঞানিগণের ব্যবহারের মুখ্য লক্ষণ। মধুসূদনে তাহাই পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। আচার্য্য শঙ্কর দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাও প্রধানতঃ ব্যাসদেবের অনুরোধে এবং কোথাও শিষ্যবর্গের অনুরোধে। মধুসূদন যে নাগাসন্ন্যাসীর মধ্যে অস্ত্রবিদ্যার চর্চ্চা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহাও অপর সন্ন্যাসিগণের অনুরোধে। এই কারণে মনে হয়, জীবন্মুক্ত জ্ঞানিগণের স্বভাব যে "পরেচ্ছাজনিত প্রারব্ধভোগ" তাহা মধুসূদনের জীবনে পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত ছিল।

মধুসূদন ও তাঁহার শিষ্যবর্গ।

সন্ন্যাসের অনতিপরে মধুসূদন যখন গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন হইতেই মধুসূদনের শিষ্যসমাগম হইতে লাগিল। কিন্তু কয়েকটী ঘটনার পর মধুসূদনের শিষ্যসংখ্যা বহুল হইয়া উঠিল। এই সকল ঘটনার মধ্যে মধুসূদনের আশীর্ব্বাদে দিল্লীর সম্রাট্‌পত্নীর অম্লশূল ব্যাধির আরোগ্য, দিল্লীর সম্রাট্ সভায় আমন্ত্রণ, কাশীতে পণ্ডিতগণ সহ কয়েকটী বিচার, অদ্বৈতসিদ্ধির প্রচার এবং মধুসূদনের অনুরোধে সম্রাট্‌কর্ত্তৃক সন্ন্যাসিবধনিবারণই প্রধান বলা যায়। বিদ্যাবত্তার সহিত অলৌকিক শক্তির সংমিশ্রণ থাকিলে তাঁহার প্রখ্যাতির কি আর সীমা থাকে? সুতরাং মধুসূদনের শিষ্যসংখ্যা যে বহুল হইবে তাহাতে আর সন্দেহই বা কি?

মধুসূদনের বহু কৃতবিদ্য শিষ্যের মধ্যে আমরা আজ তিন জনের গ্রন্থ দেখিতে পাইতেছি। যথা—বলভদ্র, শেষগোবিন্দ ও পুরুষোত্তম সরস্বতী।

মধুসূদনের শিষ্য—বলভদ্র।

বলভদ্র—মধুসূদনের নিকট সেবক ব্রহ্মচারিরূপে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। ইঁহারই নিমিত্ত মধুসূদন ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের 'নির্ব্বাণ-

কিন্তু মধুসূদনের প্রশিষ্য বা প্রশিষ্যকোটিতে বহু মনীষীবর্গেরই নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—শিবরামবর্ণী, নারায়ণতীর্থ এবং পরমানন্দ সরস্বতী—ইঁহারা ব্রহ্মানন্দের শুরু। ব্রহ্মানন্দ যখন যুবক তখন মধুসূদন বৃদ্ধ। এতদ্ব্যতীত শাঙ্করভাষ্যরত্নপ্রভাকার রামানন্দ, তাঁহার গুরু গোবিন্দানন্দ, নারায়ণ তীর্থের গুরু রামগোবিন্দ তীর্থ ও বাসুদেব তীর্থ প্রভৃতি বহু মনীষীবর্গই এ সময় মহা ধুরন্ধর পণ্ডিত। ইঁহারা সকলেই যে মধুসূদনের প্রভাবে প্রভাবান্বিত, মধুসূদনের বেদান্তবিচারদ্বারা উপকৃত ইহা—সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। সুতরাং মধুসূদন তাঁহার আচার্য্যজীবনে যে বহু দণ্ডী সন্ন্যাসিবৃন্দের গুরুর আসন লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মধুসূদনের সদাচার ও ভগবন্নিষ্ঠা।

তাহার পর মধুসূদন যে কেবল পাণ্ডিত্য ও শিষ্যশিক্ষা এবং সম্প্রদায়ের ব্যবস্থা লইয়া থাকিতেন, তাহা নহে। শিষ্যবর্গ সন্ন্যাসিবৃন্দ যাহাতে যথার্থ সন্ন্যাসী হইতে পারেন, সে দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি রাখিতেন। একদিকে সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্যানুষ্ঠান এবং অন্যদিকে স্বয়ং শ্রীগোপালের সেবার দ্বারা ভগবদ্‌ভক্তির অভ্যাস এই উভয়ই মধুসূদনে পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। এমন কি, তিনি এজন্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের কঠোর ত্যাগভাবের ব্যাখ্যারও একটু অন্যথা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মধুসূদনের এই ভাবটী "কে বয়ং বরাকাঃ" ইত্যাদি বাক্যে গীতার—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"।

এই শ্লোকের টীকায় প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে। মধুসূদনের জ্ঞানের গভীরতা দেখিলে বুঝা যায়—উপাসনাদি তিনি তাঁহার পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ লোকরক্ষার্থই স্বয়ং যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতেন। "দণ্ডগ্রহণমাত্রেণ নরোনারায়ণো ভবেৎ" ও "নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রের উদ্দেশ্য না বুঝিয়া অনেক বিবিদিষা সন্ন্যাসীই

সন্ন্যাসীর নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং ভগবদুপাসনা পর্য্যন্ত বর্জ্জন করেন, অথচ শরীররক্ষার্থ ভিক্ষাটনাদি শাস্ত্র যথাবিধি পালন করেন। অনেকে আবার ইহাতেই বিলাসিতা করিয়াও থাকেন। বিদ্বৎসন্ন্যাসীর বিধি-নিষেধাতীতভাবের অনুকরণের জন্য যেন সকলেই ব্যস্ত। মধুসূদন এই অনধিকারিগণের ভ্রষ্টাচারনিবারণের জন্য বিবিদিষা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য যে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং ভগবদুপাসনাদি তাহা পূর্ণমাত্রায় অনুষ্ঠান করিতেন। কেবল সমাধি অবস্থা ভিন্ন এ সকলের কখনই সময়পর্য্যন্তও অতিক্রম করিতেন না। ব্রহ্মর্ষিভগবান্ বশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন—

"ন কর্ম্মাণি ত্যজেদ্ যোগী কর্ম্মভিস্ত্যজ্যতে হ্যসৌ।
কর্ম্মণো মূলভূতস্য সঙ্কল্পস্যৈব নাশতঃ॥"

অর্থাৎ যোগী কর্ম্মত্যাগ করেন না, কর্ম্মই যোগীকে ত্যাগ করে, যেহেতু কর্ম্মের মূলভূত যে সংকল্প তাহার নাশ হইয়া যায়। মধুসূদনের চরিত্রে এই বশিষ্ঠোক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্ত হইতে পারিত। এইরূপে মধুসূদন আদর্শসন্ন্যাসীর আচরণ করিয়া শিষ্যসেবকবর্গকে আদর্শসন্ন্যাসী হইবার জন্য শিক্ষা দিতেন। মধুসূদনের সময় তাঁহার শিষ্য, প্রশিষ্য ও শিষ্যানুশিষ্য এবং অনুরাগিগণের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মভাবের একটা প্রবল প্রবাহই বহিয়াছিল। ভগবান্ শঙ্কর যেমন সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের পুনঃপ্রবর্ত্তন করেন এবং দক্ষিণদেশে বিদ্যারণ্য যেমন তাহার সংরক্ষণ করেন, মধুসূদন তদ্রূপ উত্তরভারতে সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের সংস্কারসাধন করেন। অদ্বৈতসম্প্রদায়ে মধুসূদনের স্থান অতি উচ্চে—শঙ্কর, সুরেশ্বর, পদ্মপাদ, বাচস্পতি ও চিৎসুখ প্রভৃতি আচার্য্যগণেরই সমান বলিতে হয়।

(১) অদ্বৈতসিদ্ধি
(২) গীতার টীকা
(৩) গীতা নিবন্ধ
(৪) ভক্তিরসায়ন
(৫) বেদান্তকল্পলতিকা
(৬) সিদ্ধান্তবিন্দু
(৭) মহিম্নস্তোত্র টীকা
(৮) প্রস্থানভেদ
(৯) সংক্ষেপশারীরক টীকা
(১০) আনন্দমন্দাকিনী
(১১) অদ্বৈতরত্নরক্ষণ
(১২) হরিলীলাবিবেক
(১৩) ভাগবতটীকা (অপূর্ণ)
(১৪) শাণ্ডিল্যসূত্র
(১৫) রাসপঞ্চাধ্যায়
(১৬) কৃষ্ণকুতূহল নাটক
(১৭) আত্মবোধ টীকা।

যে গুলি সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, তাহারা—

(১) জটাজূটবিকৃতিবিবৃতি
(২) সর্ব্ববিদ্যাসিদ্ধান্তবর্ণন
(৩) সিদ্ধান্তলেশ টীকা,
(৪) রাজপ্রতিবোধ
(৫) বেদস্তুতি টীকা

কারণ, এই টীকাগুলি অপরের নামেও প্রচলিত দেখা যায়।

এই সকল গ্রন্থের রচনাপারম্পর্য্য আজ আর নির্ণয় করা যায় না, অথবা ইঁহাদের উপলক্ষসম্বন্ধেও কোন গল্পকথা শুনা যায় না। তথাপি আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহা এই—

অদ্বৈতসিদ্ধিরচনার উপলক্ষ—গুরু রামতীর্থের প্ররোচনা।

সিদ্ধান্তবিন্দুরচনার উপলক্ষ—বলভদ্র নামক একজন ব্রহ্মচারী শিষ্যের অনুরোধ।

গীতার টীকারচনার উপলক্ষ—গুরু শ্রীবিশ্বেশ্বর সরস্বতীর আদেশে তাঁহার নিকট পরীক্ষা প্রদান।

অদ্বৈতরত্নরক্ষণরচনার উদ্দেশ্য—শঙ্করমিশ্রের ভেদরত্ন নামক গ্রন্থের উত্তরপ্রদান।

এখন ইঁহাদের রচনাপারম্পর্য্য নির্ণয় করিতে হইলে দেখা যায়—

অদ্বৈতসিদ্ধির মধ্যে বেদান্তকল্পলতিকার নাম আছে।
মহিম্নস্তোত্র টীকার মধ্যে বেদান্তকল্পলতিকার নাম আছে।
গীতাটীকার মধ্যে ভক্তিরসায়নের উল্লেখ আছে।
ভক্তিরসায়নমধ্যে বেদান্তকল্পলতিকার নাম আছে।
অদ্বৈতসিদ্ধির মধ্যে গীতানিবন্ধের নাম আছে।
অদ্বৈতসিদ্ধির মধ্যে সিদ্ধান্তবিন্দুর উল্লেখ আছে।
ভক্তিরসায়নমধ্যে সিদ্ধান্তবিন্দুর উল্লেখ আছে।
গীতাটীকার মধ্যে সিদ্ধান্তবিন্দুর উল্লেখ আছে।
গীতাটীকামধ্যে গীতানিবন্ধের উল্লেখ আছে।
গীতাটীকামধ্যে অদ্বৈতসিদ্ধির উল্লেখ আছে।
অদ্বৈতরত্নরক্ষণমধ্যে অদ্বৈতসিদ্ধির উল্লেখ আছে।
সিদ্ধান্তবিন্দুমধ্যে বেদান্তকল্পলতিকার উল্লেখ আছে।

ইহা হইতে মনে হয়—খুব সম্ভব মধুসূদন এক সঙ্গেই অনেক গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কোন কোনটার মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্য অক্ষুণ্ণ আছে।

সন্ন্যাসিবৃন্দকে ভক্তির উপদেশ।

প্রবাদ আছে, এক সময় কাশীর জ্ঞানমার্গানুরাগী সন্ন্যাসিবৃন্দ মধুসূদনের ভগবান্ গোপালবিগ্রহের সেবা ও পূজা দেখিয়া সংশয়াকুল হন। তাঁহারা ভাবিলেন—যে মধুসূদন "অহং ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বেদমহাবাক্যের সাধনের পথপ্রদর্শক, যে মধুসূদন জ্ঞানী ও সন্ন্যাসীর আদর্শ, তিনি কি করিয়া আবার সাকার উপাসনারত হইতে পারেন?

তাঁহারা একদিন দলবদ্ধ হইয়া মধুসূদনের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং এই কথাই প্রশ্ন করিলেন। মধুসূদন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—

"অদ্বৈতসাম্রাজ্যপথাধিরূঢ়া স্তৃণীকৃতাখণ্ডলবৈভবাশ্চ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন, দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন।"

অর্থাৎ আমরা অদ্বৈতসাম্রাজ্যের পথে আরূঢ় হইয়াছি এবং ইন্দ্রের

বৈভবও তৃণজ্ঞান করিয়াছি, তথাপি কোন এক শঠ গোপবধূলম্পট বলপূর্ব্বক আমাদিগকে দাসী করিয়া ফেলিয়াছে। এস্থলে প্রথম চরণের পরিবর্ত্তে "অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যা" এবং দ্বিতীয় চরণের পরিবর্ত্তে "সাম্রাজ্যসিংহাসনলব্ধদীক্ষা," এইরূপ পাঠও শ্রুত হয়।

তিনি আরও বলিয়াছিলেন—

"বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥"

অর্থাৎ যাঁহার হস্ত বংশীবিভূষিত, যাঁহার কান্তি নবনীরদসম, যাঁহার পীতবসন পরিধান, বিম্বফলের ন্যায় যাঁহার অধরোষ্ঠ অরুণবর্ণ, যাঁহার মুখ পূর্ণেন্দুর ন্যায় সুন্দর, যাঁহার নেত্র পদ্মকর্ণিকাসদৃশ আয়ত, এতাদৃশ কৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠতত্ত্ব আমি আর জানি না।

সন্ন্যাসিবৃন্দ চমৎকৃত হইলেন, তাঁহাদের জ্ঞানী-অভিমান চূর্ণ হইয়া গেল। বস্তুতঃ, অদ্বৈতবাদীর ইহাই সিদ্ধান্ত যে, জ্ঞানপরিপাকের জন্য যেমন ভিক্ষাটনাদি প্রয়োজন বা বিহিত, তদ্রূপ জ্ঞানানুকূল উপাসনাও প্রয়োজন বা বিহিত। জ্ঞানপরিপাক হইলে উহা স্বয়ংই পরিত্যক্ত হইয়া যায়। বস্তুতঃ যোগী কর্ম্মত্যাগ করেন না, কর্ম্মই যোগীকে ত্যাগ করিয়া থাকে—ইহাই সত্য কথা। ভক্তের শেষ উপাসনা অভেদভাবে উপাসনা বা আত্মার আত্মা বলিয়া ধ্যান।

কেহ বলেন—এতদ্দ্বারা মধুসূদন অদ্বৈতসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ কথাই বলিলেন। অন্যে বলেন—মধুসূদন শেষকালে নির্ব্বিশেষবাদ পরিত্যাগ করিয়া সবিশেষ ব্রহ্মবাদী ভক্ত হইয়াছিলেন।

ইহা কিন্তু নিতান্ত ভুল। কারণ, তিনি প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন—যাঁহারা অদ্বৈতসাম্রাজ্যের পথে আরূঢ় তাঁহারাই বলপূর্ব্বক দাসী হইয়া

পড়িয়াছিলেন; তাঁহারা অদ্বৈতসাম্রাজ্যের মধ্যেও গমন করেন নাই, আর সে সাম্রাজ্যের অধীশ্বরও হন নাই। সুতরাং এরূপ ব্যক্তি যে দাসী হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

আর দ্বিতীয় বাক্যে মধুসূদন বলিয়াছেন—"সাকার কৃষ্ণ হইতে অন্য শ্রেষ্ঠতত্ত্ব আমি জানি না"। কিন্তু ইহাতে প্রমাণ হয় না যে, পরব্রহ্ম সগুণ ও সাকারই, নির্গুণ নির্বিশেষ নহেন। ইহার অর্থ—যে সাকার কৃষ্ণের তিনি উপাসনা করেন তিনিই উপাস্য পরমতত্ত্ব। অর্থাৎ তাঁহার উপাস্যতত্ত্বের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠতম—এই মাত্র তিনি জানেন। কারণ, এস্থলে "অহং ন জানে" এই কথায় তাঁহার এই কৃষ্ণতত্ত্ব "জ্ঞেয়" বা "দৃশ্য" বস্তু হইতেছেন। আর যাহা দৃশ্য, তাহা মিথ্যা, তাহা তিনি এই অদ্বৈতসিদ্ধিতেই প্রমাণিত করিয়াছেন। নির্বিশেষ অদ্বৈততত্ত্ব জ্ঞেয় বা দৃশ্যবস্তু নহে, আর তজ্জন্য তাহাই ত্রিকালে অবাধ্য সত্য বস্তু। ইহাই কৃষ্ণ হইতে পর তত্ত্ব আর "তাহা আমি জানিনা" ইহা বলিয়া তাহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন। অতএব মধুসূদন অদ্বৈতবিরোধী কোন কথাই বলেন নাই। প্রত্যুত যে সব জ্ঞানাভিমানী অল্পবুদ্ধি, তাঁহাদিগকে ভক্তির পথ দেখাইয়া কিছুদিন তাঁহাদিগকে উপাসনারত করিলে তাঁহাদের জ্ঞানে অধিকারই হইবে—এই অভিপ্রায়ে তিনি ঐরূপ বলিয়াছেন—সন্দেহ নাই।

যদি বলা যায়, অদ্বৈতসিদ্ধিরচনার পর তাঁহার মতের পরিবর্তন হইয়াছিল। অতএব অদ্বৈতসিদ্ধির কথার দ্বারা সাকার কৃষ্ণকে উপাস্য-তত্ত্ব সুতরাং মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করা উচিত নহে?

তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, মধুসূদন অদ্বৈতমতের খণ্ডন করিয়া অথবা নিজমতপরিবর্তনের উল্লেখ করিয়া কোন গ্রন্থই লেখেন নাই। আর তাঁহার শিষ্য ও সেবকসম্প্রদায়ের মধ্যেও সেরূপ কোন কথা বা তত্ত্বগ্রাহী ব্যবহারও শ্রুত বা দৃষ্ট হয় না। অতএব মধুসূদন শেষকালে সবিশেষ ব্রহ্মবাদী ভক্ত হইয়াছিলেন—এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত।

যদি বলা যায়, নির্বিশেষ তত্ত্বকেও "জ্ঞেয়" বা "দৃশ্য" বলা যাইতে পারে। কারণ, যে ব্যক্তি বলে যে, নির্বিশেষ তত্ত্বই চরম তত্ত্ব, সে ত সেই নির্বিশেষ তত্ত্বের জ্ঞানপূর্ব্বকই একথা বলে, অতএব তাহাও দৃশ্য এবং তজ্জন্য তাহাও মিথ্যা হউক।

ইহার উত্তর এই যে, নির্বিশেষ তত্ত্বকে বিধিমুখে জানা যায় না, কিন্তু 'নিষেধমুখে' জানা যায়—বলা হয়; অর্থাৎ 'তাঁহার কিছু বিশেষাদি নাই' —'যাহাই জানা হয়, তাহাই তাহা নহে'—এইরূপেই তাঁহাকে জ্ঞেয় বলা হয়। অতএব এই দুইরূপ জানা, এক প্রকার জানা নহে। নিষেধমুখে জানার চরম হইতেছে—জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয়ভাবের সম্পূর্ণ বিলয়। কারণ, যতক্ষণ না ইহারা বিলীন হয়, ততক্ষণ ইহারা প্রত্যেকেই আবার জ্ঞেয় হয়, সুতরাং যতক্ষণ যাহাই জ্ঞেয় হয়, ততক্ষণ তাহারই আবার জ্ঞাতা ও জ্ঞান অন্তরূপে প্রকাশ পায়। আর তাহারও নিষেধে জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়-ভাবশূন্য নির্বিশেষ আত্মমাত্র বা ব্রহ্মমাত্রই থাকে। আর "ইহা এই" "ইহা ঘট" "ইহা পট" এইরূপ বিধিমুখে, যাহাই জানা যায়, —যাহাই জ্ঞেয় হয়, তাহাতে বিশেষ থাকে বা ভেদ থাকে অর্থাৎ ধর্ম্ম-ধর্ম্মীর ভেদজ্ঞান থাকে। তাহাতে জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়ভাব থাকে। এইজন্য এই দুই জানা পৃথক্। নির্বিশেষ তত্ত্বকে এই "নিষেধমুখে জ্ঞেয়" বলিলে তাহার নির্বিশেষত্ব বিনষ্ট হয় না। সুতরাং "বংশীবিভূষিতকর" ইত্যাদি দৃশ্যত্ব ধর্ম্ম সগুণ সবিশেষ কৃষ্ণেই থাকে, এজন্য তিনিই জ্ঞেয় ও উপাস্য, সুতরাং মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধ হন, পক্ষান্তরে নিষেধমুখে জ্ঞেয় নির্বিশেষ ব্রহ্মের দৃশ্যত্ব শঙ্কা করিয়া তাহার মিথ্যাত্ব সিদ্ধ করিতে পারা যায় না। তথাপি এই উপাস্য কৃষ্ণ উপাসককে দর্শনাদি দান করেন এবং তাঁহার অভীষ্টও সিদ্ধ করেন, যেহেতু যাহা মিথ্যা তাহা তিনকালেই নাই, অথচ তাহা জ্ঞেয় ও দৃশ্য হয়।

এই সম্পর্কে আবার কেহ কেহ বলেন—ব্রহ্ম নির্বিশেষ হইলে তিনি

মধুসূদনের সন্ন্যাসী রক্ষা ও যোদ্ধা নাগাসন্ন্যাসীর সৃষ্টি।

মধুসূদনের সময় কাশীধামে মুসলমান মোল্লাগণের বড়ই উৎপাত ছিল। মোল্লাগণ সশস্ত্র হইয়া দলবদ্ধভাবে বিচরণ করিত এবং সুবিধা পাইলেই সন্ন্যাসিগণকে নিহত করিত। সন্ন্যাসিগণ যথাসম্ভব গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতেন, কিন্তু গঙ্গাস্নান ও দেবদর্শন-ব্যপদেশে যখনই বাহিরে আসিতেন তখনই তাঁহাদের বিপদ। তখনই তাঁহারা এই সব মোল্লাগণের বধ্য হইতেন। অধিকাংশ সময়ে গঙ্গাস্নান-কালেই তাহারা এই সকল সন্ন্যাসিগণকে আক্রমণ করিত। অনেক সময় গঙ্গাজলের পরিবর্ত্তে রক্তের স্রোতই প্রবাহিত হইত। মোল্লাগণের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া কোন ফলই হইত না, কারণ, মুসলমান আইনে রাজা মোল্লাগণের বিচারে অনধিকারী। ক্রমে এই উৎপাত অতি ভীষণ আকার ধারণ করিল, সন্ন্যাসিকুল নির্মূল হইতে চলিল।

এ সময় কাশীতে মধুসূদনের যশঃ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। একদিন বহু সন্ন্যাসী মিলিত হইয়া মধুসূদনের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা ইহার প্রতীকারের জন্য মধুসূদনকে অনুরোধ করিলেন। মধুসূদন নিরুপায় হইয়া টোডর মল্লের দ্বারা বাদসাহ আকবরের নিকট সন্ন্যাসীদিগের রক্ষার জন্য প্রার্থনা জানাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মধুসূদন, টোডরমল্ল ও আকবর উভয়েরই পরিচিত, উভয়েই মধুসূদনের নিকট উপকৃত। সুতরাং মধুসূদনের প্রার্থনা নিষ্ফল হইবার নহে। টোডরমল্ল ভাবিতে লাগিলেন—কি কৌশলে এই কার্য্য সিদ্ধ করা যায়।

মধুসূদনের আকবরের সভায় সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ।

টোডরমল্ল আকবরের সমীপে মধুসূদনের প্রার্থনা জানাইলেন। আকবর মধুসূদনের প্রার্থনা শুনিয়া একটু চিন্তিত হইলেন; কারণ, মোল্লাগণের বিরুদ্ধে আদেশপ্রদান রাজ্যের পক্ষে নিরাপদ নহে। কিন্তু তাহা হইলেও আকবর কি ভাবিয়া মধুসূদনের পাণ্ডিত্যের পরিচয়লাভের

জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। টোডরমল্লও তাহাই চাহেন। কারণ, উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে আকবর আর অন্যমত করিতে পারিবেন না। অবিলম্বে মধুসূদনের নিকট এই সংবাদ প্রেরিত হইল। মধুসূদন সদলবলে অগত্যা দ্বিতীয়বার আকবরের সভায় উপস্থিত হইলেন। নানা সম্প্রদায়ের অনেক বিশিষ্ট পণ্ডিতই বিদ্যানুরাগী আকবরের সভা সমলঙ্কৃত করিতেন। আকবর প্রায়ই ইঁহাদের দার্শনিক বিচার শ্রবণ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। এক্ষণে ইঁহাদের সঙ্গে মধুসূদনের বিচার শুনিবার ইচ্ছা হইল।

যথাসময়ে সভা হইল। নানাদেশ দেশান্তর হইতে আরও অনেক পণ্ডিত আসিলেন। পক্ষ-প্রতিপক্ষ স্থির হইল। বিচারের বিষয় হইল—দ্বৈত সত্য, কি অদ্বৈত সত্য। মধুসূদনের বিচার শ্রবণ করিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। যিনি অদ্বৈতসিদ্ধির রচনা সদ্যঃ সদ্যঃ সমাপ্ত করিয়াছেন, তাঁহার সমক্ষে দ্বৈতবাদী কে স্থির থাকিতে পারেন? মধুসূদনের জয়-জয়কার বিঘোষিত হইল। দ্বৈতবাদী মোল্লাপণ্ডিতগণও মুগ্ধ হইলেন। তখন পণ্ডিতগণ আকবরের ইচ্ছানুসারে মধুসূদনকে এই প্রশস্তি দিলেন—

"বেত্তি পারং সরস্বত্যাঃ মধুসূদনসরস্বতী।
মধুসূদনসরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরস্বতী॥"

অর্থাৎ ভগবতী সরস্বতীর পার মধুসূদন জানেন, আর মধুসূদনের পার ভগবতী সরস্বতীই জানেন। যেমন যোগ্য ব্যক্তি, প্রশস্তিও তদ্রূপই হইল। মধুসূদনের অতুলনীয় মহত্ত্ব সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল।

এইবার মধুসূদন সম্রাটের নিকট সন্ন্যাসিরক্ষার প্রার্থনা জানাইবার উপযুক্ত সময় পাইলেন। মধুসূদন মোল্লাগণকর্তৃক সন্ন্যাসিদিগের নিধন-বার্ত্তা সবিনয়ে নিবেদন করিলেন। মধুসূদনের গুণমুগ্ধ সভায় মোল্লাগণ লজ্জিত হইলেন। ধর্ম্মভীরু বুদ্ধিমান্ আকবর মোল্লাদিগের বিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা! মোল্লাগণের যেমন

বিচার হয় না, সন্ন্যাসিগণেরও তদ্রূপ বিচার হইবে না, তাঁহারা আত্মরক্ষা করুন"। মোল্লাগণও আর আপত্তি করিতে সাহসী হইলেন না।

বাদসাহের আদেশ মুহূর্ত্তমধ্যে চারিদিকে প্রচারিত হইল। মধুসূদন কাশী ফিরিয়া আসিলেন। এখন সন্ন্যাসিগণ কিরূপে আত্মরক্ষা করিবেন সকলেই ভাবিতেছেন। মধুসূদন অতি পুরাকাল হইতে প্রবর্ত্তিত নাগসন্ন্যাসীর দলকে যোগবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যাশিক্ষাও অনুমোদন করিলেন এবং রাজপুত রাজগণের বহু দেশীয় সৈন্যকে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া সন্ন্যাসী-সৈন্যের সৃষ্টিতেও সম্মতি দান করিলেন। অচিরে সমানে সমানে যুদ্ধ বাধিল। মোল্লাগণ নিরস্ত হইল। সন্ন্যাসিকুল রক্ষা পাইলেন। বাস্তবিকই সেই নাগাসন্ন্যাসীর দল অদ্যাবধি ধর্ম্মার্থ জীবন দান করিতে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন। এখনও তাঁহারা অস্ত্রবিত্তর যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকেন। শুনা যায়—বহুপূর্ব্বে আলেকজাণ্ডারের সময়ও নাগাসন্ন্যাসিগণ দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

মধুসূদনের আপ্তকামভাব। গোরক্ষনাথের পরীক্ষা।

গুরু গোরক্ষনাথ যোগিসম্প্রদায়ের গুরু। তিনি সিদ্ধ যোগী, আর এখনও সেই সিদ্ধদেহে তিনি বিরাজ করিতেছেন। যোগিসম্প্রদায় ইহা এখনও বিশ্বাস করেন।

মধুসূদনের যোগসিদ্ধি, জ্ঞানৈশ্বর্য্য ও বিশ্ববিশ্রুত যশোরাশির কথা ক্রমে গুরু গোরক্ষনাথের জ্ঞানগোচর হইল। ধনিগণ যেমন ধনবানের সংবাদ রাখেন, বলবান্ যেমন বলবানের সংবাদ রাখে, সিদ্ধগণও কে কোথায় কবে সিদ্ধ হইতেছেন—এ সংবাদ রাখিয়া থাকেন। এই জন্যই ভগবান্ শঙ্করের অবতার হইয়াছে কি না—ইহা জানিবার জন্য ভগবান্ বেদব্যাস উত্তরকাশীতে ছদ্মবেশে শঙ্করকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। এই জন্যই ব্রহ্মা কৃষ্ণকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। আর এই জন্যই অনেকে অনেক সময় সাধুমহাত্মার দর্শনলাভ করিয়া থাকেন।

মধুসূদন গঙ্গাস্নান করিয়া তীরে উঠিতেছেন, এমন সময় নিজ বেশে ভগবান্ গোরক্ষনাথ মধুসূদনের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। মধুসূদন তেজঃপুঞ্জকলেবর যোগিবরকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিলেন। গোরক্ষনাথ আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন—"মধুসূদন! তুমি সিদ্ধ হইয়াছ। আমার নিকট একটী চিন্তামণি রত্ন রহিয়াছে, আমি উপযুক্ত পাত্রের অভাবে ইহাকে বহন করিয়া বেড়াইতেছি। এক্ষণে তোমাকে এই বস্তুর যোগ্য অধিকারী বিবেচনা করিয়া ইহা তোমাকে দিতে আসিয়াছি, তুমি ইহা গ্রহণ কর, তোমার যখন যাহার অভাব হইবে, ইহার প্রভাবে তাহা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হইবে, আমার আর দেহরক্ষার বাসনা নাই। অতএব তুমিই ইহার রক্ষা কর।"

মধুসূদন অবনতমস্তকে বলিলেন—"মহাত্মন্! আমার কোন অভাবই নাই, সুতরাং ইহা আমার নিষ্প্রয়োজন, আপনি ইহা কোন যোগ্যপাত্রে অর্পণ করুন।"

গোরক্ষনাথ বলিলেন—"না, ইহার যোগ্য পাত্র আমি আর দেখিতেছি না, এজন্য তোমাকেই ইহা দিতে ইচ্ছা করি। তুমিই ইহা গ্রহণ কর।"

মধুসূদন দেখিলেন—যোগিবর ইহা তাঁহাকে একান্তই দিবেন। তখন তিনি বলিলেন—"তাহা হইলে আমি উহার যেরূপ ব্যবহার করিব, তাহাতে আপনার কোন আপত্তি থাকিবে না?"

গোরক্ষনাথ বলিলেন—"না"। ইহা শুনিয়া মধুসূদন হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ করিলেন। গোরক্ষনাথ সেই "চিন্তামণি রত্ন" মধুসূদনের হস্তে অর্পণ করিলেন। মধুসূদন গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"ভগবন্! তবে ইহা লইয়া আমি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারি।"

গোরক্ষনাথ বলিলেন—"হাঁ, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার।" মধুসূদন তৎক্ষণাৎ উহা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

গোবৰ্দ্ধনাথ তখন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"দেখ দেখি, চিন্তামণি বস্তুটী আমি যোগ্য পাত্রে দিয়াছি কিনা ?"

বস্তুতঃ, যিনি বিদ্যার্জ্জনকালে মহামতি গঙ্গেশের "চিন্তামণি গ্রন্থ" আয়ত্ত করিয়াছেন, এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া যিনি চিন্তামণি-স্বরূপ পরমাত্মবস্তু লাভ করিয়াছেন, তিনি কি আর চিন্তামণি প্রস্তরের জন্য আগ্রহ করিতে পারেন ?

মধুসূদনের নবদ্বীপে আগমন।

বহুকাল কাশীবাস করিবার পর, কি কারণে জানা যায় না—মধুসূদন একবার নবদ্বীপে আগমন করেন। এ সময় মধুসূদন অতিবৃদ্ধ হইলেও পথপর্যাটনাদিতে সম্পূর্ণ সমর্থই ছিলেন। বহু শিষ্যসেবক সহ মধুসূদন ধীরে ধীরে নবদ্বীপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দেখিলেন—নবদ্বীপ তখনও প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণে পরিপূর্ণ। মুসলমান রাজত্ব নবদ্বীপের জ্ঞানৈশ্বর্য্য কিছুমাত্র ম্লান করে নাই। বহু টোলের মধ্যেই ন্যায়প্রমুখ বহুশাস্ত্রই অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হইতেছে। শুনিলেন—বৃদ্ধ জগদীশ, বৃদ্ধ হরিরাম, অতি বৃদ্ধ মথুরানাথ তখনও জীবিত। শুনিলেন—বালক গদাধর ন্যায়শাস্ত্রে সদ্যঃ উদীয়মান রবিসদৃশ, এবং ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত।

ঘটনাচক্রে মধুসূদন গদাধরের গৃহেই আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। গদাধর অদ্বিতীয় বেদান্তী সন্ন্যাসী সশিষ্য মধুসূদনকে পাইয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলেন এবং যথোচিত সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। নবদ্বীপের আবালবৃদ্ধবনিতা কাশীর সন্ন্যাসিদর্শনে আসিয়া উপস্থিত হইল। গদাধরের গৃহ উৎসবক্ষেত্রে পরিণত হইল। সাধু এবং পণ্ডিতগণমধ্যে যেন একটা সাড়া পড়িয়া গেল।

পণ্ডিতে পণ্ডিতে মিলন, সুযোগ উপস্থিত হইলেই বিচার হয়। গদাধর, মধুসূদনের বেদান্ত ও ন্যায় প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য

দেখিয়া পদে পদে চমৎকৃত হইতে লাগিলেন। মধুসূদনও গদাধরের বুদ্ধিমত্তার যথেষ্ট সাধুবাদ করিলেন। কিন্তু তথাপি গদাধর অদ্বৈত-সিদ্ধান্তের যতই পরিচয় পাইতে লাগিলেন, তিনি ততই অন্তরে অন্তরে ব্যাকুলতাই অনুভব করিতে লাগিলেন। অপর প্রবীণ নৈয়ায়িকগণও প্রায়ই বিচারার্থ গদাধরের গৃহে আসিতেন, কিন্তু সকলেই দুই চারি কথার পরই মধুসূদনের নিকট মস্তক অবনত করিতেন। ইহা দেখিয়া গদাধরের কাতরতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কারণ, গদাধর অন্তরে অন্তরে ন্যায়ের দ্বৈতসিদ্ধান্তের অনুরাগী ছিলেন। তিনি শিরোমণির দীধিতি টীকায় "অখণ্ডানন্দবোধায়" পদের দ্বৈতপক্ষেরই ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

মহামতি জগদীশ এ সময় যথেষ্ট বৃদ্ধ হইয়াছেন, তথাপি একদিন তিনি সন্ন্যাসী মধুসূদনকে দেখিতে আসিলেন। কারণ, মধুসূদনের পাঠ্যাবস্থায় জগদীশের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। উভয়েই উভয়কে যথোচিত সাদর সম্ভাষণ করিলেন, এবং কথায় কথায় বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। জগদীশ অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক হইলেও, অদ্বৈত-বেদান্তের অনুরাগী ছিলেন। কারণ, শিরোমণির "অখণ্ডানন্দবোধায়" পদের অদ্বৈতপর ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। ওদিকে এক সাধুর আশীর্ব্বাদেই তিনি পণ্ডিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিত। মহামতি জগদীশ পরমহংস মধুসূদনের অতিপ্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং অসামান্য সূক্ষ্ম অনুভবের পরিচয় পাইয়া মধুসূদনকে গুরুবৎ সম্মানিত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মহামতি জগদীশও মধুসূদনের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছেন শুনিয়া নবদ্বীপের নৈয়ায়িক সমাজই পরাজিত—ইহাই সকলে বলিতে লাগিল। ন্যায়শাস্ত্রে মধুসূদনের প্রথম শিক্ষাগুরু মহামতি মথুরানাথ তর্কবাগীশ এ সময় অতিবৃদ্ধ, কিন্তু তথাপি নবদ্বীপের মর্য্যাদারক্ষা

করিবার জন্য এ সময়ও তিনি সভাক্ষেত্রে বিচারাদি করিয়া থাকেন। তিনি মধুসূদনের নিকট জগদীশের কথা শুনিয়া বাস্তবিকই বিচলিত হইলেন। কিন্তু নিজ শিষ্যেরই মহত্ত্ব মনে করিয়া অন্তরে অন্তরে আনন্দও অনুভব করিলেন, আর তজ্জন্য বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন না। সাধারণ লোকে বুঝিল—মথুরানাথও বিচারে অগ্রসর হইলেন না। এদিকে সন্ন্যাসী মধুসূদনের ত্যাগ, সাধুতা ও পরানুকম্পা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশিতে জনসাধারণ সকলেই মুগ্ধ। তাহারা শ্লোক রচনা করিয়া মধুসূদনের জয়জয়কার চারিদিকে বিঘোষিত করিতে লাগিল। অদ্যাবধি পণ্ডিতসমাজে সেই শ্লোকগুলি শ্রুত হয়। সেই শ্লোকগুলি এই—

"নবদ্বীপে সমায়াতে মধুসূদনবাক্‌পতৌ।
চকম্পে তর্কবাগীশঃ কাতরোঽভূদ্ গদাধরঃ॥"

কেহ কেহ বলেন—

"মথুরায়াঃ সমায়াতে মধুসূদনবাক্‌পতৌ।
অনীশো জগদীশোঽভূৎ কাতরোঽভূদ্ গদাধরঃ॥"

এস্থলে দ্বিতীয় শ্লোকে "মথুরায়াঃ" পদের পরিবর্তে "নবদ্বীপ" পাঠও শ্রুত হওয়া যায়।

মধুসূদন ও মথুরানাথ তর্কবাগীশ।

সন্ন্যাসী হইলেও গুরুর প্রতি সম্মানপ্রদর্শন সকলেই করিয়া থাকেন। মধুসূদন নিজ বিদ্যাগুরু মহামতি মথুরানাথের দর্শনার্থ একদিন তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। মথুরানাথ গুরু হইলেও শিষ্য সন্ন্যাসীর প্রতি যেরূপ সম্মানপ্রদর্শন করা উচিত, তাহাই করিলেন, মধুসূদনও তদ্রূপই করিলেন।

উভয়েই বহু সদালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। মথুরানাথের আনন্দ আর ধরে না। নিজ শিষ্য আজ ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, এ আনন্দ কি

রাখিবার স্থান আছে! যাহা হউক, এই সকল সদালাপের একটী কথা আজও পণ্ডিতসমাজে শুনিতে পাওয়া যায়।

মধুসূদন যখন মথুরানাথের গৃহে উপস্থিত হন, শুনা যায়, মথুরানাথ সেই অতিবৃদ্ধ অবস্থায় ক্ষীণদৃষ্টিনিবন্ধন চক্ষুর অতি নিকটে একখানি পত্র লইয়া অতি কষ্টে একখানি পুঁথি লিখিতেছিলেন। মধুসূদন ভাবিলেন—আহা! তাঁহার গুরু এত বৃদ্ধ অবস্থাতেও এত কষ্ট করিতেছেন কেন? হয়—পুস্তকখানি অতি প্রয়োজনীয়ই হইবে। অথবা মথুরানাথের শাস্ত্রের প্রতি অতিমাত্র আগ্রহ এখনও রহিয়াছে। তিনি তখন কৌতূহলপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাত্মন্! এত কষ্ট করিয়া এই বয়সে কি পুস্তক লিখিতেছেন?"

মথুরানাথ স্বরচিত একখানি ন্যায়শাস্ত্রের পুথীর নাম করিলেন। মধুসূদন ভাবিলেন—তাঁহার গুরু এখনও ন্যায়শাস্ত্র লইয়া কালক্ষেপ করিতেছেন কেন? এখনও কি মননের সময়? এখন ত নিদিধ্যাসনেরই সময় হইয়াছে! তিনি একটু বিস্মিত হইয়া হাঁসিতে হাঁসিতে একটী শ্লোক করিয়া বলিলেন—

"তর্ককর্কশবিচারচাতুরী, আকুলীভবতি যত্র মানসম্।

কিং তুরীয়বয়সা বিভাব্যতে—

মথুরানাথ মধুসূদনের ভাব বুঝিয়া সুখীই হইলেন, তিনি তখন নিজ ত্রুটি স্বীকার করিয়াই শ্লোকের চরণ পূর্ণ করিয়া বলিলেন—

"ধাতুরীপ্সিতমপাকরোতি কঃ॥"

অর্থাৎ কর্কশ তর্কশাস্ত্রের বিচারচাতুরী, যাহাতে চিত্ত আকুল হইয়া উঠে, তাহা আর কেন এই জীবনের চতুর্থভাগেও চিন্তা করিতেছেন—মধুসূদনের এই কথায় মথুরানাথ বলিলেন—ভগবানের ইচ্ছা কে নিবারণ করিতে পারে?

এইরূপ বহু সদালাপের পর মধুসূদন স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন,

এবং নবদ্বীপে পণ্ডিতসমাজমধ্যে বেদান্তের উপযোগিতা প্রচার করিয়া মিথিলা প্রভৃতি নানাস্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হরিদ্বারে মধুসূদনের অন্তর্ধান।

প্রবাদ আছে—মধুসূদন যখন শেষবার হরিদ্বারে আসেন, তখন তাঁহার বয়স প্রায় ১০৭ বৎসর হইয়াছিল। তিনি জীবনের শেষ কয়দিন এই স্থানেই অতিবাহিত করেন, এবং এই স্থানেই মোক্ষলাভ করেন। হরিদ্বার বা মায়াপুরী কাশী প্রভৃতি স্থানের ন্যায় মোক্ষক্ষেত্র। এখানে দেহত্যাগ হইলে জ্ঞানী ব্যক্তির মোক্ষলাভ হয়, আর জন্ম হয় না, যথা—

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরীদ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥

মধুসূদন যোগী ছিলেন, এবং সমাধিতে তিনি সিদ্ধিলাভও করিয়াছিলেন। দেহের অবস্থা দেখিয়া এইবার মধুসূদন বুঝিলেন—তাঁহার প্রয়াণকাল নিকটবর্ত্তী। তিনি সমাধিস্থ অবস্থাতেই অধিক সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। লোকজনের সঙ্গে শাস্ত্রালাপ ও উপদেশদান-কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল। সাধারণে বুঝিল—মধুসূদনের শরীর-গতি ভাল নাই। কয়েকদিন এই ভাবে অতিবাহিত করিয়া তিনি একদিন শিষ্যবর্গকে নিজ প্রয়াণেচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন এবং মায়াপুরীর গঙ্গাতীরে প্রাতঃকালে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বেচ্ছায় চিরসমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। কে বলিতে পারে—মহামতি মধুসূদন গীতোক্ত এই যোগেরই অনুষ্ঠানরত হইয়াছিলেন কি না?

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥

অংশ অংশীতে মিশিয়া গেল। মধুসূদন মধুসূদনে বিলীন হইলেন। মধুসূদন স্বস্বরূপে অবস্থিত হইলেন।

শিষ্যবর্গ সন্ন্যাসীর অন্ত্যেষ্টিবিধি অনুসারে মধুসূদনের স্থূলদেহ গঙ্গা-সলিলে সমাহিত করিলেন। মধুসূদনের সূক্ষ্মদেহ জ্ঞানগঙ্গায় মিশিয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণসমুদ্রে ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হইল। বিশুদ্ধ জলবিন্দু বিশুদ্ধ জলে মিশিয়া একীভূত হইয়া গেল।

ইহাই হইল পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রাচার্য্য মহামতি মধুসূদন সরস্বতীর জীবনবৃত্তান্ত। ইহাই সেই অমিতবুদ্ধি মহাপুরুষের জীবনচরিত। এই জীবনকথা সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতবর্গের মুখে যেরূপ শুনা গেল, তাহাই সঙ্গত করিয়া এস্থলে সঙ্কলিত করা হইল মাত্র। মধুসূদনের বৈরাগ্যাতিশয্যবশতঃই বোধ হয় তাঁহার কোন ভক্ত বা শিষ্য তাঁহার জীবনবৃত্ত লিপিবদ্ধ করেন নাই। রামানুজ প্রভৃতি অপর অতীত আচার্য্যবর্গের জীবিতকালে প্রস্তর মর্ম্মরপ্রতিমূর্ত্তি বা তৈল-চিত্রাদির ন্যায় তাঁহার কোন শিষ্যসেবকই কোন কিছুই নির্ম্মাণ করেন নাই, এবং বুদ্ধ শঙ্করাদির ন্যায় তাঁহার পরেও কিছুই নির্ম্মিত হয় নাই। আর এ কার্য্য না করিবার কারণ, বোধ হয়, মধুসূদনেরই অত্যধিক ত্যাগ-বৈরাগ্যশীলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং তাঁহার আকৃতিপ্রকৃতি অভ্রান্তভাবে বুঝিবার আজ আর কোন উপায়ই নাই। যিনি জগৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন, তাঁহার শিষ্যবর্গের এরূপ স্মৃতি-রক্ষার স্পৃহা উৎপন্ন হওয়াও সঙ্গত নহে। বস্তুতঃ, কার্য্যতঃ তাহাই হইয়াছে। জানি না, এই অনুরুচিত্ত অল্পবুদ্ধির হস্তে পড়িয়া মহামতি মধুসূদনকে আজ কতই বিকৃতরূপ ধারণ করিতে হইয়াছে! এ অপরাধের মার্জ্জনা এক্ষণে সেই মধুসূদন ও তাঁহার ভক্ত সাধুগণই করুন—ইহাই এস্থলে প্রার্থনা।

যাহা হউক, মধুসূদনের অদ্ভুত অমরকীর্ত্তি এই অদ্বৈতসিদ্ধিপাঠে

প্রবৃত্ত্যুৎপাদনের জন্য গ্রন্থপরিচয়ের পর এই গ্রন্থকারপরিচয়প্রসঙ্গে সমাপ্ত হইল। এখন ভাবিতে ইচ্ছা হয়—এরূপ গ্রন্থকারের উপদেশ গ্রহণীয় ও পালনীয় কি না? এরূপ ব্যক্তিকে আদর্শরূপে স্বীকার করা যায় কি না?

এই বিষয়টী চিন্তা করিলে দেখা যায়—যিনি সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভের পর স্বয়ং গ্রন্থরচনা করিয়া উপদেশ দান করেন—যিনি সাধক অবস্থার পর সিদ্ধ হইয়া নিজ অনুভূত এবং পরীক্ষিত সত্য স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া যান, তাঁহারই উপদেশ গ্রাহ্য, তাঁহারই প্রচারিত সত্য মাননীয় এবং তিনিই আদর্শপদবীতে অধিরূঢ় হইবার যোগ্য। অন্যথা তিনি সর্ব্বতোভাবে পূজ্য অথবা সর্ব্বমান্য হইলেও তাঁহার উপদেশ গ্রাহ্য নহে, তাঁহার নামে প্রচারিত সত্য মান্য নহে এবং তাঁহাকে আদর্শেরই আসনে আসীন করাও যায় না। অর্থাৎ যাঁহার জীবনে—সাধকভাব, সিদ্ধভাব এবং নিজ উপলব্ধ সত্যের স্বয়ং লিপিবদ্ধ করা—এই তিনটী কার্য্য সংঘটিত হয় না, অন্য কথায় এই তিনটীই যিনি করেন না, তাঁহার কথা মানিয়া চলা নিরাপদ নহে; কারণ—

যিনি সাধকমাত্র হইয়া স্বয়ংও কিছু লিপিবদ্ধ করেন, তাঁহার ঠিক্ সত্য প্রতিভাত না হইতে পারে, আর—

যিনি আজন্ম সিদ্ধমাত্র থাকিয়া স্বয়ংও কিছু লিপিবদ্ধ করেন, তাঁহার উপদেশপালনে লোকের সামর্থ্যাভাব হইতে পারে, আর—

যিনি সাধক ও সিদ্ধ হইয়াও স্বয়ং কিছু লিপিবদ্ধ করেন না, তাঁহার উপদেশ পরের হস্তে পড়িয়া বিকৃত হইতে পারে।

অতএব তাঁহাদের উপদেশপালন নিরাপদ নহে, তাহাতে ভুলভ্রান্তির অধিক সম্ভাবনাই ঘটিতে পারে। অতএব যাঁহার উপদেশ মানিয়া চলিতে হইবে, তাঁহার সাধকজীবন সিদ্ধজীবন ও গ্রন্থকারজীবন—এই তিনটীই থাকা একান্তই আবশ্যক। ইহার অন্যথা হইতে পারে না।

এখন মধুসূদনের বিষয় ভাবিলে দেখা যায়, তাঁহার সাধকজীবন

ছিল, তিনি সিদ্ধজীবনও লাভ করিয়াছিলেন, এবং তৎপরে তিনি নিজ উপলব্ধ সত্য—নিজ পরীক্ষিত সত্য, স্বয়ংই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অতএব তাঁহার জীবন অনুসরণীয়, তাঁহার উপদেশ পালনীয়।

বস্তুতঃ, তাঁহার সাধক জীবনও যে কিরূপ নির্দোষ, কিরূপ নির্মল, কিরূপ মহনীয় ও কিরূপ সদ্গুণসম্পন্ন, তাহার সীমা নির্দ্ধারণ করা যায় না; তাঁহার সিদ্ধজীবনও যে কতদূর লোকশিক্ষার অনুকূল, কতদূর যে পবিত্রতার আধার ও কতদূর সাধকের অনুকরণীয় গুণাবলীবিমণ্ডিত তাহা বলিয়া উঠা যায় না। সরলতা, সত্য, দয়া, নির্বৈরভাব, ত্যাগ, বৈরাগ্য, নিরভিমানিতা, শত্রু, মিত্র ও উদাসীনে সমভাব, গুরুভক্তি, ভক্তপূজা, সাধুসম্মান, লোকানুগ্রহস্পৃহা, নিষ্ঠা ও সিদ্ধি সকলই যেন পূর্ণমাত্রায় তাঁহাতে প্রকটিত। এরূপ মহাপুরুষের গ্রন্থ—এরূপ সিদ্ধপুরুষের গ্রন্থ—এরূপ আদর্শচরিত্রের গ্রন্থ—কাহার না চিত্ত আকর্ষণ করিবে। যদি গ্রন্থকর্ত্তার জীবন দেখিয়া, যদি গ্রন্থকারের চরিত্র দেখিয়া তাঁহার গ্রন্থপাঠে ঔচিত্যানৌচিত্য বিবেচনা করিতে হয়, আবশ্যকতা অনাবশ্যকতা নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে মধুসূদনের অতুল অক্ষয়কীর্ত্তি এই অদ্বৈতসিদ্ধিপাঠে কোন্ শ্রেয়স্কামীর না প্রবৃত্তি হইবে? মধুসূদন নিজ গুরুগণের অনুসরণ করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির শেষে লিখিয়াছেন—

সিদ্ধীনামিষ্টনৈষ্কর্ম্যব্রহ্মগানামিয়ং চিরাৎ।
অদ্বৈতসিদ্ধিরধুনা চতুর্থী সমজায়ত॥

অর্থাৎ অবিমুক্তাত্মভগবানকৃত ইষ্টসিদ্ধি, সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি এবং ব্রহ্মসিদ্ধির পর এই অদ্বৈতসিদ্ধি চতুর্থ সিদ্ধিগ্রন্থ হইল। বস্তুতঃ, উক্ত সিদ্ধিগ্রন্থ তিনখানি অদ্বৈতবেদান্তের স্তম্ভস্থানীয়; এক্ষণে এই অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থখানি তাহাদের পরবর্ত্তী বলিয়া উল্লেখ করায়, ইহার তৎসদৃশ প্রামাণ্য ও প্রয়োজনীয়তা এবং ইহাতে গ্রন্থকারের বিনয় গুণ প্রকাশ পাইল। এক্ষণে এরূপ গ্রন্থপাঠে কাহার না প্রবৃত্তি হইবে?

গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তির জন্য গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের পরিচয়।

এই গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্য গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে আলোচ্য এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। ইহার জ্ঞান হইলে 'এই গ্রন্থপাঠের ফল কি' কেবল মাত্র তাহার আলোচনাই অবশিষ্ট থাকে। যাহা হউক, এক্ষণে এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় কি তাহাই আলোচনা করা যাউক।

আমরা দেখিতে পাই এই—গ্রন্থে চারিটী অধ্যায় আছে এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে কতকগুলি পরিচ্ছেদ আছে ; তন্মধ্যে—

প্রথম অধ্যায়ে ৬৭ পরিচ্ছেদে—প্রপঞ্চমিথ্যাত্বনিরূপণ
দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩৪ পরিচ্ছেদে—আত্মনিরূপণ
তৃতীয় অধ্যায়ে ৮ পরিচ্ছেদে—শ্রবণাদি সাধননিরূপণ এবং
চতুর্থ অধ্যায়ে ৬ পরিচ্ছেদে—মুক্তিনিরূপণ আছে।

এক্ষণে দেখা যাউক—প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রত্যেক পরিচ্ছেদের নাম কি, আর তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়ই বা কি ?

প্রথম অধ্যায়।

১। মঙ্গলাচরণ।
২। অদ্বৈতসিদ্ধির দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধিপূর্ব্বকত্ব।
৩। বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শনের আবশ্যকতা।
৪। প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমানে সামান্যাকার বিপ্রতিপত্তি।
৫। প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমানে বিশেষ বিপ্রতিপত্তি।
৬। বিপ্রতিপত্তির প্রয়োগ ও মিথ্যাত্বের অনুমান।
৭। সাধ্যমিথ্যাত্বের প্রথমলক্ষণ(ন্যা ১)*
৮। „ দ্বিতীয় „ „
৯। „ তৃতীয় „ „
১০। „ চতুর্থ „ „
১১। „ পঞ্চম „ „
১২। „ মিথ্যাত্বনিরূপণ (ন্যা ২)
১৩। হেতু দৃশ্যত্ব নিরুক্তি (ন্যা ৩)
১৪। „ জড়ত্ব „ („ ৪)

* (ন্যা ১)—ইহার অর্থ অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থ যাহার প্রতিবাদ সেই ন্যায়ামৃতের পরিচ্ছেদসংখ্যা। ন্যায়ামৃতের [illegible] বালবোধিনীমধ্যে [illegible]।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

এই গ্রন্থের ইহাই মুখ্যবিষয়ের সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র। ইহাতে কত যে জ্ঞাতব্য বিষয় বিচারিত ও আলোচিত হইয়াছে, তাহা এই নামমাত্র দেখিয়া বুঝা যায় না। তবে যাঁহারা বেদান্তশাস্ত্রে কৃতবিদ্য তাঁহারা ইহা হইতে কতকটা অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ, এই সকল বিষয় অধিগত হইলে জীব জগৎ আত্মা ও মুক্তিপ্রভৃতি বিষয়ে মানবমনের যাবৎ সন্দেহই একরূপ বিনষ্ট হইয়া যায়।

ব্রহ্ম সত্য বলিয়া সিদ্ধ হইলেও জগৎ সত্য হইবার পক্ষে কোন বাধা হয় না, অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য হইলেও জগৎ সত্য হইতে পারে। কিন্তু জগৎ সত্য হইলে দুঃখ দূর হয় না। কারণ, জগৎ সুখদুঃখে চিরবিজড়িত। এজন্য দুঃখও সত্য হয়। আর সত্যদুঃখের কখন আত্যন্তিক বিলয় সম্ভবপর হয় না। এজন্য কেবল ব্রহ্মই সত্য আর দুঃখের বিনাশের জন্য জগৎ মিথ্যা—ইহা সিদ্ধ করা প্রয়োজন। জগৎ মিথ্যা হইয়া ব্রহ্ম সত্য হইলেই দুঃখ সমূলে দূর হয়, নচেৎ নহে। কারণ, মিথ্যা কখন চিরকাল থাকে না। সত্যই চিরকাল থাকে।

এজন্য এই গ্রন্থে জগৎ মিথ্যা অগ্রে সিদ্ধ করিয়া ব্রহ্মের সত্যতা কথিত হইয়াছে।

ব্রহ্মের অদ্বৈতত্বের জন্য জগতের মিথ্যাত্ব স্বীকার্য্য।

তাহার পর জগৎ মিথ্যা সিদ্ধ করিবার পর শ্রুতিতে কথিত 'অদ্বৈত' ব্রহ্ম সিদ্ধ করিতে গেলেও জগৎকে মিথ্যা সিদ্ধ করা ভিন্ন উপায় নাই। যে জগৎ প্রত্যক্ষ দৃশ্য হইতেছে, তাহাকে অস্বীকার করা ত যায় না, আর তাহাকে অস্বীকার না করিলে অদ্বৈত ব্রহ্মও সিদ্ধ হয় না। এজন্য জগৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিয়া ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব সিদ্ধ করা হইয়াছে। জগৎ সত্য হইলে ব্রহ্ম আর অদ্বৈত হন না। যেহেতু ব্রহ্মও সত্য, জগৎও সত্য, অতএব সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম আর অদ্বৈত হন কি প্রকারে? আর "ব্রহ্ম দুটী নহেন" এই অর্থে যদি 'অদ্বৈত ব্রহ্ম' স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও জগৎ সত্য বলা যায় না। কারণ, তাহাতে ব্রহ্মের বাস্তবিক অদ্বৈতত্ব সিদ্ধ হয় না। যেহেতু দুইটী বস্তু 'সত্য' হইলে একটী সত্য বস্তু অদ্বৈত হয় কি করিয়া? সত্যত্ব ধর্ম্মপুরস্কারে তাহা দ্বৈতই হইয়া যায়।

ব্রহ্মের অদ্বৈতত্বের জন্য জীবব্রহ্মের অভেদ স্বীকার্য্য।

তাহার পর জীব ও ব্রহ্ম যদি অভিন্ন না হয়, তাহা হইলেও ব্রহ্মের

অদ্বৈতত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, জীব জ্ঞানস্বরূপ হইয়া সত্য এবং ব্রহ্মও জ্ঞানস্বরূপ হইয়া সত্য। এক জাতীয় দুইটী বস্তু থাকিলে একের অদ্বৈতত্ব সিদ্ধ হয় না। অতএব ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব সিদ্ধ করিবার জন্য জীব ও ব্রহ্মের অভেদও স্বীকার করিতে হয়। এইরূপে দেখা যাইতেছে আচার্য্য শঙ্কর যে বলিয়াছেন—

"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥

ইহা প্রতিপাদন করাই এই গ্রন্থের মুখ্য তাৎপর্য্য।

এইরূপে এই অদ্বৈতসিদ্ধির মুখ্যপ্রতিপাদ্য বিষয়—অদ্বৈত সিদ্ধ করা। অর্থাৎ প্রপঞ্চমিথ্যা ও অদ্বৈত ব্রহ্মই সত্য—ইহাই প্রতিপন্ন করা। আর এই বিষয়টী এত রকমে এত দৃঢ়ভাবে ইহাতে বুঝান হইয়াছে যে, ইহাতে আর ভ্রম বা সংশয়ের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ এ সম্বন্ধে যত প্রকার যত আপত্তি হইতে পারে, সে সকলই এই উপলক্ষে নিরাকৃত হইয়াছে।

নাশে মিথ্যার আর উপলব্ধিও হইবে না। অদ্বৈতসিদ্ধিকার এই কথাটী অসংখ্য প্রতিবাদীর অনাদিকাল ধরিয়া অনন্ত প্রতিবাদ নিরস্ত করিয়া সিদ্ধ করিয়াছেন। ইহাই ইহার সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষত্ব।

অদ্বৈতসিদ্ধির বিচারের প্রভাব।

বস্তুতঃ, অদ্বৈতসিদ্ধিকার ইহা এমনই ভাবে বুঝাইয়াছেন এবং এমনই ভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন যে, ইহা বুঝিতে পারিলে বাধ্য হইয়া পাঠকের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়া যায়। অদ্বৈতব্রহ্ম না বুঝিয়া পাঠক নিবৃত্ত হইতে পারিবেন না—অদ্বৈত ব্রহ্ম না হইয়া পাঠক ক্ষান্ত হইতে পারিবেন না। বিচারে পরোক্ষ জ্ঞান হইলেও অনুভবস্বরূপ আত্মার বিচার সুদৃঢ় হইলে তাহা প্রত্যক্ষেই পর্য্যবসান হইয়া থাকে। অদ্বৈতসিদ্ধি প্রসঙ্গক্রমে ইহাও প্রতিপাদন করিয়াছে।

অদ্বৈতসিদ্ধিরচনার কৌশল।

এখন এই অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থের রচনাকৌশলের কথা একবার ভাবা উচিত। দেখা যায়—ইহাতে প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, দ্বৈতকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত না করিলে অদ্বৈত সিদ্ধ হইতে পারে না।

তৎপরে বিচার পদ্ধতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার পর "বিচার্য্য বিষয় কি" তাহা নিরূপিত হইয়াছে। তাহাতে একপক্ষ হইলেন—'জগতাদির সত্যতাবাদী' এবং অপর পক্ষ হইলেন—'জগতাদির মিথ্যাত্ববাদী'।

তাহার পর জগতাদি প্রপঞ্চ মিথ্যা, ইহা প্রমাণিত করিবার জন্য প্রথমেই এই গ্রন্থে অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই অনুমানের নির্দ্দোষতা প্রমাণ করিবার জন্য এই গ্রন্থের অধিকাংশ স্থানই অধিকৃত হইয়াছে—দেখা যাইবে। যাহা হউক, সে অনুমানটী এই—

প্রপঞ্চ—মিথ্যা ... ... (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু দৃশ্যত্ব, জড়ত্ব, অংশিত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব রহিয়াছে (হেতু)
যেমন শুক্তিরজত ... .. (দৃষ্টান্ত)

অতঃপর এই অনুমানের সাধ্য যে মিথ্যাত্ব, তাহা পাঁচটী লক্ষণদ্বারা এক একটী পরিচ্ছেদ আকারে নিরূপণ করা হইয়াছে।

ইহার পর সেই মিথ্যাত্বানুমানেরই হেতু চারিটীর বিষয় বিশেষভাবে পৃথক্ পৃথক্ পরিচ্ছেদে বিচার করা হইয়াছে।

তৎপরে এই অনুমানের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ প্রভৃতি যত রূপ প্রমাণ উপন্যাস করা যাইতে পারে, সে সমস্তেরই একে একে পৃথক্ পরিচ্ছেদে অখণ্ডনীয়ভাবে খণ্ডন করা হইয়াছে।

এইরূপে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব অনুমান ও তদ্দ্বারা অদ্বৈতের সিদ্ধিই এই গ্রন্থের প্রথম ও প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় বলা যাইতে পারে।

কিন্তু এই উপলক্ষে যে সমস্ত কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে যে, কেবল অদ্বৈতমতের যাবতীয় সিদ্ধান্ত অবগত হওয়া যায়, তাহা নহে, প্রত্যুত অপর যাবতীয় মতবাদের প্রকৃত রহস্য এবং তাহাদের সহিত অদ্বৈতবাদের কোথায় প্রভেদ, তাহাও অতি উত্তমরূপে অবগত হওয়া যায়। এক কথায় এই অদ্বৈতসিদ্ধি, অদ্বৈতমতের প্রথম প্রবর্তনকাল হইতে গ্রন্থকারের সময় পর্য্যন্ত যত কথা উঠিয়াছে সে সমস্তেরই ভাণ্ডারবিশেষ। ইহা ভাল করিয়া বুঝিলে, ভবিষ্যতে আর নূতন কল্পনারও সম্ভাবনা থাকিতে পারে না—ইহাই মনে হয়। যাহা হউক, সংক্ষেপে ইহাই হইল অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের পরিচয়। *

---

* এই অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থখানি যে ন্যায়ামৃত গ্রন্থের প্রতিবাদ, তাহার সূচীপত্র "ন্যায়ামৃতপরিচয়" দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছে। এস্থলে তাহার সহিত এই অদ্বৈতসিদ্ধির সূচীপত্র মিলাইয়া দেখা আবশ্যক। ইহাতে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, যে, অদ্বৈতসিদ্ধির বিষয়বিন্যাস, ন্যায়ামৃতের প্রত্যেক প্রতিবাদ করিবার জন্য ন্যায়ামৃতেরই অনুকরণ।

গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তির জন্য এই গ্রন্থপাঠের ফল।

এইবার দেখা যাউক, এই গ্রন্থপাঠের ফল কি? কারণ, ইহা যদি জানিতে পারা যায়, এবং সেই ফল যদি উপাদেয় হয়, অর্থাৎ আমাদের অভীষ্টসাধক হয়, তাহা হইলে এই গ্রন্থপাঠে আমাদের প্রবৃত্তি জন্মিতে পারিবে। যেহেতু ইষ্টসাধনতাজ্ঞান না হইলে কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি হয় না। অতএব দেখা যাউক—এই গ্রন্থপাঠে কি ফলোদয় হইবে।

গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা দেখিয়াছি, এই গ্রন্থে কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে এই গ্রন্থপাঠের ফল চিন্তা করিবার কালে আমাদিগকে সেই বিষয়টী স্মরণ করিতে হইবে।

এই গ্রন্থপাঠে আত্মবিষয়ক সংশয় ও ভ্রম দূর হয়।

এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমেই মনে হইবে—এই গ্রন্থে অদ্বৈততত্ত্ব সিদ্ধ করিবার জন্য যে সমুদয় যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে এবং তদুপলক্ষে যে সমুদয় কথার অবতারণা করা হইয়াছে, তাহাতে অদ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের হৃদয়ে আর কোন প্রকার সংশয় বা ভ্রম থাকিতে পারে না।

এই গ্রন্থপাঠে আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়।

তাহার পর কোন কিছুর সম্বন্ধে ভ্রম ও সংশয় দূর হইলেও তাহা পরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে, তাহার সাক্ষাৎকার নাও হইতে পারে; কিন্তু এস্থলে তাহা হয় না, এস্থলে সাক্ষাৎকারই হয়। কারণ, অদ্বৈততত্ত্ব সিদ্ধ বা নিশ্চয় হইবার পর যখন নিশ্চয় হয় যে, সেই অদ্বৈততত্ত্ব আমাদেরই আত্মা, আর এই অনুভূয়মান জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা, ইহার সত্তা নাই, তথাপি দৃষ্ট হয় মাত্র, তখন সেই নিশ্চয়ের ফলে মনে এই মিথ্যা জগতের অধিষ্ঠান যে আত্মা, সেই আত্মবিষয়ক একটী ধ্যানের প্রবাহ বহিতে থাকে। আমি এই দেহ, আমি অমুক জাতি, আমি অমুকের সন্তান, আমি পুরুষ—ইত্যাদি জ্ঞান যেমন অজ্ঞাতসারে আমাদের বহিতে থাকে, এই নিশ্চয়জ্ঞানও সেইরূপ বহিতে থাকে। যেরূপ এবং

যতই কেন ব্যবহার আমাদের দ্বারা সম্পাদিত হউক না, আমাদের উক্ত নিশ্চয়জ্ঞানধারা আমাদের বিনা চেষ্টায় অথবা আমাদের যেন অজ্ঞাতসারেই বহিতে থাকে, অন্যচিন্তার দ্বারা সেই প্রবাহ বাহ্যতঃ বিচ্ছিন্ন হইলেও অন্তরে সেই প্রবাহের বিরাম ঘটে না। আমাদের আত্মাই সেই অদ্বৈততত্ত্ব—এই নিশ্চয়, এই গ্রন্থপাঠে এতই সুদৃঢ় হয় যে, সেই দৃঢ়তার ফলেই উক্ত প্রবাহ বাহ্যতঃ বিচ্ছিন্ন হইলেও অন্তরে তাহার বিরাম ঘটে না। পণ্ডিতজনগণের হৃদয়ে এইরূপ সুদৃঢ় নিশ্চয় এই গ্রন্থদ্বারা যেরূপ সাধিত হয়, এরূপ আর অন্য কোন গ্রন্থে হইবার আশা নাই বা হয় না। ইহাই এই গ্রন্থের বিশেষত্ব। অপর ব্যক্তির নিকট অপর গ্রন্থ এতাদৃশ সুদৃঢ় নিশ্চয়তার সাধক হইলেও পণ্ডিতজনের নিকট এজন্য ইহার উপযোগিতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

ব্রহ্মানুভবের পরিচয়।

অবশ্য এই অনুভবে সম্পূর্ণ নিরবশেষ আত্মস্বরূপ প্রকাশিত না হইলেও ইহা তাহার ছায়া বিশেষ হয়। ইহারই নাম ব্রহ্মাকারা বৃত্তি। আর ইহাতে হৃদয়ে একটা পূর্ণতা বোধ, একটা অভাবশূন্যতা বোধ, একটা প্রকাশস্বরূপতা বোধ, একটা জ্যোতিঃস্বরূপতা বোধ ও একটা অপার আনন্দ বোধ হইতে থাকে। ইহার উপমা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

ব্রহ্মানুভবের ফল।

এই আনন্দবোধের ফলে জগৎ সংসার সব তুচ্ছ হইয়া যায়, জীবন-মৃত্যু সবই স্বপ্নসম উপেক্ষণীয় মনে হয়। স্তুতিনিন্দা, লাভক্ষতি, সকল বিষয়েই উপেক্ষাবুদ্ধি জন্মিয়া থাকে, মুখে এক অপূর্ব্ব হাসি ফুটিয়া উঠে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গসহ সমস্ত শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ হয়, রোগ শোক অন্তর্হিত হয়। ইহার সাধকের এই অপূর্ব্বভাব দেখিয়া তাঁহার আর কেহ শত্রু থাকে না, সকলেই তাঁহার মিত্র হয়, সুতরাং জীবন সুখময় হয়।

'জগৎ মিথ্যা' জ্ঞানের ফল।

আর 'এই জগৎ প্রপঞ্চ মিথ্যা' এই জ্ঞানের ফলে এই জগৎ প্রপঞ্চে যে সত্যবোধ, তাহা বিলুপ্ত হয়। এই যে স্ত্রীপুত্রাদিসমন্বিত সুখময় সংসার, এই যে ধন জন ঐশ্বর্য্যের আনন্দ, এই যে সুকঠিন লৌহ প্রস্তর, এই যে জন্ম মৃত্যুর হেতুভূত দুরপনেয় পঞ্চভূত ও তজ্জাত বস্তুসমূহ—এ সকলই যেন অন্তঃসারশূন্য ছায়ার ন্যায় হইয়া যায়, সকলই যেন স্বপ্নের পদার্থে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে সকলই আমাতে আশ্রিত, আমিই সকলের অধিষ্ঠান, এবং আমিই সত্যস্বরূপ—এইরূপ নিশ্চয়ই হইয়া যায়। বহু জপ তপঃ করিয়া যাহা লাভ করিতে পারা যায় না, বহু ব্রত উপবাস করিয়া যাহার উপলব্ধি ঘটিয়া উঠে না, বহু পূজাপাঠ, বহু যাগযোগ করিয়া যাহা উপলব্ধ হয় না, অদ্বৈতসিদ্ধির বিচারধারার অনুসরণ করিতে করিতে তাহা অজ্ঞাতসারে মনোমধ্যে বদ্ধমূল হইয়া যায়।

'প্রপঞ্চ মিথ্যা' এই অনুমানের ফল।

এখন দেখা যাউক—"প্রপঞ্চ মিথ্যা" এই অনুমান হইতে এই ভাবটী কি করিয়া ফুটিয়া উঠে? দেখা যাইবে "প্রপঞ্চ মিথ্যা" এই অনুমানে—

প্রতিজ্ঞা বাক্য—প্রপঞ্চ মিথ্যা
হেতুবাক্য—দৃশ্যত্ব, জড়ত্ব, পরিচ্ছিন্নত্ব ও অংশিত্বপ্রযুক্ত এবং
উদাহরণ বাক্য—যেমন শুক্তিরজত।

অনুমানের পক্ষনির্ণয়ের ফল।

এই অনুমানে পক্ষরূপ 'প্রপঞ্চ' শব্দের অর্থ অনুসরণ করিলে বুঝাইবে যে, সদ্ ব্রহ্ম ও অসদ্ বন্ধ্যাপুত্রাদি অলীক বস্তু ভিন্ন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও তদন্তর্গত যাবতীয় বস্তুই এই প্রপঞ্চ। যেহেতু ব্রহ্ম তিনকালেই আছেন, অথচ তাহা জ্ঞেয় বা দৃশ্য হয় না এবং বন্ধ্যাপুত্রাদি অলীক বস্তু তিনকালেই নাই এবং জ্ঞেয় বা দৃশ্যও হয় না। যাহারা জ্ঞেয় বা দৃশ্যই হয় না, তাহারা আর দুঃখের হেতুও হয় না। অতএব যাহারা জ্ঞেয় বা দৃশ্য হয়, তাহারাই দুঃখের হেতু হয়, তাহাদের মিথ্যাত্বজ্ঞান হইলে দুঃখ হয় না, এজন্য তাহারাই এই মিথ্যাত্বানুমানের পক্ষ।

অনুমানের সাধ্যনির্ণয়ের ফল।

তাহার পর সাধ্য মিথ্যাশব্দের অর্থ অনুসরণ করিলে বুঝা যাইবে, যাহা কোন কালেই নাই, অথচ প্রতীয়মান হয়—তাহাই মিথ্যাত্ব। সুতরাং যাহা দেখা যায় বা জ্ঞেয় হয়, তাহা তিনকালেই না থাকায় তজ্জন্য যে সুখদুঃখ তাহাও তিনকালে নাই। আর এই জ্ঞান দৃঢ় হইলে সুখদুঃখও আর অনুভূত হয় না, মৃত্যুভয়ও থাকে না। এইরূপে প্রতিজ্ঞাবাক্যের অঙ্গ—পক্ষ ও সাধ্যের জ্ঞানের ফলে যাহা বুঝা গেল, সেই পক্ষ ও সাধ্যঘটিত প্রতিজ্ঞাবাক্যের জ্ঞানে আত্মবস্তুনির্ণয়ের রাজপথ উন্মুক্ত হইল।

দৃশ্যত্বহেতু নির্ণয়ের ফল।

তৎপরে অনুমানের দ্বিতীয় অবয়ব "দৃশ্যত্ব" হেতুটীর অর্থ অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে—যাহাই দৃশ্য হয় তাহাই মিথ্যা, অর্থাৎ যাহা প্রতীয়মান হয়, তাহাই তিনকালে নাই। এখন এই দৃশ্য কি কি—ইহা যদি ভাবা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে—এই বিশাল পৃথিবী, এই অগাধ জলধি, এই সুদূরবাহিনী নদনদী, এই চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, এই অগ্নি, এই সমীরণ, এই প্রচণ্ড প্রভঞ্জন, এই অনন্ত আকাশ, এই বিচিত্র মেঘমালা, এই সুখদুঃখ, এই মনোময় জগৎ, এই চিন্তার রাজ্য, অর্থাৎ চক্ষু নিমীলিত চিন্তার কালে বা স্বপ্নদর্শনকালে যে রাজ্য আমাদের মনশ্চক্ষে প্রকাশিত হয়, সেই মনোময় জগৎ, সেই চিন্তারাজ্য, এবং এই যে আমি বস্তু, এই যে অনুভূয়মান আমিত্ব—সকলই দৃশ্য বলিয়া মিথ্যা, অর্থাৎ কোন কালেই ইহারা নাই, অথচ প্রতীত হইতেছে; সুতরাং উক্ত অনুমানের হেতুবাক্যদ্বারা বুঝা গেল—এক আত্মা ব্যতিরিক্ত সবই মিথ্যা হয়, আর এই আত্মাই স্বপ্রকাশ।

জড়ত্বাদিহেতু নির্ণয়ের ফল।

এইরূপে "জড়ত্ব" "পরিচ্ছিন্নত্ব" ও "অংশিত্ব" হেতু গুলির অর্থ অনুধাবন করিলে এই সমস্ত বিষয়ই আবার অন্যরূপে উপলব্ধ হইবে। অজড় অপরিচ্ছিন্ন ও নিরংশ বস্তুরই জ্ঞান জন্মিবে। আর তাহাতে নিজেকে চৈতন্যস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ এবং অখণ্ডস্বরূপ বলিয়া দৃঢ় নিশ্চয় হইবে।

শুক্তিরজত দৃষ্টান্তনির্ণয়ের ফল।

এখন এই সকল বস্তুই শুক্তিরজতের ন্যায় মিথ্যা বলিলে কি পাওয়া যায়, দেখা যাউক। এই বিষয়টী ভাবিতে পারিলে দেখা যাইবে—যেমন শুক্তিরজত দেখা যায় অথচ নাই, শুক্তিই যথার্থ থাকে, শুক্তিই এই রজতের আশ্রয়, শুক্তিরজত তাহার আশ্রিতমাত্র, তদ্রূপ এই আমি বস্তু হইতে এই যাবতীয় বস্তুই কোন এক বস্তুর আশ্রিত, সেই

কোন এক বস্তুটী আশ্রয়, আর সেই আশ্রয় বস্তুটী কিন্তু কোনরূপে দৃশ্য হয় না।

মিথ্যার অধিষ্ঠানজ্ঞানের ফলে সমাধিসিদ্ধি।

এখন সে বস্তুটী কি? শুক্তিরজতের আশ্রয় শুক্তিস্থানীয় সেই আমি প্রভৃতি যাবদ্ দৃশ্যের আশ্রয় কি? ইহা যতই ভাবা যাইবে, যতই অনুধাবন করা যাইবে, আর তাহার ফলে যে সকল অনুভব হইতে থাকিবে, তাহাকেও দৃশ্য বলিয়া আবার যতই তাহার আশ্রয় অনুসন্ধান করা যাইবে, ততই এমন এক অবস্থা উপস্থিত হইতে থাকিবে যে, যে অবস্থার পরিচয় আর দেওয়া যায় না, বিশুদ্ধ জল জলে মিশিলে যাহা হয় তাহাই হইয়া যায়। ততই তাহার সমাধি আসিয়া উপস্থিত হয়। অতি কঠোর অষ্টাঙ্গযোগের শেষ ফল যে সমাধি, তাহাই লব্ধ হয়।

এখন উক্ত অনুধাবন যতই দৃঢ় হইবে, যতই ঐকান্তিক হইবে, এই সমাধিই ততই স্থায়ী, ততই নির্ব্বিকল্পকরূপতা প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। এইরূপে প্রারব্ধক্ষয় পর্য্যন্ত অভ্যাস করিতে পারিলে,—এই দেহাবসান পর্য্যন্ত ইহার অনুধাবন করিতে পারিলে, পুনরাবৃত্তিশূন্য সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ হইয়া থাকে। অতএব এই গ্রন্থোক্ত এই "প্রপঞ্চ মিথ্যাত্ব" অনুমান হইতেই মানবের যাহা চরমাভীষ্ট তাহাই লাভ হইয়া থাকে। ইহাতেই সমাধি আপনা আপনি অভ্যস্ত হইয়া যায়।

অশুদ্ধচিত্তের ফল ও কর্ত্তব্য।

তাহার পর চিত্তের অশুদ্ধতা থাকিলে যদি এই অনুমানে সংশয় ও ভ্রম আবার প্রবেশ করে, তাহা হইলে এই অনুমানসম্পর্কে এই গ্রন্থমধ্যে যে সব বিচারের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহাতে সে সংশয় ও ভ্রমের সমূলে উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বিচারের এমনই একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, এমনই একটা আনন্দদায়িনী শক্তি আছে, এমনই একটা মনোহারিণী শক্তি আছে, যে মানব তাহাতে মুগ্ধ

হইয়া যেন অজ্ঞাতসারে সেই ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিতে থাকে, অলক্ষিতভাবে তাহার মনোবৃত্তির বিলয় ঘটিতে থাকে। ইহাকে পরিত্যাগ করিবার তাহার আর সামর্থ্য থাকে না, অপর কিছুই ইহার এই ভাব বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মোপলব্ধি তাহার বাধ্য হইয়াই ঘটিয়া যায়। আর তথাপি যদি বদ্ধমূল চিত্তমল-প্রযুক্ত এই ভ্রম ও সংশয় রক্তবীজের ন্যায় আবার আবির্ভূত হয়, তাহা হইলে এই গ্রন্থোক্ত এই অনুমান ও তৎসম্পর্কিত কথার পুনঃ পুনঃ আলোচনা বা অভ্যাসই একমাত্র মহৌষধ। এই আলোচনার ফলে সেই ভ্রম ও সংশয় অবশ্যই অন্তর্হিত হইবে।

অদ্বৈতসিদ্ধিপাঠের ফল। উপসংহার।

এইরূপে এই অদ্বৈতসিদ্ধিপাঠে—এই অদ্বৈতসিদ্ধির আলোচনায়—এই অদ্বৈতসিদ্ধির অভ্যাসে, মানবের চরমাভীষ্ট যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার তাহা অবশ্যম্ভাবীই হয়, শ্রদ্ধা থাকিলে সাধককে বাধ্য হইয়াই অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানই লাভ করিতে হয়।

বিচারদ্বারা অপরোক্ষজ্ঞানের সম্ভাবনা।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, বিচারদ্বারা অপরোক্ষজ্ঞান কি করিয়া হইবে? ইহাতে পরোক্ষজ্ঞানই সম্ভব। ঘটের আকৃতির বর্ণনা শুনিয়া তদ্বিষয়ক সংশয় ও বিপর্য্যয়নাশ ঘটিয়া কখনই যেমন ঘটের সাক্ষাৎকার হয় না, ইহাও তদ্রূপ। বস্তুতঃ, ব্রহ্মাত্মার বিচার বহু শ্রবণ মনন করিয়াও অনেকেরই অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান হয় না—ইহাই ত দেখা যায়।

কিন্তু এ কথা সঙ্গত নহে। কারণ, ঘটবিষয়ক শ্রবণ মনন এবং আত্ম-বিষয়ক শ্রবণ মনন—একরূপ ব্যাপার নহে। ঘট বহির্বিষয়, তাহার সঙ্গে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ না হইলে অপরোক্ষজ্ঞান হয় না, আত্মা বা ব্রহ্ম কিন্তু বহির্বিষয় নহে, তাহার সহিত মনের সংযোগ নিয়তই রহিয়াছে।

তাহার সহিত মনের সংযোগ না হইলে কোন জ্ঞানই হয় না। অতএব শ্রবণ মননের পর নিদিধ্যাসন হইলেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে কোন বাধা নাই। প্রকৃত কথা এই যে, পদজন্য পদার্থোপস্থিতি হইলে শাব্দবোধ হয়, আত্মবিষয়ক শ্রুতিবাক্যজন্য যে অর্থোপস্থিতি হয়, তাহা যদি অনুভবসহকারে হয়, তাহা হইলে শ্রুতিবাক্য হইতে ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান অবশ্যম্ভাবীই হয়। অতএব এরূপ সংশয় এস্থলে অসঙ্গত। অদ্বৈতসিদ্ধির আলোচনায় শ্রুতিবাক্যে সংশয়াদি সমূলে বিনষ্ট হয়, আর তজ্জন্য ইহার আলোচনায় অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান শ্রদ্ধালু সাধকের বলপূর্ব্বকই ঘটিয়া যায়।

এই গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি উৎপাদক সামগ্রীর একত্র ফল।

এখন গ্রন্থ, গ্রন্থকার, গ্রন্থপ্রতিপাদ্যবিষয় ও গ্রন্থপাঠের ফল যদি সবগুলি একত্রভাবে চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে বলিতে পারা যায়—যে গ্রন্থ সর্ব্বপ্রাচীন বেদান্তচিন্তাধারামধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুনির্দ্দিষ্ট গুরুপূর্ণ প্রশস্ত প্রশান্ত ও সুগভীর স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, অথবা যে গ্রন্থ বেদান্তচিন্তারাজ্যের সর্ব্বোচ্চস্থানে বিরাজিত রহিয়াছে, অথবা যে গ্রন্থে বেদান্তসিদ্ধান্তের সমুদায় কথাই যথাযোগ্য স্থান পাইয়াছে, অথবা যে গ্রন্থের পর যত মতের যত বেদান্তগ্রন্থ হইতেছে, সকলই যে গ্রন্থকে শত্রুভাবেই হউক, অথবা মিত্রভাবেই হউক অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা লাভ করিতেছে—যাহার গ্রন্থকার আকুমার ব্রহ্মচারী, নিষ্কলঙ্কচরিত্র, সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী, সর্ব্বজনমান্য এবং সিদ্ধ মহাপুরুষ; বৈরাগ্য, নম্রতা, সরলতা উদারতা জ্ঞান ও ভক্তির যিনি আদর্শ পুরুষ; তাহার পর যে গ্রন্থের প্রতিপাদ্যবিষয় যাবতীয় বেদান্তের সিদ্ধান্ত এবং যে গ্রন্থের পাঠের সঙ্গে নিদিধ্যাসন সহজ হইয়া যায়, সুতরাং ব্রহ্মসাক্ষাৎকার অবশ্যম্ভাবী হয়, সে গ্রন্থপাঠে কাহার না প্রবৃত্তি জন্মে?

গ্রন্থপাঠে সামর্থ্য উৎপাদনের জন্য ন্যায়শাস্ত্রের পরিচয়।

এই গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা আলোচিত হইল, এইবার এই গ্রন্থপাঠে সামর্থ্য উৎপাদনের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহাই আলোচ্য। ভূমিকার উদ্দেশ্যবর্ণনপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—এই গ্রন্থার্থ বুঝিবার জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহা, এক কথায়, যে শাস্ত্রে বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় সেই শাস্ত্রের জ্ঞান, অর্থাৎ ন্যায় ও মীমাংসা শাস্ত্রের জ্ঞান এবং এই শাস্ত্রের অনুকূল ও প্রতিকূল শাস্ত্রের জ্ঞান। তন্মধ্যে অনুকূল শাস্ত্রের জ্ঞানের জন্য শঙ্করমতের জ্ঞান আবশ্যক এবং প্রতিকূল শাস্ত্রের জ্ঞানের জন্য অপর যাবতীয় দার্শনিক মতবাদের জ্ঞান আবশ্যক। ইহার মধ্যে আবার মাধ্ব ও রামানুজ মতের জ্ঞানই বিশেষভাবে আবশ্যক। যেহেতু এই দুই মতবাদী আচার্য্যগণ অদ্বৈতমতের বিশেষ ভাবেই খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে দেখা যাউক, ন্যায়শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় কি ?

ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন।

ন্যায়শাস্ত্রের পরম তাৎপর্য্য মোক্ষ। সেই মোক্ষলাভের উপায় আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার। সেই আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারের উপায় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। মনন অর্থ—শ্রুত বিষয়ের অর্থে ভ্রম ও সংশয় বিদূরিত করিবার জন্য যুক্তির অনুধাবন। সেই যুক্তি, যাহাকে আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়, তাহা হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া বুঝা, অথবা আত্মভিন্ন পদার্থের সহিত আত্মবস্তুর ভেদ অনুমান। এখন এই কার্য্য করিতে গেলে যে সকল বস্তুতে আত্ম ভ্রম হয় সেই সকল বস্তুর, অথবা আত্মভিন্ন যাবৎ পদার্থের জ্ঞান আবশ্যক হয়। আর তাহার ফলে বস্তুতঃ সামান্যভাবে সর্ব্বজ্ঞই হইতে হয়। মহর্ষি গৌতম প্রথমোক্ত পথে ও কণাদ দ্বিতীয় পথে এইরূপ সর্ব্বজ্ঞত্বের জন্য, আর তাহার ফলে আত্মজ্ঞানের দ্বার

করিয়া মোক্ষলাভের জন্য, যথাক্রমে ন্যায় ও বৈশেষিক শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন।

নব্যন্যায়ের পরিচয় ও অদ্বৈতসিদ্ধির সহিত তাহার সম্বন্ধ।

ইহার বহু পরে উদয়ন ও গঙ্গেশ প্রভৃতি ন্যায়াচার্য্যগণ এই উভয় মতের সংমিশ্রণে নব্যন্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থের অভিপ্রেত অর্থ বুঝিবার সামর্থ্যের জন্য, অর্থাৎ এই গ্রন্থার্থ বুঝিবার পক্ষে বুদ্ধিমার্জ্জিত করিবার জন্য, যে ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন, তাহা এই নব্যন্যায় শাস্ত্র। কারণ, এই অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থখানি এই নব্যন্যায়ের পদ্ধতি, সূক্ষ্মতা এবং বিচারপরিপাটী অনুসারে লিখিত, নব্যন্যায়ের অনেক সিদ্ধান্ত এই গ্রন্থে গৃহীত এবং অনেক সিদ্ধান্ত নিরাকৃত হইয়াছে।

আর ইহারও যদি কারণ অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নব্যন্যায়ের সূক্ষ্মতা, নব্যন্যায়ের পরিপাটী, বক্তব্যপ্রকাশে নব্যন্যায়ের যোগ্যতা প্রভৃতি এতই সুন্দর যে, ইহার সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ থাকিলেও ইহার পদ্ধতি প্রভৃতি সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন, সকলেই নব্যন্যায়ের সাহায্যে নিজ নিজ মতের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। বস্তুতঃ, নব্যন্যায়ের প্রচারের পর অপরাপর দর্শন এবং ব্যাকরণাদি অপরাপর সকল শাস্ত্রই এই নব্যন্যায়ের পদ্ধতি অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক, এখন দেখা যাউক, এই নব্যন্যায়ের মতে কি করিয়া আত্মভিন্ন যাবৎ পদার্থের জ্ঞানলাভ করা যায়—কি করিয়া এই মহানুসরণে মানব পূর্ব্বোক্ত সামান্যতঃ সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করিতে পারে।

কিন্তু এই কার্য্যটী করিতে হইলে ন্যায়ের "চিন্তামণি" নামক গ্রন্থখানি পাঠ করাই আবশ্যক। ভূমিকামধ্যে তাহার সব কথা বলা কখনই সম্ভবও নহে এবং সঙ্গতও নহে। তথাপি যাঁহাদের এতদ্রূপ সময় ও সুবিধার অভাব, তাঁহাদের নিমিত্ত এস্থলে আমরা এই ন্যায়শাস্ত্রের উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা এই ত্রিবিধ পথ আলোচনা না করিয়া কেবল

ইহার উদ্দেশমাত্র বর্ণনা করিব, অর্থাৎ এই শাস্ত্রের পদার্থ ও তাহার বিভাগাদি মাত্র লিপিবদ্ধ করিব এবং সেই সঙ্গে বিচারকার্য্যের জন্য যে সব বিষয় বিশেষ প্রয়োজন, তাহাই বর্ণনা করিব।

পদার্থবিভাগের উদ্দেশ্য।

কিন্তু এই পদার্থবিভাগ বর্ণন করিবার পূর্ব্বে ইহার উদ্দেশ্যসম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলা প্রয়োজন, যথা—

পদের দ্বারা যাহা বুঝান যাইতে পারে, তাহাই 'পদার্থ' পদের বাচ্য। সুতরাং মানবের চিন্তনীয় ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান যাবৎ বিষয়ই পদার্থ। অতএব আত্মা ও অনাত্মা সবই পদার্থ। আত্মজ্ঞানের জন্য এই আত্মা ও অনাত্মা যাবৎ পদার্থের জ্ঞান আবশ্যক বলিয়া মহর্ষি গৌতম পদার্থকে ষোড়শ প্রকারে, অর্থাৎ প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে "প্রমেয়" পদার্থ বলিতে আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মনঃ, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ, এই দ্বাদশটী বুঝায়। এই দ্বাদশটী প্রমেয় পদার্থের জ্ঞানলাভের জন্যই প্রমাণ ও সংশয়াদি অবশিষ্ট পঞ্চদশ পদার্থের জ্ঞান আবশ্যক। এই গুলি জানা থাকিলে শরীর ইন্দ্রিয়াদি, যাহাদের সহিত আত্মার ভ্রম হইয়া থাকে, তাহাদের সহিত আত্মার ভেদের অনুমানও সম্ভবপর হইবে। আর তাহার ফলে আত্মার ইতরভেদানুমাপক লক্ষণও ঠিক্ হইবে, সুতরাং আত্মজ্ঞানও লাভ হইবে।

মহর্ষি কণাদ দেখিলেন—মহর্ষি গৌতম আত্মজ্ঞানের জন্য উপায় নির্দ্দেশ করিলেন বটে, কিন্তু প্রমেয় পদার্থ কি, তাহা ত ঠিক্ করিয়া বলিয়া দিলেন না। প্রমেয় বলিতে প্রমাণ সংশয়াদি অবশিষ্ট পঞ্চদশ পদার্থও ত বুঝায়। অতএব মহর্ষি গৌতমের পদার্থবিভাগ যথার্থ বিভাগ হয় নাই। তাহার পর আত্মার জ্ঞানলাভ করিতে হইলে আত-

ভিন্ন যাবদ্ বস্তুরই সামান্যতঃ জ্ঞান আবশ্যক। কারণ, কোন কিছুর জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তদ্ভিন্ন যাবৎ বস্তুর সহিত তাঁহার সামান্যভাবে ভেদজ্ঞান আবশ্যক হয়। কেবল যে গৌতমোক্ত শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বাদশটী প্রমেয়ের জ্ঞান হইলেই তাহাদের সহিত আত্মার ভেদজ্ঞান হইয়া আত্মজ্ঞান হইবে, তাহা নহে। বোধ হয়, এইরূপ চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া মহর্ষি কণাদ প্রমেয় পদার্থ কি, অর্থাৎ যাবৎ পদার্থ ই কি, তাহা বলিবার জন্য পদার্থকে দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায় ও অভাব —এই সাতভাগে বিভক্ত করিলেন, এবং পরে তাহাদেরও আবার বহু অবান্তর বিভাগ করিয়া যাবৎ পদার্থের একটা সামান্যভাবে জ্ঞানলাভের পথ প্রদর্শন করিলেন। বস্তুতঃ, গৌতমের প্রমেয় এবং কণাদের প্রমেয় ঠিক্ এক বস্তু নহে। গৌতমের প্রমেয় শরীরেন্দ্রিয় দ্বাদশটী। কণাদের প্রমেয় কিন্তু যথার্থ ই পদার্থ-পদবাচ্য যাবদ্ বস্তু। কিন্তু ইহাতেও কার্য্য সিদ্ধ হয় না দেখিয়া মহর্ষি কণাদ বলিলেন—এই পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য জ্ঞানও আবশ্যক। আর তদনুসারে তাঁহার বৈশেষিক সূত্রগ্রন্থে লিখিলেন—

"ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাৎ দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সম্"। ১।১।৪

অর্থাৎ দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ ও সমবায়—এই ছয়টী ভাবপদার্থ এবং অভাব এই সাতটী পদার্থ এবং তাহাদের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যদ্বারা যে তত্ত্বজ্ঞান হয়, তদ্দ্বারা যেই জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানজন্য ধর্ম্মবিশেষপ্রসূত নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। সূত্রে অভাব পদার্থ না থাকিলেও নবীনগণ উহাকে ভাবভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়া, পদার্থসংখ্যা সাতটীই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক, এতদনুসারে আমরা নিম্নে পদার্থবিভাগ এবং তাহাদের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যপ্রদানের চেষ্টা করিলাম এবং বিচারকার্য্যের জন্য গৌতমোক্ত পদার্থের কিঞ্চিৎ পরিচয়ও প্রদান করিলাম। বলা বাহুল্য,

গৌতমের উক্ত ষোলটী পদার্থ, কণাদের এই সাতটীরই অন্তর্গত হইয়াছে। যেহেতু গৌতম, আত্মজ্ঞানের জন্ম যে বিচার আবশ্যক, সেই বিচারের যাহা অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি তাহাই প্রধানতঃ শিক্ষা দিয়াছেন। আর কণাদ, সেই বিচারের যাহা বিষয়, অর্থাৎ গৌতমের প্রমেয় পদার্থ, যাহার অংশ-বিশেষ তাহারই বিষয় প্রধানতঃ শিক্ষা দিয়াছেন। ইহা হইতে দেখা যাইবে, উভয়েই একই উদ্দেশ্যে অনেকটা একই পথে চলিয়াছেন। অন্য কথায় উভয়েই সর্বজ্ঞতার জন্ম পদার্থপরিচয়প্রদানরূপ পথপ্রদর্শন করিয়াছেন। মীমাংসাদি অপরাপর দর্শনশাস্ত্র এই পদার্থপরিচায়ক পথের অনুসরণ করেন নাই। তাঁহারা, কণাদের দ্রব্য-পদার্থ-আশ্রিত অপর যাবতীয় পদার্থ বলিয়া দ্রব্যপদার্থেরই যাহা মূলরূপ, তাহা হইতে যাবৎ কার্যদ্রব্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। পদার্থজ্ঞানদ্বারা আত্মজ্ঞানদান, আর সেই আত্মজ্ঞানদ্বারা মোক্ষলাভ, কেবল মহর্ষি কণাদ ও গৌতমেরই প্রদর্শিত পথ। আর অনাত্মদ্রব্যপদার্থকে আত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া আত্মজ্ঞানদানই সাংখ্যাদি অপর দর্শনের প্রদর্শিত পথ। কিন্তু তাহা হইলেও এই পদার্থনির্ণয় পথটী এতই সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী যে, অপর মতেও স্বতন্ত্র মতপ্রবর্তকগণ, কিংবা তন্ত্রের আচার্যগণ শেষ-কালে নিজমত বর্ণন করিতে গিয়া, মতভেদ থাকিলেও এই পথে কতকটা স্বমতের পদার্থনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, এখন দেখা যাউক—নব্যন্যায়মতে পদার্থবিভাগ ও সাধর্ম্যবৈধর্ম্যাদি কিরূপ।

নব্যন্যায়মতে পদার্থপরিচয়।

পদার্থ সাত প্রকার, যথা—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য অর্থাৎ জাতি, বিশেষ, সমবায় অর্থাৎ নিত্যসম্বন্ধ ও অভাব।

কিন্তু ইহাদের পরিচয় দিতে হইলে ইহাদের লক্ষণ বলিতে হয়। আর লক্ষণ বলিতে হইলে লক্ষণের অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব—এই তিনটী দোষ বর্জন করিতে হয়। ইহাদের অর্থ এই—

অব্যাপ্তি অর্থ—যাহার দ্বারা যাহা বুঝান উচিত, তাহা যদি সম্পূর্ণরূপে না বুঝায়। অন্য কথায়—লক্ষ্যের একদেশবৃত্তিত্বই অব্যাপ্তি। যেমন, গরুর লক্ষণ 'কপিলবর্ণ' বলিলে শ্বেতবর্ণ গরুকে আর বুঝায় না বলিয়া এই গরুর লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ হয়।

অতিব্যাপ্তি অর্থ—যাহার দ্বারা যাহা বুঝান উচিত, তদপেক্ষা যদি অধিক বস্তু বুঝায়। অন্য কথায়—লক্ষ্যে বৃত্তি হইয়া অলক্ষ্যে বৃত্তিত্বই অতিব্যাপ্তি। যেমন গরুকে 'শৃঙ্গী' বলিলে হয়। যেহেতু ইহাতে মহিষকেও বুঝায় বলিয়া এই গোলক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়।

অসম্ভব অর্থ—যাহা একেবারেই লক্ষ্যকে বুঝায় না। যেমন গরুর লক্ষণ "পক্ষবিশিষ্ট" বলিলে হয়। যেহেতু গরুর পক্ষই থাকে না। অতএব এরূপ গোলক্ষণে অসম্ভব দোষ হয়।

বস্তুতঃ, এমন অনেক লক্ষণ আছে, যাহাতে অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি উভয় প্রকার দোষই হয়। যাহা হউক, এই ত্রিবিধ দোষশূন্য যে ধর্ম্ম তাহাই লক্ষণ। এই লক্ষণ আবার তিন প্রকার, যথা—স্বরূপাভিব্যঞ্জক, ইতরভেদানুমাপক ও ব্যবহারৌপয়িক। ইহাদের মধ্যে ইতরভেদানুমাপক লক্ষণই ন্যায়মতে গ্রাহ্য। এই লক্ষণের দ্বারা অপরের সহিত লক্ষ্যের ভেদ অনুমান করা যায়।

বেদান্তমতে পদার্থ দুই প্রকার, যথা—বস্তু ও অবস্তু কিংবা চিৎ ও অচিৎ কিংবা দৃক্ ও দৃশ্য। বস্তু ব্রহ্ম—নির্গুণ, এবং অবস্তু—ব্রহ্মভিন্ন। দ্রব্যগুণাদি বিভাগ তাহারই হয়। তবে তাহাও প্রায়শঃ মীমাংসকমতেই গ্রাহ্য হয়। মীমাংসকমত বলিতে প্রায়ই কুমারিল ভট্টের মত ও প্রভাকরের মতই বুঝায়। বেদান্তমতে তন্মধ্যে কুমারিলের মতই অধিক গ্রাহ্য, স্থলে স্থলে প্রভাকরেরও মত গৃহীত হয়। বেদান্তমতে পদার্থ—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, শক্তি, সাদৃশ্য ও অভাব—এই সাতটী। কুমারিলমতে—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য ও অভাব—এই পাঁচটী। প্রভাকরমতে—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, সমবায়, সংখ্যা, শক্তি ও সাদৃশ্য—এই আটটী।

দ্রব্য—যাহা গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের আশ্রয় হয়, তাহাই দ্রব্য। অথবা গুণের অত্যন্তাভাবের যে অধিকরণ হয় না

তাহাই দ্রব্য। ইহা নয় প্রকার, যথা—ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মনঃ।

বেদান্তমতে পঞ্চভূত সত্ত্ব, রজ ও তমঃ, বুদ্ধি বা মনঃ, বর্ণাত্মকশব্দ ও অন্ধকার এই একাদশটী দ্রব্য বলা হয়। কুমারিলমতে—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ব্যোম্, কাল, দিক্, আত্মা, মনঃ অন্ধকার ও বর্ণাত্মক শব্দই দ্রব্য। প্রভাকরমতে তমঃ তেজের অভাব বলিয়া অধিকরণস্বরূপ এবং শব্দ আকাশের গুণ বলিয়া ইহারা দ্রব্য নহে।

গুণ—দ্রব্য ও কর্ম্মভিন্ন হইয়া যাহা জাতিমান হয় তাহাই গুণ। ইহা চতুর্ব্বিংশতি প্রকার, যথা—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথক্‌ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি বা জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও শব্দ।

বেদান্তমতে পৃথক্ত্বকে বাদ দিয়া ও আলস্যকে গ্রহণ করিয়া গুণ ২৪ প্রকার হয়। অথবা কুমারিলমতের ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও বর্ণাত্মক শব্দবাদে ধ্বনি, প্রাকট্য ও শক্তি লইয়া ২৪ প্রকার। প্রভাকরমতে পৃথক্ত্ব ও সংখ্যাবাদে ২২ প্রকার।

কর্ম্ম—সংযোগ ভিন্ন হইয়া যাহা সংযোগের অসমবায়ি কারণ হয় তাহাই কর্ম্ম। ইহা পাঁচ প্রকার, যথা—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন। এই গমন আবার পাঁচ প্রকার, যথা—ভ্রমণ, রেচন, স্পন্দন, উর্দ্ধজ্বলন ও তির্য্যক্‌গমন।

ভট্ট ও প্রভাকরমতেও—চলনাত্মকই কর্ম্ম। ভট্টমতে ইহা প্রত্যক্ষও হয়। প্রভাকরমতে ইহা অনুমেয়।

সামান্য—ইহার অর্থ জাতি। যাহা নিত্য অথচ অনেকে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, তাদৃশ ধর্ম্মকে বুঝায়। ইহা দুই প্রকার, যথা—পরা জাতি এবং অপরা জাতি।

বেদান্তমতে ইহা নিত্য নহে। ইহা অনুগত ধর্ম্মবিশেষ এবং ব্যক্তির সহিত ভিন্নাভিন্ন বলা হয়। প্রভাকরমতে পরসামান্য নাই। সর্ব্বমতেই ইহা প্রত্যক্ষও হয়।

বিশেষ—যাহা নিত্য দ্রব্যে থাকে এতাদৃশ ধর্ম্মকে বুঝায়। ইহা যত নিত্য দ্রব্য—তত সংখ্যক হয়।

বেদান্ত, ভট্ট ও প্রভাকরমতে ইহা স্বীকার করা হয় না। প্রভাকরমতে ইহা পৃথক্ত্বের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়।

সমবায়—নিত্য সম্বন্ধ। ইহা একই প্রকার।

ভট্ট ও বেদান্তমতে ইহা পদার্থান্তর নহে। এস্থলে তাদাত্ম্যই স্বীকার করা হয়। তাদাত্ম্য—ভেদসহিষ্ণু অভেদ সম্বন্ধ। প্রভাকরমতে সমবায় স্বীকার করা হয়।

অভাব—দুই প্রকার, যথা—সংসর্গাভাব এবং অন্যোন্যাভাব। তন্মধ্যে সংসর্গাভাব আবার তিন প্রকার, যথা—প্রাগভাব, ধ্বংস এবং অত্যন্তাভাব। অন্যোন্যাভাব অর্থ—ভেদ।

বেদান্ত ও ভট্টমতে অভাব—ন্যায়মতেরই অনুরূপ, কিন্তু অনুপলব্ধিপ্রমাণগম্য। প্রভাকরমতে অভাব পদার্থান্তর নহে, কিন্তু অধিকরণরূপ।

আর শক্তি উভয় মীমাংসার মতেই ত্রিবিধ, যথা—সহজশক্তি, আধেয়শক্তি ও পদশক্তি। প্রভাকর ও বেদান্তমতে ইহা একটী পৃথক্ পদার্থ। ভট্টমতে ইহা গুণ, এবং লৌকিক ও বৈদিকভেদে দ্বিবিধ। লৌকিকশক্তি দ্রব্যগতা, কর্ম্মগতা ও গুণগতা। বৈদিকশক্তি যাগাদির অপূর্ব্বসাধিকা। ইহাতে শক্তিত্বজাতি থাকে এবং ইহা দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মকে আশ্রয় করে ও অর্থাপত্তিপ্রমাণগম্যা হইয়া থাকে।

সংখ্যাটী ভট্ট ও বেদান্তমতে গুণ, প্রভাকরমতে পদার্থান্তর।

সাদৃশ্য প্রভাকরমতেই পদার্থ। ভট্ট ও বেদান্তমতে ইহা তদ্গতভূয়োধর্ম্মবত্ত্ব।

ইহাই হইল পদার্থ পরিচয়।

দ্রব্য পরিচয়।

হয়। ইহার রজোগুণ হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয় পায়ু উৎপন্ন হয়। ইহা অপর চারি ভূতের সহিত মিলিত হইয়া এই স্থূল ক্ষিতিতে পরিণত হয়। শরীরমাত্রই পাঞ্চভৌতিক।

জল—যাহা শীতল স্পর্শযুক্ত তাহাই জল। তাহাও দ্বিবিধ, যথা—নিত্য ও অনিত্য। নিত্য জল—পরমাণুরূপ এবং অনিত্য জল—কার্য্যরূপ। সেই অনিত্য কার্য্যরূপ জল আবার ত্রিবিধ, যথা—শরীররূপ জল, ইন্দ্রিয়রূপ জল এবং বিষয়রূপ জল। শরীররূপ জলের দৃষ্টান্ত—বরুণলোকে জলময় দেহ। ইন্দ্রিয়রূপ জল—রসগ্রাহক রসনেন্দ্রিয়। উহার স্থান জিহ্বার অগ্রভাগ। বিষয়রূপ জল—নদী ও সমুদ্র প্রভৃতি। পরমাণুরূপ ও দ্ব্যণুকরূপ জল ও ইন্দ্রিয়রূপ জল প্রত্যক্ষ হয় না।

বেদান্তমতে জলপরমাণুও নিত্য নহে। সূক্ষ্ম জলকে রসতন্মাত্র বলে। উহা সূক্ষ্ম তেজঃ বা রূপতন্মাত্র হইতে উৎপন্ন। সূক্ষ্ম জলের সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় রসনা উৎপন্ন হয়। ইহার রজোগুণ হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয় উপস্থ উৎপন্ন হয়। তমোগুণ হইতে গন্ধতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। ইহা অপর চারি ভূতের সহিত মিলিত হইয়া এই স্থূল জলে পরিণত হয়।

তেজঃ—যাহা উষ্ণস্পর্শযুক্ত তাহাই তেজঃ। ইহা দ্বিবিধ, যথা—নিত্য এবং অনিত্য। তন্মধ্যে যাহা নিত্য তেজঃ তাহা পরমাণুরূপ, এবং যাহা অনিত্য তেজঃ তাহা কার্য্যরূপ। সেই কার্য্যরূপ তেজঃ আবার তিন প্রকার, যথা—শরীররূপ তেজঃ, ইন্দ্রিয়রূপ তেজঃ এবং বিষয়রূপ তেজঃ। শরীররূপ তেজঃ আদিত্যলোকে যে শরীর আছে, তাহা। ইন্দ্রিয়রূপ তেজঃ—চক্ষুরিন্দ্রিয়, উহার স্থান চক্ষুর মধ্যে যে কৃষ্ণতারা আছে, তাহার অগ্রদেশ। বিষয়রূপ তেজঃ কিন্তু চারি প্রকার, যথা—ভৌমতেজঃ, দিব্যতেজঃ, ঔদর্য্যতেজঃ এবং খনিজতেজঃ। ভৌমতেজের দৃষ্টান্ত—বহ্নি প্রভৃতি; দিব্যতেজের দৃষ্টান্ত—অবিন্ধন বিদ্যুদাদি। অপ্ অর্থাৎ জল হয় ইন্ধন যাহার তাহাই অবিন্ধন। ঔদর্য্যতেজের দৃষ্টান্ত—ভুক্ত অন্ন পরিপাকের হেতু উদরমধ্যগত পিত্তরসবিশেষ। খনিজতেজের দৃষ্টান্ত—সুবর্ণাদি ধাতু বস্তু। পরমাণু ও দ্ব্যণুকরূপ তেজঃ ও ইন্দ্রিয়রূপ তেজঃ প্রত্যক্ষ হয় না।

বেদান্তমতে তেজঃপরমাণুও নিত্য নহে। সূক্ষ্ম তেজকে রূপতন্মাত্র বলে। উহা সূক্ষ্ম বায়ু বা স্পর্শতন্মাত্র হইতে উৎপন্ন। সূক্ষ্ম তেজের সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষুঃ উৎপন্ন হয়। ইহার রজোগুণ হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয় পদ উৎপন্ন হয়। তমোগুণ হইতে রসতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। ইহা অপর চারিভূতের সহিত মিলিত হইয়া এই স্থূল তেজে পরিণত হয়।

বায়ু—যাহার রূপ নাই কিন্তু স্পর্শ আছে তাহাই বায়ু। সেই বায়ু দ্বিবিধ, যথা—নিত্য এবং অনিত্য। তন্মধ্যে যাহা নিত্য বায়ু তাহা বায়ুর পরমাণুরূপ এবং যাহা অনিত্য বায়ু তাহা কার্য্যরূপ বায়ু। সেই কার্য্যরূপ বায়ু আবার তিন প্রকার, যথা—শরীররূপ বায়ু, ইন্দ্রিয়রূপ বায়ু এবং বিষয়রূপ বায়ু। শরীররূপ বায়ুর দৃষ্টান্ত—বায়ুলোকে যে বায়বীয় শরীর তাহা। ইন্দ্রিয়রূপ বায়ুর দৃষ্টান্ত—স্পর্শের গ্রাহক ত্বগিন্দ্রিয়, ইহার স্থান সর্ব্বশরীর। বিষয়রূপ বায়ুর দৃষ্টান্ত—এই অনুভূয়মান বায়ু, যাহার দ্বারা বৃক্ষাদি কম্পিত হয়। শরীরমধ্যে সঞ্চরণশীল যে বায়ু তাহার নাম প্রাণ। তাহা এক হইলেও উপাধিভেদে প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যান—এই পঞ্চনামে অভিহিত হয়। সর্ব্ববিধ বায়ুই প্রত্যক্ষ হয় না। নবীনমতে কিন্তু ইহার ত্বাচ প্রত্যক্ষ স্বীকার করা হয়।

বেদান্তমতে বায়ুপরমাণুও নিত্য নহে। সূক্ষ্মবায়ুকে স্পর্শতন্মাত্র বলে। উহা সূক্ষ্ম আকাশ অর্থাৎ শব্দতন্মাত্র হইতে উৎপন্ন। সূক্ষ্মবায়ুর সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ত্বক্ উৎপন্ন হয়। ইহার রজোগুণ হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয় হস্ত উৎপন্ন হয়। তমোগুণ হইতে রূপ-তন্মাত্র উৎপন্ন হয়। ইহা অপর চারি ভূতের সহিত মিলিত হইয়া এই স্থূলবায়ুতে পরিণত হয়।

মীমাংসকমতে ক্ষিতি, অপ্ ও তেজের ত্বাচ ও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, বায়ুর কিন্তু কেবলই ত্বাচ প্রত্যক্ষ হয়। তাহার পর সকল শরীরই পার্থিব, জলীয় তৈজসাদি শরীরভেদ স্বীকার করা হয় না।

আকাশ—শব্দ যাহার গুণ তাহাই আকাশ; তাহা "একটী" বস্তু, বহু নহে। ইহা বিভু অর্থাৎ সর্ব্বমূর্ত্তদ্রব্যের সহিত সংযুক্ত এবং নিত্য। যাহা ক্রিয়ার আশ্রয় হয়, তাহাকেই মূর্ত্ত বলা হয়। উহার কার্য্যরূপ নাই, সুতরাং অনিত্যরূপও নাই। এজন্য ইহার শরীররূপ ও বিষয়রূপ অবস্থাভেদও নাই। তবে ইহার ইন্দ্রিয়রূপ আছে, আর তাহা এই

নিত্য এক আকাশই কর্ণগহ্বরদ্বারা অবচ্ছিন্ন হইলে হয়। আকাশ প্রত্যক্ষ হয় না।

বেদান্তমতে আকাশও উৎপন্ন দ্রব্য, সুতরাং অনিত্য। সূক্ষ্ম আকাশকে শব্দতন্মাত্র বলে। ইহা অন্য চারিভূতের সহিত মিলিত হইয়া এই স্থূল আকাশ হইয়াছে। সূক্ষ্ম আকাশের সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রবণ উৎপন্ন হইয়াছে। উহার রজোগুণ হইতে কর্মেন্দ্রিয় বাক্ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার তমোগুণ হইতে স্পর্শতন্মাত্র হইয়াছে। এই সূক্ষ্ম আকাশ মায়াযুক্ত ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ভট্টমতে পুরোবর্ত্তিত্ব উপাধি-বিশিষ্ট আকাশের প্রত্যক্ষও হয়।

পঞ্চভূত হইতে জগতের উৎপত্তি।

ন্যায়মতে ক্ষিত্যাদি পাঁচটীকে ভূত বলে, আর ক্ষিত্যাদি চারিটী ভূত-পরমাণু ও আকাশ মিলিয়া এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। অপ্রত্যক্ষ পরমাণুগুলি জীবকর্ম্মবশে ঈশ্বরেচ্ছায় মিলিত হইয়া থাকে। প্রথমে দুইটী পরমাণু মিলিয়া একটী দ্ব্যণুক হয়। উহাও প্রত্যক্ষ হয় না। তৎপরে তিনটী দ্ব্যণুক মিলিয়া একটী ত্রসরেণু হয়। উহা মহদ্ বস্তু ও প্রত্যক্ষযোগ্য। ত্রসরেণুর মূল অবয়ব ছয়টী পরমাণু। এই বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সাহায্যে যতই সূক্ষ্ম পরমাণু কল্পনা করা যাইতেছে, সবই ত্রসরেণুই বলিতে হইবে। কারণ, তাহারও অবয়ব বা অংশ আছে। যাহার অবয়ব বা অংশ নাই তাহাই পরমাণু। ত্রসরেণু মিলিয়া ক্রমে ঘট পট মঠাদি যাবৎ বস্তু হইয়াছে।

মহাভূতের মিলিত অবস্থার সত্ত্বগুণ হইতে অন্তঃকরণ জন্মিয়াছে। উহা চারি প্রকার যথা—মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার। অথবা মতান্তরে দুই প্রকার, যথা—মনঃ ও বুদ্ধি। এমতে অহংকার মনের মধ্যে এবং চিত্ত বুদ্ধিমধ্যে পরিগণিত হয়। আর উক্ত পঞ্চমহাভূতের মিলিতাবস্থার রজোগুণ হইতে পঞ্চপ্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে, উহাদের নাম—প্রাণ, অপান সমান উদান ও ব্যান। এই চারি অন্তঃকরণ, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণবিশিষ্ট চৈতন্যই তাহাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হইয়াছেন। যথা—অচ্যুত চিত্তের, শঙ্কর অহংকারের, ব্রহ্মা বুদ্ধির, চন্দ্র মনের, দিক্ শ্রবণেন্দ্রিয়ের, বায়ু ত্বগিন্দ্রিয়ের, সূর্য্য চক্ষুরিন্দ্রিয়ের, বরুণ রসনেন্দ্রিয়ের, অশ্বিনীকুমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের, অগ্নি বাগিন্দ্রিয়ের, ইন্দ্র পাণ্যিন্দ্রিয়ের, বিষ্ণু পাদেন্দ্রিয়ের, যম পায়ু ইন্দ্রিয়ের এবং প্রজাপতি উপস্থেন্দ্রিয়ের দেবতা—ইহা বলা হয়। পঞ্চ প্রাণের দেবতা প্রাণ নামেই অভিহিত হন। পঞ্চ স্থূলভূত হইতে জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ স্থূলশরীর উৎপন্ন হইয়াছে। আর মনঃ ও বুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণদ্বয়, দশ ইন্দ্রিয়, ও পঞ্চ প্রাণ মিলিত হইয়া ১৭টী অবয়বযুক্ত সূক্ষ্মশরীর উৎপন্ন হইয়াছে। অজ্ঞানকে কারণশরীর বলা হয়। এই ত্রিবিধ শরীরকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া পঞ্চকোষ বলা হয়।

ভট্টমতে দেশরূপ উপাধিযোগে অথবা বিশেষণরূপে আকাশও প্রত্যক্ষ হয়। বায়ুর স্বাচ প্রত্যক্ষ হয়। প্রভাকরমতে আকাশ অনুমেয়ই হয়।

কাল—ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ব্যবহারের যে হেতু তাহাই কাল। তাহা—এক, বিভু ও নিত্য; ইহা উপাধিভেদে নানা। ইহাও অপ্রত্যক্ষ কিন্তু অনুমেয়। কালিক সম্বন্ধে ইহা সকলের অধিকরণ হয়।

বেদান্তমতে ইহাও অনিত্য। বর্ত্তমানতারূপ উপাধিবিশিষ্টরূপে ইহা প্রত্যক্ষও হয়।

দিক্—পূর্ব্বপশ্চিমাদি ব্যবহারের যে হেতু তাহাই দিক্। তাহাও এক বিভু ও নিত্য। ইহাও উপাধিভেদে নানা। ইহাও অপ্রত্যক্ষ কিন্তু অনুমেয়। দৈশিক সম্বন্ধে ইহা সকলের অধিকরণ হয়।

বেদান্তমতে ইহাও অনিত্য। পূর্ব্বাদি উপাধিবিশিষ্টরূপে ইহা প্রত্যক্ষও হয়। এক কথায় আত্মভিন্ন সবই অনিত্য এবং মিথ্যা। মিথ্যা অর্থ যাহা তিনকালে নাই, অথচ জ্ঞেয় হয়। অনিত্য বলিলে সকল স্থলে মিথ্যা বুঝায় না। মীমাংসকমতে জগৎ সংসার সত্য ও অনিত্য, মিথ্যা নহে। আর ইহার মহাপ্রলয়ও নাই।

আত্মা—যাহা জ্ঞানের অধিকরণ তাহাই আত্মা। উহা দ্বিবিধ, যথা—পরমাত্মা ও জীবাত্মা। তন্মধ্যে পরমাত্মাই ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, অশরীরী এবং একই। জীবাত্মা প্রতি শরীরে বিভিন্ন সুতরাং অসংখ্য। উভয়ই বিভু ও নিত্য। অর্থাৎ সর্ব্বমূর্ত্তদ্রব্যসংযোগী ও উৎপত্তিবিনাশশূন্য। ঈশ্বর অনুমেয়

ও শব্দপ্রমাণগম্য আর জীবাত্মা জ্ঞান ও ইচ্ছাদিবিশিষ্টরূপে মানস-প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। ঈশ্বরকৃপায় ও আত্মার জ্ঞানে জীবের মুক্তি হয়।

বেদান্তমতে আত্মা একই নিত্য ও সত্য। জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। পরমাত্মা অবিদ্যারূপ উপাধিবশে নানা হয়। ইহা স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া সাক্ষাৎ অপরোক্ষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ। ব্যষ্টি অবিদ্যারূপ কারণশরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মচৈতন্যের নাম প্রাজ্ঞ, আর সমষ্টি অবিদ্যারূপ কারণশরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মচৈতন্যই ঈশ্বর। সুতরাং প্রাজ্ঞসমষ্টিই ঈশ্বর। এই ব্যষ্টি প্রাজ্ঞ যখন সূক্ষ্মশরীরবিশিষ্ট ও সমষ্টি ঈশ্বর সূক্ষ্মশরীর ও সূক্ষ্ম জগৎরূপ শরীর হন তখন প্রাজ্ঞের নাম তৈজস ও ঈশ্বরের নাম হিরণ্যগর্ভ হয়। সূক্ষ্ম জগৎ ও দেবতাদি সকলই ইহার শরীর। আবার এই ব্যষ্টি তৈজস ও সমষ্টি হিরণ্যগর্ভ যখন স্থূলশরীরবিশিষ্ট হন তখন তৈজসের নাম বিশ্ব বা বৈশ্বানর এবং হিরণ্যগর্ভের নাম বিরাট্ হয়। সুতরাং এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার দেহ। মীমাংসকমতে তার্কিকসম্মত ঈশ্বর অস্বীকার্য, বৈদিক ঈশ্বর স্বীকার্য। আত্মা চৈতন্যাশ্রয় বস্তু ও বিভু মানস প্রত্যক্ষগম্য।

মনঃ—সুখ দুঃখ প্রভৃতির যে উপলব্ধি, তাহার সাধন যে ইন্দ্রিয়, তাহাই মনঃ। তাহা এক একটী জীবাত্মার এক একটী; এজন্য জীবাত্মাও যেমন অনন্ত, মনও তদ্রূপ অনন্ত। পরমাত্মার জ্ঞান নিত্য বলিয়া উৎপন্ন হয় না, আর তজ্জন্য তাঁহার জ্ঞানের জন্য মনের আবশ্যকতা হয় না। এই মনঃ পরমাণুরূপ নিত্য এবং অপ্রত্যক্ষ।

বেদান্তমতে মনঃ অনিত্য, সাবয়ব ও সংকোচবিকাশশীল মধ্যম পরিমাণ এবং অনন্ত। ইহার অপর নাম অন্তঃকরণ। উহা পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূতের মিলিতাবস্থার সত্ত্বগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারই দ্বারা সুখ ও দুঃখাদির অনুভব হয় বলিয়া কেহ ইহাকে ইন্দ্রিয় বলেন। কেহ বলেন—সুখদুঃখাদি সাক্ষিভাস্য হইয়া সাক্ষিযুক্ত মনোদ্বারা পরে জ্ঞেয় হয়। কেহ বা মনকে ইন্দ্রিয়ই বলেন না। ভট্টমীমাংসকমতে ইহা বিভু এবং ইন্দ্রিয়।

অপ্রত্যক্ষ দ্রব্য—পরমাণু, দ্ব্যণুক, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্ ও মনঃ। ইন্দ্রিয়গুলিও অপ্রত্যক্ষ।

প্রত্যক্ষ দ্রব্য—আত্মা, মহত্ত্ব ও উদ্ভূতরূপবিশিষ্ট পৃথিবী, জল ও তেজঃ, অর্থাৎ ইহাদের ত্রসরেণু হইতে ঘটপটাদি যাবদ্ বস্তু। আত্মার ও আত্মধর্ম্মের যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহা মানসপ্রত্যক্ষ; অপর ইন্দ্রিয়ের যে প্রত্যক্ষ, তাহা বহিরিন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ। বহির্দ্রব্যপ্রত্যক্ষের প্রতি মহত্ত্ববিশিষ্ট উদ্ভূতরূপবত্ত্বই কারণ।

অবৃত্তি দ্রব্য—আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও পরমাণু। ইহারা কালিকান্ত সম্বন্ধে কোথাও থাকে না।

মূর্ত্ত ও ক্রিয়াবান্ দ্রব্য—পৃথিবী, অপ্, তেজঃ, বায়ু ও মনঃ।

দ্রব্যসমবায়িকারণ—পৃথিবী, অপ্, তেজঃ ও বায়ু।

ইহাই হইল দ্রব্যপরিচয়।

গুণপরিচয়।

রূপ—চক্ষুরিন্দ্রিয় মাত্রের গ্রাহ্য যে গুণ তাহাই রূপ। তাহা শুক্ল, নীল, পীত, হরিত, রক্ত, কপিশ এবং চিত্র অর্থাৎ অবয়বগত নানা রূপ হইতে উৎপন্ন একটী বিচিত্র রূপ বিশেষ, এইরূপে সাত প্রকার। ইহা পৃথিবী জল ও তেজে থাকে। তন্মধ্যে পৃথিবীতে সাত প্রকার রূপই থাকে, জলে অভাস্বর শুক্লরূপ থাকে এবং তেজে উজ্জ্বল শুক্লরূপ থাকে।

বেদান্তমতে ইহা তেজেরই গুণ তবে তেজ হইতে জল ও জল হইতে ক্ষিতি উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহা জল ও ক্ষিতিতেও থাকে। অন্ধকারেও ইহা থাকে। পঞ্চীকৃত ভূত-পঞ্চকেই ইহা থাকে, তবে বায়ুতে ও আকাশে তাহা দৃষ্ট হয় না। ষট্‌মতে ইহা শুক্ল, কৃষ্ণ, পীত রক্ত ও শ্যামভেদে পাঁচ প্রকার। অবান্তরভেদে বহু।

রস—রসনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য যে গুণ তাহাই রস। তাহা মধুর অম্ল লবণ কটু কষায় তিক্তভেদে ছয় প্রকার। ইহা পৃথিবী ও জলে থাকে। তন্মধ্যে পৃথিবীতে ছয় প্রকার রসই থাকে। জলে কিন্তু মধুর রসই থাকে।

স্পর্শ—ত্বগিন্দ্রিয়মাত্রের গ্রাহ্য যে গুণ তাহাই স্পর্শ। তাহা তিন প্রকার, যথা—শীতস্পর্শ, উষ্ণস্পর্শ এবং অনুষ্ণাশীতস্পর্শ। ইহা পৃথিবী অপ্ তেজ ও বায়ুতে থাকে। তন্মধ্যে শীতস্পর্শ থাকে জলে, উষ্ণস্পর্শ থাকে তেজে এবং অনুষ্ণাশীতস্পর্শ থাকে পৃথিবী এবং বায়ুতে।

বেদান্তমতে ইহা বায়ুরই গুণ, আর বায়ু হইতে তেজঃ ও তেজঃ হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহা তেজঃ জল ও ক্ষিতিতেও থাকে। পঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চকেই ইহা থাকিবার কথা, কিন্তু আকাশে ইহা অনুভবযোগ্য নহে।

রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ—এই চারিটী গুণই পৃথিবীতে পাকজ অর্থাৎ অগ্নিসংযোগে পরিবর্ত্তনশীল এবং অনিত্য। জল, তেজঃ ও বায়ুতে অপাকজ অর্থাৎ অগ্নিসংযোগে পরিবর্ত্তিত হয় না। কিন্তু নিত্য ও অনিত্য উভয় প্রকারই হয়, অর্থাৎ পৃথিবীভিন্ন নিত্য পরমাণুতে উহারা নিত্য, এবং পরমাণুজাত অনিত্য কার্য্যদ্রব্যে উহা অনিত্য।

সংখ্যা—একত্বাদি ব্যবহারের যে 'হেতু' তাহাই সংখ্যা। ইহা নয়টী দ্রব্যেই থাকে। সংখ্যা একত্ব হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত। একত্ব সংখ্যাটী নিত্য এবং অনিত্য উভয় প্রকারই হয়। তন্মধ্যে নিত্য দ্রব্যের একত্ব সংখ্যা নিত্য এবং অনিত্য দ্রব্যের একত্ব সংখ্যা অনিত্য। কিন্তু দ্বিত্বাদি অপর যাবতীয় সংখ্যাই অনিত্য। পরার্দ্ধ সংখ্যায় একের পর ১৭টী শূন্য থাকে। দ্বিত্বাদিসংখ্যা অপেক্ষাবুদ্ধি হইতে জন্মে।

প্রাভাকরমতে সংখ্যা একটী পদার্থ, গুণ নহে। যেহেতু গুণ কখন গুণের উপর থাকে না। ভট্টমতে ইহা কিন্তু গুণ। গুণাদির সংখ্যা দ্রব্যানুসারেই জ্ঞেয়।

পরিমাণ—মানব্যবহারের যে অসাধারণ কারণ তাহাই পরিমাণ। ইহা নয়টী দ্রব্যেই থাকে। ইহা চারিপ্রকার যথা—অণুপরিমাণ, মহৎ-পরিমাণ, দীর্ঘপরিমাণ ও হ্রস্বপরিমাণ। কারণগুণানুসারে নিজ অবয়বের বহুত্বই মহত্ত্বের জনক হয়। অবয়বের শিথিলসংযোগ এবং বৃদ্ধিও মহত্ত্বের জনক হয়।

পৃথক্ত্ব—পৃথক্ ব্যবহারের যাহা অসাধারণ কারণ, তাহাই পৃথক্ত্ব।

ইহা সমুদয় দ্রব্যেই থাকে। ইহা একপৃথক্ত্ব, দ্বিপৃথক্ত্ব ইত্যাদি প্রকারে বহু। ইহাও কারণগুণানুসারে জন্মে।

বেদান্তমতে ইহা ভেদ নামক অভাবের মধ্যে গণ্য করা হয়। প্রভাকরমতে ইহা নিত্যদ্রব্যের গুণ, কার্য্যদ্রব্যের গুণ নহে। ভট্টমতে ইহাকে গুণ বলা হয়।

সংযোগ—সংযুক্ত বলিয়া যে ব্যবহার হয় তাহার যে 'হেতু' তাহাই সংযোগ। ইহাও নয়টী দ্রব্যেই থাকে। ইহা এককর্ম্মজ, উভয়কর্ম্মজ, এবং সংযোগজভেদে তিন প্রকার। তন্মধ্যে সংযোগজ-সংযোগ আবার অভিঘাত ও নোদনভেদে দুই প্রকার।

ভট্টমতে ইহা নিত্য ও অনিত্যভেদে দ্বিবিধ; যথা—নিত্যসংযোগ—নিত্য বিভুদ্রব্যের পরস্পর সংযোগ। অনিত্যসংযোগ ন্যায়মতানুরূপ।

বিভাগ—সংযোগের নাশক যে গুণ তাহাই বিভাগ। ইহাও নয়টী দ্রব্যেই থাকে। ইহা এককর্ম্মজ, উভয়কর্ম্মজ ও সংযোগজভেদে তিন প্রকার। সংযোগজ বিভাগ আবার হেতুমাত্রবিভাগজ এবং হেতু-হেতুবিভাগজভেদে দুই প্রকার।

ভট্টমতে ইহা অবিভুদ্রব্যেরই গুণ। বিভুদ্বয়ের বিভাগ নাই। অবশিষ্ট ন্যায়মতানুরূপ।

পরত্ব—পর বলিয়া ব্যবহারের যে অসাধারণ কারণ, তাহাই পরত্ব।

অপরত্ব—অপর বলিয়া ব্যবহারের যে অসাধারণ কারণ, তাহাই অপরত্ব।

এই পরত্ব ও অপরত্ব আবার দ্বিবিধ হয়, যথা—দিক্‌কৃত পরত্ব ও অপরত্ব এবং কালকৃত পরত্ব ও অপরত্ব। দূরস্থে দিক্‌কৃত পরত্ব, সমীপে দিক্‌কৃত অপরত্ব, জ্যেষ্ঠে কালকৃত পরত্ব এবং কনিষ্ঠে কালকৃত অপরত্ব। ইহারা পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও মনে থাকে।

ভট্টমত—ন্যায়মতানুরূপ।

ভট্টমত—ন্যায়মতানুরূপ।

দ্রবত্ব—প্রথম গড়াইয়া যাওয়ার যে অসমবায়ি কারণ তাহাই দ্রবত্ব। ইহা পৃথিবী, জল ও তেজে থাকে। এই দ্রবত্ব আবার দ্বিবিধ যথা—সাংসিদ্ধিক অর্থাৎ স্বাভাবিক ও নৈমিত্তিক। তন্মধ্যে সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব থাকে জলে এবং নৈমিত্তিক দ্রবত্ব থাকে পৃথিবী ও তেজে। ঘৃতাদিতে অগ্নিসংযোগজন্য যে দ্রবত্ব, তাহা পৃথিবীর নৈমিত্তিক দ্রবত্ব। আর আকরজতেজঃ যে স্বর্ণাদি, তাহাতে অগ্নিসংযোগজন্য যে দ্রবত্ব, তাহা তাহার নৈমিত্তিক দ্রবত্ব।

ভট্টমত—ন্যায়মতানুরূপ।

স্নেহ—চূর্ণাদির পিণ্ডীভাবের হেতু যে গুণ তাহাই স্নেহ। উহা জলমাত্রে থাকে এবং কারণগুণানুসারে জন্মে।

শব্দ—শ্রবণেন্দ্রিয়মাত্রের গ্রাহ্য যে গুণ তাহাই শব্দ। ইহা আকাশমাত্রে থাকে। তাহা দ্বিবিধ—ধ্বনিস্বরূপ ও বর্ণস্বরূপ। তন্মধ্যে ধ্বনিস্বরূপ—শব্দ ঢাক ঢোলের শব্দ। আর সংস্কৃত ভাষাদিরূপ যে শব্দ, তাহা বর্ণাত্মক শব্দ। শব্দ—সংযোগজ, বিভাগজ ও শব্দজভেদে তিন প্রকার হয়।

মীমাংসকমতে বর্ণাত্মকশব্দ—নিত্য দ্রব্যবিশেষ। ধ্বনিটী বায়ুর গুণ ও অনিত্য। বেদান্তমতে বর্ণাত্মকশব্দ—দ্রব্য; ধ্বনি আকাশের গুণ, কেহই নিত্য নহে। কারণ ব্রহ্মভিন্ন সবই অনিত্য ও মিথ্যা। উক্তমতে ধ্বন্যাত্মক শব্দটী বর্ণাত্মক শব্দরূপ দ্রব্যের অভিব্যঞ্জক।

প্রাকট্য—ভট্টমতে ইহা সর্ব্বদ্রব্যবৃত্তি সামান্য গুণ। ইহা সংযুক্ততাদাত্ম্যসম্বন্ধে প্রত্যক্ষগম্য। দ্রব্যের সহিত তাদাত্ম্যবশতঃ ইহা জাতি, গুণ ও কর্ম্মেও থাকে। "ঘটঃ প্রকাশতে" "প্রকটঃ ঘটঃ" ইত্যাদি ব্যবহারের হেতু বলিয়া ইহা স্বীকার্য্য।

শক্তি—এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। (২২৫ পৃঃ)

বুদ্ধি—সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারের যে অসাধারণ হেতু তাহাই বুদ্ধি বা জ্ঞান। ব্যবহার অর্থ—আহার বিহারাদি সকলরূপ ব্যবহার। অথবা এস্থলে কেবল শব্দপ্রয়োগমাত্র। এতজ্জ শব্দপ্রয়োগের অসাধারণ হেতুই জ্ঞান—এরূপও বলা যায়। ইহা আত্মা ও মনের সংযোগে কিংবা আত্মা

মনঃ ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগে আত্মাতে উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য, তাহা উৎপন্ন হয় না। জন্যজ্ঞান প্রথমক্ষণে উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয়ক্ষণে স্থিতিলাভ করে, তৃতীয়ক্ষণে বিনষ্ট হয়। ধারাবাহিক জ্ঞান বিভিন্ন জ্ঞান। প্রথম উৎপন্ন সবিকল্পক জ্ঞানকে ব্যবসায়াত্মক জ্ঞান বলে, আর এই জ্ঞানের জ্ঞানকে অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞান বলে। ইহাতে জ্ঞানেরও প্রত্যক্ষ হয়। জ্ঞান কিন্তু পরতঃপ্রমাণ এবং পরতঃপ্রকাশ। স্বতঃপ্রমাণ বা স্বতঃপ্রকাশ নহে।

বেদান্তমতে—এই জ্ঞান বা বুদ্ধি—গুণ পদার্থ নহে; কিন্তু ইহা অন্তঃকরণরূপ দ্রব্য পদার্থ। এই জ্ঞান দুইরূপ, যথা—অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপ জ্ঞান এবং স্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান। ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞানবিশিষ্ট অন্তঃকরণ যখন যে বিষয়ের আকার ধারণ করে, তখন সেই বিষয়ের জ্ঞান হয়। বিষয়ের সহিত জ্ঞানের যে সম্বন্ধ তাহার নাম আধ্যাসিক সম্বন্ধ। এই আকার ধারণ করাই অন্তঃকরণের বৃত্তি বা পরিণাম। বৃত্তিজ্ঞানেরই উৎপত্তি বিনাশ আছে, স্বরূপজ্ঞানের উৎপত্তি বিনাশ নাই। বৃত্তিজ্ঞান, যাবৎকাল বিষয়স্ফুরণ হয় তাবৎকালস্থায়ী বলা হয়। ধারাবাহিক জ্ঞান বিভিন্ন জ্ঞান নহে—বলা হয়। ভট্টমতে ইহা গুণ, এবং অর্থাপত্তি প্রমাণগম্য। সুতরাং পরতঃপ্রকাশ। কিন্তু স্বতঃপ্রমাণ বলা হয়। প্রভাকর ও বেদান্তমতে ইহা স্বতঃপ্রকাশ ও স্বতঃপ্রমাণ বলা হয়।

বুদ্ধির বিভাগ।

এই বুদ্ধি দ্বিবিধ, যথা—স্মৃতি ও অনুভব। সংস্কারমাত্র হইতে জন্মে যে জ্ঞান তাহাই স্মৃতি। এই স্মৃতিভিন্ন যে জ্ঞান তাহাই অনুভব।

অনুভবের বিভাগ।

এই অনুভব দ্বিবিধ, যথা—যথার্থ বা প্রমা এবং অযথার্থ বা অপ্রমা।

বেদান্তমতে বৃত্তিজ্ঞান দ্বিবিধ, যথা—প্রমা ও অপ্রমা। প্রমাণজন্য জ্ঞানকে 'প্রমা' বা 'যথার্থ' বলে, প্রমাভিন্ন জ্ঞানকে 'অপ্রমা' বলে। অপ্রমা আবার 'যথার্থ' ও 'ভ্রম' বা 'অযথার্থ' ভেদে দ্বিবিধ। দোষজন্য জ্ঞানের নাম 'অযথার্থ' বা ভ্রম, আর যাহা প্রমাণজন্য অথবা অন্য কোন কারণজন্য তাহা যথার্থ। শুক্তিতে রজতজ্ঞান সাদৃশ্যদোষজন্য, মিষ্টবস্তুতে তিক্তবোধ পিত্তদোষজন্য, চন্দ্রে ক্ষুদ্রতার জ্ঞান এবং অনেক বৃক্ষে একতার জ্ঞান দূরত্বরূপ দোষজন্য বলিয়া ভ্রম। স্মৃতিজ্ঞান, সুখদুঃখের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও ঈশ্বরের বৃত্তিজ্ঞান দোষজন্য নহে বলিয়া ভ্রম নহে, কিন্তু যথার্থ। আর প্রমাণজন্য নহে বলিয়া প্রমা নহে, অর্থাৎ অপ্রমা। এই জ্ঞানের বিষয় সংসারদশাতে বাধিত হয় না বলিয়া ইহাকে যথার্থও বলা হয়। যথার্থ অনুভবজাত সংস্কার হইতে উৎপন্ন স্মৃতি যথার্থ এবং ভ্রম অনুভব হইতে জাত সংস্কার হইতে উৎপন্ন স্মৃতি অযথার্থ।

যথার্থ অনুভবের লক্ষণ।

তদ্‌বিশিষ্টে তৎপ্রকারক যে অনুভব—তাহাই যথার্থ বা প্রমা। সুতরাং রজতত্ববিশিষ্টে যে রজতত্বপ্রকারক জ্ঞান অর্থাৎ "ইহা রজত" এই প্রকার যে জ্ঞান, তাহাই যথার্থ জ্ঞান। সূক্ষ্ম করিয়া বলিতে গেলে—"তদ্‌বন্নিষ্ঠবিশেষ্যতানিরূপিত তন্নিষ্ঠপ্রকারতাশালী যে অনুভব—তাহাই যথার্থ" বলিতে হইবে। নচেৎ রঙ্গ ও রজতকে "ইহা রজতরঙ্গ" এইরূপ সমূহালম্বন ভ্রমস্থলে অতিব্যাপ্তি হয়। নানামুখ্যবিশেষ্যতাশালী এক জ্ঞানকে সমূহালম্বন জ্ঞান বলে। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানে প্রকারতা বিশেষ্যতা থাকে না বলিয়া তাহা প্রমা বা অপ্রমা কিছুই নহে।

বেদান্তমতে অবাধিতার্থক জ্ঞানের নাম প্রমা। অর্থাৎ যে জ্ঞান বাধিত হয় না তাহাই প্রমা। আর স্মৃতিকে প্রমা না বলিতে ইচ্ছা হইলে যাহা অনধিগত এবং অবাধিতার্থক জ্ঞান তাহাকেই প্রমা বলিতে হইবে। এ মতে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানও প্রমা হয়। ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শুক্তিতে যে শুক্তিজ্ঞান তাহা সুতরাং প্রমা জ্ঞান।

অযথার্থ অনুভবের লক্ষণ।

তাহার অভাববিশিষ্টে তৎপ্রকারক যে অনুভব—তাহাই অযথার্থ। যেমন শুক্তিতে "ইহা রজত" বলিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহা অযথার্থ জ্ঞান বা অপ্রমা বলা হয়। সূক্ষ্ম করিয়া বলিতে গেলে "তদভাববন্নিষ্ঠ বিশেষ্যতা-নিরূপিত তন্নিষ্ঠপ্রকারতাশালী জ্ঞানই অযথার্থ বলিতে হইবে।

বেদান্তমতে যে জ্ঞান বাধিত হয় তাহা অপ্রমা জ্ঞান, সুতরাং শুক্তিতে রজতজ্ঞান অযথার্থ অপ্রমা জ্ঞান, আর ব্রহ্মজ্ঞান হইলে ব্রহ্মভিন্ন ঘটপটাদি যাবৎ বিষয়ের জ্ঞানই বাধিত হয় বলিয়া যথার্থ অপ্রমা জ্ঞান বলা হয়।

যথার্থ অনুভবের বিভাগ।

যথার্থানুভব চারিপ্রকার, যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ।

ভট্ট ও বেদান্তমতে ইহা ছয় প্রকার, যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি, শাব্দ, অর্থা-পত্তি, এবং অনুপলব্ধি। প্রভাকরমতে অনুপলব্ধি স্বীকার করা হয় না বলিয়া পাঁচ প্রকার।

প্রমাণ বিভাগ।

এই চারিপ্রকার প্রমার করণও চারিপ্রকার; যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। নির্ব্বিকল্পকপ্রত্যক্ষ ভিন্ন সবই সবিকল্পক জ্ঞান।

বেদান্ত ও ভট্ট মতে ইহা ছয় প্রকার, যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, ও অনুপলব্ধি। প্রভাকরমতে অনুপলব্ধি প্রমাণ স্বীকার করা হয় না। কারণ, তন্মতে অভাব অধিকরণস্বরূপ, পদার্থান্তর নহে। বেদান্তমতে এই প্রমাণের প্রামাণ্য দ্বিবিধ, যথা—ব্যাবহারিকতত্ত্বাবেদকত্ব ও পারমার্থিকতত্ত্বাবেদকত্ব। তন্মধ্যে ব্রহ্মস্বরূপাবগাহি প্রমাণ ব্যতিরিক্ত সকল প্রমাণের প্রামাণ্য প্রথম প্রকার। এই সকল প্রমাণের, বিষয় যে ঘটপটাদি তাহাদের ব্যবহার দশায় বাধ হয় না। আর জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যবোধক "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" হইতে "তত্ত্বমসি" পর্য্যন্ত প্রমাণের প্রামাণ্য দ্বিতীয় প্রকার। ইহাদের বিষয় যে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য তাহার কোন কালেই বাধ হয় না।

করণের লক্ষণ।

ব্যাপারবৎ যে অসাধারণ কারণ তাহাই করণ। অসাধারণ অর্থ—কার্য্যত্বব্যাপ্যধর্ম্মাবচ্ছিন্ন কার্য্যতানিরূপিত কারণতাশালী। যেমন দণ্ডাদিতে ঘটের প্রতি অসাধারণকারণত্ব থাকে; যেহেতু—কার্য্যত্বের ব্যাপ্য ঘটত্বাদিরূপ যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন যে কার্য্যতা, তাহা থাকে সেই ঘটে, আর সেই ঘটনিরূপিত যে কারণতা, তাহা থাকে দণ্ডে। এই হেতু ঘটের প্রতি দণ্ড অসাধারণ কারণ। ভ্রমণাদিরূপ যে ব্যাপার, সেই ব্যাপারবত্ত্বশতঃ উহাই করণ। সুতরাং সাধারণত্ব বলিতে—কার্য্যত্বাবচ্ছিন্ন কার্য্যতানিরূপিত কারণতাশালিত্ব। ঈশ্বরেচ্ছা ও অদৃষ্টাদি কার্য্যত্বাবচ্ছিন্নের প্রতিই কারণ হয় বলিয়া সাধারণ কারণ। কার্য্যমাত্রের প্রতি সাধারণ কারন—ঈশ্বর, ঈশ্বরের জ্ঞান, ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বরের যত্ন, প্রাগভাব, কাল, দিক্ এবং অদৃষ্ট—এই আটটী।

কারণের লক্ষণ।

যাহা কার্য্যের নিয়তভাবে পূর্ব্বে থাকে, তাহাই কারণ। ইহার অর্থ—অনন্যথাসিদ্ধ হইয়া কার্য্যের যাহা নিয়তপূর্ব্ববৃত্তি তাহাই কারণ।

কার্য্যের লক্ষণ।

যাহা প্রাগভাবের প্রতিযোগী তাহাই কার্য্য। "এখানে ঘট হইবে" বলিলে যে অভাব বুঝায় তাহাই প্রাগভাব। এস্থলে ঘট তাহার প্রতিযোগী বলিয়া ঘটটী কার্য্য।

কারণের বিভাগ।

কারণ ত্রিবিধ, যথা—সমবায়ি, অসমবায়ি এবং নিমিত্ত।

সমবায়িকারণের লক্ষণ।

যাহাতে সমবেত হইয়া কার্য্য উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ যে কারণের উপর সমবায় সম্বন্ধে কার্য্য থাকে—তাহাই সমবায়ি কারণ। যেমন, পটের প্রতি তন্তু, এবং ঘটের প্রতি কপাল—সমবায়ি কারণ। এখানে কারণ-রূপ তন্তুতে সমবায় সম্বন্ধদ্বারা কার্য্যপট সম্বদ্ধ হইলে পটাত্মক কার্য্য উৎপন্ন হয় বলিয়া অর্থাৎ পট সমবায়সম্বন্ধে তন্তুতে থাকে বলিয়া তন্তু পটের সমবায়ি কারণ। তদ্রূপ পটরূপাদির প্রতি পট—সমবায়ি কারণ। যেহেতু, পটরূপটী গুণ, সমবায়সম্বন্ধে তাহা দ্রব্যপটে থাকে। সূক্ষ্মভাবে সমবায়িকারণের লক্ষণ বলিতে গেলে বলিতে হয়—সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-কার্য্যতানিরূপিত-তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-কারণতাশ্রয়ত্বই সমবায়িকারণত্ব। যেমন—সমবায়সম্বন্ধে ঘটাদির অধিকরণ কপালাদিতে, কপালাদি তাদাত্ম্য সম্বন্ধে থাকে বলিয়া, সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং ঘটত্বাবচ্ছিন্ন যে কার্য্যতা, সেই কার্য্যতানিরূপিত তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন কারণতা কপালাদিতে থাকে। জন্যভাববস্তু যে দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম, সেই তিনটীরই পক্ষে দ্রব্যটী সমবায়িকারণ হয়। অর্থাৎ ঘটাদি অংশী দ্রব্যের সমবায়ি-কারণ—তাহার অংশ কপালাদি দ্রব্যই হয়, আর উৎপন্ন গুণের এবং কর্ম্মের সমবায়িকারণ—তাহাদের আশ্রয় দ্রব্যই হয়। সংক্ষেপে—সম-বায়িকারণ—দ্রব্যই হয়।

অসমবায়িকারণের লক্ষণ।

কার্য্যের সহিত কিংবা কারণের সহিত একই বিষয়ে সমবেত হইয়া যাহা কারণ হয়, তাহা অসমবায়িকারণ। যেমন প্রথম স্থলে তন্তুসংযোগ পটের অসমবায়িকারণ এবং দ্বিতীয় স্থলে তন্তুরূপ পটরূপের অসমবায়ি কারণ। প্রথম স্থলে অর্থাৎ কার্য্যের সহিত একই বিষয়ে সমবেত হইয়া

যাহা কারণ হয় তাহাই অসমবায়িকারণ—এইস্থলে, সুতরাং তন্তুসংযোগ পটের অসমবায়িকারণ—এইস্থলে, পটস্বরূপ কার্য্যের সহিত তন্তুসংযোগটী একই বিষয়ে অর্থাৎ তন্তুতে সমবেত হওয়ায় অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে থাকায় পটাত্মক কার্য্যের প্রতি তন্তুসংযোগ অসমবায়িকারণ হয়। দ্বিতীয় স্থলে অর্থাৎ কারণের সহিত একই বিষয়ে সমবেত হইয়া যাহা কারণ হয় তাহাই অসমবায়িকারণ—এই স্থলে, সুতরাং তন্তুরূপ পটরূপের অসমবায়িকারণ—এইস্থলে, পটরূপের সমবায়িকারণ যে পট, সেই কারণরূপ পটের সহিত তন্তুরূপটী একই বিষয়ে অর্থাৎ তন্তুতে সমবেত হওয়ায় অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধে থাকায় তন্তুরূপ পটরূপের প্রতি অসমবায়িকারণ হয়। যেহেতু পট সমবায়সম্বন্ধে তন্তুতে থাকে, তন্তুরূপও তন্তুতে সমবায়সম্বন্ধে থাকে, পটরূপও পটে সমবায়সম্বন্ধে থাকে এবং তন্তুসংযোগও তন্তুতে সমবায়সম্বন্ধে থাকে। এজন্য তন্তুসংযোগ পটের অসমবায়িকারণ, এবং তন্তুরূপও পটরূপের অসমবায়িকারণ বলা হয়। স্বল্প কথায়—'সমবায়িকারণে সম্বদ্ধ কারণই অসমবায়িকারণ'। ইহা দ্রব্যের পক্ষে গুণই হয় এবং গুণের পক্ষে গুণ ও কর্ম্ম হয়।

নিমিত্তকারণের লক্ষণ।

এই সমবায়িকারণতা ও অসমবায়িকারণতা ভিন্ন যে কারণতা, তাহা নিমিত্তকারণতা। যেমন দ্ব্যণুকের পক্ষে ঈশ্বর এবং পটের পক্ষে তাঁত, তাঁতী ও মাকু প্রভৃতি নিমিত্তকারণ।

এই কারণ তিনটী ভাবরূপ কার্য্যপদার্থেরই সম্ভব হয়। ধ্বংস-অভাবের কেবল নিমিত্তকারণই থাকে। তবে পর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধে ঘটত্বপটত্বনিষ্ঠ যে দ্বিত্বসংখ্যা তাহা ভাবকার্য্য হইলেও তাহার কেবল নিমিত্তকারণই থাকে। এরূপ ব্যতিক্রম আরও আছে।

বেদান্তমতে সমবায় স্বীকার করা হয় না বলিয়া তন্মতে সমবায়ি ও অসমবায়ি কারণ স্বীকার করা হয় না। এজন্য তন্মতে উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ—এই দ্বিবিধ

কারণই স্বীকার করা হয়। সমবায়ি কারণটী উপাদান কারণ রূপ হয় এবং অসমবায়ি কারণটী নিমিত্তকারণের অন্তর্ভুক্ত হয়। এতদ্ব্যতীত তন্মতে কারণত্বেরই নির্ব্বচন হয় না বলিয়া অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ মিথ্যা বলা হয়। আর তাহা হইলেই জগৎ মিথ্যা হয়। প্রভাকরমতে সমবায় স্বীকার করা হয় বলিয়া অসমবায়িকারণ স্বীকারে আপত্তি নাই।

করণলক্ষণের উপসংহার।

এইরূপে এই ত্রিবিধ কারণমধ্যে যাহা ব্যাপারবৎ হইয়া অসাধারণ কারণ হয়, তাহাই করণ। ব্যাপারবত্ত বিশেষণটী না দিলে, তন্তুসংযোগ এবং কপালসংযোগও, পট এবং ঘটের করণ হইয়া যায়। কিন্তু তাহারা করণ হয় না। যেহেতু কার্য্যত্বের ব্যাপ্য ধর্ম্মদ্বারা অবচ্ছিন্ন যে কার্য্যতা, সেই কার্য্যতানিরূপিত কারণতাশালিত্বই অসাধারণত্ব। এস্থলে তন্তু-সংযোগ ও কপালসংযোগ, কার্য্যত্বের ব্যাপ্য ধর্ম্ম যে পটত্ব ও ঘটত্বাদি, তদ্দ্বারা অবচ্ছিন্নের প্রতি কারণ হওয়ায় অসাধারণ কারণ হয়, কিন্তু তাহারা ব্যাপারবৎ হয় না। যেহেতু "তজ্জন্য হইয়া তজ্জন্যের জনকই" ব্যাপার-পদবাচ্য। এখানে তন্তুসংযোগ ও কপালসংযোগজন্য কোন কিছু পদার্থ, কার্য্যস্বরূপ পট ও ঘটের জনক হয় না। এজন্য তন্তুসংযোগ ও কপাল-সংযোগ করণ হয় না। অসাধারণ পদ না দিলে, ঈশ্বর ও অদৃষ্টাদিরও ব্যাপারবত্ত্ববশতঃ করণত্ব সিদ্ধ হয়। কিন্তু ঈশ্বর অদৃষ্ট আদি—সকল কার্য্যেরই সাধারণ কারণ, অসাধারণ কারণ নহেন।

প্রত্যক্ষপ্রমাণের লক্ষণ।

প্রত্যক্ষজ্ঞানের যাহা করণ তাহাই প্রত্যক্ষপ্রমাণ। ইহা—চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মনঃ—এই ছয়টী ইন্দ্রিয়। প্রত্যক্ষ শব্দে প্রত্যক্ষের করণ 'ইন্দ্রিয়াদি' এবং 'প্রত্যক্ষ জ্ঞান'—এই উভয়ই বুঝায়।

যেমন জল ও তাহার শীতস্পর্শের প্রত্যক্ষ, এবং যাহা মনইন্দ্রিয়করণক প্রত্যক্ষ তাহা মানস প্রত্যক্ষ, যেমন সুখ, দুঃখ ও আত্মার প্রত্যক্ষ।

বেদান্তমতে এই ষড় বিধ ও উক্ত দ্বিবিধ প্রত্যক্ষই স্বীকার করা হয়। এতদ্ভিন্ন শব্দজন্য প্রত্যক্ষও পদ্মপাদের মতে স্বীকার করা হয়।

নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ প্রমার লক্ষণ।

যাহা নিষ্প্রকারক জ্ঞান, তাহাই নির্বিকল্পক জ্ঞান। অর্থাৎ যে জ্ঞানে প্রকারতা, বিশেষ্যতা ও সংসর্গতা নাই তাহাই নির্বিকল্পক জ্ঞান। এই জ্ঞানের যে বিষয়তা তাহা বিশেষ্যতা, প্রকারতা ও সংসর্গতারূপ নহে; কিন্তু তাহা চতুর্থপ্রকার। কোন কিছুকে 'একটা কিছুমাত্র' বলিয়া যে বোধ, তাহাই এই জ্ঞান। এই জ্ঞানের প্রত্যক্ষ বা অনুব্যবসায় হয় না।

সবিকল্পক প্রত্যক্ষ প্রমার লক্ষণ।

যাহা সপ্রকারক জ্ঞান তাহাই সবিকল্পক জ্ঞান। যেমন "অয়ং ঘটঃ" "অয়ং ব্রাহ্মণঃ" ইত্যাদি। এই জ্ঞানে বিশেষ্যতা, প্রকারতা এবং সংসর্গতা —এই ত্রিবিধ বিষয়তা থাকে। "ইনি ব্রাহ্মণ" এই জ্ঞানটী ইদন্ত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতানিরূপিত সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ব্রাহ্মণত্বনিষ্ঠপ্রকারতাশালী জ্ঞান।

এই জ্ঞান দুই প্রকার, যথা—ব্যবসায়াত্মক ও অনুব্যবসায়াত্মক। "অয়ং ঘটঃ" ব্যবসায়াত্মক জ্ঞান, আর "ঘটজ্ঞানবান্ অহং" ইহা অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞান। এই ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানে ঘটটী বিষয়, আর অনুবসায়াত্মক জ্ঞানে ঘট, ঘটজ্ঞান এবং সেই ঘটজ্ঞানের যে জ্ঞাতা—এই তিনটীই বিষয় হয়।

প্রত্যক্ষের ব্যাপার সন্নিকর্ষের ভেদ।

প্রত্যক্ষজ্ঞানের আর একটী কারণ সন্নিকর্ষ। ইহার নাম ব্যাপার। ইহা দুই প্রকার যথা—লৌকিক সন্নিকর্ষ এবং অলৌকিক সন্নিকর্ষ।

লৌকিক সন্নিকর্ষ নিরূপণ।

লৌকিক সন্নিকর্ষ ছয়প্রকার, যথা—সংযোগ, সংযুক্তসমবায়, সংযুক্তসমবেতসমবায়, সমবায়, সমবেতসমবায় এবং বিশেষণবিশেষ্যভাব। যথা—চক্ষুদ্বারা ঘটপ্রত্যক্ষে চক্ষু ও ঘটের সংযোগটী সন্নিকর্ষ হয়।

চক্ষুদ্বারা ঘটরূপ প্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবায়টী সন্নিকর্ষ। যেহেতু চক্ষুসংযুক্ত হয় ঘট, সেই ঘটে রূপটী সমবায় সম্বন্ধে থাকে।

„ ঘটরূপত্ব „ সংযুক্তসমবেতসমবায়টী সন্নিকর্ষ। যেহেতু চক্ষুসংযুক্ত ঘটে রূপটী সমবেত, সেই রূপে রূপত্ব জাতিটী সমবায় সম্বন্ধে থাকে।

শ্রোত্রদ্বারা শব্দ „ সমবায়টী সন্নিকর্ষ। যেহেতু কর্ণবিবরবর্ত্তী আকাশই শ্রবণেন্দ্রিয় এবং শব্দ আকাশের গুণ, আর গুণ ও গুণীর মধ্যে সমবায়ই সম্বন্ধ।

„ শব্দত্ব „ সমবেত সমবায়টী সন্নিকর্ষ। যেহেতু শ্রোত্রসমবেত শব্দে শব্দত্ব সমবায় সম্বন্ধে থাকে।

চক্ষুদ্বারা অভাব „ বিশেষণবিশেষ্যভাবটী সন্নিকর্ষ। যেহেতু ঘটাভাববদ্ ভূতল এইস্থলে চক্ষুসংযুক্ত ভূতলে ঘটাভাবটী বিশেষণ হইয়া থাকে।

এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, দ্রব্যগ্রাহক ইন্দ্রিয় বলিতে চক্ষু ত্বক্ ও মনঃ—এই তিনটী বুঝিতে হইবে। অপর যে ঘ্রাণ, রসনা ও শ্রোত্র ইন্দ্রিয়, তাহারা গুণগ্রাহক, দ্রব্যগ্রাহক নহে। এজন্য রসনেন্দ্রিয় এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় যথাক্রমে রস ও গন্ধ গুণের এবং রসত্ব ও গন্ধত্ব জাতির গ্রাহক বলিয়া সেই রসের প্রত্যক্ষে রসনাসংযুক্তসমবায় এবং গন্ধের প্রত্যক্ষে ঘ্রাণসংযুক্তসমবায় সন্নিকর্ষ হয়; আর রসত্বপ্রত্যক্ষে রসনাসংযুক্তসমবেতসমবায় এবং গন্ধত্বপ্রত্যক্ষে ঘ্রাণসংযুক্তসমবেতসমবায় সন্নিকর্ষ হয়। এস্থলে সংযোগটী সন্নিকর্ষ হয় না। পরন্তু অভাবপ্রত্যক্ষে বিশেষণবিশেষ্যভাব নামক বিশেষণতাটী সন্নিকর্ষ হয়, এজন্য উক্ত পাঁচ প্রকার প্রত্যক্ষের বিষয় যে ঘট, ঘটরূপ, রূপত্ব, শব্দ ও শব্দত্ব, তাহাদের অভাব প্রত্যক্ষকালে উক্ত পাঁচ প্রকার সন্নিকর্ষের সহিত বিশেষণতা সন্নিকর্ষটী যুক্ত করিতে হইবে। অর্থাৎ দ্রব্যাধিকরণক অভাবপ্রত্যক্ষে, যথা—ভূতলে ঘটাভাব

প্রত্যক্ষে সংযুক্তবিশেষণতা সন্নিকর্ষ, দ্রব্যসমবেতাধিকরণক অভাব-প্রত্যক্ষে, যথা—নীলাদিতে পীতত্বের অভাব এবং ঘটত্বাদি জাতিতে পটত্বের অভাব, ইত্যাদির প্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবেতবিশেষণতা, আর দ্রব্যসমবেতসমবেতাধিকরণক অভাবপ্রত্যক্ষে, যথা—নীলত্বাদি জাতিতে পীতত্বের অভাবপ্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবেতসমবেতবিশেষণতা সন্নিকর্ষ হয়।

এস্থলে কার্য্যকারণের সামানাধিকরণ্য এইরূপ—দ্রব্যবৃত্তি লৌকিক-বিষয়তা সম্বন্ধে চাক্ষুষত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি চক্ষুঃসংযোগের কারণতা। আবার দ্রব্যসমবেতবৃত্তি লৌকিকবিষয়তা সম্বন্ধে চাক্ষুষত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি চক্ষুঃসংযুক্তসমবায়ের কারণতা। আর দ্রব্যসমবেতসমবেতবৃত্তি লৌকিকবিষয়তা সম্বন্ধে চাক্ষুষত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি চক্ষুঃসংযুক্তসমবেত-সমবায় সম্বন্ধের কারণতা বুঝিতে হইবে। এইরূপ দ্রব্যবৃত্তি লৌকিক বিষয়তা সম্বন্ধে ত্বাচপ্রত্যক্ষত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি ত্বক্‌সংযোগের হেতুতা। দ্রব্যসমবেতবৃত্তি লৌকিকবিষয়তাসম্বন্ধে দ্রব্যসমবেত ত্বাচপ্রত্যক্ষত্বাব-চ্ছিন্নের প্রতি ত্বক্‌সংযুক্তসমবায়ের হেতুতা। আর দ্রব্যসমবেতসমবেত-বৃত্তি লৌকিকবিষয়তাসম্বন্ধে দ্রব্যসমবেতসমবেত উষ্ণত্বশীতত্বাদি জাতির স্পার্শনপ্রত্যক্ষে ত্বক্‌সংযুক্তসমবেতসমবায়ের হেতুতা। আর আত্মরূপ দ্রব্যের মানসপ্রত্যক্ষে মনঃসংযোগের হেতুতা। আত্মসমবেত সুখাদির মানসপ্রত্যক্ষে মনঃসংযুক্তসমবায়ের হেতুতা এবং আত্মসমবেতসমবেত সুখত্বাদি জাতির মানসপ্রত্যক্ষে মনঃসংযুক্তসমবেতসমবায়ের হেতুতা।

চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের ন্যায় সংযোগ, সংযুক্ততাদাত্ম্য এবং সংযুক্ততাদাত্ম্যবৎতাদাত্ম্য সন্নিকর্ষ আবশ্যক হয়। আর ঘ্রাণজ ও রাসনপ্রত্যক্ষে সংযুক্ততাদাত্ম্য এবং সংযুক্ততাদাত্ম্যবৎতাদাত্ম্য এই দুইটীই সন্নিকর্ষ হয়। সুতরাং বেদান্তমতে সন্নিকর্ষ তিনটী, যথা—সংযোগ, সংযুক্ত-তাদাত্ম্য এবং সংযুক্ততাদাত্ম্যবৎতাদাত্ম্য। চাক্ষুষ ও শ্রাবণপ্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় বিষয়দেশে গমন করে, কিন্তু অপরপ্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় বিষয়দেশে গমন করে না; পদ্মপাদের মতে "তুমিই সেই" ইত্যাদি শব্দ হইতেও প্রত্যক্ষ হয়। বাচস্পতিমতে তাহা হয় না। এজন্য পদ্মপাদের মত শব্দাপরোক্ষবাদ এবং বাচস্পতিমতে শব্দপরোক্ষবাদ স্বীকার করা হয়।

অলৌকিক সন্নিকর্ষ বিভাগ।

অলৌকিক সন্নিকর্ষ তিন প্রকার, যথা—সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ, জ্ঞান-লক্ষণ সন্নিকর্ষ এবং যোগজ সন্নিকর্ষ।

সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ।

ধূম ও বহ্নির প্রত্যক্ষানন্তর ধূমত্ব ও বহ্নিত্বরূপে যাবদ্ ধূম ও বহ্নির প্রত্যক্ষ হয়। ধূমত্ব ও বহ্নিত্ব এখানে সামান্য বা সাধারণ ধর্ম্ম। ধূমত্ব ও বহ্নিত্বরূপে যাবদ্ ধূম ও বহ্নির প্রত্যক্ষ না হইলে ধূম ও বহ্নি ব্যক্তির দর্শনান্তর ধূমত্বাবচ্ছিন্নে বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নের ব্যাপ্তিসংশয় হইত না। এই যাবদ্ ধূম ও বহ্নিপ্রত্যক্ষে ধূমত্ব ও বহ্নিত্বরূপ সামান্যের জ্ঞানটী সন্নিকর্ষ-রূপ হয় বলিয়া ইহাকে সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ বলে।

বেদান্তমতে এই সন্নিকর্ষ স্বীকার করা হয় না। তন্মতে তাবৎ ঘটের প্রত্যক্ষ হয় না, পরন্তু প্রত্যেক ঘটপ্রত্যক্ষে ঘটত্ববিশিষ্ট ঘটব্যক্তিরই প্রত্যক্ষ হয়—ইহাই অনুভবসিদ্ধ। অন্য ঘটকে যে ঘট বলিয়া জানি তাহা অনুমানবলেই জানি।

যোগজ সন্নিকর্ষ।

যোগশক্তি বলে দূরবর্ত্তী অতীত অনাগত বস্তর প্রত্যক্ষ আমাদের হয়। এই যোগশক্তিটী তখন সন্নিকর্ষস্থানীয় হয় বলিয়া ঐরূপ জ্ঞান হয়। বেদান্তমতে ইহাও স্বীকার করা হয় না। ইহাও স্থলবিশেষে প্রত্যক্ষ এবং স্থলবিশেষে অনুমানরূপ হয়। ইহা ইন্দ্রিয়াদির সামর্থ্যাদিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

সন্নিকর্ষটী প্রত্যক্ষের ব্যাপাররূপ কারণ।

এই সন্নিকর্ষটী প্রত্যক্ষজ্ঞানের ব্যাপার। ইহা হইতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। ইন্দ্রিয়গণ এই ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া অসাধারণ কারণ হয় বলিয়া প্রত্যক্ষের "করণ" নামে অভিহিত হয়। অতএব সন্নিকর্ষগুলি ব্যাপার বলিয়া কারণপদবাচ্য হয়।

প্রত্যক্ষের প্রক্রিয়া।

এই প্রত্যক্ষ হইতে গেলে আত্মা মনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। আত্ম-সংযুক্ত মনঃ ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয় এবং ইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয়। মানসপ্রত্যক্ষে আত্মসংযুক্ত মনঃ, অন্তরের বিষয় যে সুখাদি, তাহার সহিত সংযুক্তসমবায়াদি কথিত সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হয়—এই মাত্র প্রভেদ। চক্ষুরিন্দ্রিয় বিষয়দেশে গমন করে, অন্য ইন্দ্রিয় গমন করে না—ইহাও বলা হয়। ইহাই হইল প্রত্যক্ষের পরিচয়।

বহ্নিমান্, যেহেতু ধূম রহিয়াছে"—এই নির্দোষ অনুমানে যায় এবং "পর্ব্বতটী ধূমবান্, যেহেতু বহ্নি রহিয়াছে"—এই দুষ্ট অনুমানে যায় না।

যেমন, "পর্ব্বত বহ্নিমান্, যেহেতু ধূমবান্" এস্থলে সাধ্য = বহ্নি, হেতু = ধূম। সাধ্যের অভাব = বহ্নির অভাব, তাহার অধিকরণ = জলহ্রদ, কারণ, সেখানে বহ্নি থাকে না, তাহাতে যে অবৃত্তিত্ব অর্থাৎ না থাকা, তাহা হেতু ধূমে আছে, সুতরাং লক্ষণ যাইল।

আর "পর্ব্বত ধূমবান্, যেহেতু বহ্নি রহিয়াছে" এই দুষ্ট অনুমানস্থলে এই লক্ষণটী যায় না। কারণ, সাধ্য = ধূম, সেই সাধ্যের অভাব = ধূমাভাব, তাহার অধিকরণ = তপ্তলৌহপিণ্ড, তাহাতে অবৃত্তিত্ব অর্থাৎ না থাকা, হেতু যে বহ্নি, তাহাতে নাই; কারণ, তথায় হেতু বহ্নি থাকেই, এজন্য হেতু বহ্নিতে সাধ্যাভাববৃত্তিত্বই থাকে। অতএব এই স্থলে লক্ষণ যাইল না।

আর এই লক্ষণটী "ঘটঃ অভিধেয়ঃ, প্রমেয়ত্বাৎ" এই নির্দ্দোষ কেবলান্বয়ী অনুমানস্থলেও যায় না। কারণ, সাধ্য যে অভিধেয়ত্ব, তাহার অভাব অপ্রসিদ্ধ বলিয়া সাধ্যাভাববৃত্তিত্ব পাওয়া যায় না।

উক্ত দ্বিতীয় লক্ষণের প্রয়োগ, যথা—উক্ত "পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্, ধূমাৎ" স্থলে "প্রতিযোগিব্যধিকরণ-হেতুসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাব" বলিতে ঘটাভাব ধরা গেল; কারণ, ঘটাভাবের প্রতিযোগী যে ঘট, তাহার সহিত এক অধিকরণে ঘটাভাব থাকে না। আর এই ঘটাভাব হেতুসমানাধিকরণ হয়, কারণ, এই ঘটাভাব হেতু ধূমের সহিত এক অধিকরণে থাকে, সুতরাং প্রতিযোগিব্যধিকরণ হেতুসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবটী ঘটাভাব হইল। তাহার প্রতিযোগী হয় ঘট, আর অপ্রতিযোগী হয় বহ্নি, সেই বহ্নিই এখানে সাধ্য। তাহার সহিত এক অধিকরণে থাকে হেতু ধূম, সুতরাং ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি থাকিল।

আর ইহা কিন্তু "পর্ব্বত ধূমবান্, যেহেতু বহ্নি রহিয়াছে"—এই দুষ্ট স্থলে যাইবে না। কারণ, এস্থলে অপ্রতিযোগী সাধ্য পাওয়া যায় না।

তাহার পর এই লক্ষণটী উক্ত "ঘটঃ অভিধেয়ঃ, প্রমেয়ত্বাৎ" এই নির্দোষ কেবলান্বয়ী স্থলেও যাইবে, যেহেতু "প্রতিযোগিব্যধিকরণ হেতুসমানাধিকরণ অভাবাভাব" এখানে ঘটাভাব ধরা যায়, তাহার অপ্রতিযোগী সাধ্য বহ্নি হয়। অতএব দ্বিতীয় লক্ষণটী সকলস্থলেই যায়, প্রথমলক্ষণটী কেবলান্বয়ী স্থলভিন্ন অন্যত্র যায়।

ব্যতিরেকব্যাপ্তির লক্ষণও এই "পর্ব্বত বহ্নিমান্" স্থলে যাইবে, যথা —সাধ্যাভাব—বহ্নির অভাব, তাহার ব্যাপকীভূত অভাব=ধূমাভাব। কারণ, বহ্নির অভাব যেখানে যেখানে থাকে, সেখানে ধূমাভাব থাকেই, কিন্তু ধূমাভাব যে তপ্তলৌহপিণ্ডে থাকে, তথায় বহ্নিই থাকে, বহ্নির অভাব থাকে না। এজন্য ধূমাভাবটী বড় বা ব্যাপক এবং বহ্ন্যভাবটী ছোট বা ব্যাপ্য। অতএব সাধ্যাভাবের ব্যাপকীভূত অভাব= ধূমাভাব, তাহার প্রতিযোগিত্ব হেতু ধূমে থাকায় ধূমে এই ব্যতিরেক ব্যাপ্তি থাকিল। ব্যাপ্তি গ্রহোপায় এবং ব্যাপ্তিতে ব্যভিচার শঙ্কার নিবর্ত্তক তর্কের কথা পরে কথিত হইবে।

স্থানে অর্থাপত্তি নামক একটী পৃথক্ প্রমাণ স্বীকার করা হয়। কারণ, সাধ্যাভাবের ব্যাপকীভূত অভাবপ্রতিযোগির হেতুতে থাকিলে সেই হেতুর দ্বারা ব্যাপ্য সাধ্যাভাবেরই লাভ হয়, সাধ্যের লাভ হয় না। তাহার পর সেই হেত্বভাব ও সাধ্যাভাবকে ধরিয়া তাহাদের প্রতিযোগীর মধ্যে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ স্থির করিয়া আবার অন্বয়ব্যাপ্তির দ্বারা অনুমান করিলে "পর্ব্বত বহ্নিমান্" এই অনুমিতি হয়। এজন্য অনুপপত্তি জ্ঞানদ্বারা সাধ্যের জ্ঞানলাভ করা হয়। আর তাহারই নাম অর্থাপত্তি প্রমাণ। ইহা পরে বলা হইবে।

পক্ষধর্ম্মতার লক্ষণ।

ব্যাপ্য যে 'হেতু' তাহার যে পক্ষে থাকা, তাহাই পক্ষধর্ম্মতা। সুতরাং "পর্ব্বত বহ্নিমান্, ধূমহেতু" এই স্থলে হেতু ধূমের যে পর্ব্বতে থাকা, তাহাই পক্ষধর্ম্মতা। ইহা না থাকিলে অনুমিতি হয় না। অতএব ইহাও একটী অনুমিতির কারণ।

পরামর্শের উপসংহার।

অতএব "ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞানের নাম পরামর্শ" যে বলা হইয়াছিল, তাহা বুঝাইবার জন্য ব্যাপ্তির লক্ষণ বলিয়া এই পক্ষধর্ম্মতারও লক্ষণ বলা হইল। সুতরাং পরামর্শের আকার হইল—সাধ্যব্যাপ্য হেতুমান্ পক্ষ, অর্থাৎ বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বত—এই জ্ঞানটি প্রকৃতস্থলে পরামর্শ হইল। আর এই পরামর্শজন্য "পর্ব্বত বহ্নিমান্" এই অনুমিতি হইল।

অনুমানের ভেদ।

অনুমান দ্বিবিধ, যথা—স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। যাহা নিজকে বুঝাইবার জন্য, তাহা স্বার্থানুমান এবং যাহা পরকে বুঝাইবার জন্য তাহা পরার্থানুমান। ইহাতেই, ন্যায়াবয়ব থাকে। ন্যায়াবয়ব বলিতে প্রতিজ্ঞা, হেতু এবং উদাহরণাদি বুঝায়।

স্বার্থানুমানের পরিচয়।

যাহা নিজের জন্য অনুমিতির হেতু হয়, তাহাই স্বার্থানুমান। ইহা যে প্রকারে হয়, তাহা এই—প্রথমস্তরে—রন্ধনশালাদির দর্শন; দ্বিতীয়স্তরে—নিজে নিজে রন্ধনশালাদি হইতে "যেখানে যেখানে ধূম সেখানে সেখানে বহ্নি" এইরূপে ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তির জ্ঞানলাভ; তৃতীয়স্তরে—

এই জ্ঞানলাভ করিয়া পর্ব্বতসমীপে গমন, চতুর্থস্তরে—সেই পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া বহ্নির সন্দেহ; পঞ্চমস্তরে—"যেখানে যেখানে ধূম সেখানে সেখানে বহ্নি" এই ব্যাপ্তির স্মরণ; ষষ্ঠস্তরে—"বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ এই পর্ব্বত" এই জ্ঞানের উদয়; ইহারই নাম তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শ। সপ্তমস্তরে—এই লিঙ্গপরামর্শ হইবার পর "পর্ব্বত বহ্নিমান্"—এইরূপ অনুমিতি উৎপন্ন হয়। এইরূপ হইলে স্বার্থানুমান হয়। রন্ধনশালাতে ধূম ও বহ্নি দেখিয়া যে ব্যাপ্তিজ্ঞান তাহা প্রথমলিঙ্গপরামর্শ, তৎপরে পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া বহ্নির যে স্মরণ, তাহা দ্বিতীয়লিঙ্গপরামর্শ এবং পরিশেষে "বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ এই পর্ব্বত"—ইহা তৃতীয়লিঙ্গপরামর্শ বলা হয়।

পরার্থানুমানের পরিচয়।

আর যখন স্বয়ং ধূম, হইতে অগ্নি অনুমান করিয়া পরকে বিশ্বাস করাইবার জন্য পাঁচটী ন্যায়াবয়বযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করা হয়, তখন সেই অনুমানকে পরার্থানুমান বলে। সেই ন্যায়াবয়ব পাঁচটী, যথা—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন; যেমন—

পর্ব্বত বহ্নিমান্—ইহা প্রতিজ্ঞাবাক্য ও প্রথম ন্যায়াবয়ব।
ধূমবত্বাৎ— ইহা হেতুবাক্য ও দ্বিতীয় ন্যায়াবয়ব।
যো যো ধূমবান্ স স বহ্নিমান্, যথা মহানসম্—ইহা উদাহরণবাক্য ও তৃতীয় ন্যায়াবয়ব।
তথা চ অয়ম্ বা বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্, অয়ম্—ইহা উপনয়বাক্য ও চতুর্থ ন্যায়াবয়ব।
তস্মাৎ পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্—ইহা নিগমন বাক্য ও পঞ্চম ন্যায়াবয়ব।

পক্ষ সাধ্য হেতু ও দৃষ্টান্তের পরিচয়।

এস্থলে পর্ব্বতটী—পক্ষ। বহ্নিটী—সাধ্য, ধূমটী—হেতু এবং মহানসটী দৃষ্টান্ত। এই পক্ষ, সাধ্য, হেতু ও দৃষ্টান্তের দ্বারা উক্ত পাঁচটী ন্যায়াবয়ববাক্য রচিত হইয়াছে। যাহাতে সাধ্যের অনুমিতি হয়, তাহাই পক্ষ।

পক্ষে যাহার অনুমিতি হয় তাহাই সাধ্য, যাহা পক্ষে থাকায় অনুমিতি হয় তাহাই হেতু। এই হেতু তিন প্রকার হয়, ইহা পরে সবিস্তারে কথিত হইবে। দৃষ্টান্ত দুই প্রকার, যথা—অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী। যাহাতে হেতু ও সাধ্যের নিশ্চয় থাকে, তাহাই অন্বয়ী দৃষ্টান্ত। আর যাহাতে সাধ্যাভাব ও হেত্বভাবের নিশ্চয় থাকে, তাহাই ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত।

পক্ষ ও সাধ্যদ্বারা প্রতিজ্ঞাবাক্য হয়। হেতুতে হেতুবোধক বিভক্তি-যোগে হেতুবাক্য হয়। দৃষ্টান্ত ও ব্যাপ্তিজ্ঞানদ্বারা উদাহরণ বাক্য হয়, পরামর্শদ্বারা উপনয় বাক্য হয় এবং প্রতিজ্ঞাবাক্যের পূর্ব্বে "তস্মাৎ" অর্থাৎ "সেই হেতু" এই পদপ্রয়োগে নিগমনবাক্য হয়।

বেদান্তমতে পরার্থানুমানের জন্য পাঁচটী অবয়বের আবশ্যকতা নাই। হয়—প্রতিজ্ঞা হেতু উদাহরণ প্রয়োজন, অথবা উদাহরণ উপনয় ও নিগমনকে প্রয়োজন বলা হয়।

পরামর্শের কারণতা।

স্বার্থানুমানের ন্যায় পরার্থানুমানেও লিঙ্গপরামর্শকে অনুমিতির কারণ বলা হয়। তবে পরামর্শকে যে করণ বলা হয়, তাহা প্রাচীনের মতেই বলা হয়। নবীনের মতে ব্যাপ্তিজ্ঞানকেই করণ বলা হয়,। পরামর্শকে করণ বলিলে করণ "নির্ব্যাপার" বলিয়া বুঝিতে হইবে। তখন করণের লক্ষণ আর "ব্যাপারবৎ অসাধারণ কারণই করণ" বলা হইবে না। তখন "অসাধারণ কারণই করণ" বলিতে হইবে।

বেদান্তমতে পরামর্শের পরিবর্ত্তে ব্যাপ্তিস্মৃতি বা ব্যাপ্তির উদ্বুদ্ধ সংস্কার আবশ্যক বলা হয়।

অনুমানের অন্বয়ব্যতিরেক ভেদ।

অনুমান অর্থাৎ অনুমিতির হেতুটী—অন্বয়ব্যতিরেকী, কেবলান্বয়ী ও কেবলব্যতিরেকিভেদে তিন প্রকার হয়।

অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমানের স্থল।

যেখানে হেতুতে অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তি উভয়ই থাকে, তাহাকে অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমান বলে। যেমন "পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই স্থলে হেতু ধূমে অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তি এই উভয়ই আছে। কারণ, অন্বয় দৃষ্টান্ত মহানসাদিতে "যেখানে ধূম সেখানে বহ্নি আছে"—এরূপ অন্বয়ব্যাপ্তি আছে এবং ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত জলহ্রদে "যেখানে বহ্ন্যভাব আছে সেখানে ধূমাভাব আছে"—এইরূপ ব্যতিরেক ব্যাপ্তিও আছে। উপরে যে পাঁচটী ন্যায়াবয়ব প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে উদাহরণ ও উপনয়বাক্য অন্বয়ব্যাপ্তি অনুসারেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্যতিরেক ব্যাপ্তি অনুসারে কিন্তু তৃতীয় ন্যায়াবয়ব বাক্যটী হইবে "যো যো বহ্ন্যভাববান্ স স ধূমাভাববান্, যথা—জলহ্রদঃ" এবং চতুর্থ ন্যায়াবয়ব বাক্যটী হইবে—"ইদং ন এবম্ তৎ ন এবম্" বা "ধূমাভাবব্যাপ্য বহ্ন্যভাববান্ অয়ম্" ইত্যাদি।

কেবলান্বয়ী অনুমানের স্থল।

যেখানে কেবলই অন্বয়ব্যাপ্তি থাকে, সেখানে কেবলান্বয়ী অনুমান বলা হয়। যেমন—"ঘটটী অভিধেয়, যেহেতু প্রমেয়ত্ব রহিয়াছে, যেমন পট," ইত্যাদি। এস্থলে সাধ্য—অভিধেয়ত্ব এবং হেতু—প্রমেয়ত্বের ব্যতিরেক অর্থাৎ অভাব না থাকায় ব্যতিরেকব্যাপ্তির সম্ভাবনাই নাই। যেহেতু প্রমেয়ত্বের অভাব এবং অভিধেয়ত্বের অভাব অপ্রসিদ্ধ। যাবৎ বস্তুই অভিধেয় এবং প্রমেয় হয়।

পৃথিবী—পৃথিবীভিন্ন হইতে ভিন্না, অথবা
পৃথিবী—পৃথিবীতরভেদবতী— (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু গন্ধবত্ত্ব রহিয়াছে— (হেতু)
যাহা পৃথিবীতর হইতে ভিন্ন নয় তাহা
গন্ধবৎও নয়, যেমন জল— (উদাহরণ)
এই পৃথিবী ইতরভেদাভাবব্যাপকীভূত
গন্ধাভাববতী নয়, কিন্তু গন্ধাভাবাভাববতী—(উপনয়)
সেই হেতু পৃথিবী পৃথিবীতরভিন্না— (নিগমন)

এস্থলে পক্ষ—পৃথিবী, পৃথিবীভিন্নভেদ বা পৃথিবীতরভেদ—সাধ্য, হেতু—গন্ধবত্ত্ব বা গন্ধ, ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত—জল। যাহা গন্ধবৎ তাহা পৃথিবীতর হইতে ভিন্ন অর্থাৎ পৃথিবীভিন্ন হইতে ভিন্ন—এইরূপ অন্বয়-দৃষ্টান্ত নাই, এজন্য 'হেতু' গন্ধের ব্যাপক যে ইতরভেদ, সেই ইতরভেদ-সামানাধিকরণ্যরূপ অন্বয়ব্যাপ্তির জ্ঞান সম্ভব হইল না। যেহেতু সমুদায় পৃথিবীই এস্থলে পক্ষমধ্যে পতিত হইয়াছে। কিন্তু ব্যতিরেকব্যাপ্তি অর্থাৎ "যেখানে যেখানে ইতরভেদাভাব, সেখানে সেখানে গন্ধাভাব" এবং ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত জলাদিকে পাওয়া যাইতেছে। অন্বয়ব্যাপ্তিতে হেতুর ব্যাপক সাধ্য হয়, ব্যতিরেকব্যাপ্তিতে সাধ্যাভাবের ব্যাপক হেত্বভাব হয়। বস্তুতঃ, এখানে তাহাই পাওয়া গিয়াছে। আর এই ব্যতিরেকব্যাপ্তি হইতে যে পরামর্শ টী হইয়াছে, তাহা—ইতরভেদাভাব-ব্যাপকীভূত অভাবপ্রতিযোগিগন্ধবতী পৃথিবী। ইহাই হইল কেবল-ব্যতিরেকী অনুমিতির ন্যায়াবয়ব। কেবলান্বয়ী বা অন্বয়ব্যতিরেকীর ন্যায়াবয়ব পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বেদান্তমতে এই কেবলব্যতিরেকী অনুমানও স্বীকার করা হয় না। ইহার কার্য অর্থাপত্তি প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হয়—ইহা বলা হইয়াছে। পরে সবিস্তারে বলা হইবে।

পক্ষের লক্ষণ।

যেহেতু ধূমবান্"—এস্থলে পর্ব্বতটী পক্ষ। ইহা কিন্তু প্রাচীনের মত। নবীনের মতে বলা হয়—যাহা অনুমিতির উদ্দেশ্য তাহাই পক্ষ। কারণ অনেক সময় সাধ্যসন্দেহ না হইলেও অনুমিতি হয়। এজন্য যাহাতে সাধ্যসিদ্ধি হয়, তাহাই অনুমিতির উদ্দেশ্য, আর তাহাই পক্ষ বলা হয়।

পক্ষতার লক্ষণ।

পক্ষতাও অনুমিতির প্রতি একটী কারণ। ইহা ব্যাপারও নহে, করণও নহে, কিন্তু অন্যরূপ একটী কারণবিশেষ। আর ইহা যে পক্ষের ধর্ম্ম বলা যাইবে, তাহাও নহে। ইহার লক্ষণ হইতেছে—সাধনেচ্ছাশূন্য যে সিদ্ধি, সেই সিদ্ধির অভাব। অর্থাৎ অনুমিতি করিবার ইচ্ছা নাই, অথচ সিদ্ধি অর্থাৎ সাধ্যনিশ্চয় আছে—এরূপটী যদি না হয়, তবেই লোকের অনুমিতি হয়। ইহার কারণ—

ইচ্ছা আছে সিদ্ধি আছে,—এস্থলে অনুমিতি হয়, যেমন শিষ্যশিক্ষার স্থলে সাধারণতঃ ঘটিতে দেখা যায়।

ইচ্ছা নাই সিদ্ধি নাই,—এস্থলে অনুমিতি হয়, যেমন মেঘগর্জ্জন শুনিয়া বাধ্য হইয়া অনুমিতি করা হয়।

ইচ্ছা আছে সিদ্ধি নাই,—এস্থলে অনুমিতি হয়, যেমন সাধারণতঃ লোকে অনুমান করিয়া থাকে।

কিন্তু ইচ্ছা নাই সিদ্ধি আছে,—এস্থলে অনুমিতি হয় না।

এজন্য ইচ্ছার অভাববিশিষ্ট যে সিদ্ধি, তাহার যে অভাব, তাহা উক্ত প্রথম তিনটী স্থলে দৃষ্ট হয়, কারণ, ইচ্ছার অভাববিশিষ্ট সিদ্ধিই অনুমিতির প্রতিবন্ধক। আর প্রতিবন্ধকের অভাব কার্য্যমাত্রেরই প্রতি-কারণ হয় বলিয়া ইচ্ছার অভাববিশিষ্ট সিদ্ধির অভাবই অনুমিতির প্রতিবন্ধকাভাব হইল, আর তাহাই কারণ হইল। আর তাহাতেই অনুমিতি হয় বলিয়া তাহাকে পক্ষতা বলা হয়। পক্ষতা অনুমিতির প্রতি একটী কারণ। প্রাচীনের মতে সাধ্যসংশয়ই পক্ষতা বলা হয়।

সপক্ষ ও অন্বয়ী দৃষ্টান্তের লক্ষণ।

যাহা নিশ্চিতসাধ্যবান্ তাহা সপক্ষ। এখানে হেতু থাকিলে ইহা অন্বয়দৃষ্টান্ত হয়। "পর্ব্বত বহ্নিমান্" স্থলে যেমন মহানস। এখানে হেতু আছে ও সাধ্য আছে—এইরূপ নিশ্চয় থাকে। ইহারই বলে প্রকৃতস্থলে অনুমিতি হয়। অন্বয়ব্যাপ্তির জন্য ইহা প্রদর্শন করিতে হয়।

বিপক্ষ ও ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তের লক্ষণ।

যাহাতে সাধ্যের অভাবনিশ্চয় আছে তাহাই বিপক্ষ। এখানে হেতুর অভাব থাকিলে ইহা ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত হয়। "পর্ব্বত বহ্নিমান্" স্থলে যেমন জলহ্রদ। এখানে বহ্ন্যভাবরূপ সাধ্যের অভাবনিশ্চয় থাকে, সুতরাং তাহার ব্যাপক ধূমাভাবরূপ যে হেত্বভাব তাহারও নিশ্চয় থাকে। কারণ, ব্যাপ্য থাকিলে ব্যাপক থাকিবেই, ব্যতিরেকী ব্যাপ্তির জন্য ইহা প্রদর্শন করিতে হয়।

ত্রিবিধ অনুমানের জন্য প্রয়োজন।

কেবলান্বয়ী অনুমানে অর্থাৎ "ঘটঃ অভিধেয়ঃ, প্রমেয়ত্বাৎ" এস্থলে প্রয়োজন—পক্ষবৃত্তিত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, অবাধিতত্ব এবং অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব।

কেবলব্যতিরেকী অনুমানে অর্থাৎ "পৃথিবী ইতরভেদবতী, গন্ধবত্ত্বাৎ" এস্থলে প্রয়োজন—পক্ষবৃত্তিত্ব, বিপক্ষব্যাবৃত্তত্ব, অবাধিতত্ব এবং এবং অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব।

অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমানে অর্থাৎ "পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্, ধূমাৎ" এস্থলে প্রয়োজন—পক্ষবৃত্তিত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষব্যাবৃত্তত্ব, অবাধিতত্ব এবং অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব। এই গুলির জ্ঞান থাকিলে অনুমানে কোন দোষ হয় না।

দেখাইতে পারা যায়। বিচারক্ষেত্রে বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে একজন যদি অপরের কথায় এই হেত্বাভাস দেখাইতে পারেন, তবে তাঁহার বিচারে জয় হয়। এইজন্য বাদী কিংবা প্রতিবাদীর পরাজয়ের স্থল যত প্রকার হয়, হেত্বাভাস তাহাদের মধ্যে এক প্রকার বলা হয়। বাদী কিংবা প্রতিবাদীর যে পরাজয়স্থল তাহার নাম নিগ্রহস্থান। এই নিগ্রহস্থান বাইশ প্রকার। হেত্বাভাস তাহার মধ্যে অন্তিম প্রকার। ইহা মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন। মহর্ষি কণাদ বা নব্যনৈয়ায়িকগণ সকল প্রকার নিগ্রহস্থানের পরিচয় আর দেন নাই। তাঁহারা হেত্বাভাসেরই পরিচয় দিয়াছেন। যেহেতু ইহাই নিগ্রহস্থানের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বা ইহাতেই তাঁহাদের পর্য্যবসান হয় বলিয়া বিবেচিত হয়। এজন্য এস্থলে হেত্বাভাসের পরিচয় দিয়া অবশিষ্ট নিগ্রহস্থানের পরিচয় পরে প্রদত্ত হইতেছে। হেতুর আভাস অর্থাৎ দোষ, অথবা হেতুর ন্যায় যাহার আভাস অর্থাৎ প্রতীতি হয়—তাহাই হেত্বাভাস শব্দের অর্থ। অনুমিতি ও তাহার করণের মধ্যে অন্যতরের প্রতিবন্ধক যে যথার্থ জ্ঞান, তাহার যে বিষয়, তাহাই হেত্বাভাসের অর্থাৎ হেতুদোষের সাধারণ লক্ষণ।

হেত্বাভাস বিভাগ।

হেত্বাভাস অর্থাৎ দুষ্ট হেতু পাঁচ প্রকার, যথা—সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ এবং বাধিত।

সব্যভিচার বিভাগ।

সব্যভিচার অর্থ—অনৈকান্তিক। ইহা আবার ত্রিবিধ, যথা—সাধারণ সব্যভিচার, অসাধারণ সব্যভিচার এবং অনুপসংহারি সব্যভিচার।

সাধারণ সব্যভিচারের পরিচয়।

সাধ্যাভাববদ্বৃত্তি অর্থাৎ সাধ্যের অভাবের অধিকরণে হেতুর থাকা—সাধারণ সব্যভিচার বা সাধারণ অনৈকান্তিকের লক্ষণ। যেমন "পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্, প্রমেয়ত্বাৎ" এস্থলে সাধ্য বহ্নি, তাহার অভাবের অধিকরণ

জলহ্রদ, তাহাতে হেতু প্রমেয়ত্ব থাকায় প্রমেয়ত্ব হেতুটী সাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তি হইল। এরূপ অনুমান করিলে ভুল হয়। ইহাতে অব্যভিচারের অভাবপ্রযুক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা ঘটাইয়া পরামর্শের প্রতিবন্ধকতা ঘটায়।

সন্দিগ্ধ সব্যভিচারের পরিচয়।

যেখানে বিপক্ষবৃত্তিত্বে সন্দেহ থাকে সেখানে সন্দিগ্ধ সব্যভিচার বা সন্দিগ্ধ অনৈকান্তিক বলা হয়। যেমন—"ক্ষণিকাঃ ভাবাঃ সত্ত্বাৎ" এস্থলে সত্ত্বের অক্ষণিকত্বে বাধা না থাকায় বিপক্ষবৃত্তিত্ব শঙ্কিত হয় বলিয়া সন্দিগ্ধ অনৈকান্তিক দোষ হয়। ইহারও ফল পূর্ব্ববৎ।

অসাধারণ সব্যভিচারের পরিচয়।

সমুদায় সপক্ষ ও বিপক্ষে না থাকিয়া হেতুটী যদি পক্ষমাত্রে বৃত্তি হয়, তাহা হইলে অসাধারণ সব্যভিচার হেত্বাভাস হয়। যেমন "শব্দটী নিত্য, যেহেতু শব্দত্ব রহিয়াছে"। এখানে হেতু শব্দত্ব সমুদায় নিত্য ও অনিত্যে না থাকিয়া কেবল পক্ষ যে শব্দ, তাহাতেই থাকিতেছে। এজন্য এস্থলে অসাধারণ সব্যভিচার হেত্বাভাস হইল। ইহা ব্যাপ্তিসংশয়ের উৎপাদক হয় বলিয়া ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা করিয়া পরামর্শের প্রতিবন্ধক হয়।

অনুপসংহারি সব্যভিচারের পরিচয়।

হয়। যেমন—"শব্দ নিত্য, যেহেতু কৃতকত্ব অর্থাৎ জন্যত্ব রহিয়াছে"। এখানে কৃতকত্ব হেতুটী সাধ্যাভাব যে নিত্যত্বাভাব অর্থাৎ অনিত্যত্ব তাহার দ্বারা ব্যাপ্ত হইতেছে। এজন্য এস্থলে বিরুদ্ধ হেত্বাভাস হইল। ইহা সামানাধিকরণ্যের অভাবরূপ বলিয়া ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা করিয়া পরামর্শের প্রতিবন্ধকতা করে।

সৎপ্রতিপক্ষের পরিচয়।

সাধ্যের অভাবসাধক যদি অন্য হেতু থাকে, তাহা হইলে হেতুতে সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস থাকে; যেমন—"শব্দ নিত্য, যেহেতু শ্রাবণত্ব রহিয়াছে, যেমন শব্দত্ব"—এইরূপ অনুমানস্থলে যদি কেহ বলে—"শব্দ অনিত্য, যেহেতু কার্য্যত্ব রহিয়াছে, যেমন ঘট" তাহা হইলে প্রথম অনুমানের সাধ্য যে নিত্যত্ব, তাহার অভাবসাধক কার্য্যত্বরূপ অন্য হেতু প্রাপ্ত হওয়ায় প্রথম অনুমানের হেতুতে সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস দোষ ঘটে। ইহাতে বিরোধি জ্ঞানের সামগ্রী থাকায় অনুমিতির সাক্ষাৎ প্রতিবন্ধকতা ঘটে।

আশ্রয়াসিদ্ধ হেত্বাভাস হয়। ইহা পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হইয়া পরামর্শের প্রতিবন্ধকতা করে।

সিদ্ধসাধন আশ্রয়াসিদ্ধের পরিচয়।

যেখানে পক্ষে সাধ্যনিশ্চয় থাকে, অথচ তাহারই অনুমান প্রকারান্তরে করা হয়, সেখানে এই হেত্বাভাস হয়। যেমন "শরীর হস্তাদিযুক্ত" "যেহেতু হস্তাদিমত্ত্বরূপে প্রতীয়মানত্ব রহিয়াছে" এখানে শরীর হস্তাদিযুক্তরূপে নিশ্চয় থাকা সত্ত্বেও যদি কেহ অনুমান করে "কায়ঃ করাদিমান্" ইত্যাদি তাহা হইলে এই দোষ হয়। যেহেতু এখানে সিদ্ধ বিষয়ই সিদ্ধ করা হইতেছে। ইহাও পক্ষতার বিঘটক বলিয়া আশ্রয়াসিদ্ধের অন্তর্ভুক্ত। নবীনমতে ইহা নিগ্রহস্থান।

স্বরূপাসিদ্ধের বিভাগ।

স্বরূপাসিদ্ধ আবার চারিপ্রকার, যথা—শুদ্ধাসিদ্ধ, ভাগাসিদ্ধ, বিশেষণাসিদ্ধ এবং বিশেষ্যাসিদ্ধ।

শুদ্ধাসিদ্ধ স্বরূপাসিদ্ধের পরিচয়।

যেখানে পক্ষে বা সপক্ষে হেতু থাকে না, সেখানে শুদ্ধাসিদ্ধ স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাস হয়। যেমন "শব্দটী গুণ, যেহেতু তাহাতে চাক্ষুষত্ব রহিয়াছে, যেমন রূপ"। এখানে চাক্ষুষত্ব হেতু, উহা পক্ষ যে শব্দ, তাহাতে থাকে না। কারণ, শব্দ কখনই চাক্ষুষ হয় না। ইহা পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হইয়া পরামর্শের প্রতিবন্ধকতা করে।

বিশেষণাসিদ্ধ স্বরূপাসিদ্ধের পরিচয়।

যেখানে বিশেষণসহিত হেতু পক্ষে থাকে না, সেখানে এই হেত্বাভাস হয়। যেমন—"শব্দটী অনিত্য, যেহেতু তাহা চাক্ষুষ অথচ জন্য"। এখানে চাক্ষুষত্ব বিশেষণটী পক্ষ শব্দে থাকে না বলিয়া এই হেত্বাভাস হইল। ভাগাসিদ্ধের ন্যায় ইহাতে পরামর্শের প্রতিবন্ধক হয়।

বিশেষ্যাসিদ্ধ স্বরূপাসিদ্ধের পরিচয়।

যেখানে হেতুর বিশেষ্যভাগটী পক্ষে থাকে না সেখানে এই হেত্বাভাস হয়। যেমন—"বায়ু প্রত্যক্ষ, যেহেতু স্পর্শবত্ত্ববিশিষ্ট রূপবত্ত্ব রহিয়াছে"। এখানে হেতু স্পর্শবত্ত্ববিশিষ্টরূপবত্ত্ব। ইহার বিশেষ্যভাগ রূপবত্ত্ব, তাহা পক্ষ বায়ুতে থাকে না, এজন্য এই হেত্বাভাস হইল। প্রতিবন্ধ পূর্ব্ববৎ।

ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধের পরিচয়।

যেখানে হেতুতে "উপাধি" থাকে, সেখানে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেত্বাভাস হয়। যেমন "পর্ব্বতটী ধূমবান্, যেহেতু বহ্নি রহিয়াছে, যেমন রন্ধনশালা"। এখানে হেতু বহ্নিতে "আর্দ্রেন্ধনসংযোগ"রূপ উপাধি পাওয়া যায়। এজন্য ইহা সোপাধিক হেতু, আর তজ্জন্য ইহাকে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেত্বাভাস বলা হয়। ইহা বিশিষ্টব্যাপ্তির অভাবরূপ বলিয়া ব্যাপ্তি-জ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা করিয়া পরামর্শের প্রতিবন্ধকতা করে।

বহ্নি থাকে কিন্তু আর্দ্রেন্ধনসংযোগ থাকে না, এজন্য আর্দ্রেন্ধনসংযোগটী অয়োগোলক-অন্তর্ভাবে হেতু বহ্নির অব্যাপক হইল। অতএব "পর্ব্বত ধূমবান্, যেহেতু বহ্নিমান্" এস্থলে আর্দ্রেন্ধনসংযোগটী সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক হওয়ায় উপাধি পদবাচ্য হইল।

সাধ্যব্যাপকত্বের পরিচয়।

যাহা সাধ্যের সমানাধিকরণ যে অত্যন্তাভাব সেই অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী হয়, অর্থাৎ সাধ্য যেখানে যেখানে থাকে সেই সেই স্থানে থাকে, তাহা সাধ্যের ব্যাপক হয়। এস্থলে সাধ্যের সমব্যাপ্তিই প্রয়োজন, কারণ, ইহা না বলিলে "পক্ষেতরত্ব"টী উপাধি হয়। কারণ, উহা পক্ষে থাকে না বলিয়া হেতুর অব্যাপক হয় এবং অন্য সকল স্থলেই সাধ্যের সঙ্গে থাকে বলিয়া সাধ্যের ব্যাপক হয়, কিন্তু সাধ্যের সমব্যাপক হয় না। পক্ষেতরত্বকে উপাধি বলিলে অনুমিতিমাত্রের উচ্ছেদ হয়।

সাধনের অব্যাপকত্বের পরিচয়।

যাহা সাধন অর্থাৎ হেতু যেখানে যেখানে থাকে সেখানে সেখানে থাকে যে অত্যন্তাভাব তাহার প্রতিযোগী হয়, অর্থাৎ হেতু যেখানে যেখানে থাকে সেখানে সেখানে থাকে না, তাহা সাধনের অব্যাপক হয়।

অতএব আর্দ্রেন্ধনসংযোগটী সাধ্যের ব্যাপক হইয়া সাধনের অব্যাপক হওয়ায় "পর্ব্বত ধূমবান্, যেহেতু বহ্নি রহিয়াছে" এই অনুমানের হেতুটী ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি নামক হেত্বাভাসদোষদুষ্ট হইল।

পক্ষধর্ম্মাবচ্ছিন্নসাধ্যের ব্যাপক, যথা—বায়ু প্রত্যক্ষ, প্রমেয়ত্বহেতু। এস্থলে "বহির্দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষত্বব্যাপক উদ্ভূতরূপবত্ত্ব"—উপাধি।

সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক, যথা—ধ্বংস বিনাশী, জন্যত্বহেতু। এস্থলে "জন্যত্বাবচ্ছিন্ন অনিত্যত্বের ব্যাপক ভাবত্ব"—উপাধি।

উদাসীনধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক, যথা—প্রাগভাব বিনাশী, প্রমেয়ত্ব হেতু। এস্থলে "জন্যত্বাবচ্ছিন্ন অনিত্যত্বের ব্যাপক ভাবত্ব"—উপাধি। সংক্ষেপে—যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপকত্ব, তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সাধনাব্যাপকত্ব হইলে উপাধি হয়। এ লক্ষণ সকল স্থলেই যাইবে।

নিশ্চিত উপাধি—যেখানে উপাধি সাধ্যের ব্যাপক এবং হেতুর অব্যাপক ইহা নিশ্চিত। যেমন "ধূমবান্ বহ্নেঃ" স্থলে "আর্দ্রেন্ধন-সংযোগ" নিশ্চিত উপাধি।

সন্দিগ্ধ উপাধি—যেখানে উপাধিতে সাধ্যের ব্যাপকত্ব অথবা হেতুর অব্যাপকত্ব অথবা উভয়ই সন্দিগ্ধ। যেমন "স শ্যামঃ, মিত্রাতনয়ত্বাৎ" এস্থলে "শাকপাকজত্ব" সন্দিগ্ধ উপাধি।

এই উপাধি উদ্ভাবন করিতে গেলে এমন একটী ধর্ম্ম আবিষ্কার করিতে হইবে, যাহা "যে কোন" স্থলে সাধ্যের ব্যাপক হইবে, অর্থাৎ যে কোন একটী স্থলে সাধ্যের সহিত একত্র থাকে দেখাইতে পারা যায়, এবং যাহা পক্ষে নাই, অথবা অন্য কোনস্থলে হেতুর সঙ্গে একত্র থাকে না। ঐ ধর্ম্মটী পক্ষে না থাকায় হেতুর অব্যাপক হয়, কারণ, সেখানে হেতু থাকেই, নচেৎ স্বরূপাসিদ্ধি হেত্বাভাস হয়, আর অন্য কোনস্থলে হেতুর সঙ্গে না থাকাতেও হেতুর অব্যাপকই হয়। সুতরাং যে ধর্ম্মটী কোন স্থলে সাধ্যের সহিত একত্র থাকে, এবং পক্ষে থাকে না, কিংবা অন্য কোন স্থলে হেতুর সঙ্গে থাকে না, তাহাই উপাধি হয়। "পর্ব্বত ধূমবান্, বহ্নি-হেতু" এস্থলে আর্দ্রেন্ধনসংযোগ ধর্ম্মটী, দৃষ্টান্ত মহানসে সাধ্যের সঙ্গে থাকে, কিন্তু অয়োগোলকরূপ অন্যস্থলে হেতু থাকে, আর তাহা থাকে না, অর্থাৎ *হেতুর সঙ্গে থাকে না। এজন্য সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক* হয়। এস্থলে অয়োগোলক-অন্তর্ভাবে উপাধি প্রদর্শিত হইল। ঐরূপ স্থলবিশেষে পক্ষান্তর্ভাবেও উপাধি দেখান যায়। অর্থাৎ পক্ষে হেতুর অব্যাপকত্ব এবং দৃষ্টান্তে সাধ্যব্যাপকত্ব থাকে—এমন ধর্ম্ম অনুমান করাই উপাধি-উদ্ভাবনের কৌশল।

ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধের বিভাগ।

অন্যরূপ ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ আবার ত্রিবিধ হয়, যথা—সাধ্যাপ্রসিদ্ধ, সাধনাপ্রসিদ্ধ এবং ব্যর্থবিশেষণবিশিষ্ট হেতু।

সাধ্যাপ্রসিদ্ধের পরিচয়।

যেখানে সাধ্য অপ্রসিদ্ধ হয়, সেখানে এই হেত্বাভাস হয়, যেমন—"পর্ব্বতটী সুবর্ণময় বহ্নিমান্, যেহেতু ধূম তথায় রহিয়াছে।" এখানে সাধ্য—সুবর্ণময় বহ্নি অপ্রসিদ্ধ বলিয়া সাধ্যাপ্রসিদ্ধ হেত্বাভাস হইল।

"পর্ব্বতটী বহ্নিমান্, যেহেতু সুবর্ণময় ধূম তথায় রহিয়াছে।" এখানে 'হেতু' সুবর্ণময় ধূম অপ্রসিদ্ধ বলিয়া এই দোষ হইল।

ব্যর্থবিশেষণবিশিষ্ট হেতুর পরিচয়।

যেখানে হেতুর বিশেষণ ব্যর্থ হয়, সেখানে এই হেত্বাভাস হয়। যেমন—"পর্ব্বতটী বহ্নিমান্, যেহেতু নীলধূম তথায় রহিয়াছে।" এখানে হেতু নীলধূম। এই হেতু নীলধূমের বিশেষণ নীল। ইহা ব্যর্থ, কারণ, ধূম নীলবর্ণই হইয়া থাকে, ইহার প্রয়োগে কোন ফল নাই। এজন্য ইহাকে ব্যর্থবিশেষণবিশিষ্টহেতু নামক হেত্বাভাস বলে।

বাধিতের পরিচয়।

যেখানে সাধ্যের অভাব অন্য প্রমাণদ্বারা নিশ্চিত থাকে, সেখানে সেই অনুমানের হেতু বাধিত হেত্বাভাস হয়। যেমন "বহ্নি অনুষ্ণ, যেহেতু তাহাতে দ্রব্যত্ব রহিয়াছে"—এই অনুমানে বহ্নির উষ্ণত্বরূপ সাধ্যাভাবটী প্রত্যক্ষদ্বারা নিশ্চিত থাকায় আর অনুমান হইতে পারিল না। ইহাতে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় থাকে বলিয়া অনুমিতির সাক্ষাৎ প্রতিবন্ধকতা হয়।

মীমাংসকমতে হেত্বাভাস কিন্তু অন্যরূপে কথিত হয়। এ বিষয়ে চিদানন্দের "মত" বলিয়া মানমেয়োদয়গ্রন্থে যেরূপ আছে তাহাই লিখিত হইতেছে।

হেত্বাভাস ত্রিবিধ, যথা—(১) প্রতিজ্ঞাভাস, (২) হেত্বাভাস ও (৩) দৃষ্টান্তাভাস। তন্মধ্যে—

(১) প্রতিজ্ঞাভাস আবার ত্রিবিধ, যথা—(ক) সিদ্ধবিশেষণ, (খ) অপ্রসিদ্ধবিশেষণ এবং (গ) বাধিতবিশেষণ।

(ক) সিদ্ধবিশেষণ, যথা—বহ্নিঃ উষ্ণঃ।

(খ) অপ্রসিদ্ধবিশেষণ, যথা—ক্ষিত্যাদিকং সর্ব্বজ্ঞকর্ত্তৃকম্।

(গ) বাধিতবিশেষণ আবার—১। প্রত্যক্ষবাধ ২। অনুমানবাধ, ৩। শাস্ত্রবাধ, ৪। উপমানবাধ, ৫। অর্থাপত্তিবাধ, ৬। অনুপলব্ধিবাধ, ৭। স্বোক্তিবাধ, ৮। লোকবাধ এবং ৯। পূর্ব্বসম্বন্ধবাধ—এই নয় প্রকার।

১। প্রত্যক্ষবাধ, যথা—বহ্নিঃ অনুষ্ণঃ।

২। অনুমানবাধ, যথা—মনঃ ন ইন্দ্রিয়ম্, অভূতাত্মকত্বাৎ, দিগাদিবৎ।

৩। শাস্ত্রবাধ, যথা—ব্রাহ্মণঃ অর্দ্দসাধনং ন অবধি, ক্রিয়াত্বাৎ, গমনবৎ। এস্থলে

পক্ষসম্বন্ধিস্বরূপে প্রযুক্ত হয় না, কিন্তু অন্যাশ্রয়সম্বন্ধিস্বরূপে প্রযুক্ত হয়, তথায় ইহা হয়। এখানে ঘটাশ্রিত কৃতকত্ব নহে, কিন্তু তদ্‌গুণাশ্রিত।

৮। ব্যতিরেকাসিদ্ধ, যথা—অনিত্যং গগনং গগনত্বাৎ। যেখানে পক্ষ হইতে ব্যতিরেকাভাবপ্রযুক্ত পক্ষসম্বন্ধিত্ব থাকে না তথায় ইহা হয়। এখানে গগন-স্বরূপ হইতে অন্য গগনত্ব কিছু নাই।

(ঙ) জ্ঞানাসিদ্ধ বা সন্দিগ্ধাসিদ্ধ, যথা—দেবদত্তঃ বহুধনঃ ভবিষ্যতি তদ্‌হেতুভূতাদৃষ্ট-শালিত্বাৎ। যখন এই সকলের স্বরূপাদিবিষয়ক অজ্ঞান থাকে তখনই ইহা হয়। এস্থলে ধনপ্রদ অদৃষ্ট যে আছে তাহার প্রমাণ নাই বলিয়া জ্ঞানাসিদ্ধ হইল। অগ্নিমান্ পর্ব্বতঃ ধূমত্বাৎ এই মাত্র প্রয়োগে ব্যাপ্তি প্রদর্শিত না হইলে ব্যাপ্যত্বজ্ঞানাসিদ্ধ হয়। তদ্রূপ সন্দিগ্ধবিশেষণাসিদ্ধাদিও এই জ্ঞানাসিদ্ধের ভেদ।

খ। বিরুদ্ধ বা বাধক দুই প্রকার, যথা—১। সাধ্যস্বরূপ বিরুদ্ধ, এবং ২। বিশেষ বিরুদ্ধ। তন্মধ্যে—

১। সাধ্যস্বরূপবিরুদ্ধ, যথা—শব্দঃ নিত্যঃ, কৃতকত্বাৎ। অর্থাৎ হেতু যখন সাধ্য-বিপরীতের ব্যাপ্ত হয় তখনই এই হেত্বাভাস হয়। এখানে হেতু কৃতকত্বটী সাধ্য নিত্যত্বের বিপরীত অনিত্যত্বের ব্যাপ্ত।

২। বিশেষ বিরুদ্ধ, যথা—ক্ষিত্যাদিকং সকর্ত্তৃকং, কার্য্যত্বাৎ, ঘটবৎ। অর্থাৎ সাধ্যের যে বিশেষ তাহার বিপরীত বিশেষণের দ্বারা হেতু ব্যাপ্ত হইলে ইহা হয়। এখানে ক্ষিত্যাদির কর্ত্তা সাধ্য, তাহার যে অশরীরিত্ব তাহাই এখানে বিশেষ। তাহার বিপরীত যে শরীরিত্ব, তাহার দ্বারা ব্যাপ্ত ঘটাদিতে কার্য্যত্ব দৃষ্ট হয়। এজন্য সাধ্যের বিশেষ অশরীরিত্বের বাধক কার্য্যত্ব হেতু হওয়ায় কার্য্যত্ব বিশেষবিরুদ্ধ হয়। আর তজ্জন্য ক্ষিত্যাদির কর্ত্তৃত্বও আর সিদ্ধ হয় না।

গ। অনৈকান্তিক বা সব্যভিচার দুই প্রকার, যথা—১। সাধারণ অনৈকান্তিক এবং ২। সন্দিগ্ধ অনৈকান্তিক। তন্মধ্যে—

১। সাধারণ অনৈকান্তিক, যথা—শব্দঃ, অনিত্যঃ, প্রমেয়ত্বাৎ। অর্থাৎ হেতু যদি বিপক্ষে থাকে তাহা হইলে ইহা হয়। এখানে হেতু প্রমেয়ত্ব বিপক্ষ নিত্য পদার্থেও থাকে।

১। অপ্রয়োজকত্ব নামক হেত্বাভাস বলিতে অনুকূলতর্করাহিত্য। উহা ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধের অন্তর্গত বলিয়া পৃথক্ হেত্বাভাস নহে।

২। অনধ্যবসিত নামক হেত্বাভাস "সাধ্যাসাধকঃ পক্ষে এব বর্তমান হেতুঃ" ইহা ভাসর্বজ্ঞের মতে স্বীকার্য। কিন্তু তাহা অসাধারণের অথবা ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধের অন্তর্গত বলিয়া পৃথক্ হেত্বাভাস নহে। কারণ, "ভূঃ নিত্যা গন্ধবত্ত্বাৎ" ইহা অসাধারণ এবং "সর্বং ক্ষণিকং, সত্ত্বাৎ" ইহা ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ মাত্র।

৩। সৎপ্রতিপক্ষটী পক্ষদূষণবিশেষ। ইহা বাধিতবিশেষণত্বের অন্তর্গত। অথবা অনৈকান্তিকের অন্তর্গত। এজন্য ইহা পৃথক্ হেত্বাভাস নহে।

৪। বাধিত হেত্বাভাসটী বাধিতবিশেষণ নামক পক্ষদোষের অন্তর্গত। ইহাও পৃথক্ হেত্বাভাস নহে।

(৩) দৃষ্টান্তদোষ আবার (ক) সাধর্ম্য ও (খ) বৈধর্ম্যভেদে দ্বিবিধ, তন্মধ্যে—

(ক) সাধর্ম্য দৃষ্টান্তদোষ আবার চারি প্রকার, যথা—১। সাধ্যহীন, ২। সাধনহীন, ৩। উভয়হীন এবং ৪। আশ্রয়হীন। তন্মধ্যে—

১। সাধ্যহীন, যথা—ধ্বনিঃ নিত্যঃ, অকারণত্বাৎ। যৎ অকারণং তৎ নিত্যম্—এস্থলে দৃষ্টান্ত যদি প্রাগভাববৎ বলা হয়, তবে সাধ্যহীন হয়।

২। সাধনহীন, যথা—উক্ত স্থলে দৃষ্টান্ত যদি প্রধ্বংসবৎ বলা হয়, তবে সাধনহীন হয়।

৩। উভয়হীন, যথা—উক্ত স্থলে দৃষ্টান্ত যদি ঘটবৎ বলা হয়, তবে উভয়হীন হয়।

৪। আশ্রয়হীন, যথা—উক্ত স্থলে দৃষ্টান্ত যদি নরশৃঙ্গবৎ বলা হয়, তবে আশ্রয়হীন হয়।

(খ) বৈধর্ম্য দৃষ্টান্তদোষ আবার চারিপ্রকার, যথা—১। সাধ্যাব্যাবৃত্ত, ২। সাধনাব্যাবৃত্ত, ৩। উভয়াব্যাবৃত্ত এবং ৪। আশ্রয়হীন। তন্মধ্যে—

১। সাধ্যাব্যাবৃত্ত, যথা—উক্ত স্থলে ব্যতিরেকব্যাপ্তির জন্য যদি বলা হয়—যাহা নিত্য নহে তাহা অকারণ নহে, আর এস্থলে যদি দৃষ্টান্ত প্রধ্বংস বলা হয় তবে এই দোষ হয়।

২। সাধনাব্যাবৃত্ত, যথা—উক্ত স্থলে ঐরূপ যদি প্রাগভাব দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, তবে সাধনাব্যাবৃত্ত হয়।

৩। উভয়াব্যাবৃত্ত, যথা—উক্ত স্থলে ঐরূপ যদি গগন দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় তবে উভয়াব্যাবৃত্ত হয়।

৪। আশ্রয়হীন, যথা—উক্ত স্থলে ঐরূপ যদি নরশৃঙ্গ দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, তবে আশ্রয়হীন হয়।

ইহাই হইল কথকতে হেত্বাভাসের পরিচয়।

১। প্রতিজ্ঞাহানি, ২। প্রতিজ্ঞান্তর, ৩। প্রতিজ্ঞাবিরোধ, ৪। প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস, ৫। হেত্বন্তর, ৬। অর্থান্তর, ৭। নিরর্থক, ৮। অবিজ্ঞাতার্থ, ৯। অপার্থক, ১০। অপ্রাপ্তকাল, ১১। ন্যূন, ১২। অধিক, ১৩। পুনরুক্ত, ১৪। অননুভাষণ, ১৫। অজ্ঞান, ১৬। অপ্রতিভা, ১৭। বিক্ষেপ, ১৮। মতানুজ্ঞা, ১৯। পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ, ২০। নিরনুযোজ্যানুযোগ, ২১। অপসিদ্ধান্ত। (২২। হেত্বাভাস।)

১। প্রতিজ্ঞাহানি।

বাদী অথবা প্রতিবাদী প্রথমে যে পক্ষ, সাধ্য, হেতু, দৃষ্টান্ত ও দূষণ বলেন, পরে অপর পক্ষের সহিত বিচার করিতে করিতে তন্মধ্যে উহার যে কোন পদার্থের পরিত্যাগ করিয়া অন্য গ্রহণ করিলেই তাঁহার প্রতিজ্ঞাহানি নামক নিগ্রহস্থান হইবে। অর্থাৎ বাদী বা প্রতিবাদী নিজের উক্তহানিই প্রতিজ্ঞাহানি। যথা—

বাদী—"শব্দঃ অনিত্যঃ, ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ, ঘটবৎ" বলিলে যদি—

প্রতিবাদী—"শব্দঃ নিত্যঃ, ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ, ঘটত্ববৎ" বলেন, অর্থাৎ ঘটত্বজাতি নিত্য অথচ ইন্দ্রিয়গোচর বলিয়া শব্দকে নিত্য বলেন, আর তাহাতে যদি—

বাদী—শব্দকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন, অর্থাৎ সাধ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য সাধ্য গ্রহণ করেন, তবে বাদীর প্রতিজ্ঞাহানি হইল।

গুণব্যতিরিক্তং দ্রব্যম্ (প্রতিজ্ঞা)
রূপাদিতঃ অর্থান্তরস্য অনুপলব্ধেঃ (হেতু)

এখানে দ্রব্যকে গুণ ব্যতিরিক্ত বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া হেতুমধ্যে বলা হইল—রূপাদি হইতে ভিন্ন বস্তুর উপলব্ধি হয় না। অতএব হেতুটী প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধ হইল।

প্রতিজ্ঞাবাক্যের অন্তর্গত পদার্থের মধ্যে বিরোধ, যথা—শ্রমণা—গর্ভিণী। এখানে শ্রমণা অর্থ—সন্ন্যাসিনী, তাহার গার্ভিণী হওয়া অসম্ভব বলিয়া প্রতিজ্ঞাবিরোধ হইল।

৪। প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস।

বাদী যদি প্রতিবাদীর প্রদর্শিত ব্যভিচারাদি দোষ দেখিয়া নিজের প্রতিজ্ঞা বা হেতু বা দৃষ্টান্তের অস্বীকার করে, তবে এই দোষ হয়। প্রতিজ্ঞার অস্বীকার, যেমন—

বাদী—"শব্দঃ অনিত্যঃ, ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ" ইহা বলিলে

প্রতিবাদী—জাতির নিত্যতা ও ঐন্দ্রিয়কত্ব প্রদর্শন করিয়া ব্যভিচার দেখাইলে যদি

বাদী—"শব্দঃ অনিত্যঃ" আমার প্রতিজ্ঞা নহে বলিয়া অস্বীকার করেন

তাহা হইলে বাদীর প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাসরূপ নিগ্রহস্থান হইল। এই অস্বীকার চারি প্রকার হয়, যথা—(১) "কে ইহা বলিয়াছে, অর্থাৎ ইহা বলি নাই, (২) আমি ইহা অপরের মত বলিয়াছি, আমার নিজমত নহে (৩) তুমিই ইহা বলিয়াছ আমি ত বলি নাই, আর (৪) আমি অপরের কথারই অনুবাদ করিয়াছি, আমিই প্রথমে ঐ কথা বলি নাই।"

৫। হেত্বন্তর।

বাদী যদি প্রতিবাদীর প্রদর্শিত ব্যভিচারাদি দোষ দেখিয়া নিজের হেতুবাক্যে কোন বিশেষণ প্রবিষ্ট করেন, তবে বাদীর পক্ষে হেত্বন্তর নিগ্রহস্থান বলিতে হইবে। যেমন—

বাদী—"শব্দঃ অনিত্যঃ, প্রত্যক্ষত্বাৎ" এইরূপ বলিলে যদি

প্রতিবাদী—প্রত্যক্ষজাতি অদর্শনে তাহার ব্যভিচার দেখান, আর তজ্জন্য যদি—

বাদী বলেন—"আমার হেতুটী জাতিমত্বে সতি প্রত্যক্ষত্বাৎ" কেবল প্রত্যক্ষত্বাৎ নহে, তাহা হইলে হেতুতে এই বিশেষণদানে এই হেত্বন্তর নিগ্রহস্থান হইল।

"শব্দত্বাৎ শব্দঃ অনিত্যঃ" ইত্যাদি
তাহা হইলে এস্থলে এই নিগ্রহস্থান ঘটে। এখানে হেতুবাক্যে অগ্রে, পরে প্রতিজ্ঞাবাক্য কওয়ার এই দোষ হইল।

১১। ন্যূন।

প্রতিজ্ঞাপ্রভৃতি ন্যায়াবয়বের মধ্যে কোন একটী না থাকিলে এই দোষ হয়। কথাবস্ত, বাদাংশ, বাদ এবং প্রতিজ্ঞাদিভেদে ইহা চতুর্ব্বিধ হয়। যথা (১) "জল্প"কথায় বাদী প্রথমে ব্যবহারনিয়মাদি কথাবস্ত না করিয়াই প্রতিজ্ঞাদির প্রয়োগ করিলে "কথাবস্ত ন্যূন" হয়, (২) হেতু প্রয়োগ করিয়া উহার নির্দ্দোষত্বপ্রতিপন্ন না করিলে অথবা হেতুর প্রয়োগ না করিয়াই বক্ষ্যমাণ হেতুর নির্দ্দোষত্ব প্রতিপন্ন করিলে "বাদাংশ ন্যূন" হয়, (৩) প্রতিবাদী বাদীর পক্ষস্থাপনার খণ্ডন না করিয়া নিজপক্ষ স্থাপনা করিলে অথবা নিজপক্ষ স্থাপন না করিয়া কেবল বাদীর পক্ষ স্থাপনার খণ্ডন করিলে "বাদ ন্যূন" হয়। আর (৪) প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের মধ্যে যে কোন অবয়ব না বলিলে "অবয়ব ন্যূন" হয়।

১২। অধিক।

ন্যায়াবয়বের মধ্যে হেতুবাক্য বা উদাহরণবাক্য বা উপনয়বাক্য অধিক বলিলে এই নিগ্রহস্থান হয়। তবে পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারিত থাকিলে ইহা নিগ্রহস্থান হয় না। হেতুতে ব্যর্থ বিশেষণ দিলেও এই নিগ্রহস্থানের অন্তর্গত হয়। যেমন "নীলধূমাৎ" বলিলে হয়।

১৩। পুনরুক্ত।

অনুবাদ ব্যতীত কথিত বিষয়ের যে পুনঃকথন তাহাই পুনরুক্ত নামক নিগ্রহস্থান। ইহা শব্দপুনরুক্ত, অর্থপুনরুক্ত এবং অর্থাপত্তিলব্ধপুনরুক্ত বা আক্ষেপপুনরুক্তভেদে ত্রিবিধ। শব্দপুনরুক্ত, যথা—নিত্যঃ শব্দঃ, নিত্যঃ শব্দঃ—এইরূপ দুইবার বলা। অর্থ-পুনরুক্ত যথা—অনিত্যঃ শব্দঃ বলিয়া যদি আবার বলা হয় "নিরোধধর্ম্মকঃ ধ্বনিঃ" অর্থাৎ ধ্বনি বিনাশরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট। এইরূপ ঘটঃ ঘটঃ ঘটঃ কলসঃ ইত্যাদি বলিলেও হয়। অর্থাপত্তিলব্ধ পুনরুক্ত, যথা—"উৎপত্তিধর্ম্মকম্ অনিত্যম্" বলিয়া যদি বলা হয় "অনুৎপত্তি-ধর্ম্মকং নিত্যম্" তাহা হইলেও এই দোষ হয়। প্রয়োজনীয় পুনরুক্তিকে অনুবাদ বলা হয়। যেমন প্রতিজ্ঞাবাক্যের পর নিগমন বাক্য পুনরুক্ত নহে। এজন্য অনুবাদভিন্নস্থলে এই নিগ্রহস্থান হয়।

করিয়া অনুযোগ করেন, তবে আরোপকারীর নিরনুযোজ্যানুযোগ নিগ্রহস্থান হয়। যথাসময়ে যথার্থ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন ভিন্ন যে নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন, তাহাই এই নিরনুযোজ্যানুযোগ। ইহা চারিপ্রকার হয়, যথা—(১) অপ্রাপ্তকালে গ্রহণ, অর্থাৎ অসময়ে নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন (২) প্রতিজ্ঞা প্রভৃতির আভাস, অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাহান্যাদি না হইলেও তাহার প্রদর্শন (৩) ছল ও (৪) জাতি। যথার্থ নিগ্রহস্থান উদ্ভাবন করিতে না পারিলে তিনিই নিগৃহীত হন। উদ্ভাবনকালের নিয়মানুসারেই নিগ্রহস্থানগুলি (১) উক্তগ্রাহ্য, (২) অনুক্তগ্রাহ্য এবং (৩) উচ্যমানগ্রাহ্য—এই তিনরূপ হয়। যাহা উক্ত হইলে বুঝা যায়, তাহা—উক্তগ্রাহ্য, যাহা উক্ত না হইলে পূর্ব্বেও বুঝা যায়, তাহা—অনুক্তগ্রাহ্য, আর যাহা বলিবার সময়ই বুঝা যায়, তাহা—উচ্যমানগ্রাহ্য বলা হয়।

২১। অপসিদ্ধান্ত।

এক সিদ্ধান্ত আশ্রয় করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া প্রতিবাদীর কথার উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া সেই নিজ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ মত অবলম্বনে যদি উত্তর দেওয়া হয়, তবে অপসিদ্ধান্ত হয়। যেমন—সাংখ্য, সদ্বস্তুর বিনাশ হয় না এবং অসতের উৎপত্তি হয় না—এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া যদি বলেন—

এই ব্যক্তজগৎ একপ্রকৃতিক	..	(প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু বিকারসমূহের সমন্বয় দেখা যায়	..	(হেতু)
যেমন মৃত্তিকানির্ম্মিত শরাবাদি একপ্রকৃতিক	.	(উদাহরণ)
এই ব্যক্তভেদ সেই প্রকার সুখদুঃখমোহান্বিত		(উপনয়)
সুতরাং ব্যক্তজগৎ একপ্রকৃতিক	...	(নিগমন)

ইহাতে প্রতিবাদী নৈয়ায়িক যদি বলেন—আচ্ছা প্রকৃতি ও বিকৃতির লক্ষণ কি? উত্তরে সাংখ্য বলিলেন—যে পদার্থের একটী ধর্ম্ম নিবৃত্ত হইলে একটী ধর্ম্মের প্রবৃত্তি হয় সেই পদার্থটী প্রকৃতি, যেমন ঘটশরাবের পক্ষে মাটী, এবং যে ধর্ম্ম প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হয় তাহাই বিকৃতি, যেমন ঘটশরাবাদি। ইহাতে সাংখ্য শরাবাদি বিকৃতিরূপ অসতের আবির্ভাব স্বীকার করিলেন এবং মৃত্তিকারূপ সতের বিনাশ স্বীকার করিলেন। একজন্য সাংখ্যমতে অপসিদ্ধান্ত নামক নিগ্রহস্থান হইল।

২২। হেত্বাভাস।

হেত্বাভাসটী দ্বাবিংশ নিগ্রহস্থান। উহার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব এস্থলে আর পুনরুক্তি করা গেল না। (২৭৫ পৃঃ)

জাতির পরিচয়।

নিগ্রহস্থান বা পরাজয়ের স্থল জানিবার পর ২৪ প্রকার জাতির পরিচয়লাভ আবশ্যক। কারণ, জাতি বলিতে অসদুত্তর বুঝায়। আর অসদুত্তর যিনি করেন তাঁহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। অতএব বিচারে প্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে এই জাতি বা অসদুত্তর কত প্রকার এবং কিরূপ

তাহা জানা থাকিলে আত্মপক্ষের রক্ষা ও পরপক্ষের দোষপ্রদর্শন সহজ হয় বলিয়া ইহার জ্ঞান অত্যাবশ্যক। অবশ্য জাত্যুত্তর ভিন্ন স্থলেও নিগ্রহ-স্থান হয়, তাহা এই বিষয় দুইটী আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে।

এই জাতি বা অসদুত্তর ২৪ প্রকার, যথা—১। সাধর্ম্ম্যসমা, ২। বৈধর্ম্ম্যসমা, ৩। উৎকর্ষসমা, ৪। অপকর্ষসমা, ৫। বর্ণ্যসমা, ৬। অবর্ণ্যসমা, ৭। বিকল্পসমা, ৮। সাধ্যসমা, ৯। প্রাপ্তিসমা, ১০। অপ্রাপ্তিসমা, ১১। প্রসঙ্গসমা, ১২। প্রতিদৃষ্টান্তসমা, ১৩। অনুৎপত্তিসমা, ১৪। সংশয়সমা, ১৫। প্রকরণসমা, ১৬। অহেতুসমা বা হেতুসমা, ১৭। অর্থাপত্তিসমা, ১৮। অবিশেষসমা, ১৯। অনুপপত্তিসমা, ২০। উপলব্ধিসমা, ২১। অনুপলব্ধিসমা, ২২। নিত্যসমা, ২৩। অনিত্যসমা এবং ২৪। কার্য্যসমা বা কারণ-সমা। ইহাদের বিবরণ এইরূপ—

১। সাধর্ম্ম্যসমা।

দুইটী বস্তুতে যখন কোন একটী সাধারণ ধর্ম্ম দেখা যায়, তখন সেই ধর্ম্মকে তাহাদের সাধর্ম্ম্য বলে; যেমন ঘট পট ও মঠের সাধর্ম্ম্য পৃথিবীত্ব, আর তাহাদের যে নিজ নিজ ধর্ম্ম বা অসাধারণ ধর্ম্ম, তাহাকে তাহাদের বৈধর্ম্ম্য বলে; যেমন ঘটত্ব পটত্ব ও মঠত্ব প্রভৃতি। অর্থাৎ ঘটত্ব পট ও মঠের বৈধর্ম্ম্য, পটত্ব ঘট ও মঠের বৈধর্ম্ম্য, ইত্যাদি। বাদী যখন কোন সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্যরূপ হেতু বা দুষ্টহেতুর দ্বারা কোন পক্ষরূপ ধর্ম্মীতে কোন সাধ্যের সাধন করেন, তখন প্রতিবাদী যদি কোন একটী বিপরীত সাধর্ম্ম্যমাত্রদ্বারা বাদীর গৃহীত সেই ধর্ম্মীতে সাধ্যাভাবের সাধন করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর যে উত্তর, তাহা সাধর্ম্ম্যসমা নামক জাত্যুত্তর। যেমন—

বাদী যদি বলেন—"আত্মা—সক্রিয়ঃ, ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বাৎ, লোষ্ট্রবৎ" আর—

প্রতিবাদী বলেন—"আত্মা—নিষ্ক্রিয়ঃ বিভুত্বাৎ, আকাশবৎ। তাহা হইলে—প্রতিবাদীর উত্তর সাধর্ম্ম্যসমা নামক জাত্যুত্তর হইল। অর্থাৎ—

বাদী বলিলেন—"লোষ্ট্রে ক্রিয়ার হেতু গুণ থাকায়, অর্থাৎ গুরুত্ব বা সংযোগাদিরূপ গুণ থাকায়, যদি লোষ্ট্র সক্রিয় হয়, তবে আত্মাতে অদৃষ্টাদি ক্রিয়াহেতু গুণ থাকায়, অর্থাৎ ক্রিয়াহেতু গুণী লোষ্ট্র ও আত্মার সাধর্ম্ম্য হওয়ায় লোষ্ট্রের ন্যায়—আত্মা সক্রিয় হইবে না কেন? ইহাতে—

প্রতিবাদী বলিলেন—"আকাশ বিভুদ্রব্য বলিয়া যদি নিষ্ক্রিয় হয়, তবে আত্মা বিভুদ্রব্য বলিয়া অর্থাৎ বিভুত্ব গুণটি আকাশ ও আত্মার সাধর্ম্ম্য বলিয়া আকাশের ন্যায় আত্মা নিষ্ক্রিয় হইবেন না কেন?

এখানে বাদী পক্ষ ও দৃষ্টান্তের সাধর্ম্ম্যদ্বারা যে সাধ্য সিদ্ধ করিতেছেন, প্রতিবাদী সেই পক্ষ ও অন্য দৃষ্টান্তের সাধর্ম্ম্যদ্বারা সেই সাধ্যের অভাব সিদ্ধ করিলেন। এখানে যেমন বাদী সাধর্ম্ম্যদ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলেন এবং প্রতিবাদী সাধর্ম্ম্যদ্বারাই তাহাতে দোষ দিলেন, তদ্রূপ বাদী বৈধর্ম্ম্যদ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলে এবং প্রতিবাদী সাধর্ম্ম্যদ্বারা তাহাতে দোষ দিলেও এই সাধর্ম্ম্যসমা নামক জাত্যুত্তর হয়। যেমন—

বাদী যদি বলেন—আত্মা—নিষ্ক্রিয়ঃ বিভুত্বাৎ, লোষ্ট্রবৎ, আর ইহাতে—

প্রতিবাদী যদি বলেন—আত্মা—সক্রিয়ঃ ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বাৎ, লোষ্ট্রবৎ, তাহা হইলে প্রতিবাদীর উত্তরে সাধর্ম্ম্যসমা দোষ হইল। অর্থাৎ প্রতিবাদী বলিতেছেন—সক্রিয় লোষ্ট্রের বৈধর্ম্ম্য বিভুত্ববশতঃ আত্মা যদি নিষ্ক্রিয় হয়, তবে সক্রিয় লোষ্ট্রের সাধর্ম্ম্য ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বপ্রযুক্ত আত্মা সক্রিয় হইবে না কেন? ইহাই হইল দ্বিতীয় প্রকার সাধর্ম্ম্যসমা। সুতরাং

বাদীর সাধর্ম্ম্য এবং প্রতিবাদীর সাধর্ম্ম্যদ্বারা এক প্রকার, এবং
বাদীর বৈধর্ম্ম্য আর প্রতিবাদীর সাধর্ম্ম্যদ্বারা অন্যপ্রকার—

এই দ্বিবিধ সাধর্ম্ম্যসমা-হইল।

এস্থলে আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রতিবাদী যদি বাদীর অনুমানের দোষ না দেখাইয়া সৎপ্রতিপক্ষ উত্থাপনাভিপ্রায়ে, অব্যভিচারী সাধর্ম্ম্য হেতুর দ্বারা সাধ্যাভাব প্রদর্শন করেন, তাহা হইলেও প্রতিবাদীর উত্তর সাধর্ম্ম্যসমা হয়। কারণ, সাধ্যাভাব দেখাইবার অগ্রে প্রতিবাদিকর্তৃক বাদীর হেতুর দোষপ্রদর্শনই কর্তব্য। আর এইজন্য এই সাধর্ম্ম্যসমা আবার তিন প্রকারে বিভক্ত করা হয়, যথা—১। সদ্বিষয়া, ২। অসদ্বিষয়া, ৩। অসদুক্তিকা।

১। সদ্বিষয়া—আত্মা নিষ্ক্রিয়ঃ, বিভুত্বাৎ, আকাশবৎ—এই পক্ষটী। যেহেতু এ কথায় কোন দোষ নাই।

২। অসদ্বিষয়া—শব্দঃ অনিত্যঃ, উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ, ঘটবৎ—বলিলে যদি প্রতিবাদী বলেন—শব্দঃ নিত্যঃ, অমূর্ত্তত্বাৎ, আকাশবৎ। ইহা দুষ্ট অনুমান, কারণ, অনিত্য গুণ ও ক্রিয়াতে অমূর্ত্তত্ব আছে।

৩। অসদুক্তিকা—শব্দঃ নিত্যঃ, শ্রাবণত্বাৎ, শব্দত্ববৎ—বলিলে যদি প্রতিবাদী বলেন—শব্দঃ অনিত্যঃ, কৃতকত্বাৎ, ঘটবৎ; তাহা হইলে উক্তিমাত্রই দোষ বুঝা যায় বলিয়া ইহা অসদুক্তিকা বলা হয়।

প্রতিবাদী ব্যভিচারী সাধর্ম্ম্য হেতুদ্বারা যখন সৎপ্রতিপক্ষ প্রদর্শন করেন, তখন ইহার বল হইবে—

২। বৈধর্ম্ম্যসমা।

বাদী কোন সাধর্ম্ম্য অথবা বৈধর্ম্ম্যদ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি উহার বিপরীত কোন বৈধর্ম্ম্যদ্বারাই উহার খণ্ডন করেন, অর্থাৎ সাধ্যাভাব সাধন করেন, তাহা হইলে বৈধর্ম্ম্যসমা জাতি হয়। অর্থাৎ—

বাদীর সাধর্ম্ম্য এবং প্রতিবাদীর বৈধর্ম্ম্য—এক প্রকার, আর
বাদীর বৈধর্ম্ম্য এবং প্রতিবাদীর বৈধর্ম্ম্য—অন্য প্রকার, অর্থাৎ—

এই দুই প্রকার বৈধর্ম্ম্যসমা জাত্যুত্তর হয়। যেমন প্রথম প্রকার—

বাদী যদি বলেন—"আত্মা সক্রিয়ঃ, ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বাৎ, লোষ্টবৎ" আর তদুত্তরে—
প্রতিবাদী যদি বলেন—"আত্মা নিষ্ক্রিয়ঃ, অপরিচ্ছিন্নত্বাৎ, লোষ্টবৎ" ইত্যাদি।

এখানে লোষ্টের সাধর্ম্ম্য ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্ব এবং বৈধর্ম্ম্য অপরিচ্ছিন্নত্ব। আত্মা ক্রিয়াহেতুগুণবান্ এবং অপরিচ্ছিন্ন উভয়ই। অর্থাৎ লোষ্টসাধর্ম্ম্যে সক্রিয় হইলে লোষ্ট-বৈধর্ম্ম্যদ্বারা আত্মা নিষ্ক্রিয় হইবে না কেন?

দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টান্ত, যথা—

বাদী যদি বলেন—"আত্মা নিষ্ক্রিয়ঃ, বিভুত্বাৎ, লোষ্টবৎ" আর তদুত্তরে—
প্রতিবাদী যদি বলেন—"আত্মা সক্রিয়ঃ, ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বাৎ, আকাশবৎ, ইত্যাদি।

এখানে লোষ্টের বৈধর্ম্ম্য বিভুত্ব এবং আকাশের বৈধর্ম্ম্য ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্ব। বস্তুতঃ আত্মা বিভু ও ক্রিয়াহেতুগুণবান্ উভয়ই। অর্থাৎ লোষ্টের বৈধর্ম্ম্য বিভুত্ববশতঃ আত্মা নিষ্ক্রিয় হইলে আকাশের বৈধর্ম্ম্য ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্ববশতঃ আত্মা সক্রিয় হইবে না কেন? অপর কথা সাধর্ম্ম্যসমার ন্যায়। এস্থলে বাদীর দোষ না দেখাইয়া সৎপ্রতিপক্ষপ্রদর্শনে এই উত্তর জাত্যুত্তর হইয়াছে।

ব্যভিচারী। এইরূপে বাদীর পক্ষ অথবা দৃষ্টান্তে সাধ্যধর্ম্ম অথবা হেতুদ্বারাই অবিদ্যমান ধর্ম্মের আপত্তি করিলে উৎকর্ষসমা হয়। ইহা অসদুত্তর। যে ধর্ম্ম যাহাতে নাই, তাহাতে তাহার আরোপই এস্থলে তাহার উৎকর্ষ।

৪। অপকর্ষসমা।

বাদী কোন ধর্ম্মীতে কোন হেতু ও দৃষ্টান্তদ্বারা কোন সাধ্যধর্ম্মের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি বাদীর ঐ দৃষ্টান্তদ্বারাই তাঁহার গৃহীত ধর্ম্মীতে বিদ্যমান ধর্ম্মের অভাব আপত্তি করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম অপকর্ষসমা জাতি। যেমন—

বাদী যদি বলেন—"আত্মা সক্রিয়ঃ, ক্রিয়াহেতুগুণবত্বাৎ, লোষ্টবৎ" আর তাহাতে—

প্রতিবাদী যদি বলেন—"আত্মা অপরিচ্ছিন্নঃ, ক্রিয়াহেতুগুণবত্বাৎ, লোষ্টবৎ" অর্থাৎ সক্রিয় লোষ্টের দৃষ্টান্তবলে বাদী যদি আত্মাকে সক্রিয় বলেন, তবে সেই লোষ্টের পরিচ্ছিন্নত্বধর্ম্মবশতঃ আত্মার অপরিচ্ছিন্নধর্ম্মের অপকর্ষ বা অপলাপ হইবে না কেন? ঐরূপ—

বাদী যদি বলেন—"শব্দঃ অনিত্যঃ, কার্য্যত্বাৎ, ঘটবৎ" আর তদুত্তরে—

প্রতিবাদী যদি বলেন—"শব্দঃ অশ্রাবণঃ, কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ"—এরূপ হইবে না কেন? তাহা হইলেও অপকর্ষসমা জাত্যুত্তর হইবে।

৫। বর্ণ্যসমা।

বাদী কোন হেতু এবং দৃষ্টান্তদ্বারা কোন পক্ষে তাঁহার সাধ্যধর্ম্মের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বাদীর গৃহীত সেই দৃষ্টান্তে বর্ণ্যত্ব অর্থাৎ সন্দিগ্ধসাধ্যকত্বের আপত্তি করেন, তাহা হইলে সেখানে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম বর্ণ্যসমাজাতি। যেমন—

বাদী যদি বলেন—"আত্মা সক্রিয়ঃ, ক্রিয়াহেতুগুণবত্বাৎ, লোষ্টবৎ" আর তদুত্তরে—

প্রতিবাদী বলেন—পক্ষ বলিয়া আত্মার সক্রিয়ত্ব যেমন বর্ণ্য, অর্থাৎ সন্দিগ্ধ, তদ্রূপ দৃষ্টান্ত লোষ্টেরও সক্রিয়ত্ব সন্দিগ্ধ হউক; যেহেতু ক্রিয়াহেতুগুণবত্ব উভয়স্থলেই স্বীকার করা হইতেছে। ইহাতে দৃষ্টান্তে সাধ্যনিশ্চয়ের অভাববশতঃ দৃষ্টান্তাসিদ্ধিপ্রযুক্ত অসাধারণ অনৈকান্তিক হেত্বাভাস থাকিল ও প্রতিবাদীর উত্তরটী দুষ্ট হইল।

৭। বিকল্পসমা।

বাদীর কথিত হেতুবিশিষ্ট দৃষ্টান্তপদার্থে কোন একটী ধর্ম আছে এবং কোন একটী ধর্ম নাই, এইরূপ বিকল্প প্রদর্শন করিয়া দার্ষ্টান্তিক "পক্ষে"ও যদি প্রতিবাদী সাধ্যাভাব সাধন করেন, তবে এই বিকল্পসমা জাত্যুত্তর হয়। যেমন—

বাদী যদি বলেন—"আত্মা সক্রিয়ঃ, ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বাৎ, লোষ্টবৎ" আর তদুত্তরে—

প্রতিবাদী বলেন—ক্রিয়াহেতুগুণযুক্ত হইলেও যেমন কোন দ্রব্য গুরু, যেমন লোষ্ট- এবং ক্রিয়াহেতুগুণযুক্ত হইলেও যেমন কোন দ্রব্য লঘু, যেমন বায়ু, তদ্রূপ ক্রিয়াহেতু, গুণযুক্ত লোষ্টাদির ন্যায় কতকগুলি বস্তু সক্রিয় এবং কতকগুলি বস্তু নিষ্ক্রিয়ও হইবে; সেই নিষ্ক্রিয় বস্তুই আত্মা। ইহা স্বীকার করিলে বায়ু কেন গুরু হইবে না? তাহা হইলে প্রতিবাদীর উত্তরটী বিকল্পসমা জাত্যুত্তর হয়। এস্থলে বাদীর হেতুতে ঐ লঘুত্ব ধর্মের ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া তদ্দ্বারা বাদীর ঐ হেতুতে তাঁহার সাধ্যধর্ম সক্রিয়ত্বের ব্যভিচার সমর্থন করাই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য।

এই বিকল্পসমা তিন প্রকার হইতে পারে, যথা—(১) বাদীর হেতুরূপ ধর্মে অন্য যে কোন ধর্মের ব্যভিচার, অথবা (২) অন্য যে কোন ধর্মে বাদীর সাধ্যধর্মের ব্যভিচার, অথবা (৩) যে কোন ধর্মে তদ্ভিন্ন যে কোন ধর্মের ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া প্রতিবাদী যদি বাদীর হেতুতেও তাঁহার সাধ্যধর্মের ব্যভিচারের আপত্তি করেন, তাহা হইলে এই বিকল্পসমা জাত্যুত্তর হইবে। তন্মধ্যে প্রথমটী অর্থাৎ বাদীর হেতুতে অন্য যে কোন ধর্মের ব্যভিচারটী আবার ত্রিবিধ, যথা—(ক) বাদীর পক্ষ ও দৃষ্টান্তে ব্যভিচার, (খ) বাদী পদার্থদ্বয় পক্ষরূপে গ্রহণ করিলে সেই পক্ষদ্বয়ে ব্যভিচার, এবং (গ) বাদী পদার্থদ্বয় দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করিলে সেই দৃষ্টান্তদ্বয়ে ব্যভিচার, ইত্যাদি।

৮। সাধ্যসমা।

বাদীর অনুমানে তাঁহার পক্ষ, হেতু ও দৃষ্টান্ত পদার্থ প্রমাণান্তরদ্বারা সিদ্ধ হইলেও প্রতিবাদী যদি তাহাতেও বাদীর সেই হেতুপ্রযুক্তই সাধ্যত্বের আপত্তি করেন, তাহা হইলে সাধ্যসমা জাত্যুত্তর হয়। এইরূপে বাদীর অনুমানে হেত্বসিদ্ধি, পক্ষাসিদ্ধি বা আশ্রয়াসিদ্ধি এবং দৃষ্টান্তাসিদ্ধির প্রদর্শনই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য হয়। যেমন—

বাদী যদি বলেন—"আত্মা সক্রিয়ঃ, ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বাৎ, লোষ্টবৎ" আর তদুত্তরে—

প্রতিবাদী বলেন—ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বশতঃ লোষ্ট যেমন, আত্মা যদি তদ্রূপ হয়, তবে আত্মা যেমন, লোষ্টও তদ্রূপ হইবে না কেন? অর্থাৎ দৃষ্টান্তেও উক্ত হেতুবশতঃ সাধ্যসিদ্ধি করিবে না কেন? সুতরাং দৃষ্টান্তই অসিদ্ধ হইল। ঐরূপ পক্ষ ও হেতুতেও সাধ্যসিদ্ধির আপত্তি করিলে এই জাত্যুত্তর হয়। পূর্বোক্ত বর্ণ্যসমাতে প্রতিবাদী, বাদীর সেই হেতুপ্রযুক্ত উক্তরূপে বাদীর দৃষ্টান্ত, হেতু ও পক্ষে সাধ্যত্বের আপত্তি করেন না—ইহাই প্রভেদ।

৯। প্রাপ্তিসমা।

বাদী কোন হেতুর দ্বারা কোন পক্ষে সাধ্যসিদ্ধি করিলে প্রতিবাদী যদি বাদীর স্বীকৃত

১২। প্রতিদৃষ্টান্তসমা।

বাদীর অনুমানে যাহা প্রতিকূল দৃষ্টান্ত, অন্য কথায় যাহা সাধ্যাভাবনিশ্চয়যুক্ত, তাহাতে প্রতিবাদী যদি বাদীর কথিত হেতুর সত্তা প্রদর্শন করিয়া পক্ষে সাধ্যাভাবের আপত্তি করেন, তবে প্রতিবাদীর উত্তর প্রতিদৃষ্টান্তসমা জাত্যুত্তর হয়। যেমন—

বাদী যদি বলেন—"আত্মা সক্রিয়ঃ, ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্বাৎ, লোষ্টবৎ," আর তদুত্তরে—

প্রতিবাদী যদি বলেন—ক্রিয়াহেতুগুণবত্ত্ব আকাশেও আছে; কারণ, বৃক্ষের সহিত বায়ুর সংযোগটী বৃক্ষের ক্রিয়াহেতুগুণ, ঐ বায়ুর সংযোগ আকাশেও আছে, সুতরাং আত্মা আকাশের ন্যায় নিষ্ক্রিয় হউক! ক্রিয়াহেতুগুণবশতঃ আত্মা যদি লোষ্টের ন্যায় সক্রিয় হয়, তবে ঐ হেতুবশতঃ আকাশের ন্যায় আত্মা নিষ্ক্রিয় হইবে না কেন? প্রতিবাদীর এই উত্তর প্রতিদৃষ্টান্তসমা জাত্যুত্তর। এস্থলে বাধ অথবা সৎপ্রতিপক্ষের উদ্ভাবনই উদ্দেশ্য।

১৩। অনুৎপত্তিসমা।

বাদী কোন পক্ষে কোন হেতুর দ্বারা তাহার সাধ্য সিদ্ধ করিলে, প্রতিবাদী যদি সেই পক্ষের অনুৎপত্তিকে আশ্রয় করিয়া বাদীর ঐ হেতুতে দোষের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর উত্তরটী অনুৎপত্তিসমা জাত্যুত্তর হয়। যেমন—

বাদী যদি বলেন—"শব্দঃ অনিত্যঃ, প্রযত্নান্তরীয়কত্বাৎ, ঘটবৎ" আর তদুত্তরে—

প্রতিবাদী যদি বলেন—শব্দের উৎপত্তির পূর্ব্বে শব্দে ত হেতু "প্রযত্নান্তরীয়কত্ব" অর্থাৎ প্রযত্নের পর উৎপত্তিমত্ত্ব নাই। সুতরাং শব্দে তখন অনিত্যত্বসাধক হেতু না থাকায় সেই শব্দ নিত্য হউক। নিত্য হইলে আর উহাতে ঐ উৎপত্তি ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। অতএব বাদীর হেতু পক্ষে না থাকায়, তাহার অনুমান অসিদ্ধ, ইত্যাদি, তাহা হইলে প্রতিবাদীর উত্তর উৎপত্তিসমা জাতি হইবে।

বস্তুতঃ পক্ষের ন্যায় হেতু ও দৃষ্টান্তেরও উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহাতে হেতুর অভাব দেখাইলেও এইরূপ উত্তর হয়। ইহাতে পক্ষ অনুসারে ভাগাসিদ্ধি, দৃষ্টান্তানুসারে দৃষ্টান্তাসিদ্ধি এবং বাধ দোষই প্রদর্শিত হয়।

১৪। সংশয়সমা।

বাদী কোন পক্ষে কোন হেতুর দ্বারা সাধ্যসিদ্ধি করিলে প্রতিবাদী যদি সংশয়ের কোন কারণ দেখাইয়া বাদীর সেই পক্ষে বাদীর সাধ্যবিষয়ে সংশয় উত্থাপন করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর সেই উত্তর সংশয়সমা জাত্যুত্তর হয়। যেমন—

বাদী যদি বলেন—শব্দঃ অনিত্যঃ, প্রযত্নজন্যত্বাৎ, ঘটবৎ" আর তদুত্তরে—

প্রতিবাদী যদি বলেন—অনিত্য ঘটের সাধর্ম্ম্য 'প্রযত্নজন্যত্ব' শব্দে আছে বলিয়া যদি শব্দে অনিত্যত্বের নিশ্চয় হয়, তবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বহেতু শব্দ নিত্য কি অনিত্য—এরূপ সংশয় কেন হইবে না? কারণ,—শব্দ যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তদ্রূপ ঘট এবং তদ্গত ঘটত্বজাতিও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। অতএব সংশয় হয়—শব্দ ঘটত্ব জাতির ন্যায় নিত্য অথবা ঘটের ন্যায় অনিত্য কি না? তাহা হইলে প্রতিবাদীর এই উত্তর সংশয়সমা জাত্যুত্তর হইল। এস্থলে সৎপ্রতিপক্ষ উদ্ভাবনই উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রযত্নজন্যত্ব বিশেষধর্ম্ম এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব সামান্য-ধর্ম্ম, অতএব বিশেষধর্ম্মের জ্ঞান থাকিলে সামান্যধর্ম্ম জ্ঞানদ্বারা সংশয় হইতে পারে না।

বাদী যদি বলেন—"শব্দ অনুমানপ্রযুক্ত অনিত্য" আর তদুত্তরে—

প্রতিবাদী যদি বলেন—"শব্দ প্রত্যক্ষপ্রযুক্ত নিত্য" তাহা হইলে এই অর্থাপত্তিসমা জাত্যুত্তর হইবে। এস্থলে অনুমানপ্রযুক্ত যদি অনিত্য হয়, তবে অর্থতঃ যাহা অনুমানভিন্ন প্রত্যক্ষপ্রযুক্ত, তাহা নিত্যই হইবার কথা। সুতরাং পক্ষ ও হেতু অবলম্বনে অর্থতঃ বাদীর বাধিত বিষয়ের আপত্তিই এই অর্থাপত্তিসমা হইল।

১৮। অবিশেষসমা।

বাদী কোন পক্ষে কোন দৃষ্টান্ত ও সেই পক্ষের সাধর্ম্যকে হেতু করিয়া তাঁহার সাধ্য সিদ্ধি করিলে প্রতিবাদী যদি সকল পদার্থের সাধর্ম্য—সত্তা প্রমেয়ত্ব অভিধেয়ত্বাদিকে হেতু করিয়া সকল পদার্থের অবিশেষ আপত্তি করেন, তবে প্রতিবাদীর উত্তর অবিশেষসমা জাত্যুত্তর হয়। যেমন—

বাদী যদি বলেন—"শব্দঃ অনিত্যঃ, প্রযত্নজন্যত্বাৎ, ঘটবৎ" আর তদুত্তরে—

প্রতিবাদী যদি বলেন—ঘট ও শব্দে প্রযত্নজন্যত্বরূপ এক ধর্ম থাকায় যদি শব্দ ও ঘটের অনিত্যত্বরূপ অবিশেষ হয় তাহা হইলে সকল পদার্থেই সত্তা ও প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি একধর্ম থাকায় সকল পদার্থেরই অবিশেষ হউক। আর তাহা হইলে পক্ষ, সাধ্য হেতু ও দৃষ্টান্তের ভেদ না থাকায় অনুমানই আর হইতে পারিবে না। কারণ, সকল পদার্থ এক জাতীয় হওয়ায় পদার্থের আর নিত্যানিত্য বিভাগও থাকিবে না। সুতরাং সকল পদার্থ নিত্য বা অনিত্য হইবে। আর যদি নিত্য হয়, তবে অনিত্যত্ব সাধনই অসম্ভব হয়; ইত্যাদি। ইহাই অবিশেষসমা নামক জাত্যুত্তর।

১৯। উপপত্তিসমা।

বাদী তাহার সাধ্যসিদ্ধির জন্য হেতু প্রদর্শন করিলে প্রতিবাদী যদি বাদীর পক্ষকে দৃষ্টান্ত করিয়া নিজের পক্ষেও হেতু আছে বলিয়া অনুমান করেন, তবে প্রতিবাদীর উত্তরটী উপপত্তিসমা জাত্যুত্তর হয়। যেমন—

বাদী যদি বলেন—"শব্দঃ অনিত্যঃ, কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ" আর তদুত্তরে—

প্রতিবাদী যদি বলেন—শব্দের অনিত্যতায় যদি কার্য্যত্ব হেতু থাকে, তবে বাদীর পক্ষের ন্যায় শব্দের নিত্যত্ব-পক্ষেও কিছু হেতু থাকিবে না কেন? যেহেতু ইহা বাদি-প্রতিবাদীর অন্যতর পক্ষেরই উক্ত, অথবা ইহা ত তোমার পক্ষ ও আমার পক্ষের অন্যতর পক্ষ, অথবা ইহা প্রকৃত সন্দেহের বিষয়, অথবা ইহা বিপ্রতিপত্তির বিষয়। সুতরাং বাদীর অনুমানে বাধ বা সৎপ্রতিপক্ষ দোষ অনিবার্য্য ইত্যাদি, তাহা হইলে এই উত্তরটী উপপত্তিসমা জাত্যুত্তর হয়।

প্রতিবাদী বলিলেন—না; কারণ, উচ্চারণের পূর্ব্বে অনুপলব্ধিবশতঃ শব্দ নাই।

বাদী বলিলেন—ঐ অনুপলব্ধি কি নিজের স্বরূপে তদ্রূপে অর্থাৎ অনুপলব্ধিস্বরূপেই বর্ত্তমান থাকে, কিংবা তদ্রূপে বর্ত্তমান থাকে না। অনুপলব্ধি স্বস্বরূপে বর্ত্তমান থাকে না, বলিলে উহা অনুপলব্ধিই বলা যায় না। সুতরাং অনুপলব্ধি স্বরূপেই বর্ত্তমান থাকে বলিতে হইবে। অর্থাৎ যাহা সতত অনুপলব্ধিস্বরূপে ব্যবস্থিত, তাহাতে সতত অনুপলব্ধিই আছে।

প্রতিবাদী বলিলেন—তাহা হইলে সেই অনুপলব্ধিপ্রযুক্ত উহা সতত নিজেরও অভাবরূপ, অর্থাৎ উপলব্ধিস্বরূপ। আর ইহা স্বীকারে ব্যাঘাত হয়। ইহাই অনুপলব্ধিসমা জাত্যুত্তর।

২২। অনিত্যসমা।

বাদী যদি কোন পদার্থে হেতু ও দৃষ্টান্তদ্বারা অনিত্যত্ব সাধন করেন, আর প্রতিবাদী যদি উত্তরে ঐ দৃষ্টান্তের সহিত সকল পদার্থের কোন সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্যের দ্বারা সকল পদার্থের অনিত্যত্বের আপত্তি করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর উত্তর অনিত্যসমা জাত্যুত্তর হয়। যেমন—

বাদী বলিলেন—"শব্দঃ অনিত্যঃ, প্রযত্নজন্যত্বাৎ, ঘটবৎ" আর তদুত্তরে—

প্রতিবাদী বলিলেন—সর্ব্বম্ অনিত্যম্, প্রমেয়ত্বাৎ, ঘটবৎ" অর্থাৎ ঘটের সাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত শব্দ যদি ঘটের ন্যায় অনিত্য হয়, তবে সত্তা ও প্রমেয়ত্বরূপ সাধর্ম্ম্যবশতঃ সকল পদার্থ ঘটের ন্যায় অনিত্য হউক। এস্থলে প্রতিবাদীর উত্তরটী অনিত্যসমা জাত্যুত্তর।

বা বিজ্ঞজনের বাক্য শুনিয়া হয়, এবং বাদী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষের বিচার শুনিয়া মধ্যস্থ কর্ত্তৃকও করা হয়। ইহার ফলে সংশয়নিবৃত্তি হয়।

জল্প কথার পরিচয়।

জল্পকথায় মধ্যস্থ থাকা আবশ্যক। উভয়পক্ষ নিজ নিজ পক্ষ স্থাপন করিয়া পরপক্ষ খণ্ডন করেন। ইহাতে তত্ত্বনির্ণয় ও জয়পরাজয় উভয়ই হইয়া থাকে।

বিতণ্ডা কথার পরিচয়।

বিতণ্ডাকথায় স্বপক্ষস্থাপনহীন পরপক্ষখণ্ডনজনিত জয়পরাজয় বুঝায়। ইহাতে প্রতিবাদী স্বপক্ষস্থাপন করেন না। ইহাতেও মধ্যস্থ থাকা আবশ্যক।

জাত্যুত্তরের সাতটী অঙ্গ।

উক্ত প্রধান ২৪ প্রকার জাতির অঙ্গ সাতটী, যথা—১ লক্ষ্য, ২ লক্ষণ, ৩ উত্থান, ৪ পাতন, ৫ অবসর, ৬ ফল এবং ৭ মূল। এস্থলে ২৪ প্রকার জাতিই ১ লক্ষ্য, উপরে তাহাদের যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহাই ২ লক্ষণ, যেরূপ জ্ঞানবশতঃ ঐ সমস্ত জাতির উত্থিতি হয় তাহাই ৩ উত্থিতি, প্রতিবাদীর দুষ্ট উত্তরে বাদীর হেতুকে হেত্বাভাস বলিয়া প্রতিপাদনই ৪ পাতন; যে সময়ে যে কারণে প্রতিবাদী জাত্যুত্তর করিয়া সময় গ্রহণ করেন তাহাই ৫ অবসর; প্রতিবাদীর জাতিপ্রয়োগে মধ্যস্থাদির ভ্রান্তি উৎপাদনই ৬ ফল; প্রতিবাদীর জাত্যুত্তরের দোষের বীজই ৭ মূল। জাতির এই অঙ্গ সাতটীর জ্ঞান থাকিলে জাতির প্রয়োগ ও নিরাস ভাল করিয়া করিতে পারা যায়।

ছলের বিভাগ।

এই ছল তিন প্রকার, যথা—১। বাক্‌ছল, ২। সামান্যছল এবং ৩। উপচারছল।

বাক্‌ছলের পরিচয়।

যখন কাহারও বাক্যের বা তন্মধ্যস্থপদের একাধিক অর্থ সম্ভব হয় এবং তন্মধ্যে তাহার যে অর্থ অভিপ্রেত, তাহা ত্যাগ করিয়া অনভিপ্রেত অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহার বাক্যে দোষ প্রদর্শন করা হয়, তখন বাক্‌ছল হয়। যেমন—"এই ব্যক্তি নবকম্বলযুক্ত" অর্থাৎ নূতন কম্বলযুক্ত এই অর্থে এই কথা যদি কেহ বলে, আর তখন যদি নব শব্দের অর্থ "নয়খানি" করিয়া অপরে বলে "কৈ ! ইহার ত নয়খানি কম্বল দেখা যাইতেছে না", তখন বাক্‌ছল হয়। এখানে সাধ্য পক্ষে না থাকায় প্রত্যক্ষবিরোধ অর্থাৎ বাধ প্রদর্শিত হইল। এইরূপ "ইনি নেপাল হইতে আগত, যেহেতু নবকম্বলযুক্ত," অথবা "ইনি ধনবান্ যেহেতু নবকম্বলযুক্ত" এস্থলে প্রতিবাদী নবশব্দের অর্থ 'নূতন' না করিয়া 'নয়টী' করায় অনুমান-বিরোধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ সাধ্যসম বা স্বরূপাসিদ্ধ নামক হেত্বাভাস অর্থাৎ হেতুতে দোষ প্রদর্শিত হইল। এজন্য ইহাও অসদুত্তরের মধ্যে গণ্য হয়। এইরূপে এই ছল পক্ষ সাধ্য হেতু ও দৃষ্টান্ত—সর্বত্রই হইতে পারে।

সামান্যছলের পরিচয়।

সম্ভাব্যমান অর্থকে অতিক্রম করিয়া অন্যত্রও থাকে, একরূপ সামান্যধর্মের সম্বন্ধবশতঃ অসম্ভব অর্থের যে কল্পনা তাহাই সামান্যছল। যেমন—

এক ব্যক্তি বলিলেন—এই ব্রাহ্মণ বেদবিদ্যাচরণসম্পন্ন। ইহাতে—

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন—ব্রাহ্মণে বেদবিদ্যা আচরণসম্পত্তি সম্ভব। অর্থাৎ ইনি যখন ব্রাহ্মণ, তখন ইহাতে বেদবিদ্যাচরণসম্পত্তি থাকাই সম্ভব। ইহাতে দ্বিতীয় ব্যক্তির অভিপ্রায় বুঝিয়াই হউক, আর না বুঝিয়াই হউক—

তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন—যদি ব্রাহ্মণ হইলেই বেদবিদ্যাচরণসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ শিশু ও ব্রাত্যও বেদবিদ্যাচরণসম্পন্ন হউন ?

এস্থলে প্রথম বক্তার বাক্য হইতে কোন এক ব্রাহ্মণের প্রশংসামাত্র বুঝা যায়, দ্বিতীয় বক্তা তাহারই অনুবাদমাত্র করিয়াছেন, ব্রাহ্মণত্বকে বেদবিদ্যাচরণসম্পদের হেতু বলেন নাই, কিন্তু তৃতীয় বক্তা, দ্বিতীয় বক্তার বাক্যে ব্রাহ্মণত্বকে বেদবিদ্যাচরণসম্পদের হেতু কল্পনা করিয়া হেতুতে ব্যভিচার দোষ দিলেন। এজন্য ইহা অসদুত্তর হইল।

উপচারছলের পরিচয়।

কোন ব্যক্তি কোন শব্দের প্রসিদ্ধ লাক্ষণিক বা গৌণ অর্থে, কোন বাক্য প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি সেই শব্দের মুখ্যার্থ অবলম্বনে তাহার বাক্যে দোষ দেন, তবে উপচার ছল বলা হয়। যেমন—

বাদী বলিলেন—মঞ্চ রোদন করিতেছে, ইহাতে—

প্রতিবাদী বলিলেন—মঞ্চ জড়বস্তু, সে আবার রোদন করিবে কি ?

যেটী যাহার ব্যাপ্য, সে তাহার ব্যাপক হয়। যেমন ধূম ব্যাপ্য এবং বহ্নি ব্যাপক, অথবা বহ্ন্যভাব ব্যাপ্য এবং ধূমাভাব ব্যাপক। সুতরাং ব্যাপ্য লাভ হইলে ব্যাপক লাভ অবশ্যম্ভাবী। এজন্য ধূম দেখিয়া যখন বহ্নির অনুমিতি করিতে হয়, তখন ধূম ব্যাপ্য ও বহ্নি ব্যাপক—এই ব্যাপ্তিতে যদি ধূমদর্শনকারী অনুমানকর্ত্তার মনে সংশয় হয়, তবে এস্থলে তাহার পূর্ব্বনিশ্চিত ব্যাপ্য যে বহ্ন্যভাব, তাহার আরোপ করিয়া প্রত্যক্ষ যে ধূম, তাহার অভাবরূপ যে ব্যাপক, সেই ব্যাপকের আরোপ করিয়া ধূমপ্রত্যক্ষকারীর নিকট যে তাহার অনভীষ্টের সম্ভাবনা প্রদর্শন করা হয়, তাহাকেই তর্ক বলা হয়। এই অনিষ্টের ভয়ে উক্ত সংশয়কারীর মনে ধূমবহ্নির ব্যাপ্তিতে যে সংশয় হইয়াছিল, তাহা তিনি বর্জ্জন করেন।

ধূমবহ্নির ব্যাপ্তিসংশয়স্থলে তাঁহার মনে হয়—ধূমঃ বহ্নিব্যাপ্যঃ ন বা? অর্থাৎ ধূম বহ্নির ব্যাপ্য কি না? আর এই সংশয়নিবারণের জন্য যে তর্ক করা হয়, তাহার আকার হয়—"যদি অয়ং নির্ব্বহ্নিঃ স্যাৎ, তর্হি নির্ধূমোঽপি স্যাৎ" অর্থাৎ যদি এখানে বহ্নি না থাকে, তবে ধূমও থাকিতে পারে না।

এই তর্কদ্বারা তাহার ঐ সংশয় দূর হয়। এস্থলে সংশয়কারীর মনে ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তিতে অর্থাৎ ধূম থাকিলে বহ্নি থাকে—ইহাতে, সংশয় হইলেও বহ্ন্যভাব ও ধূমাভাবের ব্যাপ্তি অর্থাৎ বহ্নি না থাকিলে ধূম থাকে না, অর্থাৎ বহ্ন্যভাব থাকিলে ধূমাভাব থাকে—ইহাতে সংশয় ছিল না বলিতে হইবে। আর ইহাতে সংশয় না থাকায় এবং ধূমও সেই-স্থলে প্রত্যক্ষ হওয়ায় বাধের আশঙ্কায় সেই সংশয়কারীকে স্বীকার করিতে হয় যে, ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, অর্থাৎ যেখানে ধূম থাকে সেখানে বহ্নি থাকে। কিন্তু ধূমাভাব ও বহ্ন্যভাবেরও ব্যাপ্তিতে যদি সংশয় হয়, তবে আবার অন্য তর্কদ্বারা তাহার নিবারণ করিতে হয়। অর্থাৎ এরূপ

সংশয় হইলে আবার তর্ক হয়—"বহ্নি না থাকিলেও যদি ধূম থাকে, তবে ধূম বহ্নিজন্য নহে"। এখন ইহা সংশয়কারীর প্রত্যক্ষ বলিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ বাধের ভয়ে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হয় যে, বহ্ন্যভাব থাকিলে ধূমাভাব থাকে, আর তাহার ফলে ধূম থাকিলে বহ্নি থাকে। অতএব বাধের ভয়ে তর্কের দ্বারা সংশয় বিদূরিত হয়, অর্থাৎ বাধ বা ব্যাঘাতকে দ্বার করিয়া তর্ক সংশয়কে বিনষ্ট করে। এইজন্যই উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন—"ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা তর্কঃ শঙ্কাবধির্মতঃ" অর্থাৎ ব্যাঘাত উপস্থিত হইলে সংশয়ের উচ্ছেদ হয়, আর তর্ক ঐ সংশয়ের নিবর্ত্তক। সুতরাং ব্যাঘাতকে দ্বার করিয়া তর্ক সংশয়ের উচ্ছেদ করে। সংশয় উচ্ছেদ হইলেই লোকে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হয়।

তর্কের পাঁচটী অঙ্গ।

এই তর্কের অঙ্গ পাঁচটী, যথা—১। ব্যাপ্তি অর্থাৎ আপাদকের সহিত আপাদ্যের অবিনাভাব; ২। তর্কাপ্রতিহতি, অর্থাৎ তর্কাভাস বা প্রতিতর্কের দ্বারা অপ্রতিঘাত, ৩। বিপর্য্যয়ে অবসান অর্থাৎ প্রসঞ্জনীয়ের বিপর্য্যয়ে পর্য্যবসান, ৪। অনিষ্টত্ব অর্থাৎ এরূপ হইলে এরূপ হয়, কিন্তু এরূপ নহে, এইরূপে যে প্রসঞ্জনীয়ের অনিষ্টত্ব তাহাই বুঝিতে হইবে। ৫। অননুকূলত্ব অর্থাৎ প্রসঙ্গের বিরুদ্ধ হেত্বাভাসের ন্যায় প্রতিপক্ষের অসাধকত্ব। এই পাঁচটী অঙ্গের কোনরূপ বৈকল্য ঘটিলে তর্কাভাস বলা হয়।

ইহাদের বিবরণ তার্কিকরক্ষা ও মানমেয়োদয় গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

বেদান্তমতে কিন্তু তর্কের দ্বারা সংশয়ের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয়—ইহা স্বীকার করা হয় না। তর্কের দ্বারা যে ব্যাঘাত উপস্থাপিত করা হয়, তাহা সংশয়ের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিতে পারে না। উহাতে সংশয়ের দুইটী কোটীর মধ্যে এক কোটীতে উৎকট্যমাত্র আনয়ন করে। তাহাতে এক পক্ষের সম্ভাবনা মাত্র হয়। আর তাহারই ফলে লোকে অনুমান করিয়া ইষ্টসাধনতাজ্ঞানপুরস্কারে প্রবৃত্ত হয়, অথবা অনিষ্টসাধনতাজ্ঞানসহকারে নিবৃত্ত হয়। ব্যাঘাত থাকিলেই সংশয় আছেই বুঝিতে হইবে। সংশয় না থাকিলে কাহার ব্যাঘাত হয়? এজন্য তর্কদ্বারা সংশয়ের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয় না। কিন্তু সম্ভাবনামাত্র জন্মায়, আর তাহাই শ্রীহর্ষ বলিয়াছেন—

"ব্যাঘাতো যদি শঙ্কাস্তি ন চেচ্ছঙ্কা ততস্তরাম্।
ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা তর্কঃ শঙ্কাবধিঃ কৃতঃ" ॥

অর্থাৎ ব্যাঘাত যদি থাকে, তবে শঙ্কা অবশ্যই থাকিবে। তর্ক ব্যাঘাতদ্বারা সংশয়ের নিবর্ত্তক হয় না। অভিপ্রায় এই যে, এক ব্রহ্মভিন্ন সকলই অনির্ব্বচনীয়, সংশয় সমূলে বিনষ্ট হইলে আর অনির্ব্বচনীয়ত্ব সিদ্ধ হয় না। তর্ক যদি সংশয়ের নিবর্ত্তক হইত, তবে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম তর্কগম্য হইতেন। কিন্তু ঈশ্বর বা ব্রহ্ম তর্কগম্য নহে, উহা শ্রুতিমাত্রগম্য। এই সম্ভাবনা দ্বারাই ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়। ভট্টমতে অনুপোপাধিবিষয়ক শঙ্কা তর্কদ্বারা নিবৃত্ত হয়। প্রমাণদ্বারা সাধ্যমান বিষয়ের অন্যথাশঙ্কা হইলে তাহার নিরাসের জন্য "অন্যথা হইলে দোষ হয়" এইরূপ যে কথন তাহাই তর্ক। এই জন্যই তার্কিকমতে অনিষ্টপ্রসঙ্গের নাম তর্ক বলা হয়। ইহাকেই বিপক্ষে বাধক বলা হয়। ভট্টমতে তর্কদ্বারা ব্যাঘাত উপস্থাপিত করিতে পারিলে শঙ্কার নিবৃত্তি হয়—বলা হয়।

তর্ক বিভাগ।

এই তর্ক পাঁচ প্রকার, যথা—১। আত্মাশ্রয়, ২। অন্যোন্যাশ্রয়, ৩। চক্রক, ৪। অনবস্থা এবং ৫। প্রমাণবাধিতার্থপ্রসঙ্গ। প্রথম চারিটীর প্রত্যেকটী আবার (ক) উৎপত্তি, (খ) স্থিতি এবং (গ) জ্ঞপ্তি অর্থাৎ জ্ঞানভেদে ত্রিবিধ।

১। আত্মাশ্রয়ের পরিচয়।

স্বাপেক্ষাপাদক অনিষ্টপ্রসঙ্গই আত্মাশ্রয়। অর্থাৎ যাহা নিজেকে (ফলতঃ পক্ষকে) অপেক্ষা করিয়া আপাদক অর্থাৎ ব্যাপ্য হয়, আর তজ্জন্য যে অনিষ্টপ্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ অনিষ্টের আপত্তি হয়, তাহাই আত্মাশ্রয় নামক তর্ক। ইহা উৎপত্তি, স্থিতি ও জ্ঞানভেদে ত্রিবিধ হয়। অর্থাৎ ব্যাপ্য আরোপের দ্বারা যখন ব্যাপকের আরোপ করা হয়, তখন যদি ব্যাপ্য নিজেকে অপেক্ষা করিয়া সিদ্ধ হয়, তখন এই দোষ হয়। যেমন উৎপত্তিগত আত্মাশ্রয়ের দৃষ্টান্তপ্রদর্শনের জন্য বলা হয়—

"অয়ং ঘটঃ যদি এতদ্ঘটজন্যঃ স্যাৎ, ... (আপাদক)
তদা এতদ্ঘটানধিকরণক্ষণোত্তরবর্ত্তী ন স্যাৎ" ... (আপাদ্য)

অর্থাৎ এই ঘটটী যদি এই ঘট হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে এই ঘটের 'অধিকরণ নয়' যে ক্ষণ, সেই ক্ষণের উত্তরবর্ত্তী হয় না। কিন্তু

কার্য্যটী কারণবস্তু হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া এবং উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য থাকে না বলিয়া তাহার যে অনধিকরণ-ক্ষণ, সেই ক্ষণে কারণবস্তুটীই থাকে, আর তজ্জন্য কার্য্য সেই কারণবস্তুটীর অধিকরণ-ক্ষণের উত্তরবর্ত্তী হয়। অর্থাৎ কার্য্য তাহার অনধিকরণ-ক্ষণের উত্তরবর্ত্তী হয়।

এখানে প্রথম স্যাদন্তভাগের "এতদ্ঘটজন্যত্বটী" ব্যাপ্য বা আপাদক, আর দ্বিতীয় স্যাদন্তভাগের "এতদ্ঘটানধিকরণক্ষণোত্তরবর্ত্তিভেদ" বা "এতদ্ঘটানধিকরণক্ষণোত্তরবর্ত্তিত্বাভাবটী" ব্যাপক বা আপাদ্য। কারণ, "এতদ্ঘটজন্যত্ব" যেখানে যেখানে থাকে, সেখানে এতদ্ঘটের অনধিকরণক্ষণের উত্তরবর্ত্তিত্ব থাকে না। এতদ্ঘটজন্যত্ব থাকে ঘটের রূপাদিতে, ঘটে তাহা থাকে না। আর এতদ্ঘটানধিকরণক্ষণোত্তরবর্ত্তিত্ব থাকে ঘটে, ঘটের রূপাদিতে তাহা থাকে না।

এস্থলে "অয়ং ঘটঃ"রূপ পক্ষে এই "এতদ্ঘটজন্যত্ব"রূপ ব্যাপ্যের বা আপাদকের আরোপদ্বারা এই "এতদ্ঘটানধিকরণক্ষণোত্তরবর্ত্তিভেদ" বা "এতদ্ঘটানধিকরণক্ষণোত্তরবর্ত্তিত্বাভাব"রূপ ব্যাপকের বা আপাদ্যের যে আরোপ করা হইতেছে, তাহা অনভীষ্ট বলিয়া তর্কের সামান্যলক্ষণ যে "ব্যাপ্যারোপদ্বারা ব্যাপকের আরোপ" তাহা প্রযুক্ত হইতে পারিতেছে। বস্তুতঃ, এই আরোপটী অনভীষ্ট, যেহেতু ইহা ফলতঃ স্বভেদস্বরূপই হয়। কিন্তু নিজের উপর কখন নিজের ভেদ থাকে না। সুতরাং এতাদৃশ আরোপদ্বারা "এই ঘটটী এতদ্ঘটজন্য"—এই কথা আর স্বীকার করা যাইতে পারে না।

এখানে এইরূপ তর্ক করিবার কারণ, "এই ঘটটী এতদ্ঘটজন্যত্ব-বিশিষ্ট" কিংবা "এতদ্ঘটজন্যত্বাভাববিশিষ্ট" অর্থাৎ "এই ঘটটী এতদ্-ঘটজন্য কি না" এইরূপ সংশয় হইয়াছিল। কিন্তু সংশয়মাত্রেই দুইটী কোটি থাকে, যথা—বিধিকোটি ও নিষেধকোটি। তন্মধ্যে এখানে ঘটজন্যত্বটী বিধিকোটি এবং ঘটজন্যত্বাভাবটী নিষেধকোটি। আর সেই

ঘটজন্যত্ব এবং ঘটজন্যত্বাভাবের প্রতি হেতু হইয়াছিল "এতদ্ঘটানধিকরণক্ষণোত্তরবর্ত্তিত্ব"। সুতরাং এস্থলে বিধিকোটিক ও নিষেধকোটিক যে দুইরূপ অনুমিতি হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বিধিকোটিতে "পক্ষে" সাধ্যসংশয় হইয়াছিল, এবং নিষেধকোটিতে হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তিতে সংশয় হইয়াছিল, আর তজ্জন্য "পক্ষে" সেই সাধ্যসংশয় হইয়াছিল। সেই যে অনুমিতি দুইটী, তন্মধ্যে প্রথমটী এই—

(১) অয়ং ঘটঃ এতদ্ঘটজন্যঃ ... (প্রতিজ্ঞা)
এতদ্ঘটানধিকরণক্ষণোত্তরবর্ত্তিত্বাৎ .. (হেতু)

এবং দ্বিতীয়টী এই—

(২) অয়ং ঘটঃ এতদ্ঘটজন্যত্বাভাববান্, (প্রতিজ্ঞা)
এতদ্ঘটানধিকরণক্ষণোত্তরবর্ত্তিত্বাৎ ... (হেতু)

ইহাদের মধ্যে প্রথম অনুমানটী অসদ্ অনুমান এবং দ্বিতীয়টী সদ্ অনুমান। আর প্রথমটী উক্ত সংশয়ের বিধিকোটিক অনুমান এবং দ্বিতীয়টী সেই সংশয়ের নিষেধকোটিক অনুমান। প্রথম অনুমানে এই ঘটটী "ঘটজন্য" বলায় এই ঘটটী নিজ হইতে ভিন্ন হইয়া যাইতেছে, সুতরাং ব্যাঘাত ঘটিতেছে। উক্ত তর্ক তাহাই প্রদর্শন করিতেছে। আর দ্বিতীয় অনুমানে সাধ্য ও হেতুর মধ্যে ব্যভিচারসংশয়ের নিবৃত্তি করিতেছে। অবশ্য এখানে যে সংশয় হইতেছে, তাহাও হেতুমত্তেই সাধ্যের সংশয়। সুতরাং, ইহাও এক প্রকার ব্যভিচারেরই সংশয় বলা যায়। উক্ত তর্কদ্বারা এই দ্বিতীয় অনুমানের ব্যভিচারশঙ্কা নিবৃত্ত হইয়া পক্ষে সাধ্যনিশ্চয় হইতেছে।

কিন্তু এই দ্বিতীয় অনুমানে উক্ত ব্যভিচারশঙ্কা নিবারণের জন্য কোন নিশ্চিত ব্যাপ্তিজ্ঞানদ্বারা তর্ক করা আবশ্যক হইল। এস্থলে ধরিয়া লওয়া গেল যে, সাধ্য "এতদ্ঘটজন্যত্বাভাবের" ব্যাপ্তি, হেতু "এতদ্ঘটানধিকরণক্ষণোত্তরবর্ত্তিত্বে" নিশ্চিত না থাকিলেও হেত্বভাব যে

"এতদ্‌ঘটানধিকরণক্ষণোত্তরবর্ত্তিত্বাভাব" তাহার ব্যাপ্তি, সাধ্যাভাব যে "এতদ্‌ঘটজন্যত্বাভাবাভাব" অর্থাৎ "এতদ্‌ঘটজন্যত্ব", তাহাতে নিশ্চিত আছে।

এস্থলে স্মরণ করিতে হইবে যে, হেতুটী যেমন সাধ্যের ব্যাপ্য হয়, এবং সাধ্যটী যেমন হেতুর ব্যাপক হয়, তদ্রূপ হেত্বভাবটী সাধ্যাভাবের ব্যাপক হয়, এবং সাধ্যাভাবটী হেত্বভাবের ব্যাপ্য হয়।

এখন সাধ্য ও হেতুর ব্যাপ্তিতে সংশয় হইলে, আর হেত্বভাব ও সাধ্যাভাবের ব্যাপ্তিতে নিশ্চয় থাকিলে যেমন সাধ্যাভাবকে আপাদক করিয়া এবং হেত্বভাবকে আপাদ্য করিয়া তর্ক করিলে অর্থাৎ "যদি অয়ং নির্বহ্নিঃ স্যাৎ, তর্হি নির্ধূমঃ স্যাৎ" এইরূপ বলিলে বহ্নিধূমের ব্যাপ্তিসংশয় নিবারিত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতস্থলেও তর্ক করিতে হইবে। অর্থাৎ "অয়ং ঘটঃ যদি এতদ্‌ঘটজন্যঃ স্যাৎ, তর্হি এতদ্‌ঘটানধিকরণক্ষণোত্তরবর্ত্তী ন স্যাৎ" এইরূপ বলিলে "এই ঘটটী এতদ্‌ঘটজন্য কি না" এরূপ সংশয় থাকিতে পারিবে না। অর্থাৎ দ্বিতীয় অনুমানের সাধ্য "এতদ্‌ঘটজন্যত্বাভাব" ও হেতু "এতদ্‌ঘটানধিকরণক্ষণোত্তরবর্ত্তিত্ব" ইহাদের ব্যাপ্তিমধ্যে আর সংশয় থাকিতে পারিবে না। সুতরাং উক্ত তর্কদ্বারা এই দ্বিতীয় অনুমানে ব্যভিচারশঙ্কার নিবৃত্তিদ্বারা পক্ষে সাধ্যনিশ্চয়-সহকারে তাহার নির্দ্দোষতা প্রমাণিত করা হইল।

এখন এই তর্কমধ্যে যে দোষ হইতেছে, তাহাকে আত্মাশ্রয় দোষ বলা হইয়া থাকে। কারণ, সাধ্য যে "এতদ্‌ঘটজন্যত্ব" বা "এতদ্‌ঘট-জন্যত্বাভাব" তাহার "জন্যত্ব" অংশটী তাহারই অপর অংশ যে "এতদ্‌ঘট" তাহাকেই অপেক্ষা করিতেছে, আর সেই "এতদ্‌ঘট"ই পক্ষ হইতেছে। এজন্য সাধ্যটী পক্ষরূপ নিজেকেই অপেক্ষা করিয়া সিদ্ধ হইতেছে। আর এতাদৃশ স্বাপেক্ষিতকে অবলম্বন করিয়া এই তর্কটী হইতেছে বলিয়া ইহা আত্মাশ্রয় তর্ক হইল। এই আত্মাশ্রয়টী দোষ; কারণ, নিজে কখন

নিজ হইতে উৎপন্ন হয় না, যেহেতু কার্য্য ও কারণ ভিন্নই হয়। আর এই দোষ নিবারণ করিবার জন্য বলা হইল—"এই ঘট যদি এই ঘট-জন্য হয়, তাহা হইলে তাহা তাহার অনধিকরণক্ষণের উত্তরবর্ত্তী হয় না"। অতএব তাহার ঘটানধিকরণক্ষণোত্তরত্ব রক্ষা করিতে গেলে তাহাকে আর "ঘটজন্য" বলা গেল না। সুতরাং সিদ্ধ হইল "এই ঘট এই ঘটজন্য নহে"। অর্থাৎ "এই ঘট এই ঘটজন্য" এই প্রথম অসদনুমানে বাধাদি দোষ সত্ত্বেও তাহাকে যে নির্দ্দোষ বলিয়া সংশয় হইয়াছিল, তাহা জন্যত্বের ব্যাপক যে জন্যানধিকরণক্ষণোত্তরবর্ত্তিত্ব, তাহার দ্বারা নিবারিত হইল। তদ্রূপ "এই ঘট ঘটজন্য নহে" এই দ্বিতীয় সদনুমানে যে ব্যভিচারসংশয় হইয়াছিল, তাহাও তাহারই দ্বারা নিবারিত হইল। কারণ, এই ঘটের ঘটজন্যত্বে সংশয় থাকিলেও এই ঘটের এতদ্‌ঘটানধিকরণক্ষণোত্তরবর্ত্তিত্বে সংশয় নাই। এস্থলে ব্যাপ্যা-রোপদ্বারা ব্যাপকারোপ হওয়ায়, পক্ষে আপাদ্যাভাবের নিশ্চয় এবং সাধ্যের সহিত আপাদ্যাভাবের ব্যাপ্তি থাকা আবশ্যক বুঝিতে হইবে।

স্থিতিগত আত্মাশ্রয়ের দৃষ্টান্ত, যথা—

"যদি অয়ং ঘটঃ এতদ্‌ঘটবৃত্তিঃ স্যাৎ, (আপাদক)
তর্হি এতদ্‌ঘটব্যাপ্যঃ ন স্যাৎ" .. (আপাদ্য)

অর্থাৎ এই ঘট যদি এই ঘটবৃত্তি হয়, অর্থাৎ এই ঘটে থাকে, তবে এই ঘটের ব্যাপ্য হয় না। এস্থলে আপাদক বা ব্যাপ্য "এতদ্‌ঘটবৃত্তিত্ব" এবং আপাদ্য বা ব্যাপক "এতদ্‌ঘটব্যাপ্যত্বাভাব"। অবশিষ্ট কথা উৎপত্তিগত আত্মাশ্রয়ের ন্যায় বুঝিতে হইবে।

জ্ঞপ্তিগত আত্মাশ্রয়ের দৃষ্টান্ত, যথা—

"যদি অয়ং ঘটঃ এতদ্‌ঘটজ্ঞানাভিন্নঃ স্যাৎ ... (আপাদক)
তর্হি জ্ঞানসামগ্রীজন্যঃ স্যাৎ" অথবা .. (আপাদ্য)
"তর্হি এতদ্‌ঘটভিন্নঃ স্যাৎ" ... (আপাদ্য)

এস্থলে তর্কের সাধ্যাঙ্গ অংশটী প্রযুক্ত হইল। এইরূপ আরোপ অনিষ্ট-প্রসঙ্গ, কারণ "এই ঘট" কখন "এই ঘট" হইতে ভিন্ন হয় না। ভিন্ন বলিলে প্রত্যক্ষবাধ হয়। যাহা হউক, ইহার মূলে যে সংশয় হইয়াছিল, তাহার মূলে যে বিধিকোটিক ও নিষেধকোটিক—অনুমান দুইটী ছিল, তাহার মধ্যে প্রথমটী এই—

(১) অয়ং ঘটঃ এতদ্ঘটভিন্নভিন্নঃ (প্রতিজ্ঞা)
এতদ্ঘটত্বাৎ বা এতদ্ভিন্নত্বাভাবাৎ (হেতু)

ইহা হইল উক্ত সংশয়ের বিধিকোটিক অনুমান।

ইহার সাধ্য হইল—"এতদ্ঘটভিন্নভিন্নত্ব" এবং হেতু হইল—"এতদ্ঘটত্ব" বা "এতদ্ঘটভিন্নত্বাভাব।" এখানে সাধ্যটী পক্ষ "এই ঘটে" থাকে না, তথাপি "থাকে কি না" এই বাধসংশয় হওয়ায় উক্ত তর্কটী তাহা নিরাকরণ করিল। কারণ, এই ঘটকে এই ঘটভিন্নভিন্ন বলিলে এই ঘটটী এই ঘট হইতে ভিন্ন বস্তু হইয়া যায়। তাহা অনভীষ্ট, কারণ, প্রত্যক্ষবাধিত, আর তাহা জানাই আছে।

আর দ্বিতীয় অনুমানটী এই—

(২) অয়ং ঘটঃ এতদ্ঘটভিন্নভিন্নত্বাভাববান্ (প্রতিজ্ঞা)
এতদ্ঘটত্বাৎ বা এতদ্ঘটভিন্নত্বাভাবাৎ (হেতু)

ইহা হইল উক্ত সংশয়ের নিষেধকোটিক অনুমান।

না থাকায় হেত্বভাবের ব্যাপ্য যে সাধ্যাভাব তাহা আর পক্ষে থাকিল না, অর্থাৎ সাধ্য "এতদ্ঘটজন্যজন্যত্বাভাব" পক্ষ "এই ঘটে" থাকিল। সুতরাং উক্ত প্রকার তর্কদ্বারা উক্ত ব্যভিচারসংশয় নিবৃত্ত হইল।

এখানে উক্ত তর্কমধ্যে যে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইতেছে, তাহা এই—এখানে মূল প্রথম ও দ্বিতীয় অনুমানের সাধ্যদ্বয় "এতদ্ঘটজন্যজন্যত্ব" এবং "এতদ্ঘটজন্যজন্যত্বাভাব"। ইহারা তাহাদের অংশবিশেষ "এতদ্ঘট" সিদ্ধ হইলে সিদ্ধ হয়, এবং সেই "এতদ্ঘট"টী আবার "এতদ্ঘটজন্যজন্যত্ব" সিদ্ধ হইলে সিদ্ধ হয়। কারণ, এই ঘটকে "এই ঘটজন্যজন্য" বলা হইতেছে। এই ঘটটীই এখানে পক্ষ এবং ইহাই আবার সাধ্যের অংশ, ইহাই "খ"পদ বাচ্য। সুতরাং "খ"কে যাহা অপেক্ষা করিতেছে, তাহাকেই আবার "খ" অপেক্ষা করিল। অতএব এস্থলে "ক" "খ"কে অপেক্ষা করে এবং "খ" "ক"কে অপেক্ষা করে—এই জাতীয় সম্বন্ধী "এই ঘট" এবং "এই ঘটজন্যজন্যত্বের" মধ্যে হওয়ায় অন্যোন্যাশ্রয় হইল। আর এই অন্যোন্যাশ্রয়টী দোষ হওয়ায় এই ঘটটী আর "এতদ্ঘটজন্যজন্য" হইল না। আর সেই দোষটী "এতদ্ঘটভেদ"রূপ আপত্তির দ্বারা প্রদর্শিত হইল। আত্মাশ্রয় মধ্যে "ক" "ক"কেই অপেক্ষা করে, আর ইহাতে ক "খ"কে এবং খ "ক"কে অপেক্ষা করে, ইহাই প্রভেদ।

জ্ঞপ্তি ও স্থিতিবিষয়ক উদাহরণের জন্য উক্ত দৃষ্টান্তমধ্যে জ্ঞানবোধক জ্ঞানাদি শব্দ এবং স্থিতিবোধক বৃত্তি প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। যথা, জ্ঞপ্তির জন্য—

"অয়ং ঘটঃ যদি এতদ্ঘটজ্ঞানজন্যজ্ঞানবিষয়ঃ স্যাৎ ... (আপাদক)
তর্হি এতদ্ঘটভিন্নঃ স্যাৎ" ... (আপাদ্য)

অথবা—

এতদ্ঘটজ্ঞানং যদি এতদ্ঘটজ্ঞানজন্যজ্ঞানবিষয়ঃ স্যাৎ ... (আপাদক)
তর্হি এতদ্ঘটজ্ঞানভিন্নং স্যাৎ। ... (আপাদ্য)

এবং স্থিতির জন্য—

"অয়ং ঘটঃ যদি এতদ্‌ঘটবৃত্তিঘটবৃত্তিঃ স্যাৎ (আপাদক)

তর্হি ঘটভিন্নঃ স্যাৎ" (আপাদ্য)

এইরূপ বলিতে হইবে।

৩। চক্রকের পরিচয়।

স্বাপেক্ষণীয়াপেক্ষিতসাপেক্ষত্বনিবন্ধন অনিষ্টপ্রসঙ্গই চক্রক নামক তর্ক। অর্থাৎ "ক" যদি "খ"কে অপেক্ষা করে, এবং "খ" যদি "গ"কে অপেক্ষা করে এবং "গ" যদি আবার "ক"কে অপেক্ষা করে, অথবা এইরূপ আরও অধিক অপেক্ষার পর যদি শেষে সেই মূল "ক"কে অপেক্ষা করে, তবে চক্রক তর্ক হয়। ইহাও উৎপত্তি, স্থিতি ও জ্ঞপ্তি ভেদে ত্রিবিধ। এস্থলে জ্ঞপ্তিগত উদাহরণের জন্য উক্ত অন্যোন্যাশ্রয়ের দৃষ্টান্তের আপাদকমধ্যে আর একটি জন্যপদার্থের নিবেশ করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। যেমন উৎপত্তিগত চক্রক তর্কের দৃষ্টান্ত—

"অয়ং ঘটঃ যদি এতদ্‌ঘটজন্যজন্যজন্যঃ স্যাৎ (আপাদক)

তর্হি এতদ্‌ঘটভিন্নঃ স্যাৎ" (আপাদ্য)

অর্থাৎ এই ঘট যদি এই ঘটজন্য যে বস্ত, সেই বস্তুজন্য আবার যে বস্ত সেই বস্তুজন্য হয়, তবে এতদ্‌ঘটভিন্ন হয়।

এস্থলে প্রথম স্যাদন্তভাগ আপাদক বা ব্যাপ্য এবং শেষ স্যাদন্তভাগ আপাদ্য বা ব্যাপক বুঝিতে হইবে। আর তজ্জন্য ব্যাপ্যারোপদ্বারা ব্যাপকারোপরূপ তর্কের সামান্যলক্ষণটী যাইবে। সুতরাং পূর্ব্বের ন্যায় উক্ত তর্কের মূল যে সংশয়, তাহার মূল যে বিধিকোটিক ও নিষেধ-কোটিক অনুমান দুইটী, তাহার মধ্যে প্রথমটী হইতেছে—

(১) অয়ং ঘটঃ এতদ্‌ঘটজন্যজন্যজন্যঃ — (প্রতিজ্ঞা)

এতদ্‌ঘটভিন্নত্বাভাবাৎ বা এতদ্‌ঘটত্বাৎ— (হেতু)

ইহা উক্ত সংশয়ের বিধিকোটিক অনুমান। উক্ত তর্কদ্বারা ইহাতে

পূর্ব্ববৎ বাধাভাবশঙ্কার বারণ হয়, অর্থাৎ পক্ষে যে সাধ্য থাকে না তাহার নিশ্চয় হয়। আর দ্বিতীয় অনুমানটী হইতেছে—

(২) অয়ং ঘটঃ এতদ্‌ঘটজন্যজন্যজন্যত্বাভাববান্ ... (প্রতিজ্ঞা)

এতদ্‌ঘটভিন্নত্বাভাবাৎ বা এতদ্‌ঘটত্বাৎ ... (হেতু)

ইহা উক্ত সংশয়ের নিষেধকোটিক সদনুমান। এস্থলে ব্যাপ্তি থাকিলেও উক্ত তর্কদ্বারা ইহাতে পূর্ব্ববৎ ব্যাপ্তির ব্যভিচারশঙ্কা নিবৃত্ত হয়, আর তাহার ফলে পক্ষে সাধ্যনির্ণয় হয়।

এস্থলে প্রথম অনুমানের সাধ্য হইল—"এতদ্‌ঘটজন্যজন্যজন্যত্ব" এবং দ্বিতীয় অনুমানের সাধ্য হইল—"এতদ্‌ঘটজন্যজন্যজন্যত্বাভাব"। এস্থলে "ক" হইতেছে সাধ্যাংশ "এতদ্‌ঘট"; ইহাই আবার পক্ষ, এবং "খ" হইতেছে তদ্‌ঘটিত সাধ্যাংশ "এতদ্‌ঘটজন্যত্ব" এবং "গ" হইতেছে তদ্‌ঘটিত সাধ্য "এতদ্‌ঘটজন্যজন্যজন্যত্ব" সুতরাং সাধ্য "গ"টী সিদ্ধ হয়, তদংশ "খ" সিদ্ধ হইলে এবং "খ" সিদ্ধ হয়, তদংশ "ক" সিদ্ধ হইলে, এবং সেই "ক" সিদ্ধ হয়, সাধ্য "গ" সিদ্ধ হইলে। কারণ, "ক" "এতদ্‌ঘট"কে "গ" অর্থাৎ তজ্জন্যজন্যজন্যই বলা হইতেছে। অতএব "খ"রূপ যে এতদ্‌ঘট, অর্থাৎ "ক", তাহাকে যাহা অপেক্ষা করে অর্থাৎ "খ", তাহাকে যাহা অপেক্ষা করে অর্থাৎ "গ", তাহার সাপেক্ষত্ব এতদ্‌ঘট "ক"তে থাকায় "স্বাপেক্ষণীয়াপেক্ষিতসাপেক্ষত্ব" হইল, আর তন্নিবন্ধন যে অনিষ্টপ্রসঙ্গ অর্থাৎ এই ঘটে যে এই ঘটভেদ, তাহা উপস্থিত হইল। এজন্য এস্থলে চক্রক তর্ক হইল। জ্ঞপ্তি ও স্থিতির উদাহরণ জ্ঞপ্তি ও স্থিতিবোধক শব্দদ্বারা কল্পনা করিয়া লইতে হইবে।

৪। অনবস্থার পরিচয়।

অব্যবস্থিত পরম্পরায় আরোপাধীন অনিষ্টপ্রসঙ্গের নাম অনবস্থা তর্ক। অর্থাৎ "ক" যদি "খ"কে অপেক্ষা করে এবং "খ" যদি "গ"কে অপেক্ষা করে এবং "গ" যদি "ঘ"কে অপেক্ষা করে—এইরূপে

অপেক্ষা করার আর শেষ না থাকে, অর্থাৎ পরবর্ত্তী তৎপরবর্ত্তীকে ক্রমাগত অপেক্ষাই করিতে থাকে, কোনরূপে কোথাও বিশ্রাম না থাকে, তবে অনবস্থা তর্ক হয়। ইহাও উৎপত্তি স্থিতি ও জ্ঞপ্তিভেদে ত্রিবিধ হয়। উৎপত্তিগত দৃষ্টান্তের জন্য বলিতে পারা যায়—

"ঘটত্বং যদি ঘটজন্যত্বব্যাপ্যং স্যাৎ, .. (আপাদক)
তর্হি কপালসমবেতত্বব্যাপ্যং ন স্যাৎ" (আপাদ্য)

অর্থাৎ "ঘটত্ব যদি ঘটজন্যত্বের ব্যাপ্য হয়, সুতরাং ঘটত্বটী ব্যাপ্য এবং ঘটজন্যত্বটী ব্যাপক হয়, অর্থাৎ যেখানে যেখানে ঘটত্ব সেখানেই যদি ঘটজন্য যে (ঘটরূপাদি সেই ঘটরূপাদিনিষ্ঠ) "ঘটজন্যত্ব" ধর্ম্মটী থাকে বলা হয়, তবে ঘটত্বটী কপালসমবেতত্বের ব্যাপ্য হয় না। অর্থাৎ যেখানে যেখানে ঘটত্ব, সেই স্থানেই কপালসমবেতত্ব থাকে—এরূপ আর বলা যায় না। বস্তুতঃ, ঘটত্ব, ঘটরূপাদি এবং কপালসমবেতত্ব সকলই ঘটে থাকে। এস্থলে "ঘটজন্যত্বব্যাপ্যত্বটী" ব্যাপ্য বা আপাদক এবং "কপাল-সমবেতত্বব্যাপ্যত্বাভাব"টী ব্যাপক বা আপাদ্য। সুতরাং "ব্যাপ্যারোপ-দ্বারা ব্যাপকারোপই তর্ক"—তর্কের এই সামান্যলক্ষণটী প্রযুক্ত হইল। এখন ঘটত্বের ঘটজন্যত্বব্যাপ্যত্ববিষয়ে সংশয় হওয়ায় মূল যে অনুমান দুইটী হইয়াছিল, তাহা এই—

(১) ঘটত্বং ঘটজন্যত্বব্যাপ্যম্ (প্রতিজ্ঞা)
কপালসমবেতত্বব্যাপ্যত্বাৎ (হেতু)

ইহা উক্ত সংশয়ের বিধিকোটিক অনুমান। কারণ, সাধ্য "ঘট-জন্যত্বব্যাপ্যত্ব"টী পক্ষ "ঘটত্বে" থাকিতে পারে না। আর তজ্জন্য বাধাশঙ্কা হয়, তাহা উক্ত তর্কদ্বারা নিবারিত হয়। আর দ্বিতীয় অনুমানটী—

(২) ঘটত্বং ঘটজন্যত্বব্যাপ্যত্বাভাববৎ .. (প্রতিজ্ঞা)
কপালসমবেতত্বব্যাপ্যত্বাৎ ... (হেতু)

ইহা উক্ত সংশয়ের নিষেধকোটিক সদনুমান। কারণ, ঘটজন্যত্ব-ব্যাপ্যত্ব ঘটত্বে থাকে না। আর তজ্জন্য উক্ত তর্কদ্বারা এই অনুমানে ব্যভিচারশঙ্কার নিবৃত্তি হইয়া পক্ষে সাধ্য নিশ্চয় হয়।

এখানে প্রথম অনুমানের সাধ্য "ঘটজন্যত্বব্যাপ্যত্ব" এবং দ্বিতীয় অনুমানের সাধ্য "ঘটজন্যত্বব্যাপ্যত্বাভাব"। এস্থলে সাধ্য বা সাধ্যাংশ "ঘটজন্যত্বব্যাপ্যত্ব" সিদ্ধ করিবার জন্য কারণরূপ অন্য ঘটের প্রয়োজন হইতেছে, সেই অন্য ঘটে যে ঘটত্ব আছে, তাহার আবার ঘটজন্যত্ব-ব্যাপ্যত্ব সিদ্ধ করিবার জন্য অপর ঘটের প্রয়োজন হইতেছে, সেই অপর ঘটে সেই ঘটত্ব আছে, তাহার আবার ঘটজন্যত্বব্যাপ্যত্ব সিদ্ধ করিবার জন্য আবার অপর একটী ঘটের প্রয়োজন হইতেছে। এইরূপে যতই ঘট গ্রহণ করা যাইবে, ততই তাহার ধর্ম ঘটত্বের ঘটজন্যত্বব্যাপ্যত্ব সিদ্ধ করা প্রয়োজন হইতে থাকিবে। আর তাহার ফলে ঘটত্বে ঘটজন্যত্ব-ব্যাপ্যত্বটী সিদ্ধই হইবে না। এজন্য এই তর্ককে অনবস্থা তর্ক বলা হইয়া থাকে। অর্থাৎ যেখানে যেখানে ঘটত্ব সেখানে ঘটজন্যত্বব্যাপ্যত্ব সিদ্ধ করিতে হইলে অন্য ঘটের প্রয়োজন হইবে, তাহাতে ঘটজন্যত্ব-ব্যাপ্যত্ব সিদ্ধ করিতে হইলে আবার অন্য ঘটের প্রয়োজন হইবে ইত্যাদি। এস্থলে কপালসমবেতত্বব্যাপ্যত্ব ঘটত্বে থাকায়, আর তাহার অভাবের ব্যাপ্য "ঘটজন্যত্বব্যাপ্যত্ব" হওয়ায় ঘটত্ব আর ঘটজন্যত্বব্যাপ্য হইল না। অতএব প্রথম অসদনুমানটী আর সিদ্ধ হয় না, এবং দ্বিতীয় সদনুমানের যে ব্যভিচারশঙ্কা, তাহা নিবৃত্ত হইয়া পক্ষে সাধ্যনিশ্চয় হইয়া অনুমানের নির্দ্দোষতা সিদ্ধ হইল।

অর্থাৎ ঘটত্ব যদি যাবদ্ ঘটের যে হেতু, তাহাতে থাকে, এমন হয়, তবে ঘটজন্য যে সব বস্তু, তাহাতে থাকিতে পারে না। এস্থলে "ঘটত্ব" যাবদ্ ঘটের হেতুতে থাকিলে সেই হেতুও ঘটই হইবে। কারণ, ঘটত্ব ঘটেই থাকে, আর সেই হেতুভূত ঘট যাবদ্ ঘটের পূর্ব্বেও থাকে বলিতে হইবে। যেহেতু পূর্ব্বক্ষণবৃত্তি না হইলে কারণই হয় না। কিন্তু সেই ঘটে ঘটত্ব থাকায় তাহাও যাবদ্ ঘটের অন্তর্গত হয়, আর তাহার হেতুর জন্য আবার তাহার পূর্ব্বক্ষণবৃত্তি অন্য ঘটের প্রয়োজন। কিন্তু তাহাও যাবদ্ ঘটের অন্তর্গতই হয়, আর তজ্জন্য তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অপর ঘট থাকা প্রয়োজন হয়। এইরূপে যতই অগ্রসর হওয়া যাইবে, ইহার শেষ আর আসিবে না। সুতরাং অনবস্থাই ঘটিবে। আর ইহাই ঘটজন্যবৃত্তিত্বরূপ হেতুর দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। আর তাহারই নিবারণোদ্দেশ্যে এই তর্ক। অবশিষ্ট কথা পূর্ব্ববৎ।

প্রামাণিক অনবস্থাদি তর্ক।

এই অনবস্থাদি তর্কগুলি প্রামাণিকও হইতে পারে, যখন আপাদ্য ও আপাদক উভয়ই অনাদিবস্তু হয়। যেমন বীজ ও অঙ্কুর। এই বীজ ও অঙ্কুর উভয়ই অনাদি বলিয়া এস্থলে অনবস্থাদি দোষই হয় না। আপাদ্য আপাদকের একতর সাদি হইলেই ইহারা দোষের মধ্যে গণ্য হয়।

৫। প্রমাণবাধিতার্থপ্রসঙ্গ।

উক্ত চারি প্রকার তর্ক ভিন্ন যে তর্ক, তাহাই "তদন্যবাধিতার্থপ্রসঙ্গ" বা "প্রমাণবাধিতার্থপ্রসঙ্গ" নামক তর্ক। অর্থাৎ প্রমাণদ্বারা বাধিত বিষয়ের যে প্রসঙ্গ, অর্থাৎ আপত্তি, তাহাই প্রমাণবাধিতার্থপ্রসঙ্গ নামক তর্ক। ইহা দ্বিবিধ, যথা—ব্যাপ্তিগ্রাহক এবং বিষয়পরিশোধক। তন্মধ্যে ব্যাপ্তির গ্রাহক তর্ক যথা—

ধূমঃ যদি বহ্নিব্যভিচারী স্যাৎ, .. (আপাদক)
তদা বহ্নিজন্যঃ ন স্যাৎ। ... (আপাদ্য)

অর্থাৎ ধূম যদি বহ্নির ব্যভিচারী হয়, অর্থাৎ বহ্নি যেখানে থাকে না সেখানে থাকে—এরূপ হয়, তাহা হইলে বহ্নিজন্য হয় না। এখানে "বহ্নিব্যভিচার" আপাদক বা ব্যাপ্য, এবং "বহ্নিজন্যত্বাভাব" ব্যাপক বা আপাদ্য। ইহার ব্যাপ্তিতে যে মূল অনুমান ছিল, তাহা এই—

পর্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ,

এখন উক্তরূপ তর্ক হইলে ধূমে বহ্নির ব্যভিচারশঙ্কা নিবৃত্তি হইয়া ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তি গৃহীত হয়। এজন্য ইহা ব্যাপ্তির গ্রাহক তর্ক বলা হয়।

বিষয়পরিশোধক তর্ক, যথা—

পর্বতঃ যদি নির্বহ্নিঃ স্যাৎ .. (আপাদক)

তর্হি নির্ধূমঃ স্যাৎ .. (আপাদ্য)

অর্থাৎ পর্বত যদি বহ্যভাববান্ হয়, তবে ধূমাভাববান্ হয়। এস্থলে "নির্বহ্নিত্ব" ব্যাপ্য বা আপাদক, এবং "নির্ধূমত্ব" ব্যাপক বা আপাদ্য। এস্থলে এই তর্কটী, উক্ত ব্যাপ্তিগ্রাহক তর্কদ্বারা ধূম ও বহ্নির ব্যভিচারশঙ্কা নিবৃত্ত হইলে, বিষয় যে বহ্ন্যাদি, পক্ষ পর্বতে, তাহার নিশ্চায়করূপ হয় বলিয়া ইহাকে বিষয়ের পরিশোধক তর্ক বলা হয়।

প্রথম স্থলে ব্যভিচার শঙ্কা নিরাস করিয়া ব্যাপ্তির জ্ঞান হইতেছে, এবং দ্বিতীয় স্থলে ব্যাপ্তির জ্ঞান আছে, কেবল এই তর্কদ্বারা পক্ষে সাধ্যসিদ্ধ করা হইতেছে—উভয়ের মধ্যে ইহাই প্রভেদ।

পাঁচ প্রকার তর্কের মধ্যে পরস্পরের প্রভেদ।

এখন তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—আত্মাশ্রয়, অন্যোন্যাশ্রয় ও চক্রক নামক তর্কগুলিতে, সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় নিজেকে অপেক্ষা করার নিয়ম আছে। আর তর্কের মধ্যে যে ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধ আছে, তাহার মূল অনুমানের বিধিকোটীতে মূল অনুমানের সাধ্যাভাবকে ব্যাপ্য ও হেত্বভাবকে ব্যাপক করিয়া নহে, কিন্তু তাহা নিষেধকোটিতেই প্রয়োজন হয়। এই বিধিকোটিতে বাধশঙ্কা নিরস্ত হয়, আর নিষেধ-

কোটিতে বিষয়ের পরিশোধন হয়। ইহা প্রমাণবাধিতার্থপ্রসঙ্গ নামক তর্কের বিষয়পরিশোধক তর্কের অনুরূপ। কিন্তু বিধিকোটিক অনুমানটী উভয়ের অনুরূপ নহে, যেহেতু তাহাতে সাধ্য ও হেত্বভাবাভাবমাত্র অবলম্বিত হয়। সুতরাং প্রমাণবাধিতার্থপ্রসঙ্গের ন্যায় সর্বাংশে সমান নহে। অনবস্থামধ্যে আত্মাশ্রয়াদি তিনটীর ন্যায় 'অপেক্ষা করা' ভাবটী আছে, কিন্তু সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় নিজের অপেক্ষা থাকে না। ইহাতেও বিধিকোটিতে বাধশঙ্কার নিরাস হয়, এবং নিষেধকোটিতে বিষয়পরিশোধন হয়। এজন্য ইহাও প্রমাণবাধিতার্থপ্রসঙ্গের মত ঠিক নহে। ইহাই হইল পাঁচটী তর্কের সাম্য ও বৈষম্য।

মতান্তরে তর্কের বিভাগ।

তর্কের উক্ত বিভাগ ভিন্ন অন্যরূপ বিভাগও আছে। প্রাচীন নৈয়ায়িকমতে তর্ক ১১ প্রকার, যথা—১। ব্যাঘাত, ২। আত্মাশ্রয়, ৩। ইতরেতরাশ্রয়, ৪। চক্রক, ৫। অনবস্থা, ৬। প্রতিবন্দী, ৭। কল্পনালাঘব, ৮। কল্পনাগৌরব, ৯। উৎসর্গ, ১০। অপবাদ, এবং ১১। বৈয়াত্য।

ভট্টমীমাংসকমতে অর্থাৎ মানমেয়োদয়ানুসারে ইহা কিন্তু ছয় প্রকার, যথা—

১। আত্মাশ্রয়, ২। অন্যোন্যাশ্রয়, ৩। চক্রক, ৪। অনবস্থিতি, ৫। গৌরব এবং ৬। লাঘব। আত্মাশ্রয়াদি চারিটীর লক্ষণ ন্যায়মতানুরূপ। কেবল গৌরব বলিতে কল্পনাগৌরব এবং লাঘব বলিতে কল্পনালাঘব বুঝায়। গৌরবের দোষটী হয় প্রসঙ্গরূপ, এবং লাঘবে সাধ্যে গুণকথনমাত্র প্রসক্ততা থাকে।

এই তর্ক আবার অনুকূল ও প্রতিকূলভেদে দ্বিবিধও বলা হয় যথা—

যেখানে সাধ্যাভাবের অনুবাদ করিয়া সাধ্যে দোষ বা গুণ প্রদর্শিত হয়, সেখানে তাহা সাধ্যসিদ্ধির অনুগ্রাহক হয় বলিয়া তাহাকে অনুকূলতর্ক বলা হয়। আর যেখানে সাধ্যেরই অনুবাদ করিয়া অনিষ্টের প্রসঞ্জন করা হয়, সেখানে তাহা সাধ্যসিদ্ধিতে বাধা ঘটায় বলিয়া তাহাকে প্রতিকূলতর্ক বলা হয়।

মতান্তরে এই ছয়রূপ তর্কমধ্যে আবার কিঞ্চিৎ অন্যথাবৃত্তি হয়, যথা সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর উপর বিদ্বানের টীকায়—

১। আত্মাশ্রয়, ২। অন্যোন্যাশ্রয়, ৩। চক্রক ৪। অনবস্থা, ৫। ব্যাঘাত এবং

৯। প্রতিবন্দী। ইহাদের মধ্যে ব্যাঘাত বলিতে "বিরুদ্ধসমুচ্চয়" এবং প্রতিবন্দী বলিতে "চোদ্যপরিহারসাম্য" বলা হয়।

উক্ত একাদশ প্রকার তর্কের পরিচয় তত্ত্বজ্ঞানামৃত নামক গ্রন্থে যেরূপ আছে, তাহা এই—

১। ব্যাঘাত তর্কের পরিচয়।

"বিরুদ্ধসমুচ্চয়ঃ ব্যাঘাতঃ" অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধধর্মের এক অধিকরণে সমুচ্চয়কে ব্যাঘাত বলে। যেমন—

"বিবাদাধ্যাসিতং জগৎ প্রযত্নজন্যম্" ... (প্রতিজ্ঞা)

"কার্য্যত্বাৎ" (হেতু)

"ঘটবৎ" (দৃষ্টান্ত)

অর্থাৎ বিবাদের বিষয়ভূত ক্ষিতি-অঙ্কুরাদি জগৎ কোন প্রযত্নদ্বারা জন্য, যেহেতু তাহা কার্য্যরূপ। যে যে কার্য্য হয়, সে সে প্রযত্নদ্বারাই 'জন্য' হয়, যেমন ঘট কার্য্যরূপ হওয়ায় কুলালের প্রযত্নদ্বারা 'জন্য', তদ্রূপ এই জগতও কার্য্যরূপ হওয়ায় কাহারও প্রযত্নদ্বারা অবশ্য 'জন্য' হইবে।

এস্থলে জীবের প্রযত্নকে সমস্তজগতের কারণ বলা সম্ভব নহে, সুতরাং উক্ত অনুমানে ঈশ্বরের প্রযত্নই সমস্তজগতের কারণ বলিয়া সিদ্ধ হয়। নবীনমতে স্বক্রিয়াবিরোধই ব্যাঘাত বলা হয়।

এখন যদি কেহ এ অনুমানে শঙ্কা করেন যে,—জগতে কার্য্যত্বরূপ হেতু থাকে থাকুক, কিন্তু প্রযত্নজন্যত্বরূপ সাধ্য নাই। এই প্রকার শঙ্কার নিবৃত্তি ব্যাঘাতরূপ তর্কদ্বারা হইয়া থাকে। এখানে হেতু কার্য্যত্ব এবং সাধ্যাভাব প্রযত্নজন্যত্বাভাব—এই দুই ধর্ম্ম পরস্পরবিরুদ্ধ। যেমন ঘট ও ঘটের প্রাগভাব, আর ঘট ও ঘটের প্রধ্বংস—এই দুইটী পরস্পরবিরুদ্ধ। এই সকল বিরুদ্ধ ধর্ম্মের এক বস্তুতে সমুচ্চয় বলিলে যেমন ব্যাঘাত দোষের প্রাপ্তি হয়, তদ্রূপ কার্য্যত্ব ও প্রযত্নজন্যত্বাভাব—এই দুই বিরুদ্ধ ধর্ম্মেরও এক বস্তুতে সমুচ্চয় বলিলে ব্যাঘাতের প্রাপ্তি হইবে।

২। আত্মাশ্রয়ের পরিচয়।

এখন যদি বাদী বলেন, ঘট ও ঘটের প্রাগভাব এই দুই একত্র থাকে না বটে, পরন্তু কার্য্যত্ব ও প্রযত্নজন্যত্বাভাব—এ দুয়ের একত্র সমুচ্চয় হইয়া থাকে। এরূপ বলিলে জিজ্ঞাস্য হইবে, ঘট ও ঘটের প্রাগভাব এই দুইটী বিরোধী ধর্ম্ম হইতে কার্য্যত্ব ও প্রযত্নজন্যত্বাভাবরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের, কোন বিশেষত্ব আছে কি না? যদি বলা হয়—"না", তাহা হইলে ঘট ও ঘটের প্রাগভাব এই দুইয়ের যেমন একত্রাবস্থিতি সম্ভব নহে, তদ্রূপ কার্য্যত্ব ও প্রযত্নজন্যত্বাভাব—এ দুয়েরও একত্র সমুচ্চয় হইবে না। আর যদি বলা হয়—তাহাদের মধ্যে বিশেষত্ব আছে, তাহা হইলে যে বিশেষত্বের বলে কার্য্যত্ব ও প্রযত্নজন্যত্বাভাব—এই দুই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একত্র অবস্থান হয়, সে বিশেষবিষয়ে সেই বিশেষই প্রমাণ, অথবা অন্য বিশেষ প্রমাণ? যদি সে বিশেষই প্রমাণ হয়, তাহা হইলে আত্মাশ্রয় হইবে। সেই আত্মাশ্রয়ের লক্ষণ, যথা—

"অব্যবধানেন স্বাপেক্ষণম্ আত্মাশ্রয়ঃ" অর্থাৎ ব্যবধান বিনা আপনাতে আপনারই অপেক্ষার নাম আত্মাশ্রয়। এস্থলে উক্ত বিশেষ আপনার বিষয়ে আপনিই প্রমাণ হওয়ায় আত্মাশ্রয় হইল। এই আত্মাশ্রয় (ক) নিজের অধিকরণে নিজের অপেক্ষা, (খ) নিজের জ্ঞানে নিজের অপেক্ষা, (গ) নিজের উৎপত্তিতে নিজের অপেক্ষা, (ঘ) নিজের স্থানিত্বে নিজের অপেক্ষা, (ঙ) নিজের উপমাতে নিজের অপেক্ষা— ইত্যাদি ভেদে নানা প্রকার। এই প্রকারে বক্ষ্যমাণ ইতরেতরাশ্রয় এবং চক্রিকা নামক তর্কও নানাবিধ বুঝিতে হইবে।

৩। অন্যোন্যাশ্রয়ের পরিচয়।

আর যদি বল, সেই বিশেষের প্রতি দ্বিতীয় বিশেষ প্রমাণ, তাহা হইলে উক্ত দ্বিতীয় বিশেষের প্রতি প্রমাণ কি? এখন সেই দ্বিতীয় বিশেষের প্রমাণ সেই দ্বিতীয় বিশেষই বলিলে অথবা প্রথম বিশেষ বলিলে প্রথম

পক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় আত্মাশ্রয় দোষ হয়, আর দ্বিতীয় পক্ষে অন্যোন্যাশ্রয় বা ইতরেতরাশ্রয় দোষের প্রাপ্তি হয়। ইহার লক্ষণ, যথা—

"দ্বয়োরন্যোন্যাপেক্ষণম্ ইতরেতরাশ্রয়ঃ" অর্থাৎ "উভয়ের মধ্যে যে পরস্পর অপেক্ষা, তাহার নাম ইতরেতরাশ্রয়, ইহারই নামান্তর অন্যোন্যাশ্রয়। যেমন প্রস্তাবিত প্রসঙ্গে প্রথম বিশেষের সিদ্ধির জন্য দ্বিতীয় বিশেষের অপেক্ষা হয়, এবং দ্বিতীয় বিশেষের সিদ্ধির জন্য প্রথম বিশেষের অপেক্ষা হয়।

৩। চক্রক তর্কের পরিচয়।

যদি বল, দ্বিতীয় বিশেষের প্রতি তৃতীয় বিশেষ প্রমাণ, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, উক্ত দ্বিতীয় বিশেষের জন্য তৃতীয় একটী বিশেষ প্রমাণ অথবা দ্বিতীয় বিশেষ প্রমাণ, অথবা প্রথম বিশেষ প্রমাণ? প্রথম পক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় আত্মাশ্রয় হয়, দ্বিতীয় পক্ষে ইতরেতরাশ্রয় হয়, আর তৃতীয় পক্ষে চক্রক তর্কের প্রাপ্তি হয়। চক্রকের লক্ষণ, যথা—

"পূর্ব্বস্য পূর্ব্বাপেক্ষিত-মধ্যমাপেক্ষিতোত্তরাপেক্ষিতত্বং চক্রিকা" অর্থাৎ পূর্ব্বের অপেক্ষিত যে মধ্যম, এই মধ্যমের অপেক্ষিত যে উত্তর, সেই উত্তরের যে পূর্ব্বের প্রতি অপেক্ষা হয়, তাহাকে চক্রিকা বলে। যেমন এই প্রসঙ্গে, প্রথম বিশেষের সিদ্ধির জন্য দ্বিতীয় বিশেষ অপেক্ষিত, আর দ্বিতীয় বিশেষের সিদ্ধির জন্য তৃতীয় বিশেষ অপেক্ষিত, এবং তৃতীয় বিশেষের সিদ্ধির জন্য প্রথম বিশেষ অপেক্ষিত হয় বলিয়া ইহাকে চক্রিকা বলে।

৪। অনবস্থা তর্কের পরিচয়।

যদি বল, তৃতীয় বিশেষের প্রতি চতুর্থ বিশেষ প্রমাণ, আর চতুর্থ বিশেষের প্রতি পঞ্চম বিশেষ প্রমাণ, এইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিশেষের প্রতি উত্তরোত্তর বিশেষ প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকার করিলে চক্রিকা দোষের আপত্তি পরিহৃত হয় বটে, কিন্তু অন্য দোষ ঘটে। কারণ, ইহা স্বীকার করিলে অনবস্থা নামক তর্ক উপস্থিত হয়। সেই অনবস্থার লক্ষণ, যথা—

"পূর্ব্বস্য উত্তরোত্তরাপেক্ষিতত্ত্বম্ অনবস্থা" অর্থাৎ পূর্ব্বের যে উত্তরোত্তর অপেক্ষিততা তাহার নাম অনবস্থা। যেমন প্রথম বিশেষের সিদ্ধির জন্য দ্বিতীয় বিশেষের অপেক্ষা, দ্বিতীয় বিশেষের সিদ্ধির জন্য তৃতীয় বিশেষের অপেক্ষা, তৃতীয় বিশেষের সিদ্ধির জন্য চতুর্থ বিশেষের অপেক্ষা, আর চতুর্থ বিশেষের সিদ্ধির জন্য পঞ্চম বিশেষের অপেক্ষা, এই প্রকারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিশেষের উত্তরোত্তর বিশেষের অপেক্ষা অঙ্গীকার করিলে অনবস্থা দোষের প্রসঙ্গ হয়।

৬। প্রতিবন্দীর পরিচয়।

যদি বলা হয়—পঞ্চম বিশেষ স্বতঃপ্রমাণ, সে আপনার সিদ্ধির জন্য অন্য বিশেষের অপেক্ষা করে না, অতএব অনবস্থা দোষের আপত্তি নাই, ইত্যাদি, তাহা হইলে এই শঙ্কার নিবৃত্তি প্রতিবন্দীরূপ তর্কদ্বারা করা যাইতে পারে। সেই প্রতিবন্দীর লক্ষণ, যথা—

"চোদ্যপরিহারয়োঃ সাম্যং প্রতিবন্দী" অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের পক্ষে শঙ্কাসমাধানের তুল্যতাকে প্রতিবন্দী বলে। যেমন বাদীর মতে পঞ্চম বিশেষের যেরূপ স্বতঃপ্রমাণতা হয়, তদ্রূপ প্রথম বিশেষেরও স্বতঃপ্রমাণতা সম্ভব। কারণ, নিয়ামকের অভাবের সামগ্রী উভয় পক্ষে তুল্য। যেস্থলে তুল্য সামগ্রী হয়, সেস্থলে কার্য্যও তুল্য হয়, যেমন তুল্যাবয়ববান্ তন্তুপ্রভৃতি কারণদ্বারা পটাদি কার্য্য তুল্য হইয়া থাকে।

আর যদি বাদী পঞ্চম বিশেষের স্বতঃপ্রমাণতা-বিষয়ে কোন পরিহার কল্পনা করেন, তাহা হইলে সেই পরিহারেরও পূর্ব্বোক্ত রীতিতে পঞ্চম বিশেষ ও প্রথম বিশেষ—এই উভয় বিশেষের তুল্যতাই হইবে। এইরূপে প্রদর্শিত রীত্যনুসারে উভয় পক্ষে শঙ্কা ও সমাধানের যে তুল্যতা, তাহাই প্রতিবন্দী নামক তর্ক।

৭। কল্পনালাঘব তর্কের পরিচয়।

যেমন পৃথিব্যাদি মহাভূত প্রভৃতি এই স্থূল পদার্থের এক জন কর্তা

সম্ভব নহে। যেহেতু কার্য্যমাত্রই নানাকারণজন্য হইয়া থাকে—এইরূপ, যদি আশঙ্কা করা যায়, তাহা হইলে এই আশঙ্কার নিবৃত্তি কল্পনালাঘবরূপ তর্কদ্বারা হইতে পারে। ইহার লক্ষণ, যথা—

"সমর্থাল্পকল্পনা কল্পনালাঘবম্" অর্থাৎ কার্য্য উৎপন্ন করিতে সমর্থ বস্তুর অল্পতার যে কল্পনা, তাহার নাম কল্পনালাঘব তর্ক। যেমন সর্ব্ব জগতের কর্ত্তৃরূপে যে ঈশ্বরকে কল্পনা করা হইয়াছে, তাঁহাকে 'এক' বলিয়া অঙ্গীকার করিলে কল্পনার লাঘবই হয়।

৮। কল্পনাগৌরব তর্কের পরিচয়।

আর কার্য্যের সিদ্ধি করিবার যোগ্য একটী সমর্থ বস্তুর বিদ্যমানতা-স্থলেও অনেক বস্তুর যে কল্পনা তাহাকে কল্পনাগৌরব তর্ক বলা হয়। ইহার লক্ষণ, যথা—

"সমর্থানল্পকল্পনা কল্পনাগৌরবম্" অর্থাৎ কার্য্য উৎপন্ন করিতে সমর্থ কারণের অল্পতার কল্পনা না করাকে কল্পনাগৌরব নামক তর্ক বলে। যেমন কোন একটী কন্যার এক সমর্থ বরের স্বীকারে তাহার বিবাহ সিদ্ধি হইলে, অনেক বরের কল্পনাতে কল্পনা-গৌরব হয়, তদ্রূপ এক ঈশ্বরদ্বারা সকল জগতের উৎপত্তির সিদ্ধি হইলে, অনেক ঈশ্বরের কল্পনা করিলে কল্পনাগৌরব নামক তর্কের প্রসক্তি হয়।

৯। উৎসর্গ তর্কের পরিচয়।

যেমন কুম্ভকারের শরীর না থাকিলে ঘটকার্য্য সিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ ঈশ্বর শরীররহিত হওয়ায় ঈশ্বরের যখন কর্ত্তৃত্বই সম্ভব নহে, তখন সকল জগতের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরের পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অর্থাৎ, কখনই সম্ভব নহে, এই আশঙ্কার নিবৃত্তি উৎসর্গাখ্য তর্কদ্বারা হইয়া থাকে। সেই উৎসর্গ তর্কের লক্ষণ, যথা—

"ভূয়োদর্শনম্ উৎসর্গঃ" অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ দর্শনের নাম উৎসর্গ। যেমন যেখানে যেখানে চেতনত্ব আছে, সেখানে সেখানে কর্ত্তৃত্ব আছে।

যেমন কুম্ভকার এবং তন্তুবায়াদিতে চেতনত্ব থাকে বলিয়া ঘটপটাদি কার্য্যের প্রতি তাঁহাদের কর্তৃত্বও থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বরেও চেতনত্ব ধর্ম্ম থাকায় তাঁহাতে জগৎবিষয়ক কর্তৃত্বের সম্ভাবনা স্বীকার করা যাইতে পারে। চেতনাহীন শরীর থাকিলেও কুম্ভকার বা তন্তুবায় ঘটপটাদি কার্য্য উৎপাদন করিতে পারে না। আর চেতনা যে, শরীর না থাকিলে থাকিতে পারে না, তাহাও বলা যায় না, যেহেতু চেতনা শরীরের বিশেষণ হওয়ায়, বিশেষণ যেমন বিশেষ্য হইতে পৃথক্ই হয়, তদ্রূপ পৃথক্ই হইবে। সুতরাং শরীর থাকিলে কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়—ইহা সঙ্গত কথা নহে, প্রত্যুত চেতনা থাকিলেই কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। অতএব ঈশ্বরই জগতের কর্ত্তা।

আর যদি কদাচিৎ ঈশ্বরে কর্তৃত্ব স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরের চেতনত্বও থাকিবে না। যেমন ঘটাদিতে কুম্ভকারের কর্তৃত্ব অসম্ভাবিত হইলে চেতনত্বও অস্বীকৃত হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরেও কর্তৃত্ব স্বীকার না করিলে, তাঁহাতে চেতনত্ব নাই—ইহাই মানিতে হইবে।

১০। অপবাদ তর্কের পরিচয়।

যদি বলা হয়, যেমন অস্মদাদি জীবগণের চেতনত্ব থাকায় কর্তৃত্ব নিশ্চিত আছে, তেমনই ঈশ্বরেরও চেতনত্ব থাকায় কর্তৃত্ব নিশ্চিত হওয়া উচিত, চেতনত্ব থাকায় কর্তৃত্বের সম্ভাবনামাত্র স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু যেহেতু কর্তৃত্ব নিশ্চিত নাই, সেই হেতু তাহা তাঁহাতে নাই। এতাদৃশবাদীর আশঙ্কা অপবাদরূপ তর্কদ্বারা নিবৃত্ত করা যাইতে পারে। সেই অপবাদের লক্ষণ, যথা—

"তত্তোৎসর্গস্য একদেশে বাধঃ অপবাদঃ" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত উৎসর্গের কোন এক দেশের বাধ হইলে তাহাকে অপবাদ বলা যায়। যেমন মুক্তাত্মাতে চেতনত্ব থাকিলেও কর্তৃত্ব নাই, কিন্তু কোন স্থানে চেতনত্ব থাকায় কর্তৃত্বের কদাচিৎ নিশ্চয় হইলে মুক্ত পুরুষদিগেরও চেতনত্ব

থাকায় কর্ত্তৃত্বের নিশ্চয় হওয়া উচিত; কিন্তু তাঁহাদের চেতনত্ব থাকিলেও কর্ত্তৃত্ব থাকে না। সুতরাং মুক্তপুরুষগণের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত উৎসর্গের এই অপবাদ, উক্ত অর্থের অর্থাৎ তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বের নিশ্চায়ক হয় না, যেমন প্রমেয়ত্বদ্বারা অনিত্যের নিশ্চয় হয় না। কথিত কারণে চেতনত্ব-দ্বারা ঈশ্বরে কর্ত্তৃত্বের সম্ভাবনামাত্রই হয়, কর্ত্তৃত্বের নিশ্চয় হয় না। সুতরাং ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব নিশ্চিত নাই বলিয়া কর্ত্তৃত্ব নাই—এরূপ বলা গেল না।

১১। বৈয়াত্য তর্কের পরিচয়।

যদি বাদী বলেন, ঈশ্বর-বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত অনুমান থাকে থাকুক, ঈশ্বরের অস্তিত্বসাধক প্রমাণ কি? কথিতপ্রকার আশঙ্কার উত্তর-প্রদানে অশক্ত হইয়া মৌন হইলে তাহাকে বৈয়াত্যরূপ তর্ক বলা হয়। ইহার লক্ষণ, যথা—

"অপ্রতিসমাধেয়প্রশ্নপরম্পরায়াং মৌনং বৈয়াত্যম্" অর্থাৎ সমাধান করিতে অশক্য এইরূপ বাদীর প্রশ্নের যে পরম্পরা, তাহা প্রাপ্ত হইলে যে মৌনভাব হয়, তাহাকে বৈয়াত্য বলে। যেস্থলে বাদীর প্রশ্নের উত্তরদান শক্য হয়, সেস্থলে উত্তর বলা হইয়া থাকে, আর যেস্থলে উত্তরদান শক্য নহে, সেস্থলে মৌনরূপ অনুত্তরই উত্তর হয়, ইহারই নাম "বৈয়াত্য"।

তর্কের সাতটী দোষ।

পূর্ব্বোক্ত তর্কে নিম্নলিখিত সপ্ত দূষণ হইয়া থাকে, যথা—১। আপাদ্যাসিদ্ধি, ২। আপাদকাসিদ্ধি, ৩। উভয়াসিদ্ধি, ৪। প্রশিথিল-মূলতা, ৫। মিথস্তর্কবিরোধ, ৬। ইষ্টাপত্তি, ৭। বিপর্য্যয়াপর্য্যবসান। এই সকলের লক্ষণ ও উদাহরণ তর্কনিরূপক গ্রন্থাদিতে বিস্তৃতরূপে আছে, গ্রন্থবৃদ্ধি "ভয়ে পরিত্যক্ত হইল"।

ইহাই হইল তর্কের পরিচয়। বিচারক্ষেত্রে এই তর্কের বিশেষ

প্রয়োজন। বস্তুতঃ বিচারক্ষেত্রে অনুমিতির যেরূপ প্রয়োজন হয় এইরূপ তর্কেরও তদ্রূপ প্রয়োজন হয় বুঝিতে হইবে।

ব্যাপ্তিগ্রহোপায়।

অনুমিতির পক্ষে ব্যাপ্তির জ্ঞানটী করণ। এই ব্যাপ্তির জ্ঞানই ব্যাপ্তিগ্রহ। গ্রহ শব্দের অর্থ জ্ঞান। ইহার উপায় অর্থাৎ যাহার দ্বারা এই জ্ঞান জন্মে, তাহা পুনঃ পুনঃ সহচারদর্শন। অর্থাৎ যাহার সঙ্গে যাহার ব্যাপ্তি আছে বুঝিতে হয়, তাহা তাহার সহচর অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে থাকে—এইরূপ বহুবার যদি দেখা যায় বা জানা যায়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে ব্যাপ্তির জ্ঞান হয়। কিন্তু এই বহুদর্শনের মধ্যে যদি একবার ব্যভিচার দর্শন হয়, অর্থাৎ একটী না থাকিলেও অপরটী থাকে—এরূপ জ্ঞান হয়, তাহা হইলে আর ব্যাপ্তিগ্রহ হয় না। এজন্য ব্যভিচার জ্ঞানশূন্য যে ভূয়োদর্শন তাহাই ব্যাপ্তিগ্রহের উপায় বলা হয়। যেমন বহু স্থলে ধূম থাকিলে বহ্নি থাকে দেখিয়া এবং কোথাও ধূম থাকিলে বহ্নি থাকে না—ইহা না দেখায় ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিগ্রহ হয়। অর্থাৎ যেখানেই ধূম থাকে সেখানেই বহ্নি থাকে—এই জ্ঞান হয়। এস্থলে, কতিপয় ধূম ও বহ্নি দেখিয়া যে যাবৎ ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞান, তাহা সামান্যলক্ষণ অলৌকিক সন্নিকর্ষবলে হয়। স্মরণ করিতে হইবে—একটী ঘটদর্শনের পর যে ঘটত্বরূপ যাবৎ ঘটদর্শন, তাহা এই সামান্যলক্ষণ অলৌকিক সন্নিকর্ষবলেই হয়। বলা বাহুল্য, ব্যভিচারজ্ঞান না থাকিলে সকৃদ্দর্শনেও ব্যাপ্তিজ্ঞান হইয়া থাকে, ইহাও চিন্তামণিকার বলিয়াছেন। (১৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

সিদ্ধান্তের পরিচয়।

অনুমানের প্রক্রিয়া জানিবার পর এবং তাহার দোষাদির বিষয় জানিবার পর "সিদ্ধান্ত" সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন। কারণ, অনুমান সাহায্যে যে বিচারকার্য নিষ্পন্ন হয়, তাহার ফল সিদ্ধান্ত, অথবা

কোন মতবিশেষ অবলম্বন করিয়া যে বিচার করা হয়, তাহাকেও সিদ্ধান্ত বলা হয়। ইহার লক্ষণ এই—পদার্থমাত্রেরই যে সামান্য এবং বিশেষ ধর্ম্ম আছে, সেই সামান্যধর্ম্মপুরস্কারে স্বীকৃত পদার্থের প্রমাণদ্বারা যে বিশেষতঃ নিশ্চয়, তাহাই সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ পদার্থটী "এইরূপ এবং ঐরূপ নয়" বলিয়া প্রমাণদ্বারা যে নিশ্চয় তাহাই সিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্তের বিভাগ।

এই সিদ্ধান্ত চারি প্রকার, যথা—১। সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত, ২। প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত, ৩। অধিকরণসিদ্ধান্ত এবং ৪। অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত।

সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তের পরিচয়।

যে পদার্থ কোন শাস্ত্রেরই বিরুদ্ধ নহে, এবং কোন এক শাস্ত্রে অন্ততঃপক্ষে কথিত, তাহাই সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত। যেমন, ঘ্রাণাদিকে যে "ইন্দ্রিয়" বলে এবং গন্ধ প্রভৃতিকে যে ইন্দ্রিয়ের "বিষয়" বলে—তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য এবং বহু শাস্ত্রেই কথিত বলিয়া ইহা সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত বলা হয়।

কতিপয় অনুমেয় পদার্থের অনুমান।

এইবার ন্যায় ও বেদান্তমতে কতিপয় অনুমেয় পদার্থের অনুমান কিরূপ হয়, তাহাই দৃষ্টান্তস্বরূপে প্রদর্শন করা যাউক—

আত্মার অনুমান—

আত্মা—ইতরভিন্নঃ, (প্রতিজ্ঞা)
আত্মত্বাৎ, (হেতু)
ব্যতিরেকেণ যথা ঘটঃ। (উদাহরণ)

ঈশ্বরানুমান—

দ্ব্যণুকাদিকং—কর্তৃজন্যং, (প্রতিজ্ঞা)
কার্য্যত্বাৎ, (হেতু)
যথা ঘটাদিঃ। (উদাহরণ)

পরমাণু ও দ্ব্যণুকের অনুমান—

ত্রসরেণুঃ—সাবয়বদ্রব্যারব্ধঃ, (প্রতিজ্ঞা)
বহিরিন্দ্রিয়বেদ্যদ্রব্যত্বাৎ, (হেতু)
বহিরিন্দ্রিয়বেদ্যদ্রব্যং যৎ তৎ
সাবয়বদ্রব্যারব্ধং যথা ঘটঃ। (উদাহরণ)

শব্দের অনুমান—

শব্দঃ—দ্রব্যাশ্রিতঃ, (প্রতিজ্ঞা)
গুণত্বাৎ, (হেতু)
যথা ঘটরূপম্। (উদাহরণ)

এস্থলে দ্রব্যান্তরে বাধা থাকায় শব্দাশ্রয়রূপে আকাশ সিদ্ধ হয়।

বায়ুর অনুমান—

পৃথিব্যাদিত্রয়াবৃত্তিঃ অয়ং স্পর্শঃ—দ্রব্যাশ্রিতঃ, (প্রতিজ্ঞা)
গুণত্বাৎ, (হেতু)
যথা ঘটরূপম্। (উদাহরণ)

এস্থলে দ্রব্যান্তরে বাধা থাকায় স্পর্শাশ্রয়রূপে বায়ু সিদ্ধ হয়।

কতিপয় অনুমেয় পদার্থের অনুমান।

এইবার ন্যায় ও বেদান্তমতে কতিপয় অনুমেয় পদার্থের অনুমান কিরূপ হয়, তাহাই দৃষ্টান্তস্বরূপে প্রদর্শন করা যাউক—

আত্মার অনুমান—

আত্মা—ইতরভিন্নঃ, (প্রতিজ্ঞা)
আত্মত্বাৎ, (হেতু)
ব্যতিরেকেণ যথা ঘটঃ (উদাহরণ)

অন্বয়ানুমান—

দ্ব্যণুকাদিকং—কর্তৃজন্যং, (প্রতিজ্ঞা)
কার্য্যত্বাৎ, (হেতু)
যথা ঘটাদিঃ। (উদাহরণ)

পরমাণু ও দ্ব্যণুকের অনুমান—

ত্রসরেণুঃ—সাবয়বদ্রব্যারব্ধঃ, (প্রতিজ্ঞা)
বাহিরিন্দ্রিয়বেদ্যদ্রব্যত্বাৎ, (হেতু)
বহিরিন্দ্রিয়বেদ্যদ্রব্যং যৎ তৎ
সাবয়বদ্রব্যারব্ধং যথা ঘটঃ (উদাহরণ)

শব্দের অনুমান—

শব্দঃ—দ্রব্যাশ্রিতঃ, (প্রতিজ্ঞা)
গুণত্বাৎ, (হেতু)
যথা ঘটরূপম্। (উদাহরণ)

এস্থলে দ্রব্যান্তরে বাধা থাকায় শব্দাশ্রয়রূপে আকাশ সিদ্ধ হয়।

বায়ুর অনুমান—

পৃথিব্যাদিভেদোত্তরঃ অয়ং স্পর্শঃ—দ্রব্যাশ্রিতঃ, (প্রতিজ্ঞা)
গুণত্বাৎ, (হেতু)
যথা ঘটরূপম্। ... (উদাহরণ)

এস্থলে দ্রব্যান্তরে বাধা থাকায় স্পর্শাশ্রয়রূপে বায়ু সিদ্ধ হয়।

কালের অনুমান—

পরত্বজনকং বহুতররবিক্রিয়াবিশিষ্ট-
শরীরজ্ঞানমিদং—পরম্পরাসম্বন্ধঘটকসাপেক্ষম্, (প্রতিজ্ঞা)
সাক্ষাৎসম্বন্ধাভাবে সতি বিশিষ্টজ্ঞানত্বাৎ, .. (হেতু)
লোহিতস্ফটিক ইতি প্রত্যয়বৎ। ... (উদাহরণ)

এখানে পরম্পরাসম্বন্ধটী স্বসমবায়িসংযুক্তসংযোগ, এজন্য সম্বন্ধঘটক কাল সিদ্ধ হইয়া থাকে।

দিকের অনুমান—

অবধিসাপেক্ষবহুতরসংযোগবিশিষ্টশরীরজ্ঞানমিদং
পরত্বজনকম্—পরম্পরাসম্বন্ধঘটকসাপেক্ষম্, ... (প্রতিজ্ঞা)
সাক্ষাৎসম্বন্ধাভাবে সতি বিশিষ্টজ্ঞানত্বাৎ, ... (হেতু)
লোহিতস্ফটিক ইতি প্রত্যয়বৎ। ... (উদাহরণ)

এস্থলে পরম্পরাসম্বন্ধটী স্বসমবায়িসংযুক্তসংযোগ, এজন্য সম্বন্ধঘটক দিক্ সিদ্ধ হইল। আকাশ এস্থলে সম্বন্ধঘটক হয় না, তাহা শব্দাশ্রয়ত্ব-দ্বারাই ধর্মিগ্রাহকপ্রমাণসিদ্ধ হয় বলিয়া তাহার রবিক্রিয়াদি-উপনায়কত্বের সম্ভাবনা নাই।

মনের অনুমান—

সুখাদিপ্রত্যক্ষম্—ইন্দ্রিয়জন্যম্, ... (প্রতিজ্ঞা)
জন্যপ্রত্যক্ষত্বাৎ, ... (হেতু)
ঘটপ্রত্যক্ষবৎ। .. (উদাহরণ)

এস্থলে ইন্দ্রিয়ান্তরে বাধা থাকায় মনের সিদ্ধি হয়।

বেদান্তসিদ্ধান্তানুকূল কতিপয় অনুমান।

জগন্মিথ্যাত্বানুমান—

প্রপঞ্চ—মিথ্যা, ... (প্রতিজ্ঞা)
দৃশ্যত্বাৎ, জড়ত্বাৎ, পরিচ্ছিন্নত্বাৎ, অংশিত্বাৎ (হেতু)
যথা শুক্তিরজতম্। .. (উদাহরণ)

ব্রহ্মভিন্নত্বের মিথ্যাত্বানুমান—

ব্রহ্মভিন্নং সর্ব্বং—মিথ্যা, ... (প্রতিজ্ঞা)

ব্রহ্মভিন্নত্বাৎ, ... (হেতু)

যদ্ এবং তদ্ এবং, যথা শুক্তিরূপ্যম্। .. (উদাহরণ)

বিশেষভাবে দ্রব্যমিথ্যাত্বের অনুমান—

অয়ং পটঃ—এতৎতন্তুনিষ্ঠাত্যন্তাভাব-
প্রতিযোগী, .. (প্রতিজ্ঞা)

পটত্বাৎ, (হেতু)

পটান্তরবৎ। .. (উদাহরণ)

সামান্যভাবে দ্রব্যমিথ্যাত্বের অনুমান—

অংশী—স্বাংশগতাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগী, (প্রতিজ্ঞা)

অংশিত্বাৎ, . (হেতু)

ইতরাংশীবৎ। . (উদাহরণ)

গুণমিথ্যাত্বানুমান—

রূপং—রূপনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগী, ... (প্রতিজ্ঞা)

গুণত্বাৎ, ... (হেতু)

স্পর্শবৎ। (উদাহরণ)

ক্রিয়ামিথ্যাত্বানুমান—

বিশেষের মিথ্যাত্বানুমান—

অয়ং বিশেষঃ—পরমাণুনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগী,		(প্রতিজ্ঞা)
বিশেষত্বাৎ,	...	(হেতু)
বিশেষান্তরবৎ।	...	(উদাহরণ)

সমবায়ের মিথ্যানুমান—

সমবায়ঃ—স্বসমবায়িনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগী,		(প্রতিজ্ঞা)
সম্বন্ধত্বাৎ,	...	(হেতু)
সংযোগবৎ।	...	(উদাহরণ)

ভট্টমতে বায়ুপ্রত্যক্ষে অনুমান—

বায়ুঃ—প্রত্যক্ষঃ,	...	(প্রতিজ্ঞা)
মহত্ত্বানিন্দ্রিয়ত্বে সতি স্পর্শবত্ত্বাৎ ভূতত্বাদ্ বা		(হেতু)
ঘটবৎ।	...	(উদাহরণ)

তমোদ্রব্যের অনুমান—

তমঃ—দ্রব্যান্তরম্,	...	(প্রতিজ্ঞা)
নীলাত্মকত্বাৎ,	...	(হেতু)
নীলোৎপলনৈল্যবৎ।	...	(উদাহরণ)

প্রভাকরমতে শক্তির অনুমান—

বহ্নিঃ—দাহাহকূলাদিষ্ঠাতীন্দ্রিয়ধর্ম্মসমবায়ী	...	(প্রতিজ্ঞা)
দাহকার্য্যজনকত্বাৎ,	...	(হেতু)
আত্মবৎ।	...	(উদাহরণ)

ইহাই হইল অনুমিতির পরিচয়।

উপমিতি পরিচয়।

সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম বা পদ ও সংজ্ঞী অর্থাৎ নামী বা অর্থ, তাহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধজ্ঞান, তাহাই উপমিতি। যেমন—গবয় শব্দের সহিত গবয়

বস্তুর যে একটী বাচ্যবাচকত্ব সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ গবয় শব্দটী বাচক এবং গবয় বস্তুটী বাচ্য—এইরূপ যে সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধের যে জ্ঞান তাহাই উপমিতি। এই সম্বন্ধটী গবয় পদের শক্তিরূপা বৃত্তি।

উপমিতির প্রক্রিয়া।

যে ব্যক্তি গবয় কখন দেখেন নাই, সে শুনিল যে, "অরণ্যমধ্যে প্রায় ঠিক্ গোসদৃশ এক প্রকার জন্তু আছে, তাহার নাম গবয়।" তৎপরে সে ব্যক্তি কোন দিন একটী গবয় দেখিল, তখন সে ভাবিল, ইহা কোন্ জন্তু? ইহার নাম কি? তখন তাহার মনে হইল "ইহা যেন গোসদৃশ জন্তু, অর্থাৎ ইহা গরুর মত জন্তু, কিন্তু ঠিক্ গরু নহে"। তখন তাহার স্মরণ হইল যে, সে লোকমুখে শুনিয়াছে যে, "গোসদৃশ গবয় নামক এক প্রকার জন্তু আছে"। তখন তাহার মনে হইল—ইহাই তবে "গবয়"। অর্থাৎ গবয় শব্দের সহিত গবয় শব্দের অর্থের একটী সম্বন্ধজ্ঞান তাহার হইল। এই যে সম্বন্ধজ্ঞান ইহাই উপমিতি। স্বতরাং উপমিতি-জ্ঞানোৎপত্তির যে ক্রম, তাহা এই—

প্রথমে—"গোসদৃশ গবয়" এইরূপ অতিদেশবাক্য শ্রবণজন্য সাদৃশ্যজ্ঞানার্জ্জন।

দ্বিতীয়—গবয়দর্শন।

তৃতীয়—গবয় বস্তুর নামনির্দ্দেশের ইচ্ছা।

চতুর্থ—গো সদৃশ ইহা—এইরূপ জ্ঞানোদয়।

পঞ্চম—গো সদৃশ গবয়—এই অতিদেশবাক্যার্থের স্মরণ।

ষষ্ঠ—তবে "এই গবয় সেই গবয় শব্দবাচ্য জন্তু"—এই জ্ঞান।

উপমিতির করণ উপমান।

এই উপমিতির করণ যে সাদৃশ্যজ্ঞান, তাহারই নাম উপমান প্রমাণ। যেমন "গোসদৃশ গবয়" বলিলে যে সাদৃশ্যের জ্ঞান হয়, তাহাই এই সাদৃশ্যজ্ঞান। ইহারই নাম অতিদেশবাক্যার্থজ্ঞান।

উপমিতির ব্যাপার।

"গোসদৃশ গবয়"—এই অতিদেশবাক্য শ্রবণজন্য যে সাদৃশ্যজ্ঞান, তাহা পরে গবয় দেখিয়া যখন সেই গবয়ের নাম নির্দ্দেশের জন্য স্মরণ করা হয়, তখন সেই সাদৃশ্যজ্ঞানের যে স্মরণ, তাহাকেই উপমিতির "ব্যাপার" বলা হয়। ইহার নাম অতিদেশবাক্যার্থের স্মরণ। ব্যাপার বলিয়া, ইহাও সুতরাং উপমিতির কারণ। উক্ত সাদৃশ্যজ্ঞানটী এই ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়াই করণ পদবাচ্য হয়।

সাদৃশ্যজ্ঞানের অনুযোগী প্রতিযোগী।

যাহার সাদৃশ্য তাহা সাদৃশ্যের প্রতিযোগী, যাহাতে সাদৃশ্য থাকে তাহা সাদৃশ্যের অনুযোগী। "গোসদৃশ গবয়" বলিলে গরু হয়—সাদৃশ্যের প্রতিযোগী এবং গবয় হয়—অনুযোগী। সুতরাং "গোসদৃশ গবয়" বলিলে গোপ্রতিযোগিক গবয়ানুযোগিক সাদৃশ্য বুঝায়। আর "গবয় সদৃশ গো" বলিলে গবয়প্রতিযোগিক গো-অনুযোগিক সাদৃশ্য বুঝায়।

উপমিতির ফল।

উপমান প্রমাণের যে ফল তাহাই উপমিতি। ইহা শব্দ ও তাহার অর্থমধ্যে যে শক্তিরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহার জ্ঞান। এস্থলে ইহা "গবয়ঃ গবয়পদবাচ্যঃ" বা "গোসদৃশঃ গবয়পদবাচ্যঃ"। ইহার অর্থ—গোসদৃশ-ত্বাবচ্ছিন্নবিশেষ্যক গবয়পদবাচ্যত্বপ্রকারক জ্ঞান। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ ভিন্ন তত্ত্বনির্ণয়ও উপমিতির ফল বলা হয়। যেমন "মুদ্গপর্ণীর ন্যায় এক প্রকার ওষধি আছে, তাহা বিষনাশক"—এইরূপ উপমিতির স্থলে উপমিতির ফল তত্ত্বনির্ণয় বলা হয়। এই উপমিতির ফলে দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ প্রভৃতি সকল পদার্থের সাদৃশ্যমূলক জ্ঞান হইতে পারে।

অর্থাৎ গবয়প্রতিযোগিক গবানুযোগিক যে সাদৃশ্যজ্ঞান তাহাই উপমিতি বলা হয়। এমতে অতিদেশবাক্যের অনুসন্ধান বা স্মরণ আবশ্যক নহে বলা হয়। এজন্য উপমিতির ব্যাপার বলিয়া কিছু এমতে স্বীকার করা হয় না। অর্থাৎ ইহা নির্ব্যাপার বলা হয়। এমতে সাধর্ম্ম্যোপমিতি, ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য আবশ্যক না হইলেও, যেহেতু ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক, বৈধর্ম্ম্যোপমিতির দ্বারা জগতের মিথ্যাত্বাদি সিদ্ধ হয়। সুতরাং বেদান্তমতেও ইহার উপযোগিতা আছে। এতদ্ভিন্ন চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্মকাণ্ডে ইহার উপযোগিতা থাকায় পরম্পরায় ইহাও ব্রহ্মজ্ঞানের উপযোগী বলা হয়। অতএব সাদৃশ্যজ্ঞান ও বৈধর্ম্ম্যজ্ঞানজন্য যে জ্ঞান তাহাই উপমিতি। গবয়ে গোসাদৃশ্য দর্শনান্তর স্মর্যমাণ গোতে যে গবয়সাদৃশ্যজ্ঞান তাহাই উপমিতি। গবয়স্থিত সাদৃশ্যদর্শনই করণ আর গোগত সাদৃশ্যজ্ঞানটী ফল। গবয় দেখিয়া গোসাদৃশ্যের স্মরণ হয় না কিন্তু গরুরই স্মরণ হয়, এজন্য ন্যায়মত স্বীকার্য্য নহে। এই উপমিতির মধ্যে গো-অংশে স্মরণ এবং সাদৃশ্য অংশে উপমিতি হইয়া সাদৃশ্যবিশিষ্ট গোস্মরণই উপমিতি হয় বলা হয়।

"নৈয়ায়িক বলেন—"গোসদৃশ গবয়" জ্ঞান হইলেই "গবয়সদৃশ গো" এই জ্ঞান আপনা আপনি হয়, এক সম্বন্ধীয় জ্ঞানে অপর সম্বন্ধীয় জ্ঞান হওয়া স্বাভাবিক, অতএব বেদান্তমতে ইহাকে যে উপমিতি বলা হয়, তাহা বৃথা।

বেদান্তী বলেন—তাহা হইলে "গোসদৃশ গবয়" ইহা শ্রবণমাত্রই সেই জ্ঞান হইয়াছে, কিন্তু গবয়দর্শনের পর "গবয়সদৃশ গো" এই যে জ্ঞান হয়, তাহা ত হয় না, ইত্যাদি।

উপমিতির বিভাগ।

উপমিতি—সাধর্ম্ম্য, বৈধর্ম্ম্য এবং ধর্ম্মমাত্রবোধক শব্দ হইতে হয় বলিয়া ইহা তিন প্রকার বলা হয়, যথা—১। সাধর্ম্ম্যোপমিতি, ২। বৈধর্ম্ম্যোপমিতি এবং ৩। ধর্ম্মমাত্রপ্রাপ্য উপমিতি। তন্মধ্যে "গো-সদৃশ গবয়" এই বাক্যদ্বারা গবয়পদবাচ্যের জ্ঞান—ইহাই (১) সাধর্ম্ম্যোপমিতি। "কুশ্রী, দীর্ঘওষ্ঠ ও গ্রীবাযুক্ত, কণ্টকভক্ষণকারী, কুব্জপৃষ্ঠ, উষ্ট্র করভ" এই বাক্যদ্বারা উষ্ট্রের যে জ্ঞান—তাহা (২) বৈধর্ম্ম্যোপমিতি এবং "মুদ্গপর্ণীর ন্যায় ওষধি বিষনাশক" এই বাক্যদ্বারা যে বিষনাশক ওষধির জ্ঞান—তাহা (৩) ধর্ম্মমাত্রপ্রাপ্য উপমিতি।

সাদৃশজ্ঞানদ্বারা যে অপরের সহিত একের সাদৃশ্যের জ্ঞান, অর্থাৎ "গোসাদৃশ্যাবচ্ছিন্ন গবয়" এইরূপ যে জ্ঞান, তাহাই উপমিতি বলা হয়। কোন কিছুর সংজ্ঞার সহিত তাহার পরিচয় হইলে তাহার যেরূপ জ্ঞান হয়, কোন কিছুর সহিত কাহারও সাদৃশ্যের জ্ঞান হইলে তদপেক্ষা আরও বিশেষ জ্ঞান হয়, ইহাই এই মতের লাভাধিক্য। ন্যায়মতে নাম ও নামীর সম্বন্ধের জ্ঞান হয়, আর এ মতে উপমেয় বস্তুরই জ্ঞান হয়। এজন্য ব্রহ্মজ্ঞানের পক্ষে এতাদৃশ উপমিতি অধিকতর আনুকূল্য করিয়া থাকে। ইহাই হইল উপমিতি পরিচয়।

শাব্দ পরিচয়।

শব্দজন্য জ্ঞানের নাম শাব্দজ্ঞান। শব্দ অর্থ—আপ্তবাক্য। আপ্ত অর্থ—যথার্থবক্তা। আপ্তের যে বাক্য তাহা আপ্তবাক্য এবং তাহা প্রমাণ।

বাক্যের পরিচয়।

বাক্য বলিতে অন্বয়যোগ্য পদসমূহ। যেমন "গাম্ আনয়" অর্থাৎ গরু আন, ইত্যাদি। এস্থলে "গাম্" ও "আনয়" পদের যে সমূহ, সেই সমূহকে বাক্য বলা হয়। কেবল "গাম্" বা কেবল "আনয়" শব্দ বাক্য নহে, উহারা পদ মাত্র। তার্কিকমতে কিন্তু উভয়ই বাক্য।

শাব্দজ্ঞানের কারণ ও ফল।

ঐ শাব্দজ্ঞানের "করণ" পদের জ্ঞান; আর পদার্থের স্মরণটী "ব্যাপার"। শক্তিজ্ঞান সহকারি কারণ এবং পদজন্য জ্ঞানটী ফল। এই জ্ঞানটী বাক্যঘটক পদার্থের মধ্যে সম্বন্ধের জ্ঞান। যেমন "পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্" বলিলে পর্ব্বতরূপ উদ্দেশ্যের সহিত বিধেয়রূপ বহ্নির সম্বন্ধই বুঝায়। এজন্য বাক্যের অর্থ—সম্বন্ধ।

বেদান্তমতে যে বাক্যের তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত সংসর্গ প্রমাণান্তরদ্বারা বাধিত হয় না, সেই বাক্যই প্রমাণ। এই বাক্যের অর্থ সর্ব্বত্রই "সম্বন্ধ" এরূপ বলা হয় না। এমতে বাক্যদ্বারা স্বরূপমাত্রও বুঝান যাইতে পারে, অর্থাৎ সম্বন্ধশূন্য বাক্যার্থের জ্ঞানও সম্ভব। এজন্য এরূপ স্থলে সেই বাক্যকে অখণ্ডার্থবোধক বাক্য বলে। যেমন "প্রকৃষ্টপ্রকাশঃ চন্দ্রঃ" অর্থাৎ ঐ অত্যুজ্জ্বলটী চন্দ্র. "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" অর্থাৎ সেই এই দেবদত্ত—এই বাক্যে চন্দ্র ও দেবদত্ত ব্যক্তিমাত্রের স্বরূপেরই জ্ঞান হয়। পূর্ব্বদৃষ্ট দেবদত্তের সহিত বর্ত্তমানদৃষ্ট দেবদত্তের সম্বন্ধ বুঝায় না। তদ্রূপ "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ তুমি তাহাই—এস্থলে জীব ও ব্রহ্মের চৈতন্যাংশের ঐক্য বা অভেদই অর্থ। জীব ও ব্রহ্মের কোনরূপ সম্বন্ধ এতদ্দ্বারা বুঝায় না। এইরূপ বাক্যের যে অখণ্ডার্থবোধকতা তাহা তাৎপর্য্যদ্বারা গৃহীত হয়।

আর সেই তাৎপর্য্যটী উপক্রম-উপসংহারাদি ছয় প্রকার তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গদ্বারা নির্ণীত হয়। ইহাদের পরিচয় পরে তাৎপর্য্যপরিচয়স্থলে সবিস্তরে কথিত হইবে।

শাব্দবোধের পরোক্ষত্ব অপরোক্ষত্ব।

শব্দ হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহা পরোক্ষ জ্ঞান, অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান; পরোক্ষ জ্ঞানে বিশেষ দর্শন হয় না; প্রত্যক্ষ জ্ঞানেই বিশেষদর্শন হয়।

বেদান্তমতে শব্দ হইতে যে জ্ঞান হয় তাহা অপরোক্ষও হয়। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র ইহা স্বীকার করেন না। বাচস্পতির মতে উহা মানসপ্রত্যক্ষ। পদ্মপাদাচার্য্য "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য হইতে প্রত্যক্ষ অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞান হয় বলিয়া থাকেন। এজন্য বাচস্পতি মিশ্রকে শব্দপরোক্ষবাদী এবং পদ্মপাদাচার্য্যকে শব্দাপরোক্ষবাদী বলা হইয়া থাকে।

শাব্দবোধের প্রক্রিয়া।

বাক্যের অন্তর্গত পদশ্রবণ করিলে পদার্থের উপস্থিতি অর্থাৎ পদার্থের স্মরণ হয়। কিন্তু জ্ঞানাদি প্রথমক্ষণে উৎপন্ন, দ্বিতীয়ক্ষণে স্থায়ী এবং তৃতীয়ক্ষণে বিনষ্ট হয় বলিয়া উত্তর পদার্থের স্মরণকালে পূর্ব্বপদার্থের স্মরণের নাশ হয়, এজন্য আসত্তিজ্ঞানাভাবে শাব্দবোধ হয় না। অর্থাৎ সমূহাবলম্বন প্রত্যক্ষের ন্যায় বাক্যান্তর্গত যাবৎ পদার্থের এককালে উপস্থিতি না হইলে তাহাদের অন্বয় সম্ভব হয় না, আর অন্বয়জ্ঞান না হইলে বাক্যার্থ বোধ হয় না। এজন্য বাক্যান্তর্গত উত্তর পদার্থের স্মরণকালে, সেই স্মরণটী উদ্বোধকরূপ হইয়া পূর্ব্বপূর্ব্ব পদার্থের স্মরণের নাশে যে তাহাদের সংস্কার থাকে, সেই সংস্কারকে স্মরণে পরিণত করে। আর এক স্মরণটি সমূহালম্বন প্রত্যক্ষের ন্যায় সমূহালম্বন স্মরণাত্মক জ্ঞানই হয়। তখন তাহাদের মধ্যে অন্বয়জ্ঞান হয়।

বেদান্ত বা মীমাংসকমতেও পদজ্ঞানের পর পদার্থের স্মরণ হয়, তৎপরে যে অসংস্থিষ্ট বাক্যার্থ জ্ঞান হয়, তাহাকেই শাব্দজ্ঞান বলে। কেহ বলেন এই স্মরণ ঠিক্ স্মরণই নহে, ইহার নাম 'অভিধান'।

শাব্দজ্ঞানের করণ।

এই শাব্দজ্ঞানের করণ হয়—পদের জ্ঞান। যেমন "গাম্" ও "আনয়" এই দুইটী পদ। এই পদদ্বয়ের জ্ঞান হইলে অর্থাৎ ইহারা শ্রুত হইলে "গাম্ আনয়" বাক্যের জ্ঞান হয়। ব্যাকরণের সুপ্ বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও তিঙ্ বিভক্তিযুক্ত ধাতুই পদ। অন্য কথায় শক্তিবিশিষ্ট যে শব্দ তাহাই পদ। সেই পদের যে অর্থ তাহাই পদার্থ।

শাব্দজ্ঞানের ব্যাপার।

পদার্থের স্মরণ অর্থাৎ পদশ্রবণ করিলে মনোমধ্যে তাহার অর্থের যে উপস্থিতি, তাহাই শাব্দজ্ঞানের ব্যাপার, এজন্য ইহাকে শাব্দজ্ঞানের একটী কারণ বলা হয়। পদজ্ঞান এই ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া করণ হয়। অর্থাৎ বৃত্তিজ্ঞান সংস্কৃত পদজ্ঞানজন্য পদার্থোপস্থিতিই ব্যাপার।

সহকারি কারণ।

পদের সহিত অর্থের যে বাচ্যবাচক সম্বন্ধ, তাহাই পদের শক্তি। পদের এই শক্তিজ্ঞানটী শাব্দজ্ঞানে সহকারি কারণ বলা হয়। এই শক্তিবলে পদশ্রবণজন্য পদার্থের উপস্থিতি হয়। শক্তিজ্ঞান পূর্ব্বে না থাকিলে, পদশ্রবণ করিয়া পদার্থের স্মরণ হয় না। পদার্থের স্মরণটী বিষয়তা সম্বন্ধে পদার্থে থাকে এবং পদও তাদৃশ সম্বন্ধে পদার্থে থাকে; এইরূপে কার্য্যকারণের সামানাধিকরণ্য থাকে বুঝিতে হইবে।

পদের বৃত্তির পরিচয়।

এই শক্তি, পদের বৃত্তিবিশেষ। পদের সহিত তাহার অর্থের যে সম্বন্ধ, তাহার সাধারণ নাম বৃত্তি। সেই বৃত্তি দুই প্রকার, যথা—শক্তি ও লক্ষণা। তন্মধ্যে শক্তি বলিতে বাচ্যবাচক সম্বন্ধ, এবং লক্ষণা বলিতে লক্ষ্যলক্ষক সম্বন্ধ। যেমন "গো" পদের শক্তি—গোৰ্দিতে, অর্থাৎ

গলকম্বলাদিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে, এবং "গঙ্গাতে গয়ালারা বাস করে" এই বাক্যে গঙ্গাপদের শক্তি গঙ্গজলপ্রবাহে, কিন্তু লক্ষণা গঙ্গাতীরে। কারণ জলের উপর লোক বাস করিতে পারে না। শক্যার্থে বাধা ঘটিলে পদ শক্যসম্বন্ধদ্বারা বোধক হয়, এজন্য স্থলবিশেষে লক্ষণা হইয়া থাকে।

শব্দের শক্তির পরিচয়।

শক্তি বলিতে তদ্বিশেষ্যক এবং তৎপদজন্য যে বোধ, সেই বোধ-বিষয়ত্বপ্রকারক ঈশ্বরসংকেত। এই ঈশ্বরসঙ্কেত ঈশ্বরের ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা—"এই পদের এই অর্থ লোকে বুঝুক" এইরূপ। শক্তিনিরূপকত্বই পদের শক্তত্ব। বিষয়তা সম্বন্ধে শক্তির যে আশ্রয় তাহাই শক্য। নব্যমতে "এই পদে এই অর্থবোধ হউক" এইরূপ ইচ্ছামাত্রই শক্তি, কেবল ঈশ্বরেরই ঐরূপ ইচ্ছা শক্তি নহে।

মীমাংসকমতে এই শক্তি অনাদি ও নিত্য। তবে ন্যায়মতেও ঈশ্বরের ইচ্ছাও নিত্য বলা হয়; এজন্য উভয়মতে বড় বিশেষ পার্থক্য থাকে না।

শক্তি জ্ঞানের কারণ।

পদের শক্তির জ্ঞান আট প্রকারে হয়, যথা—১। ব্যাকরণ, ২। উপমান, ৩। অভিধান, ৪। আপ্তবাক্য, ৫। ব্যবহার, ৬। বাক্য-শেষ, ৭। বিবরণ এবং ৮। প্রসিদ্ধ পদের সান্নিধ্য।

ব্যাকরণ হইতে শক্তিজ্ঞান।

প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের শক্তির জ্ঞানে যেখানে পদের অর্থের জ্ঞান হয়, সেখানে এই পদশক্তিজ্ঞানের প্রতি ব্যাকরণ কারণ হয়। ভূ কৃ প্রভৃতি ধাতু এবং গো অশ্ব ইত্যাদি শব্দই প্রকৃতি এবং সুপ্ তিঙ্ প্রভৃতি প্রত্যয়। যেমন পচ্ ধাতু পাক করা, তিপ্ প্রত্যয় করিয়া "পচতি" পদ হয়। ইহার অর্থ—পাকানুকূল কৃতিবিশিষ্ট। তার্কিকোক্ত বৈয়াকরণের মতে "পাকানুকূলকৃতিবিশিষ্ট হইতে অভিন্ন"।

অতএব পচ্ ধাতুর শক্তি পাক ক্রিয়াতে, এবং তিপ্ প্রত্যয়ের শক্তি কৃতিতে। বৈয়াকরণমতে ইহা কর্তাতে অর্থাৎ কৃতিবিশিষ্টে। এখন

"চৈত্রঃ পচতি" বাক্যের অর্থ—পাকানুকূলকৃতিবিশিষ্ট চৈত্র, এবং ব্যাকরণ-মতে—চৈত্র পাকানুকূলকৃতিবিশিষ্ট হইতে অভিন্ন। "রথো গচ্ছতি" স্থলে তিপ্ প্রত্যয়ের আশ্রয়ত্বে লক্ষণা। "দেবদত্তঃ নশ্যতি" স্থলে তিপ প্রত্যয়ের প্রতিযোগিত্বে লক্ষণা। যেহেতু এখানে কৃতিতে শক্তি সম্ভব নহে। সুতরাং গমনাশ্রয় রথ ও ধ্বংসের প্রতিযোগী দেবদত্ত এইরূপ অর্থ হয়। এস্থলে ব্যাকরণ হইতে এইরূপ শক্তিগ্রহ হয়।

কোষ বা অভিধান হইতে শক্তিজ্ঞান।

যেখানে অভিধান হইতে পদের অর্থবোধ হয়, সেখানে অভিধানকে শক্তিজ্ঞানের কারণ বলা হয়। যেমন "অমর" শব্দের অর্থ—দেবতা। "নীল" শব্দের অর্থ—নীলরূপ ও নীলরূপবিশিষ্ট। এখানে শক্তি—নীলরূপে এবং নীলরূপবিশিষ্টে লক্ষণা। নানার্থক শব্দে—প্রসিদ্ধ অর্থে শক্তি এবং অপ্রসিদ্ধে লক্ষণা নহে, কিন্তু সমুদায় অর্থেই শক্তি বলা হয়।

আপ্তবাক্য হইতে শক্তিজ্ঞান।

বিশ্বাসী ব্যক্তির বাক্য হইতেও শক্তিজ্ঞান হয় বলিয়া আপ্তবাক্যও শক্তিগ্রহের প্রতি কারণ। যেমন পিক শব্দের শক্তি কোকিলে। ইহা বিশ্বাসী ব্যক্তির বাক্য হইতে জন্ম।

ব্যবহার হইতে শক্তিজ্ঞান।

যেমন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে "পুস্তক আন" বলিল, আর সে ব্যক্তি পুস্তক আনিল। তৃতীয় ব্যক্তি পুস্তক ও আন শব্দের অর্থ জানিত না। সে ইহা দেখিল। তৎপরে সে আবার শুনিল প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিল—"ঘট আন" এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি পূর্ব্ববৎ ঘট আনয়ন করিল, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ইহা দেখিল। ইহাতে তৃতীয় ব্যক্তির "ঘট" "আন" ও "পুস্তক" এই পদত্রয়ের শক্তিগ্রহ হইল। এই প্রয়োজক অর্থাৎ আদেশকারী প্রথম ব্যক্তির বাক্য ও আদেশপ্রতি-পালনকারী দ্বিতীয় বা প্রয়োজ্য ব্যক্তির ক্রিয়াই এই ব্যবহার।

আবাপ উদ্বাপ দ্বারা শক্তিজ্ঞান।

যে উপায়ে "ঘট" "পুস্তক" ও "আন" পদের অর্থবোধ হইল তাহাকে আবাপ ও উদ্বাপ প্রক্রিয়া বলা হয়। আবাপ অর্থ—গ্রহণ বা সংযোগ ও উদ্বাপ অর্থ—ত্যাগ বা বিয়োগ। "আন" পদেব সহিত ঘটের সংযোগ—ইহা "আবাপ" আর "আন" পদের সহিত পুস্তকেব বিয়োগই এই "উদ্বাপ"। এই আবাপ ও উদ্বাপ ক্রিয়াব জন্য সর্ব্বত্র "আন," "রাখ" এরূপ আদেশবোধক ক্রিয়াপদেব আবশ্যকতা নাই। সিদ্ধপদেব প্রয়োগেও শক্তিগ্রহ হয়। যেমন স্থল বিশেষ "পুত্রস্তে জাতঃ" "পুত্রস্তে মৃতঃ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারাও পুত্রাদি পদের শক্তিজ্ঞান হয়। এজন্য ন্যায়মতে "কার্য্যান্বিতে শক্তিবাদ" স্বীকাব অনাবশ্যক।

প্রভাকর মীমাংসকমতে কিন্তু যে বাক্যের মধ্যে কর্ত্তব্যতাবোধক ক্রিয়াপদ থাকে, সেই বাক্যের অন্তর্গত কারকপদের শক্তিগ্রহ হয়। ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইলে তবে পদেব শক্তির জ্ঞান হয়। কিন্তু বেদান্ত ও ভট্টমতে তাহা স্বীকার করা হয় না। এস্থলে ন্যায়, ভট্ট ও বেদান্ত একমত। অর্থাৎ প্রভাকরমতে "স্বর্গে ইন্দ্র বাস করেন"। "তোমার পুত্র হইয়াছে" ইত্যাদি বাক্যে শক্তিগ্রহ হয় না বলা হয়। কিন্তু ন্যায় ও বেদান্তাদি মতে তাহা হয়—বলা হয়।

বাক্যশেষ হইতে শক্তিজ্ঞান।

প্রথম বাক্যঘটক পদের নানা অর্থের মধ্যে একটী অর্থ পরবর্ত্তী বাক্যঘটক পদের দ্বারা নির্ণীত হয় বলিয়া বাক্যশেষ হইতে পদের শক্তিজ্ঞান হয়। যেমন "যব আনয়ন কর" এই বাক্যের যবপদে শূক-বিশিষ্ট ধান্যবিশেষ এবং ম্লেচ্ছগণের নিকট "যব"শব্দের অর্থ কঙ্গু বুঝাইলেও, যখন পরবাক্য শুনা যায় যে, বসন্তকালে সকল শস্যের পাতা পাড়িয়া যায়, কিন্তু যব স্ফীত হয় ও মঞ্জরীযুক্ত হয়, তখন যব পদের শক্তি প্রসিদ্ধ যবেই গৃহীত হয়, কঙ্গুতে গৃহীত হয় না।

বিবরণ হইতে শক্তিজ্ঞান।

যেমন "অশ্ব আন" এই বাক্যের পর শ্রোতা বক্তার অর্থ না বুঝিলে বক্তা যদি "ঘোটক আন" বলে, তাহা হইলে "ঘোটক আন" এই বাক্য শুনিয়া অশ্ব পদের শক্তি "ঘোটকে"—এরূপ জ্ঞান হয়।

প্রসিদ্ধপদের সান্নিধ্য হইতে শক্তিজ্ঞান।

"বসন্তকালে আম্রবৃক্ষে পিক গান করিতেছে" এই বাক্য শুনিলে পিক শব্দের অর্থ কোকিল বুঝা যায় বলিয়া পিক শব্দের শক্তি কোকিল ইহা বুঝা যায়। বসন্ত ও আম্রবৃক্ষ এই সকল প্রসিদ্ধ পদ, পিক শব্দে কোকিলকেই বুঝাইয়া দেয়।

শক্তির বোধ্য নিরূপণ।

শক্তি দ্বারা জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝায়। যেমন "গো" শব্দের শক্তি গোত্বজাতিবিশিষ্ট যে গো-ব্যক্তি, তাহাতে থাকে। শিরোমণি প্রভৃতি নবীন নৈয়ায়িক, ব্যক্তিতেই পদের শক্তি বলিয়া স্বীকার করেন। জাতি ব্যক্তি ও সম্বন্ধে একই শক্তি থাকে। এজন্য গৌতমসূত্র—"জাত্যাকৃতিব্যক্তয়ঃ পদার্থঃ"।

মীমাংসকমতে জাতিতেই শক্তি স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ গোশব্দের অর্থ গোত্ব জাতি মাত্র। ব্যক্তির যে জ্ঞান হয়, তাহা অনুমিতি বা অর্থাপত্তি প্রমাণদ্বারা হয়। লাঘবের জন্য জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করা হয় না। কারণ, তত্তৎ পদজন্য শাব্দবোধে তত্তৎ পদার্থের জ্ঞান হয়, আর সেই জ্ঞানের প্রতি তত্তৎ পদের তত্তৎ পদার্থে শক্তিজ্ঞানই কারণ হয়। মণ্ডনমিশ্রমতে গো পদের গোত্বে শক্তি, আর ব্যক্তিতে লক্ষণা। (বৃত্তি-দীপিকা)। প্রভাকরমতে কার্য্যান্বিত পদার্থে শক্তি স্বীকার করা হয়।

কুব্জশক্তিবাদ।

বেদান্তমতেও জাতিতেই শক্তি স্বীকার করা হয়। কেহ বলেন—গো পদে গোত্ব জাতি এবং গো ব্যক্তি—দুইই বুঝায়, তবে গো পদের শক্তি যে গোত্বে, সেই গোত্বে শক্তির জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এবং গো ব্যক্তিতে যে শক্তি, তাহার জ্ঞান থাকা প্রয়োজন নহে। তাহার স্বরূপতঃ থাকা মাত্র আবশ্যকতা। এই মতকে "কুব্জশক্তিবাদ" বলা হয়। গোত্বপ্রকারক গো-বিশেষ্যক শাব্দবোধের প্রতি গোত্ববিষয়ক গোপদশক্তির জ্ঞানটী হেতু।

শক্তির বিভাগ।

শক্তি চারি প্রকার, যথা—যৌগিকী, রূঢ়ি, যোগরূঢ়ি এবং যৌগিক-রূঢ়ি। এই চারি প্রকার শক্তির ভেদে শক্তিবিশিষ্ট নাম বা পদ চারি প্রকার হয়, যথা—যৌগিক, রূঢ়, যোগরূঢ় এবং যৌগিকরূঢ়।

যৌগিক পদ।

যে পদে কেবল অবয়বের অর্থাৎ ধাতুপ্রত্যয়াদিরূপ পদের প্রত্যেক

অংশের শক্তির দ্বারা পদের অর্থের বোধ উৎপাদন করে, সেই পদকে যৌগিক পদ বলা হয়। যেমন—পাচক, ধনবান, ও ভূপতি পদ। এখানে পচ্ ধাতু ণক প্রত্যয় করিয়া পাচক হইয়াছে। পচ্ ধাতুর শক্তি পাক ক্রিয়াতে, ণক প্রত্যয়ের শক্তি কর্ত্তাতে। এজন্য পাচক পদটী তাহার অবয়বের শক্তির দ্বারা রন্ধনকারীকে বুঝাইল, আর তজ্জন্য ইহা যৌগিক শব্দ। তদ্রূপ ধনবান পদের "ধন"শব্দের শক্তি স্বর্ণাদিতে, এবং বতুপ্ এই প্রত্যয়ের শক্তি অধিকরণে, সুতরাং যাহাতে স্বস্বামিত্ব সম্বন্ধে স্বর্ণাদি আছে, সেই ব্যক্তি ধনবান্ ইহাই বুঝাইল। আবার "ভুব পতি" এই সমাসে ভূপতি পদের ভূশব্দের শক্তি পৃথিবীতে, ভুব এই ষষ্ঠী বিভক্তির শক্তি স্বস্বামিত্ব সম্বন্ধে এবং পতিপদের অর্থ—পালক। অতএব ভূপতি শব্দের প্রত্যেক অবয়বের শক্তির দ্বারা ভূপতির অর্থ পৃথিবীর পালক অর্থাৎ রাজা হইল।

রূঢ়পদ।

যেস্থলে পদের অবয়বের শক্তি সম্ভব হইলেও সেই অবয়ব শক্তি ব্যতিরেকেই কেবল সমুদায়ের শক্তির দ্বারা অর্থের বোধ জন্মায়, সেই পদকে রূঢ় পদ বলা হয়। যেমন, গো, ঘট, পট, মণ্ড ইত্যাদি। ইহারা নিজ অবয়বের শক্তি নিরপেক্ষ হইয়া বিশেষ বিশেষ বস্তুকে বুঝাইতেছে। রূঢ় শব্দের অর্থ—প্রসিদ্ধ। "গম্" ধাতু "ডো" প্রত্যয় দ্বারা গো শব্দ নিষ্পন্ন। গম্ ধাতু অর্থ—গমন এবং ডো প্রত্যয়ের অর্থ—কর্ত্তা। কিন্তু "যে গমন করে" তাহাকে না বুঝাইয়া গরুকেই বুঝাইল। গরু গো শব্দের রূঢ় বা প্রসিদ্ধ অর্থ।

যোগরূঢ় শব্দ।

যেখানে যৌগিকীশক্তি ও রূঢ়িশক্তি উভয়দ্বারাই অর্থের বোধ জন্মায়, কেবল একটীর দ্বারা অর্থবোধ হয় না, সেই স্থলে সেই পদকে যোগরূঢ় পদ বলা হয়। যেমন—পঙ্কজ, জলধর ইত্যাদি শব্দ। পঙ্ক শব্দের

উত্তর জন্ ধাতু ড প্রত্যয় করিয়া পঙ্কজ হইয়াছে। পঙ্ক+জন+ড এই অবয়বের শক্তির দ্বারা পঙ্কে যাহা জন্মে তাহা পঙ্কজ। ইহা যৌগিক অর্থ। আর পঙ্কজের প্রসিদ্ধ অর্থ—পদ্মস্বরূপে পদ্ম। ইহা সমুদায়ের শক্তি। পদ্মও পঙ্কে জন্মে। সুতরাং এস্থলে উভয় অর্থ মিলিত হইয়া পদ্মকে বুঝাইতেছে বলিয়া পঙ্কজ শব্দটী যোগরূঢ়ি পদ। পঙ্কজ শব্দে কুমুদকে বুঝায়, কিন্তু রূঢ়ীশক্তি যৌগিকীশক্তির প্রতিবন্ধক হয় বলিয়া পদ্মকেই বুঝাইল। অবশ্য তাৎপর্য্যানুরোধে ইহার অন্যথাও হয়। তদ্রূপ জলধর পদের অর্থ—জলধারণকারী মেঘ।

যৌগিকরূঢ় শব্দ।

যে পদে যৌগিকীশক্তি ও রূঢ়িশক্তি—ইহাদের অন্যতর শক্তিদ্বারাই অর্থ বোধ জন্মায়, অর্থাৎ কেবল যৌগিকীশক্তির দ্বারা কিংবা কেবল রূঢ়িশক্তির দ্বারা অর্থের বোধ জন্মায়, সেই স্থলে যৌগিকরূঢ় শব্দ হয়। যেমন—উদ্ভিদ, অন্ন ইত্যাদি। উৎ পূর্ব্বক ভিদ্ ধাতু ক্বিপ্ করিয়া উদ্ভিদ পদ এবং অদ্ ধাতু ক্ত প্রত্যয় করিয়া অন্ন পদ হইয়াছে। এখানে উৎ পদের উর্দ্ধে শক্তি, ভিদ্‌ধাতুর শক্তি ভেদে এবং ক্বিপ্ প্রত্যয়ের শক্তি কর্ত্তায়। তদ্রূপ অদ্ ধাতুর শক্তি ভক্ষণে এবং ক্ত প্রত্যয়ের শক্তি আশ্রয়ে। এজন্য যৌগিকশক্তিবলে উদ্ভিদ অর্থ বৃক্ষাদি এবং অন্ন শব্দে ভক্ষণীয় বস্তুমাত্র বুঝা যায়। কিন্তু রূঢ়িশক্তিবশতঃ উদ্ভিদ অর্থ শাক-বিশেষ এবং অন্ন শব্দের অর্থ পক্বতণ্ডুলাদি বুঝায়। এস্থলে এই উভয় অর্থেই এই পদদ্বয় ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহারা যৌগিকরূঢ়পদ বলা হয়। যোগরূঢ় ও যৌগিকরূঢ়ের প্রভেদ এই যে, যোগরূঢ়পদ যৌগিকীশক্তির সহকারেই রূঢ়ার্থের বোধ জন্মায়, যেমন পঙ্কজ, কিন্তু যৌগিকরূঢ়শব্দ—যৌগিক অর্থ ও রূঢ়ার্থ এই দুই অর্থেরই বোধ জন্মায়, যেমন—উদ্ভিদ শব্দ।

লক্ষণার পরিচয়।

পদের অর্থের অংশের প্রতি যেমন পদের শক্তিবৃত্তির জ্ঞান কারণ

হয়, তদ্রূপ স্থলবিশেষে পদের লক্ষণাবৃত্তির জ্ঞানও কারণ হয়। যেখানে পদের শক্তির দ্বারা যে অর্থের জ্ঞান হয়, সেই অর্থের সহিত সম্বন্ধ কোন কিছুর জ্ঞান হয়, সেখানে পদের লক্ষণাবৃত্তির দ্বারাই সেই অর্থের জ্ঞান হয়। এজন্য বলা হয় পদের শক্যার্থের সহিত যে সম্বন্ধ তাহাই লক্ষণা। লক্ষ্যতাবচ্ছেদকে লক্ষণা হয় না, কিন্তু শক্যতাবচ্ছেদকে শক্তি থাকে—ইহা স্বীকার করা হয়।

লক্ষণার কারণ।

যখন তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি হয়, তখন শব্দের লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা পদার্থের স্মরণ হয়। লক্ষণার দ্বারা যে অর্থের স্মরণ হয়, তাহাকে লক্ষ্যার্থ বলা হয়। অন্বয়ের অনুপপত্তি লক্ষণার কারণ নহে। কারণ, "যষ্টী প্রবিষ্ট কর" এ বাক্যে যষ্টীপদে যষ্টীধারীতে লক্ষণা, তাহা হইলে সম্ভব হয় না। আর গঙ্গা পদে তীর না বুঝাইয়া মৎস্যাদিও বুঝাইত। এজন্য তাৎপর্য্যের অনুপপত্তিতে লক্ষণার বীজ বলা হয়।

লক্ষণার বিভাগ।

লক্ষণা দুই প্রকার, যথা—শক্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধরূপা লক্ষণা বা শুদ্ধা-লক্ষণা এবং শক্যের পরম্পরা সম্বন্ধরূপা লক্ষণা বা লক্ষিতলক্ষণা। তন্মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধরূপা লক্ষণা বা শুদ্ধা লক্ষণা আবার দুই প্রকার, যথা—জহৎস্বার্থ লক্ষণা এবং অজহৎ স্বার্থলক্ষণা।

লক্ষণার অন্যরূপ বিভাগ। শুদ্ধা ও গৌণী।

এই লক্ষণা আবার শুদ্ধা ও গৌণীভেদেও দুই প্রকার, বলা হয়। তন্মধ্যে শুদ্ধা লক্ষণা জহৎস্বার্থ ও অজহৎস্বার্থ-ভেদে দুই প্রকার এবং গৌণী একই প্রকার। দৃষ্টান্ত পরে প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রয়োজনবতী ও নিরূঢ় লক্ষণা।

প্রয়োজনবতী লক্ষণা ও নিরূঢ়লক্ষণাভেদেও লক্ষণা দুই প্রকার হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত পরে প্রদর্শিত হইতেছে।

বেদান্তমতে সাক্ষাৎসম্বন্ধরূপা লক্ষণা তিন প্রকার বলা হয়, যথা—জহৎস্বার্থ, অজহৎ-স্বার্থ এবং ভাগত্যাগ লক্ষণা বা জহদজহৎস্বার্থ লক্ষণা। প্রথম দুইটীর লক্ষণে কোন বিশেষ নাই। জহদজহৎস্বার্থ লক্ষণা বা ভাগত্যাগ লক্ষণাটী শক্যতাবচ্ছেদককে পরিত্যাগ করিয়া ব্যক্তিমাত্রবোধের প্রয়োজিকা হইয়া থাকে। অর্থাৎ শক্যার্থের এক অংশ ত্যাগ করিয়া এক অংশবোধে বক্তার তাৎপর্য্য হইলে ইহা হয়। যেমন "সেই এই দেবদত্ত"। এখানে "সেই" ও "এই" পদ দুইটী বিশেষ্য দেবদত্তের বিশেষণ। কিন্তু "সেই" পদের অর্থ পরোক্ষত্ব এবং "এই" পদের অর্থ অপরোক্ষত্ব পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া বিশেষ্য দেবদত্তমাত্রের যে গ্রহণ, তাহা এই লক্ষণার দ্বারা হইয়া থাকে।

জহৎস্বার্থ লক্ষণার পরিচয়।

যে লক্ষণা পদের শক্যার্থ ত্যাগ করিয়া কেবল লক্ষ্যার্থের বোধ জন্মায়, তাহাই জহৎস্বার্থ লক্ষণা। হা ধাতুর অর্থ—ত্যাগ করা, তাহার উত্তর শতৃ প্রত্যয় করিয়া "জহৎ" পদ হয়। যেমন নদীতে ধীবরগণ বাস করে, এস্থলে নদী পদের শক্যার্থ যে জলপ্রবাহ, তাহাতে ধীবরের বাস অসম্ভব হয় বলিয়া নদীতীরে বাসই তাৎপর্য্য। অতএব তাৎপর্য্যের অনুপপত্তিপ্রযুক্ত নদীপদের নদীতীরে লক্ষণা হয়। এই লক্ষণা এস্থলে নদীপদের শক্যার্থ যে জলপ্রবাহ, তাহার সামীপ্যরূপ সম্বন্ধ বিশেষ। আর তজ্জন্য প্রথমতঃ নদীপদের জ্ঞান হয়। তৎপরে তাহার শক্যার্থের জ্ঞান হয়, পরে জলে বাস অসম্ভব বোধ হয়। তাহার পরে নদীপদের লক্ষণার দ্বারা নদীতীরস্বরূপ অর্থের স্মরণ হয়, তাহার পর নদীতীরে ধীবরেরা বাস করে—এইরূপ শাব্দবোধ হয়। এস্থলে নদীপদের নিজ অর্থ ত্যাগ এবং সেই অর্থের সহিত সম্বন্ধ অপর অর্থের গ্রহণ হওয়ায় জহৎস্বার্থ লক্ষণা হইল। ন্যায়ের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—লক্ষ্যতাবচ্ছেদকরূপে লক্ষ্যমাত্রবোধের যাহা প্রয়োজিকা তাহাই জহৎস্বার্থলক্ষণা।

অজহৎস্বার্থ লক্ষণার পরিচয়।

যে লক্ষণা পদের শক্যার্থ ত্যাগ না করিয়া লক্ষ্যার্থের বোধ জন্মায়, তাহার নাম অজহৎস্বার্থ লক্ষণা। যেমন "কাক হইতে অন্ন রক্ষা কর" ইত্যাদি স্থলে সর্ব্বতোভাবে অন্নরক্ষাই তাৎপর্য্য। যদি আদিষ্ট ব্যক্তি

কুক্কুরাদি হইতে অন্নরক্ষা না করে, তবে উক্ত তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি হয়। এজন্য কাকপদে অন্নের অপচয়কারকমাত্রে লক্ষণা হয়। এই লক্ষণা এস্থলে কাকপদের শক্যার্থ কাকপক্ষিবিশেষ, তাহার সহিত স্বগ্রাহ্যদ্রব্যগ্রাহকত্বস্বরূপ সম্বন্ধ। এস্থলে প্রথমতঃ কাকপদের জ্ঞান হয়, তৎপরে তাহার অর্থোপস্থিতি হয়, তৎপরে তাহাতে তাৎপর্য্যের অনুপপত্তিবোধ হয়, তৎপরে কাক পদার্থের সহিত সম্বন্ধ অন্নোপঘাতকমাত্র জীবের লক্ষণাদ্বারা স্মরণ হয়। তাহার পর অন্নোপঘাতক জীবমাত্র হইতে অন্নরক্ষা কর—এইরূপ শাব্দবোধ হয়। ইহা অজহৎস্বার্থলক্ষণা, কারণ, এস্থলে কাক পদের শক্যার্থ পক্ষী ও লক্ষ্যার্থ কুক্কুরাদি সকল অর্থেরই বোধ হয়।

লক্ষিত লক্ষণার পরিচয়।

শক্যার্থের পরম্পরা সম্বন্ধস্বরূপা যে লক্ষণা তাহার নাম লক্ষিতলক্ষণা। যেমন "দ্বিরেফ" পদের ভ্রমর পদার্থে লক্ষণা। কারণ, দুই রেফ আছে যে পদে, এইরূপ সমাস-ব্যুৎপত্তিতে শক্যার্থ হয়—রেফদ্বয়যুক্ত পদ, তাহার সম্বন্ধ হয়—প্রথমতঃ ভ্রমর এই "পদে", তৎপরে সেই ভ্রমর পদের সম্বন্ধ হয়—ভ্রমর "পদার্থে"। এস্থলে প্রথম সম্বন্ধ হয়—ঘটিতত্ব, এবং দ্বিতীয় সম্বন্ধটী হয়—শক্তি। এইরূপে দ্বিরেফ পদের শক্যার্থ যে রেফদ্বয়, তদ্‌ঘটিত যে ভ্রমর পদ, তাহার শক্তি, ভ্রমর পদার্থ যে মধুকর, তাহাতে আছে বলিয়া ইহাকে লক্ষিতলক্ষণা বলা হয়।

গৌণীলক্ষণার পরিচয়।

গৌণীলক্ষণা বলিতে সাদৃশ্যবিশেষই যে শক্যসম্বন্ধ তাহাকে বুঝায়। যেমন "অগ্নিঃ মানবকঃ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণশিশু অগ্নিসদৃশ। এস্থলে অগ্নি পদে অগ্নিসাদৃশ্যবিশিষ্টে লক্ষণা। সাদৃশ্য বলিতে ভেদজ্ঞানসহকারে যে তদ্‌গত ভূয়োধর্ম্ম, তদ্বত্ত্ব বুঝায়। সুতরাং এস্থলে ব্রাহ্মণশিশু যে অগ্নি নহে সে জ্ঞানও থাকে বুঝিতে হইবে।

বেদান্তমতে গৌণীলক্ষণা লক্ষিতলক্ষণারই অন্তর্ভুক্ত বলা হয়।

ব্যঞ্জনাবৃত্তি।

আলঙ্কারিকগণ শক্তি ও লক্ষণাবৃত্তি ব্যতীত পদের ব্যঞ্জনা নামক আর এক প্রকার বৃত্তি স্বীকার করেন। ন্যায়মতে তাহা লক্ষণারই অন্তর্গত। কারণ, মানস জ্ঞানেই ব্যঞ্জনার প্রয়োজন হয়। পদের শক্যার্থবোধের বা লক্ষ্যার্থবোধের অবশেষে যে বৃত্তিদ্বারা অন্যার্থের বোধ জন্মে, তাহার নাম ব্যঞ্জনা। অতএব ইহা শক্তিমূলা ব্যঞ্জনা ও লক্ষণামূলা ব্যঞ্জনাভেদে দ্বিবিধ হয়। যেমন "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" বাক্যে গঙ্গাপদে শৈত্যপাবনাদি অর্থ ব্যঞ্জনাবলে বুঝা যায়।

প্রয়োজনবতী লক্ষণা।

শক্তিবিশিষ্ট পদত্যাগ করিয়া লাক্ষণিক শব্দপ্রয়োগে যদি প্রয়োজন অর্থাৎ ফল হয়, তবে ইহাকে প্রয়োজনবতী লক্ষণা বলে। যেমন গঙ্গা-পদের তীরে যে লক্ষণা, তাহা প্রয়োজনবতী লক্ষণা। ইহাতে গঙ্গার ধর্ম্ম শীতত্ব ও পাবনত্বাদির প্রতীতি হয়। ন্যায়মতে ব্যঞ্জনা লক্ষণাবিশেষ।

নিরূঢ় লক্ষণা।

পদের যে অর্থে শক্তিবৃত্তি নাই, অথচ শক্যের ন্যায় যে পদ হইতে অর্থের প্রতীতি সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ, সেই অর্থে সেই পদের প্রয়োজনশূন্য লক্ষণাই নিরূঢ় লক্ষণা হয়। যেমন নীলাদি পদের গুণীতে যে প্রয়োজন-শূন্য লক্ষণা তাহা নিরূঢ় লক্ষণা। ইহাকে শক্তির সদৃশ বলা হইয়া থাকে।

শাব্দবোধের কারণ।

কোন বাক্য শুনিয়া যে শাব্দবোধ হয়, তাহার প্রতি চারিটী কারণ থাকে, যথা—১। যোগ্যতা, ২। আকাঙ্ক্ষা, ৩। আসত্তি এবং ৪। তাৎপর্য্যজ্ঞান। যে বাক্যে এই চারিটী থাকে না, তাহার অর্থবোধ হয় না। যেহেতু ইহারা বাক্যঘটক পদার্থের অন্বয়সাধনে সহায় হয়। মীমাংসক বা বেদান্তমতেও এইরূপই বলা হয়।

যোগ্যতার পরিচয়।

এক পদার্থে অপর পদার্থের যে বিদ্যমানতা, তাহার নাম যোগ্যতা।

এই যোগ্যতার জ্ঞানও শাব্দবোধের কারণ। অতএব "নৌকাদ্বারা নদীপার হইতেছে" অর্থাৎ নৌকাকরণক নদীপার হইতেছে—ইত্যাদি স্থলে শাব্দবোধ হয়। কারণ, নৌকাতে নদীপারের কারণত্ব আছে। তদ্রূপ "মূক পাঠ করিতেছে" ও "বধির শ্রবণ করিতেছে"—ইত্যাদি স্থলে শাব্দবোধ হয় না। কারণ, মূকে পাঠকর্তৃত্ব ও বধিরে শ্রবণকর্তৃত্ব নাই। অবশ্য যোগ্যতার ভ্রমে শাব্দবোধ হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয়—বাক্যার্থমধ্যে বাধের যে অভাব, তাহারই নাম যোগ্যতা।

বেদান্তমতে বলা হয়—বাক্যের যে তাৎপর্য্য সেই তাৎপর্য্যের বিষয় যে সংসর্গ, তাহার অবাধই যোগ্যতা।

আকাঙ্ক্ষার পরিচয়।

পদান্তর ব্যতিরেকে একটী পদের যে অন্বয়ের অননুভাবকতা, তাহাই আকাঙ্ক্ষা। অন্য কথায়—যে পদ ব্যতীত যে পদটী শাব্দবোধের জনক হয় না, সেই পদের সহিত সেই পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে। অর্থাৎ আনুপূর্ব্বীবিশেষ, সমভিব্যাহার ও অজনিতান্বয়ত্ব এই অংশ তিনটী যাহার ঘটক হয়, তাহাই আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষার জ্ঞান, শাব্দবোধের জনক হয়। আনুপূর্ব্বী অর্থ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণবিশিষ্ট চরমবর্ণত্ব। সমভিব্যাহার অর্থ—ক্রিয়াপদ ও কারকাদি পদের অব্যবধানে উপস্থিতি। অজনিতান্বয়ত্ব অর্থ—পূর্ব্বে কোন পদের সহিত অন্বয় না হইয়া যাওয়া।

বেদান্তমতে পরস্পরের জিজ্ঞাসাবিষয়ত্বের যে যোগ্যতা তাহাই আকাঙ্ক্ষা। যেমন ক্রিয়াশ্রবণে কারকের, কারকশ্রবণে ক্রিয়ার, করণশ্রবণে তাহার ইতিকর্ত্তব্যতার অর্থাৎ ব্যাপারের আকাংক্ষা।

আসত্তি বা সান্নিধ্যের পরিচয়।

অন্বয়ের প্রতিযোগী ও অনুযোগী পদদ্বয়ের যে অব্যবধান, অর্থাৎ যে পদের অর্থের সহিত যে পদের অর্থের অন্বয়ের অপেক্ষা হয়, সেই পদদ্বয়ের যে অব্যবধান, তাহাই আসত্তি। এতাদৃশ অব্যবধান বা আসত্তির জ্ঞানও শাব্দবোধের প্রতি একটী কারণ। যেমন এক প্রহরে

একজন "গাম্" শব্দ উচ্চারণ করিয়া আর এক প্রহরে যদি "আনয়" শব্দ উচ্চারণ করে, তাহা হইলে আসত্তিজ্ঞানের অভাবে শাব্দবোধ হয় না।

– বেদান্তমতে ইহা অব্যবধানে পরজন্য যে পদার্থোপস্থিতি তাহাকেই বুঝায়।

বহুপদাত্মক বাক্যেও আসত্তিজ্ঞান শাব্দবোধের হেতু।

যদি বলা যায়—বহু পদঘটিত বাক্যে আসত্তির জ্ঞান শাব্দবোধের কারণ হয় না; কারণ, জ্ঞান দ্বিক্ষণস্থায়ী হয়, এজন্য তাদৃশ বাক্যের শেষ পদের স্মরণকালে পূর্ব্বপদের স্মরণের নাশ হয়। যেমন "ছত্রযুক্ত কুণ্ডলবিশিষ্ট ও বস্ত্রসমন্বিত রাম গমন করিতেছেন" এই বাক্যে রাম পদের জ্ঞানকালে ছত্রযুক্তের জ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়, ইত্যাদি। এরূপ শঙ্কা অমূলক। কারণ, ঘটপটাদি নানা পদার্থে নানা চক্ষুঃসংযোগানন্তর ঘটপটাদি যাবৎপদার্থবিষয়ক এক সমূহালম্বন প্রত্যক্ষ যেমন হয়, তদ্রূপ উক্ত স্থলে প্রত্যেক পদের জ্ঞানানন্তর সর্ব্বশেষে প্রত্যেক পদের সংস্কার-জন্য যাবতীয় পদবিষয়ক এক সমূহালম্বন স্মরণ জন্মে। এস্থলে যাবতীয় পদের সংস্কার সাহিত চরম পদের জ্ঞানই উদ্বোধক হয়। ইহা অস্বীকার করিলে বহু বর্ণাত্মক পদের জ্ঞানও সম্ভব হয় না। এজন্য বহু পদঘটিত বাক্যেও আসত্তিজ্ঞান শাব্দবোধের হেতু হয়। উক্তরূপ সমূহালম্বন জ্ঞানের পর অন্বয়বোধ হয়, আর তাহাই শাব্দবোধ। এজন্য স্ফোটাত্মক শব্দ স্বীকার অনাবশ্যক।

স্ফোটবাদী পাণিনি ও পতঞ্জলির মতে ইহা আনুপূর্ব্বীক্রমে বিন্যস্ত বর্ণসমূহের দ্বারা ব্যক্তভাবপ্রাপ্ত অর্থবোধক নিরাকার শব্দবিশেষের নাম স্ফোট। "গো" এতদ্রূপ ধ্বনি হইলে তাহা হইতে প্রতিধ্বনির ন্যায় অন্য একটী নিঃশব্দ শব্দ জন্মে। তাহা "গো" ইত্যাকার জ্ঞানে ব্যক্ত হয়। সেই জ্ঞানময় গো শব্দই স্ফোট, ইহাই নিত্য। ইহারই সামর্থ্যে গলকম্বলযুক্ত পশুবিশেষের প্রতীতি হইয়া থাকে। "গো" এই ধ্বন্যাত্মক শব্দ যতবার উচ্চারিত হয়, ততবারই পৃথক্ পৃথক্ শব্দ উচ্চারিত হয়, এবং তাহারাও অনিত্য, কিন্তু স্ফোটাত্মক "গো"শব্দ নিত্য ও একই হয়। "ইহা সেই গো-শব্দ" ইহার দ্বারা ইহার অভিন্ন প্রমাণিত হয়। বর্ণ বা পদের সমূহালম্বনস্মরণদ্বারা স্ফোটের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। অবয়বসমষ্টি অবয়বী হইতে যেমন অতিরিক্ত, ইহাও আনুপূর্ব্বীসহকারে তদ্রূপ অতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার্য্য। পাণিনিমতে স্ফোট অষ্টবিধ, যথা—বর্ণস্ফোট, পদস্ফোট, বাক্যস্ফোট, অখণ্ডপদস্ফোট, অখণ্ডবাক্যস্ফোট, বর্ণজাতিস্ফোট, পদজাতিস্ফোট, বাক্যজাতিস্ফোট। মীমাংসকাচার্য্য উপবর্ষের মতানুসারে বেদান্তমতে কিন্তু বর্ণের নিত্যতা স্বীকার করায়, আর স্ফোট স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই বলা হয়। তখন আনুপূর্ব্বীবিশিষ্ট নিত্যবর্ণসমূহের সমূহালম্বনস্মরণই স্ফোটের স্থানীয় বলা হয়। সুতরাং নৈয়ায়িক, অধিকাংশ মীমাংসক এবং বেদান্তমতে স্ফোট অস্বীকার্য্য। বস্তুতঃ এই মতভেদ নাম মাত্র।

তাৎপর্য্যজ্ঞানের পরিচয়।

"এই বাক্যে এই অর্থের বোধ হউক"—এই প্রকার যে বক্তার ইচ্ছা তাহার নাম তাৎপর্য্য। এই তাৎপর্য্যের জ্ঞান শাব্দবোধের কারণ। অতএব ভোজনকালে লবণানয়নতাৎপর্য্যে "সৈন্ধব আনয়ন কর" এই বাক্যের "সৈন্ধব" পদের অর্থ—"সিন্ধুদেশীয় অশ্ব" না বুঝাইয়া "সৈন্ধব লবণ" বুঝাইল। এস্থলে তাৎপর্য্যলক্ষণোক্ত "বক্তা" পদে মনুষ্য এবং ঈশ্বর উভয়ই বুঝিতে হইবে। কারণ, শুকপক্ষীর বাক্য শুনিয়া যে শাব্দবোধ হয়, তাহাতে বক্তা জীবের ইচ্ছা থাকে না, কিন্তু তথায় ঈশ্বরেচ্ছাই থাকে।

তাৎপর্য্যজ্ঞানের কারণ।

তাৎপর্য্যজ্ঞানের প্রতি কারণ ছয় প্রকার হয়; যথা—অর্থ, প্রকরণ, লিঙ্গ, ঔচিত্য, দেশ ও কাল। অর্থ শব্দের অর্থ—শব্দের দ্বারা যে বিষয় বুঝায় তাহা। ইহা না জানিতে পারিলে, বক্তার অভিপ্রায়বোধ অসম্ভব। প্রকরণ অর্থ—যে প্রসঙ্গ চলিতেছে তাহা। যেমন ভোজন-প্রসঙ্গে বা ভোজনপ্রকরণে সৈন্ধব শব্দের অর্থনির্ণয়। লিঙ্গ অর্থে—চিহ্ন। যেমন কোন পদের কোন্ অর্থে তাৎপর্য্য, তজ্জন্ত সেই পদের বা তজ্জাতীয় তদর্থক পদের অন্যত্র যে অর্থে প্রয়োগাদি হইয়াছে তাহা। ঔচিত্য অর্থ—পূর্ব্বাপর বাক্যের সহিত সঙ্গতি। দেশ অর্থ—স্থান। কাল অর্থ—সময়। এই সকল বা ইহাদের অন্যতরের সাহায্যে বক্তার ইচ্ছা নির্ণীত হইয়া থাকে। অর্থাৎ নানার্থক শব্দের প্রয়োগে এই ছয় প্রকার কারণের অন্যতর কারণে তাৎপর্য্যজ্ঞান হয়।

বেদান্তমতে ইহা লৌকিকবাক্যের তাৎপর্য্যজ্ঞানের কারণ বলা হয়। অর্থাৎ বেদান্ত-মতে তাৎপর্য্যজ্ঞানের কারণ উপরি উক্ত আটটীও স্বীকার করায় আপত্তি নাই। তথাপি বৈদিকবাক্যে তাৎপর্য্যজ্ঞানের কারণ ছয়টী বলা হয়, যথা—১। উপক্রমোপসংহার, ২। অভ্যাস, ৩। অপূর্ব্বতা, ৪। ফল, ৫। অর্থবাদ এবং ৬। উপপত্তি। বৈদিকবাক্যের জন্য এই ছয়টী তাৎপর্য্যজ্ঞানের প্রতি কারণ। ইহার কারণ এমতে বক্তার ইচ্ছা তাৎপর্য্য নহে। যেহেতু বেদ অপৌরুষেয়, তাহার বক্তা নাই। এই হেতু লৌকিক ও বৈদিক বাক্যসাধারণ তাৎপর্য্যনির্ণয়ের উপায় তাঁহারা অন্ততপক্ষেও নির্ণয় করিয়াছেন। যথা—

২। অভ্যাস।

অভ্যাস অর্থ—পুনঃ পুনঃ কথন। গ্রন্থ বা প্রকরণমধ্যে যাহা পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়া থাকে, সেই বিষয়টীই তাহার তাৎপর্য্য হয়, আর তাহা এই অভ্যাসজ্ঞানদ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে। লৌকিকবাক্যাদিতে ইহাও বক্তার স্বভাববশেই প্রকটিত হইয়া পড়ে। কারণ, যে ব্যক্তি কোন কিছু বলিতে চাহে, সে নানারূপেই তাহা বলিয়া লোককে বুঝাইতে চাহে। বৃহদারণ্যকমধ্যে "স এষ নেতি নেতি আত্মা" (৩।৯।২৬) বাক্যটী অভ্যাস বাক্য। অতএব এই অভ্যাসবাক্য নির্ণয় করিতে পারিলে তাৎপর্য্যনির্ণয় সহজ হয়। ইহার সহিত উপক্রম-উপসংহারের ঐক্য থাকা আবশ্যক। এস্থলে তাহাও আছে, আর তজ্জন্য এস্থলে "জীবাভিন্ন এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম"ই তাৎপর্য্য হয়।

৩। অপূর্ব্বতা।

প্রমাণান্তরের অনধিগত বিষয়ই অপূর্ব্ব। গ্রন্থাদিমধ্যে যে বিষয়টীকে নূতন বলিয়া উল্লেখ করা হয়, বা 'অন্যত্র নাই ইহাতে বিশেষভাবে আলোচিত হইতেছে'—এইভাবে বর্ণিত হয়, তাহাই অপূর্ব্বতার বিষয় হয়। লৌকিকস্থলে বাস্তবিকই বক্তা বা লেখক নিজ বক্তব্যের বা গ্রন্থের যে বিশেষত্ব, তাহা কোথাও না কোথাও উল্লেখ করেনই। বৃহদারণ্যকে "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" (৩।৯।২৬) বাক্যটী অপূর্ব্বতার বোধক। এই অপূর্ব্বতার বোধক বাক্য নির্ণীত হইলে তাৎপর্য্যনির্ণয় সহজ হয়। ইহারও সহিত উপক্রমোপসংহার এবং অভ্যাসের ঐক্য থাকা আবশ্যক। তাহা এখানে আছে, আর তজ্জন্য উক্ত তাৎপর্য্যই এস্থলের তাৎপর্য্য বলা হয়।

৪। ফল।

গ্রন্থ বা গ্রন্থোক্ত প্রমেয়জ্ঞানের প্রয়োজনই এই ফল। লৌকিকস্থলে এই ফলের কথা বক্তা বা লেখক উল্লেখ করিয়াই থাকেন। বেদমধ্যেও সেই বেদোক্ত বিষয়ের জ্ঞানের ফল বা অনুষ্ঠানের ফল উক্ত হইতে দেখা যায়। অতএব ইহার দ্বারাও গ্রন্থ বা বক্তব্যের তাৎপর্য্য নির্ণীত হয়। বৃহদারণ্যকে "অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি" (৪।২।৪) "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" (৪।৪।৬) ইত্যাদি বাক্যগুলি ফলের বোধক। ইহারও সহিত পূর্ব্বোক্ত উপক্রমাদির ঐক্য থাকা আবশ্যক। আর বাস্তবিকই তাহা আছে, আর তজ্জন্য উক্ত তাৎপর্য্যই এস্থলের তাৎপর্য্য।

৬। উপপত্তি।

উপপত্তি অর্থ যুক্তি বা প্রমাণান্তরের সহিত অবিরোধ উপপাদন। গ্রন্থাদিতে ইহা থাকাও স্বাভাবিক। কারণ, যে বিষয়টী প্রতিপাদ্য হয়, তাহা বুঝাইবার জন্য যুক্তি বিচার প্রদর্শন করিতে দেখাই যায়। বেদমধ্যেও ইহা দেখা যায়। যেমন বৃহদারণ্যকে "স যথা দুন্দুভেঃ" (২।৪।৭) ইত্যাদি বাক্য। এজন্য যে বিষয়ের জন্য যুক্তি প্রদর্শিত হয়, তাহাতে গ্রন্থের তাৎপর্য্যই থাকে। এইরূপে এই ছয়টীর দ্বারা যে একটী বিষয় নির্ণীত হয়, তাহাই সেই গ্রন্থের বা প্রসঙ্গের তাৎপর্য্য হইয়া থাকে। এস্থলে তাহা আছে, আর তজ্জন্য বৃহদারণ্যকের এই প্রসঙ্গের তাৎপর্য্য হইল—"জীবাভিন্ন এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম"।

শব্দার্থের বলাবল বিচারদ্বারা অর্থ নির্ণয়।

কিন্তু অন্যান্বিতাভিধায়ক শব্দের অর্থনির্ণয়ের জন্য মীমাংসাশাস্ত্রমধ্যে বাক্যার্থের বলাবল বিচার করিবার একটী কৌশল অবলম্বিত আছে। ইহাতে ১। শ্রুতি, ২। লিঙ্গ, ৩। বাক্য, ৪। প্রকরণ, ৫। স্থান ও ৬। সমাখ্যা—এই ছয়টী বিষয়ের চিন্তা করিতে হয়। অর্থাৎ সমাখ্যাবলে যে বাক্যের যে অর্থ নির্ণীত হইবে, স্থানবলে নির্ণীত অর্থ তদপেক্ষা প্রবল হইবে। এইরূপে স্থান হইতে প্রকরণ, প্রকরণ হইতে বাক্য, বাক্য হইতে লিঙ্গ এবং লিঙ্গ হইতে শ্রুতিসিদ্ধ অর্থ বলবান হয়। ইহাদের বিবরণ এইরূপ—

১। শ্রুতি।

যাহা সাক্ষাদ্‌ভাবে অর্থাৎ অন্যের অপেক্ষা না করিয়া কোন অর্থাদির বোধক হয় তাহাই শ্রুতি। যেমন "দধ্না জুহোতি" অর্থাৎ দধির দ্বারা হোম করিবে—এই বাক্যে দধির দ্বারা যে হোমের বিধান, তাহা অন্যনিরপেক্ষ সাক্ষাদ্ "দধ্না" এই তৃতীয়ান্ত পদের দ্বারা বিধান। ইহা বস্তুতঃ কারক, বিভক্তিযুক্ত পদবিশেষই হয়। এস্থলে দধির দ্বারা হোম শ্রুতিবলেই লব্ধ হইল। যেহেতু দধিশব্দ কারকবিভক্তিযুক্ত হইয়া শ্রুত হইতেছে।

২। লিঙ্গ।

লিঙ্গ বলিতে সামর্থ্য বুঝায়। ইহা অবয়বযোগ্যতাবিশেষ। উহা আবার দ্বিবিধ, যথা—অর্থগত ও শব্দগত। অর্থগত লিঙ্গ, যথা—"স্রুবেণ অবদ্যতি", অর্থাৎ স্রুবপাত্রদ্বারা অবদান করিবে। স্রুব অর্থাৎ চামচাকৃতি পাত্রদ্বারা ঘৃতাদি তরল বস্তুর দানই সুবিধা। সুতরাং স্রুবপদের অর্থগত সামর্থ্য বা যোগ্যতার দ্বারা ঘৃতের দ্বারা হোম করিবে—এইরূপ অর্থ করিতে হয়। এখানে স্রুবপদের লিঙ্গবলে ঘৃত লাভ হইল। তদ্রূপ শব্দগত লিঙ্গ বলিতে অর্থপ্রকাশনসামর্থ্য বুঝায়। যেমন "অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি" অর্থাৎ "অগ্নি দেবতার উদ্দেশে তোমাকে আমি নির্বপন করিতেছি" এখানে নির্বাপ এই শব্দের সামর্থ্যদ্বারা নির্বপনটী বাধ্যস্ব বলিয়া বুঝা গেল।

৩। বাক্য।

অন্য পদের যে সমভিব্যাহার তাহার নাম বাক্য। আর শেষশেষিবাচক অর্থাৎ অঙ্গাঙ্গিবোধক পদদ্বয়ের যে সহোচ্চারণ তাহাই বাক্য। যেমন "ইষে ত্বা" এই মন্ত্রে "ছিনত্তি" এই পদের অধ্যাহার করিয়া "ছেদন ক্রিয়ার অঙ্গ বলিয়া এই মন্ত্র"—ইহা স্থির করা হয়। ইহা বাক্যবলেই হয়।

৪। প্রকরণ।

প্রকরণ অর্থ—পরস্পরাকাংক্ষা। যেমন "দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" এই মন্ত্রে প্রকরণবলে প্রযাজাদি যাগ সকল দর্শপৌর্ণমাসের অঙ্গ বলিয়া স্থির করা যায়।

৫। স্থান।

স্থান শব্দের অর্থ—সন্নিধি। যেমন সান্নায্য (অর্থাৎ ঘৃত) পাত্রের নিকট "শুন্ধধ্বম্" ইত্যাদি মন্ত্রের পাঠ থাকায় সান্নায্য পাত্রে প্রোক্ষণটী যাগের অঙ্গ বলিতে হয়।

৬। সমাখ্যা বা যৌগিকশব্দ।

সমাখ্যা শব্দের অর্থ—সংজ্ঞা। যেমন অধ্বর্যুকাণ্ডে প্রতিপাদিত কর্ম্মসমূহের আধ্বর্য্যব-সমাখ্যাবশতঃ অধ্বর্য্যুর কর্ত্তৃত্ব এস্থলে যাগের অঙ্গ বলিয়া বুঝিতে হয়।

অন্বয়প্রক্রিয়া।

বাক্যান্তর্গত পদসমূহ বিশেষ্য-বিশেষণভাবে সম্বদ্ধ হইলে পদার্থসমূহের মধ্যে অন্বয়জ্ঞান জন্মে। এই অন্বয়জ্ঞানই বাক্যার্থের জ্ঞান বলা হয়। এমন কি তিঙন্তপদকেও বিশেষণরূপে পরিণত করিতে হয়। যেমন "রামঃ গচ্ছতি" এই বাক্যের "গচ্ছতি" এই তিঙন্তপদকে "গমনক্রিয়াবান্" এইরূপ একটী বিশেষণ পদে পরিণত করিয়া "গমনক্রিয়াবান্ রামঃ" এই আকারে পরিণত করিলে যে অন্বয়বোধ হয়, তাহাই বাক্যার্থবোধ বলা হয়। ইহাতে "রামঃ" পদটী বিশেষ্য এবং "গমনক্রিয়াবান্" পদটী বিশেষণ। এইরূপ ভিন্নবিভক্ত্যন্ত কারক পদগুলিকেও বিশেষ্য-বিশেষণে পরিণত করিবার পর বাক্যার্থবোধ হয়। ইহার কারণ, প্রত্যেক ব্যবহারোপযোগী জ্ঞানই প্রকার বা বিশেষণবিশিষ্টই হয়, নিষ্প্রকারক জ্ঞানদ্বারা ব্যবহারই হয় না। এইরূপ বাক্যান্তর্গত পদগুলিও বিশেষ্য-বিশেষণরূপে একজাতীয় হইলে অন্বয়বোধ জন্মিয়া থাকে। এখন বিশেষ্য ও বিশেষণ-পদে একই বিভক্তি থাকে বলিয়া সেই এক বিভক্তি দেখিয়া তাহাদিগকে একত্র করা হয়, আর তৎপরে তাহাদের মধ্যে কে বিশেষণ ও কে বিশেষ্য তাহা স্থির করা হয়। তাহার পর বাক্যার্থজ্ঞান হয়। বস্তুতঃ, এইরূপ সেই একবিভক্ত্যন্ত পদসমূহের একত্র সংগ্রহ করাই অন্বয় বলিয়া উক্ত হয়। অবশ্য ইহা অভেদসম্বন্ধে অন্বয়স্থলেই হয়।

এজন্য শ্লোকাদিতে ইহা না করিতে পারিলে বাক্যার্থজ্ঞান হয় না। এইরূপ "চৈত্রঃ পচতি" অর্থ—"পাকানুকূল কৃতিবিশিষ্ট চৈত্র" বুঝায়। বৈয়াকরণমতে কিন্তু "চৈত্র পাকানুকূলকৃতিবিশিষ্ট হইতে অভিন্ন" এইরূপ অর্থবোধ হয়। যাহা হউক, ন্যায়মতে "রথঃ গচ্ছতি" অর্থ—উত্তরদেশ-সংযোগানুকূলব্যাপারবান্ রথঃ বা গমনাশ্রয়বান্ রথঃ। "দেবদত্তঃ নশ্যতি" অর্থ—ধ্বংসপ্রতিযোগী দেবদত্ত। "রামঃ চক্ষুষা পশ্যতি" অর্থ—"চক্ষু-করণকদর্শনক্রিয়াবান্ রাম" ইত্যাদি। এইরূপে অভেদসম্বন্ধে অন্বয়স্থলে ক্রিয়া ও কারকপদগুলিকে তাহাদের বিভক্তি অনুসারে তাহাদিগকে বিশেষণ ও বিশেষ্যে পরিণত করিয়া অর্থাৎ একবিভক্ত্যন্ত করিয়া একত্র সংগ্রহ করিবার পর আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতাদি থাকিলে অন্বয়বোধ হয়। আর যেখানে অভেদ সম্বন্ধে অন্বয় হয় না, সেখানে ক্রিয়া কারক ও তাহাদের বিশেষণগুলি একত্র হইলেই অন্বয়বোধ হয়; আর তাহাই বাক্যার্থ জ্ঞান বলা হয়।

সিদ্ধপদার্থশক্তিবাদ।

ন্যায়মতে কিন্তু সিদ্ধপদার্থেও পদের শক্তি স্বীকার করা হয়। কারণ, আদেশবোধক বাক্য না হইলেও অর্থবোধ হয়, ইহা স্বীকার করা হয়। যেমন "তোমার পুত্র জন্মিয়াছে" "তোমার ভ্রাতা আসিতেছে" ইত্যাদি বাক্য শুনিয়া শ্রোতার হর্ষাদি দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত আবাপ উদ্বাপ প্রক্রিয়ার দ্বারা কোন্ পদের কি অর্থ, তাহা বুঝা যায়—বলা হয়। ইহা বেদান্ত ও ভট্টমীমাংসামতেও স্বীকার করা হয়। সুতরাং কার্য্যান্বিতে শক্তি ইহারা স্বীকার করেন না। ইহাদের মতবাদের নাম "সিদ্ধপদার্থ-শক্তিবাদ" বা "অন্বিতপদার্থশক্তিবাদ" বলা হয়।

অভিহিতান্বয় বাদ।

ইহা ভট্ট মীমাংসকের মত। এ মতে পদ হইতে পদার্থানুভাবিকা একটী শক্তি জন্মে। ইহার দ্বারা পদার্থের অনুভব জন্মে। এই অনুভব স্মৃতিও নহে, এবং প্রসিদ্ধ অনুভবও নহে; ইহারই নাম "অভিধান"। এমতে অভিহিত পদার্থে যে একটী শক্তি আছে, সেই শক্তি স্বরূপতঃ বর্ত্তমান থাকিয়া বাক্যার্থ অনুভব করাইয়া দেয়। সুতরাং অন্বিতাভিধান মতের ন্যায় বাক্য আর বাক্যার্থের বোধক হয় না, পরন্তু অভিহিত পদার্থই অন্বিত হইয়া বাক্যার্থ বুঝাইয়া দেয়। অতএব বাক্য পদার্থদ্বারক যে জনকতা, সেই জনকতাকে লইয়া পরম্পরাসম্বন্ধে প্রমাণ হইয়া থাকে। আর এইরূপে এই মতটী সিদ্ধপদার্থশক্তিবাদীর মত বলা হয়। কিন্তু চিদানন্দ প্রভৃতির মতে উক্ত অভিধানটী স্মরণ বিশেষ, উহা স্মরণ ভিন্ন নহে—বলা হয়। পদটী সংস্কারের উদ্বোধনদ্বারাই পদার্থকে বুঝায়। এজন্ত ইহা স্মরণ বিশেষ। এই পদার্থ পরে লক্ষণার দ্বারা বাক্যার্থরূপ সম্বন্ধের বোধক হয়। আর পদের দ্বারা পদার্থের অভিধান বা স্মরণটী সামান্যজ্ঞান, এবং সম্বন্ধের জ্ঞানটী বিশেষজ্ঞান বলা হয়।

কানো যজেত" স্থলে সংসর্গই তাৎপর্যবিষয়; এবং কোথাও অখণ্ডস্বরূপ, যেমন "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি। অবশিষ্ট কথা বেদান্তমতে অভিহিতান্বয়বাদেরই অনুরূপ।

পদার্থান্বয় বাদ।

ন্যায়মতে অন্বিতাভিধান বা অভিহিতান্বয়বাদ—কিছুই স্বীকার করা হয় না। ন্যায়মতে পদশ্রবণজন্য পদার্থের স্মরণ হয়, তৎপরে বাক্যের শেষ পদের অর্থ-স্মরণকালে বাক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী অবশিষ্ট পদার্থের স্মরণ হইয়া একটা সমূহালম্বন স্মরণ হয়, আর তখন তাহাতে আকাঙ্ক্ষা যোগ্যতাদি থাকিলে অন্বয়বোধরূপ বাক্যার্থবোধ হয়। অর্থাৎ পদার্থই পরে সংসর্গরূপ বাক্যার্থের বোধ করায়।

অভিলাপ ও অভিলপ্যমান।

যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়, তাহার যখন শব্দদ্বারা বর্ণন আবশ্যক হয়, তখন সেই বিষয়টী অভিলপ্যমান বলা হয়, এবং সেই বর্ণনকে অভিলাপ বলা হয়। এই অভিলাপজন্য অভিলপ্যমান বিষয়টী প্রত্যক্ষের অনুগামী হয়। প্রত্যক্ষরূপ অনুভবদ্বারা ইহার নিয়মন হয়। অতএব অভিলাপের নিয়ামক অনুভবই হয়; কিন্তু শব্দমাত্রগম্য বিষয়ের নিয়ামক প্রত্যক্ষ হয় না—ইহাও বুঝিতে হইবে।

বেদের পরিচয়।

বেদ—সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া প্রমাণ। সুতরাং বেদ ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া পৌরুষেয়। এজন্য অনুমান করা হয়, যথা—বেদাঃ পৌরুষেয়াঃ, বাক্যত্বাৎ, ভারতাদিবৎ"। পূর্ব্বকল্পে বেদ যেরূপ ছিল, পরকল্পে ঠিক্ সেইরূপ ঈশ্বর রচনাই করেন, এজন্য বেদ পৌরুষেয়। অথচ বেদ পূর্ব্বকল্প হইতে পরকল্পে বিভিন্ন হইয়া যায় না। বর্ণ অনিত্য বলিয়া কল্পারম্ভে ঈশ্বরকে রচনা করিতে হয়, কিন্তু বর্ণঘটিত পদের আনুপূর্ব্বী ঠিক্ থাকে। এজন্য বেদ বলিতে "লৌকিক বাক্যভিন্ন বাক্য" বুঝায়।

মীমাংসকমতে বেদ—অপৌরুষেয় এবং নিত্য। কারণ, তন্মতে বর্ণ নিত্য। আর তদ্ঘটিত পদ ও বাক্য সকলই নিত্য। নৈয়ায়িক বর্ণ অনিত্য মানিয়াও তাহাদের আনুপূর্ব্বীর পরিবর্ত্তন মানেন না বলিয়া ফলতঃ বেদের অপৌরুষেয়ত্বই স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকের উক্ত বেদের পৌরুষেয়ত্ব-প্রতিপাদক অনুমানে মীমাংসক "স্মর্য্যমাণকর্তৃত্ব"কে উপাধি দিয়া তাঁহাদের অনুমানের দুষ্টতা প্রমাণিত করেন।

বেদান্তমতে বেদ—অপৌরুষেয় কিন্তু অনিত্য। তবে এই অনিত্য নৈয়ায়িকের অভিমত দ্বিক্ষণস্থায়ী বলিয়া অনিত্য নহে, কিন্তু কল্পান্তস্থায়ী বলিয়া অনিত্য। নিত্য কেবল ব্রহ্মই। বেদ সেরূপ নিত্য নহে বলিয়া অনিত্য।

বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব।

বেদের নিত্যতার মধ্যে বেদই প্রমাণ, যথা—"বাচা বিরূপ নিত্যয়া"। "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং, যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ", ইত্যাদি। অন্যত্র কঠোপনিষদে আছে—"নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্" স্মৃতিতে আছে—"অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা" ইতি। ইহাতে যুক্তিও আছে—অর্থ জানিয়া শব্দরচনা হয়, এজন্য বেদরচনার পূর্ব্বে বেদার্থজ্ঞান আবশ্যক। আর বেদার্থজ্ঞান বেদাতিরিক্ত প্রমাণদ্বারা সম্ভাবিত নহে। কারণ, বিদ্যমানবিষয়ক প্রত্যক্ষ ভাবী ধর্ম্মের গ্রাহক হয় না। অনুমানাদিও প্রত্যক্ষমূলক বলিয়া তাহারাও বেদার্থজ্ঞানে প্রমাণ হয় না।

বেদ বিভাগ।

বেদমধ্যে তিনটি কাণ্ড আছে, যথা—কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ডে যাগাদির উপদেশ, উপাসনাকাণ্ডে পূজা ও উপাসনার উপদেশ এবং জ্ঞানকাণ্ডে জীব জগৎ ব্রহ্ম ও মুক্তিপ্রভৃতির স্বরূপ নির্দ্দেশ আছে। কর্ম্ম ও উপাসনা পুরুষতন্ত্র, জ্ঞান বস্তুতন্ত্র।

মীমাংসকমতে বেদের দুইটী কাণ্ড, যথা—কর্ম্মকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ড। অথবা ইহা ধর্ম্মমাত্রেরই প্রতিপাদক, সুতরাং কর্ম্মনামক একই কাণ্ডাত্মক। জ্ঞানকাণ্ড অস্বীকার্য্য। জীব জগৎ ও ব্রহ্মের স্বরূপবর্ণন যজ্ঞকালে চিন্তা করিবার জন্য। এরূপ চিন্তায় যজ্ঞ পূর্ণ হয়। সুতরাং উহা কর্ম্মেরই অঙ্গ।

বেদান্তমতে ন্যায়মতানুরূপ তিনটী কাণ্ডই স্বীকার করা হয়। জীব জগৎ ও ব্রহ্মস্বরূপ-কথন যজ্ঞকালে চিন্তার জন্য নহে। কর্ম্মের ফল স্বর্গাদি অনিত্য, জ্ঞানফল মোক্ষ নিত্য—ইত্যাদি বেদমধ্যেই উক্ত হওয়ায় জ্ঞানকাণ্ডকে একটী পৃথক্ কাণ্ড বলা হয়।

বেদের সংহিতাদি বিভাগ। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ।

বেদের অন্যরূপ বিভাগও আছে, যথা—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। যাগাদির অনুষ্ঠানকালে অর্থস্মরণের হেতুরূপে যে বেদভাগের উপযোগিতা, তাহা বেদের মন্ত্রভাগ। ইহার অপর নাম সংহিতাভাগ। আর যাহাতে মন্ত্রের অর্থ ও প্রয়োগাদি উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার নাম ব্রাহ্মণভাগ। এই উভয় মিলিয়া বেদ। ব্রাহ্মণভাগের যে অংশ অরণ্যবাসের উপযোগী, তাহার নাম আরণ্যক। আর যে অংশে উক্ত যাগাদির স্তুতিনিন্দাদি আছে তাহার নাম অর্থবাদ। কেহ কেহ ইহাকে পৃথক্ একটী ভাগ বলেন।

বেদান্ত ও বেদান্তদর্শন।

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগের যে শেষ অংশ, তাহার নাম উপনিষৎ বা বেদান্ত। এই বেদান্তের একবাক্যতা করিয়া যে সূত্রগ্রন্থ ব্যাসদেবাদি ঋষিগণ রচনা করিয়াছেন, তাহার নাম বেদান্তদর্শন। উহা বেদ নহে। উহা স্মৃতি, অনিত্য ও পৌরুষেয়। তদ্রূপ কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে একবাক্যতা করিয়া বেদার্থবিচার যে গ্রন্থে আছে, তাহার নাম পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন। ইহা জৈমিনিপ্রণীত। ইহাও সূত্রাত্মক গ্রন্থ ও পৌরুষেয়, বেদ নহে।

বেদের ঋক্‌সামাদি বিভাগ।

বেদের সংহিতাভাগ আবার ত্রিবিধ, যথা—ঋক্, যজুঃ ও সাম। ঋক্ বলিতে শ্লোক, যজুঃ বলিতে গদ্য এবং সাম বলিতে গান বুঝায়। ব্রাহ্মণভাগে গদ্য ও পদ্য দুই থাকে। ইহা সংহিতার ব্যাখ্যা বিশেষ। সকলই বেদ, আর সকলই নিত্য ও অপৌরুষেয়।

যাগোপযোগিরূপে বেদের ঋগাদি বিভাগ।

যাগাদি সম্পাদনের জন্য যে চারিজন পুরোহিতের আবশ্যকতা অনিবার্য, তন্মধ্যে একজন বেদের ঋক্‌ভাগ পাঠ করেন, অপরে বেদের যজুঃভাগ পাঠ করেন, তৃতীয় ব্যক্তি বেদের সামভাগ গান করেন এবং চতুর্থ ব্যক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান পরিদর্শন করেন। এই চারিজনের কর্ত্তব্য-সম্পাদনের জন্য বেদকে ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ নামে চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। ঋকের পুরোহিতকে হোতা, যজুর পুরোহিতকে অধ্বর্য্যু, সামের পুরোহিতকে উদ্গাতা এবং অথর্ব্ববেদের পুরোহিতকে ব্রহ্মা বলা হয়। এই চারিবেদের প্রত্যেক বেদেই মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ আছে। আর তাহাদের উপনিষদও আছে।

বেদের শাখাভেদ।

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের পাঠভেদে বেদের শাখাভেদ হইয়াছে। বেদব্যাসের সময় ঋগ্‌বেদের ২১ শাখা, যজুর্ব্বেদে ১০৯ শাখা, সামবেদের ১০০০ শাখা এবং অথর্ব্ববেদের ৫০ শাখা ছিল। সুতরাং উপনিষদ্ ১১৮০ খানি ছিল।

বেদের নাম শ্রুতি।

বেদ গুরুমুখে শুনিয়া শিখিতে হয়, এজন্য ইহার নাম শ্রুতি। অনধিকারীর অধিকারে আসিবে বলিয়া ইহা প্রথমে লিখিত হইত না। কালে ব্রাহ্মণগণ অধিকারহীন হওয়ায় বেদলিখন আরম্ভ হয়। বেদ নিজে নিজে পড়িলে অর্থবোধ হইতে পারে, কিন্তু বেদপাঠের ফল হয় না। সেরূপ পাঠ—ইতিহাস ও পুরাণপাঠ বিশেষ।

বেদোক্ত ইতিহাস পুরাণাদি।

বেদমধ্যে ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যা ও অনুব্যাখ্যারূপ অষ্টটী অংশ আছে। ইতিহাস ও পুরাণ অর্থবাদের অন্তর্গত। সেই সব ইতিহাস ও পুরাণাদি অবলম্বনে ঋষিগণ ইতিহাস ও পুরাণাদি রচনা করিয়াছেন। ঋষিরচিত এই সব ইতিহাস ও পুরাণাদি পৌরুষেয় ও স্মৃতিশাস্ত্র বিশেষ।

বেদের পৌরুষেয়ত্বাদি সংশয় নিরাস।

এই সব ইতিহাস ও পুরাণাদি অনুসারে পৃথিবীতে, বিশেষতঃ বেদপ্রধান ভারতবর্ষে, দেশ, নদ, নদী, পর্ব্বত, রাজবংশ ও ঋষিবংশ প্রভৃতির নামকরণও হইয়াছে এবং ব্যবহারশিক্ষাও হইয়াছে। কিন্তু ম্লেচ্ছভাবাপন্ন আধুনিকগণ মনে করেন—বেদমধ্যে ঐতিহাসিক দেশ ও ব্যক্তি প্রভৃতির নাম থাকায়, বেদ ঐ সব দেশ ও ব্যক্তির জন্মের পরে মনুষ্যকর্ত্তৃক রচিত। কিন্তু তাহা নহে। তাহাদের নামই বেদোক্ত নাম অনুসারে রক্ষিত। বেদ—নিত্য অপৌরুষেয়।

বেদের শাস্ত্রত্ব।

শাস্ত্র বলিতে বেদই বুঝায়। স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ ও দর্শনাদি বেদমূলক বলিয়া প্রমাণ ও শাস্ত্রনামে অভিহিত হয়। বস্তুতঃ আসল মূলশাস্ত্র বেদই।

বেদমূলক শাস্ত্রসমূহের পরিচয়।

বেদমূলক শাস্ত্রসমূহ বহু। চার্ব্বাক ও বৌদ্ধাদি নাস্তিক শাস্ত্রসমূহও বেদমূলক হইলেও বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করে বলিয়া তাহাদিগকে শাস্ত্র নামে অভিহিত করা হয় না। চার্ব্বাক ও বৌদ্ধাদিমতের বীজ বেদমধ্যেই দৃষ্ট হয়। এজন্য বেদান্তসার গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। যে সমস্ত বেদপ্রামাণ্যস্বীকারকারী শাস্ত্র, তাহারাই "আস্তিক শাস্ত্র" নামে উক্ত হয়। তাহাদের বিভাগাদি এইরূপ,—

মীমাংসাদর্শনের পরিচয়।

ইহাদের মধ্যে মীমাংসাদর্শন খানিই বেদার্থনির্ণয়চ্ছলে কর্ম্ম ও ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ণয় করিয়া থাকে। অন্য দর্শনগুলি বেদার্থনির্ণয় করিবার জন্য যত্ন করে নাই। এই মীমাংসাদর্শন দুইখানি, যথা—কর্ম্মমীমাংসা এবং ব্রহ্মমীমাংসা। এই মীমাংসাদ্বয়ের মধ্যে কর্ম্মমীমাংসা খানি আবার বেদার্থনির্ণয়ের জন্য যে সকল কৌশল অবলম্বন করিয়াছে, তাহা ব্রহ্মমীমাংসা-দর্শনেরও স্বীকার্য্য। ব্রহ্মমীমাংসা নিজত্বপ্রতিপাদনভিন্ন স্থলে কর্ম্ম-মীমাংসার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে। বেদার্থ মীমাংসারূপে ইহারা একশাস্ত্র কিন্তু প্রতিপাদ্যানুসারে ইহারা পৃথক্ শাস্ত্র।

কর্ম্মমীমাংসার পরিচয়।

এই কর্ম্মমীমাংসামধ্যে দুইটী কার্য্য করা হইয়াছে। প্রথম,—বেদবাক্যের প্রকারভেদনির্ণয় এবং দ্বিতীয়,—বেদবাক্যের মধ্যে আপাত-বিরোধের পরিহারপূর্ব্বক পরস্পরের একবাক্যতাসাধন। আর এইজন্য এক সহস্র বিচার বা ন্যায় রচিত হইয়াছে। প্রথম, যে বেদবাক্যের প্রকারভেদ, তাহা একটী চিত্রসাহায্যে পরপৃষ্ঠে প্রদত্ত হইল। তন্মধ্যে মুখ্য কয়েকটী বিষয়ের পরিচয় এই—

বেদবাক্যের প্রকারভেদ।

বেদবাক্য বলিতে সংহিতা ও ব্রাহ্মণাত্মক বাক্য বুঝিতে হইবে। ইহারা উভয়েই কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানের বোধক। এই বেদবাক্য বিধি, নিষেধ ও অর্থবাদ—এই তিনভাগে বিভক্ত।

বিধি অর্থ—অজ্ঞাতজ্ঞাপক। যাহা বেদাতিরিক্ত কোনও প্রমাণ দ্বারা জানা যায় না, তাহাই যাহা জানায় তাহাই বিধি।

নিষেধ অর্থ—যাহা করা উচিত নহে বা নাই, তাহার যাহা জ্ঞাপক তাহাই নিষেধ। চিত্রমধ্যে ইহাকে বিধির অন্তর্গত করা হইয়াছে।

অর্থবাদ অর্থ—যে বাক্য বিহিত বা নিষিদ্ধ বাক্যের স্তুতি বা

বেদবাক্য (কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানাত্মক)

- মন্ত্র
- ব্রাহ্মণ
  - বিধি
    - অপূর্ব্ব
      - উৎপত্তি
        - কেবলকর্ম্মোৎপত্তি
          - নিত্য (৬)
          - নৈমিত্তিক (৭)
          - কাম্য (৮)
        - সগুণকর্ম্মোৎপত্তি
          - নিত্য
          - নৈমিত্তিক
          - কাম্য
      - বিনিয়োগ
        - সিদ্ধবস্তুপর
          - ফলায় গুণ (৯)
          - যাগায় গুণ (১০)
            - উৎপাদ্য (১৩)
            - বিকার্য্য (১৪)
            - সংস্কার্য্য (১৫)
            - আপ্য (১৬)
        - ক্রিয়াপর
          - গুণকর্ম্ম (১১)
          - প্রধানের গুণভূত কর্ম্ম (১২)
      - অধিকার (২)
      - প্রয়োগ (৩)
    - নিয়ম (১)
    - পরিসংখ্যা
      - শ্রৌতী (৪)
      - লাক্ষণিকী (৫)
  - অর্থবাদ
    - প্রাশস্ত্য
    - নিন্দা
    - পরকৃতি (১৭)
    - পুরাকল্প (১৮)
      - গুণবাদ (১৯)
      - অনুবাদ (২০)
      - ভূতার্থবাদ (২১)

নিন্দাকে লক্ষ্য করে, তাহাই অর্থবাদ। এই অর্থবাদ বাক্যের নিজ অর্থে তাৎপর্য্য নাই। কিন্তু লক্ষণাদ্বারা কোন বিধি বা নিষেধবাক্যের সহিত মিলিত হইয়া তাহার স্তুতি বা নিন্দা প্রকাশ করে। অর্থবাদবাক্য দ্বারা বিধি বা নিষেধের কল্পনাও করিতে হয়। ইহা ত্রিবিধ, যথা—গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ।

গুণবাদ—অন্যপ্রমাণ বিরুদ্ধ থাকিলে অর্থবাদটী গুণবাদ হয়। যেমন "আদিত্যঃ যূপঃ"। অর্থাৎ সূর্য্য যূপ। যজ্ঞার্থ পশুবন্ধনার্থ কাষ্ঠকে যূপ বলে। তাহাকে সূর্য্য বলা প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। অতএব আদিত্যের ন্যায় যূপটী উজ্জ্বল করিবে বা এইরূপ ভাবিবে—এজন্য উহা উক্ত, এইরূপই উহার অর্থ বুঝিতে হইবে। গুণবাদবাক্যের তাৎপর্য্য এইরূপে অবধৃত হয়।

অনুবাদ—অন্যপ্রমাণদ্বারা অবগত যে অর্থ, তাদৃশ অর্থবোধক-

বাক্য। যেমন "অগ্নিঃ হিমস্ত ভেষজম্"। ইহা প্রত্যক্ষদ্বারা জ্ঞাত; এজন্য ইহা অনুবাদ। ইহারও অর্থ—যজ্ঞাগ্নিতে শ্রদ্ধাবুদ্ধি উৎপাদনমাত্র।

ভূতার্থবাদ—যে অর্থ টী প্রমাণান্তরের বিরুদ্ধ নয়, অথচ তাহার জ্ঞান নাই, তাদৃশ অর্থবোধক বাক্যই ভূতার্থবাদ। যেমন—"ইন্দ্রঃ বৃত্রায় বজ্রম্ উদযচ্ছৎ"। অর্থাৎ ইন্দ্র বৃত্রবধার্থ বজ্র উদ্যত করিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্তটি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিরোধী, অথচ অন্য প্রমাণদ্বারা অপ্রাপ্ত। ইহাতেও দেবতার স্তুতি বুঝায়, কিন্তু নিজ অর্থেও প্রামাণ্য থাকে বলা হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রের ঐ কার্য্যটীও সত্য। বেদান্তবাক্য ইহার অন্তর্গত। ইহাতে ব্রহ্ম ও আত্মবিষয়ক যে সব কথা, তাহাতে এজন্য যে তাৎপর্য্য নাই, তাহা নহে। কারণ, ইহাদের স্বার্থে প্রামাণ্য না থাকিলে ব্রহ্ম ও আত্মবিষয়ক তত্ত্বগুলির সত্যতা সিদ্ধ হইতে পারিত না।

বিধি প্রভৃতির বিভাগের অর্থ ও দৃষ্টান্ত মীমাংসাপরিভাষা প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে জ্ঞাতব্য। উক্ত চিত্রসাহায্যে বিধি ও অর্থবাদের অবান্তর বিভাগাদি বুঝিতে পারা যাইবে। এতদ্দ্বারা বেদবাক্যের প্রকারভেদ জানা যায় আর তাহারা যে পরস্পর বিরোধি নহে তাহাও বুঝা যায়।

বেদার্থনির্ণয়ের জন্য মীমাংসাসম্মত ন্যায়।

অতঃপর বেদবাক্যের মধ্যে আপাতবিরোধ মীমাংসার জন্য পূর্ব্ব-মীমাংসামধ্যে যে সহস্র ন্যায় বা বিচার প্রদর্শন করা হইয়াছে, এবং উত্তর-মীমাংসামধ্যে যে ১৯২টী ন্যায় বা বিচার প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহাই আলোচ্য। ইহা বস্তুতঃ একটী অপূর্ব্ব কৌশল বিশেষ। ইহাদের পরিচয় জৈমিনীয় ন্যায়মালামধ্যে এবং বৈয়াসিকন্যায়মালামধ্যে দ্রষ্টব্য।

উত্তরমীমাংসাসম্মত ন্যায়ের অবয়ব।

এই ন্যায়ের পাঁচটী অবয়ব, যথা—সঙ্গতি, বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ এবং সিদ্ধান্তপক্ষ। মতান্তরে সঙ্গতির পরিবর্ত্তে ফলনামক আর একটী অঙ্গ আছে। উক্ত সঙ্গতিমধ্যেও আবার অবান্তর বিভাগও আছে,

যথা—শ্রুতিসঙ্গতি, শাস্ত্রসঙ্গতি, অধ্যায়সঙ্গতি, পাদসঙ্গতি এবং অধিকরণসঙ্গতি। তন্মধ্যে অধিকরণসঙ্গতি আবার চারি প্রকার, যথা—আক্ষেপসঙ্গতি, দৃষ্টান্তসঙ্গতি, প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি এবং প্রাসঙ্গিকসঙ্গতি। এতদ্ব্যতীত ন্যায়শাস্ত্রীয় ছয় প্রকার সঙ্গতিও এই ন্যায়মধ্যে গৃহীত হইয়া থাকে। উহারা—প্রসঙ্গ, উপোদ্ঘাত, হেতুতা, অবসর, একনির্ব্বাহকনির্ব্বাহ্যত্ব এবং এককার্য্যকারিত্ব। এই ন্যায়গুলির অপর নাম অধিকরণ।

বেদান্তের জিজ্ঞাসাধিকরণ।

বেদান্তদর্শনের প্রথম ন্যায় বা অধিকরণের নাম "জিজ্ঞাসা অধিকরণ"। ইহার উক্ত অঙ্গগুলি এইরূপ—

বিষয়—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতি।

সংশয়—ব্রহ্ম বিচার্য্য কি অবিচার্য্য।

পূর্ব্বপক্ষ—ব্রহ্ম অবিচার্য্য।

সিদ্ধান্ত—ব্রহ্ম বিচার্য্য।

ফল—আত্মদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন।

সঙ্গতি—শ্রুতির মীমাংসা থাকায় শ্রুতিসঙ্গতি, ব্রহ্মবিষয়ক মীমাংসা বলিয়া শাস্ত্রসঙ্গতি, এইরূপ অপরাপর সঙ্গতিও আছে। বিশেষ বৈয়াসিকন্যায়মালা বা রত্নপ্রভা টীকামধ্যে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বমীমাংসার অপচ্ছেদাধিকরণ।

অপচ্ছেদন্যায়—জ্যোতিষ্টোম যাগে পুরোহিতগণকে একে অপরের 'কচ্ছ' ধরিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যাইতে হয়। এই গমনসময়ে যদি উদ্গাতা নামক পুরোহিত অপরের কচ্ছ ছাড়িয়া দেন এবং তৎপরে তাঁহার পরবর্ত্তী প্রতিহর্ত্তা নামক পুরোহিত উদ্গাতার কচ্ছ ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এখন উদ্গাতা উহা ছাড়িয়া দিলে দক্ষিণা না দিয়া যজ্ঞটী শেষ করিয়া আবার সেই যজ্ঞ করিতে হয়। এবং প্রতিহর্ত্তা উহা ছাড়িয়া দিলে সর্ব্বস্বদক্ষিণ নামক যাগ করিতে হয়—

এইরূপ বিধি আছে। কিন্তু যদি একসঙ্গে উভয়েই পূর্ব্বপূর্ব্ব ব্যক্তির বস্ত্র ছাড়িয়া দেন, তবে কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে ? ইহাই প্রশ্ন হইল। ইহাতে নিয়ম করা হইল—নিমিত্তদ্বয়ের পৌর্ব্বাপর্য্য হইলে পূর্ব্ব হইতে পরবর্ত্তী বলীয়ান্ হয়। ইহাই স্বাভাবিক বলিয়া প্রতিহর্ত্তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত যে সর্ব্বস্বদক্ষিণ যাগ তাহাই করিতে হইবে। ইহার পরিচয় মূলগ্রন্থে— ৬।৫।৪৯—৫৫ সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বিষয়াদি এইরূপ—

বিষয়—"যদ্যুদ্গাতা অপচ্ছিদ্যেত অদক্ষিণেন যজেত"।

"যদি প্রতিহর্ত্তা অপচ্ছিদ্যেত সর্ব্বস্বং দদ্যাৎ" ইত্যাদি।

সংশয়—কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে ?

পূর্ব্বপক্ষ—প্রায়শ্চিত্ত নাই।

সিদ্ধান্তপক্ষ—সর্ব্বদক্ষিণ যাগ অনুষ্ঠেয়।

সঙ্গতি এবং ফল বাহুল্যভয়ে পরিত্যক্ত হইল। যাহা হউক এখানে যেমন পূর্ব্বের সহিত পরবর্ত্তী নিয়মের বিরোধ হওয়ায় পূর্ব্বটী দুর্ব্বল হইল, তদ্রূপ জগতের সত্যত্বপ্রত্যক্ষ পূর্ব্বভাবী হইলেও পরবর্ত্তী বেদান্ত-জ্ঞানদ্বারা তাহার বাধ হইবে—ইহা বেদান্তবিচারেও গৃহীত হইল।

এইরূপ সংখ্যাতীত স্বাভাবিক নিয়মের আবিষ্কারদ্বারা বেদবাক্যের আপাতবিরুদ্ধ অর্থের মীমাংসার কৌশল এই মীমাংসামধ্যে আছে। এই সব স্বাভাবিক নিয়ম জানা থাকিলে অনুরূপ সংশয় হইলে ইহাদের প্রয়োগে সংশয়ের সংশয় মীমাংসা করা যায়। পূর্ব্বমীমাংসার সকল কৌশলই প্রায় বেদান্তমধ্যে প্রচুর পরিমাণে পরিগৃহীত। ইহাই হইল শাস্ত্র পরিচয়।

অর্থাপত্তি-পরিচয়।

ন্যায়মতে ইহা ব্যতিরেক ব্যাপ্তিদ্বারা চরিতার্থ হয়, এজন্য ইহাকে পৃথক্ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হয় না।

বেদান্ত ও মীমাংসক মতে কিন্তু ইহাকে পৃথক্ প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করা হয়। ইহার পরিচয় এইরূপ—

অর্থাপত্তি প্রমা এবং অর্থাপত্তি প্রমাণ সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনুমিতির পরিচয়প্রসঙ্গে কতকটা আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে উহার বিষয় একটু বিশেষভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

অর্থাপত্তি প্রমা ও প্রমাণ।

উপপাদ্য জ্ঞানদ্বারা যে উপপাদককল্পনা, তাহারই নাম অর্থাপত্তি প্রমা। ইহার যে করণ, তাহারও নাম অর্থাপত্তি। আর তাহা হইলে উপপাদ্য জ্ঞানটী করণ বা প্রমাণ, আর উপপাদকের জ্ঞানটী ফল বা অর্থাপত্তি প্রমা। এস্থলে করণটী ব্যাপারহীন। প্রমা-পক্ষে "অর্থের আপত্তি অর্থাৎ কল্পনা" এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হইবে, এবং প্রমাণ-পক্ষে "অর্থের আপত্তি অর্থাৎ কল্পনা যাহা হইতে"—এইরূপ বহুব্রীহি সমাস হইবে। প্রত্যক্ষস্থলে যেমন "আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি" অনুমিতিস্থলে যেমন "আমি অনুমান করিতেছি" বলিয়া অনুব্যবসায় হয়, তদ্রূপ অর্থাপত্তিস্থলে "আমি কল্পনা করিতেছি" এইরূপ অনুব্যবসায় হয়।

উপপাদ্য ও উপপাদক পরিচয়।

যাহা ব্যতিরেকে কোন কিছু অনুপপন্ন, সেই অনুপপন্ন বস্তুটী সেই স্থলে উপপাদ্য। আর যাহার অভাববশতঃ কোন কিছুর অনুপপত্তি হয়, তাহা সেস্থলে উপপাদক। যেমন রাত্রিভোজন ব্যতীত দিবাতে অভোজী ব্যক্তির স্থূলত্ব অনুপপন্ন, এজন্য এই স্থূলত্ব উপপাদ্য, আর রাত্রিভোজনাভাবে তাদৃশ স্থূলত্বের অনুপপত্তি হয়, এজন্য রাত্রিভোজনটী উপপাদক বলা হয়। ন্যায়ের ভাষায় উপপাদকাভাব ব্যাপকাভাব-প্রতিযোগিত্বই উপপাদ্যত্ব এবং উপপাদ্যাভাবব্যাপ্যাভাবপ্রতিযোগিত্বই উপপাদকত্ব বুঝিতে হইবে। এস্থলে স্থূলতার দ্বারা রাত্রিভোজনের কল্পনা করা হয় বলিয়া উপপাদ্য জ্ঞানদ্বারা উপপাদকের কল্পনা করা হয়। এজন্য যেরূপ বাক্যরচনা করা হয়, তাহা এই—

স্থূল দেবদত্ত রাত্রিভোজী … (উপপাদক)

যেহেতু দিবাভোজনহীনের রাত্রিভোজন ব্যতীত স্থূলত্ব অনুপপন্ন … (উপপাদ্য)

এস্থলে উপপাদ্য বিনা উপপাদক অনুপপন্ন এই উপপাদ্য জ্ঞানদ্বারা উপপাদকের জ্ঞান হয় বলিয়া অনুপপত্তিজ্ঞানই করণ বলা হয়।

অর্থাপত্তির বিভাগ।

অর্থাপত্তি দ্বিবিধ, যথা—দৃষ্টার্থাপত্তি ও শ্রুতার্থাপত্তি। তন্মধ্যে শ্রুতার্থাপত্তি আবার দ্বিবিধ, যথা—অভিধানানুপপত্তিরূপা এবং অভিহিতানুপপত্তিরূপা।

দৃষ্টার্থাপত্তির পরিচয়।

দৃষ্টার্থাপত্তি বলিতে দৃষ্টবিষয়ক অনুপপত্তিবশতঃ যে উপপাদ্যজ্ঞানদ্বারা উপপাদকের কল্পনা, তাহাই দৃষ্টার্থাপত্তি। যেমন শুক্তিতে "ইহা রজত" বলিয়া জ্ঞানের "ইহা রজত নহে" এই জ্ঞান হইলে ইদং-পদবাচ্য পুরোবর্ত্তি শুক্তিতে যে রজতের নিষেধ, সেই নিষেধটী রজতের সত্ত্বে বা সত্যতায় অনুপপন্ন হয়, এজন্য রজতের মিথ্যাত্ব বা সত্যতাত্যন্তাভাববত্ত্ব-রূপ মিথ্যাত্ব কল্পনা করা আবশ্যক হয়। এস্থলে রজতের মিথ্যাত্বব্যতিরেকে রজতের নিষেধ অনুপপন্ন বলিয়া উপপাদ্য হইল—রজতের নিষেধ, এবং উপপাদক হইল—রজতের মিথ্যাত্ব। সুতরাং রজতনিষেধরূপ উপপাদ্য-জ্ঞানদ্বারা রজতমিথ্যাত্বরূপ উপপাদকের কল্পনা এই অর্থাপত্তিদ্বারা করা হইল। অথবা রাত্রিভোজনব্যতীত দিবা অভোজীব্যক্তির

স্থুলত্ব অনুপপন্ন, এই দৃষ্টান্তে উপপাদ্য "স্থূলত্বে"র অনুপপত্তিজ্ঞানদ্বারা রাত্রিভোজনরূপ উপপাদকের কল্পনা—ইহা এই দৃষ্টার্থাপত্তির দ্বারা করা হইল।

শ্রুতার্থাপত্তির পরিচয়।

বাক্যশ্রবণান্তর যখন উপপাদ্যজ্ঞানদ্বারা উপপাদককল্পনারূপ অর্থাপত্তিদ্বারা কোন কিছুর কল্পনা করা যায়, তখন শ্রুতার্থাপত্তি হয়। ইহা আবার লৌকিক ও বৈদিকভেদে দ্বিবিধ, যথা—

লৌকিক শ্রুতার্থাপত্তি।

লৌকিক শ্রুতার্থাপত্তি, যথা—জীবিত দেবদত্ত গৃহে নাই, এই কথা শুনিয়া যখন "দেবদত্ত বাহিরে আছে" কল্পনা করা যায় তখন ইহা লৌকিকবাক্যজন্য বলিয়া ইহা লৌকিক শ্রুতার্থাপত্তি বলা হয়।

বৈদিক শ্রুতার্থাপত্তি।

বৈদিক শ্রুতার্থাপত্তি, যথা—"তরতি শোকম্ আত্মবিৎ" এই শ্রুতিবাক্য শুনিয়া যখন শোক-শব্দবাচ্য বন্ধের জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বের অন্যথানুপপত্তিপ্রযুক্ত বন্ধের মিথ্যাত্ব কল্পনা করা হয়, তখন ইহা বৈদিকবাক্যজন্য বলিয়া বৈদিক শ্রুতার্থাপত্তি হয়।

শ্রুতার্থাপত্তির অন্যরূপ ভেদ।

এই শ্রুতার্থাপত্তি আবার অভিধানানুপপত্তিরূপ ও অভিহিতানুপপত্তিরূপভেদে দ্বিবিধ বলিয়া ইহারা প্রত্যেকে আবার উক্ত লৌকিক ও বৈদিকভেদে দ্বিবিধ হইবে।

অভিধানানুপপত্তিরূপা শ্রুতার্থাপত্তি।

যেখানে বাক্যের একদেশশ্রবণে অন্বয়াভিধানের অনুপপত্তি হয় বলিয়া অন্বয়াভিধানের উপযোগিপদান্তর কল্পনা করা যায়, তথায় অভিধানানুপপত্তিরূপা শ্রুতার্থাপত্তি হয়। যেমন লৌকিকস্থলে "দ্বারং" এই শব্দটী কহিলে "পিধেহি" অর্থাৎ "বন্ধকর" এই পদটী অধ্যাহার না করিলে অন্বয় হয় না, এজন্য "পিধেহি" পদটী অর্থাপত্তিবলেই কল্পনা করা হয়—বলা হয়। বৈদিক স্থলে "বিশ্বজিতা যজেত" ইত্যাদি স্থলে "স্বর্গকামঃ" পদ অধ্যাহার করিতে হয়। এস্থলে অভিধান পদের অর্থ তাৎপর্য্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অভিহিতানুপপত্তিরূপা শ্রুতার্থাপত্তি।

যেখানে বাক্যাবগত অর্থ অনুপপন্ন হইতেছে বলিয়া জানিবার পর অর্থান্তরের কল্পনা করা হয়, সেখানে অভিহিতানুপপত্তিরূপা শ্রুতার্থাপত্তি হয়। বৈদিক স্থলে "স্বর্গকামঃ যজেত" ইত্যাদি স্থলে ক্রিয়াকলাপাত্মক যাগাদির ক্ষণিকত্বপ্রযুক্ত কালান্তরভাবী স্বর্গসাধনত্বের অনুপপত্তি হয় বলিয়া স্বর্গ ও যাগের মধ্যস্থলে একটী অপূর্ব্ব কল্পনা করা হয়। লৌকিক বাক্যও এইরূপেই বুঝিয়া লইতে হইবে।

তাহা ধূমাভাব, সেই ধূমাভাবের প্রতিযোগিত্ব ধূমে থাকে, আর সেই ধূমই হেতু বলিয়া সেই প্রতিযোগিত্ব, ধূম হেতুতে থাকিল। বস্তুতঃ, এই ব্যতিরেকব্যাপ্তির জ্ঞানদ্বারা পর্বতে ধূমাভাব না থাকায় অর্থাৎ ধূম থাকায় পর্বতটী বহ্ন্যভাববান্ নয় অর্থাৎ বহ্নিমান্ বলিয়া নিশ্চয় হইল। ইহার কারণ, যে দুইটী অভাবের মধ্যে ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধ থাকে, তাহাদের প্রতিযোগীর মধ্যে তদ্বিপরীত ব্যাপকব্যাপ্যভাব সম্বন্ধ থাকে। অর্থাৎ যেখানে ধূম ব্যাপ্য, বহ্নি ব্যাপক, সেখানে বহ্ন্যভাব ব্যাপ্য এবং ধূমাভাব ব্যাপক। ধূমের দ্বারা বহ্নির অনুমান অন্বয়ী অনুমান, আর বহ্ন্যভাবদ্বারা ধূমাভাবের অনুমান ব্যতিরেকী অনুমান।

যাহারা অর্থাপত্তি প্রমাণ স্বীকার করেন, সেই মীমাংসক বলেন—

জীবিত দেবদত্ত যখন গৃহে নাই, তখন তিনি অবশ্যই বাহিরে আছেন—ইহা অর্থাপত্তি-দ্বারা অর্থাৎ উক্ত বাক্যার্থদ্বারাই নিশ্চয় হয়। কারণ, এখানে জীবিত দেবদত্তের গৃহসত্তার অভাবে বহিঃসত্তা ব্যতীত দেবদত্তের জীবন অনুপপন্ন হয়। এই অনুপপত্তিজ্ঞান অর্থাপত্তি-প্রমার করণ। ইহাই উপপাদ্যের জ্ঞান। ইহারই দ্বারা উপপাদক দেবদত্তের বহিঃসত্ত্ব কল্পিত হয়। যাহা ব্যতীত যাহা অনুপপন্ন তাহাই উপপাদ্য এবং যাহার অভাববশতঃ যাহার অনুপপত্তি, তাহাই উপপাদক ইহা বলাই হইয়াছে।

নৈয়ায়িক বলেন—উক্ত উপপত্তিজ্ঞান করণ হইলেও ইহা ব্যতিরেকী অনুমানদ্বারা সিদ্ধ হয়। যেমন পর্ব্বতে মহানসীয় বহ্নির বাধজ্ঞানকালে, ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তিজ্ঞান হইলে পর্ব্বতে মহানসীয় বহ্নিভিন্ন বহ্নির অনুমিতি হয়, তদ্রূপ যেস্থানে দেবদত্তের জীবিতত্ব অর্থাৎ স্থায়িত্ব অন্য প্রমাণদ্বারা নিশ্চিত, সেস্থলে দেবদত্তের গৃহে অনবস্থান প্রত্যক্ষদৃষ্ট হইলে, দেবদত্তের গৃহস্থায়িত্ব ও বহিঃস্থায়িত্ব এতদন্যতররূপ সাধ্যের ব্যাপ্য যে জীবিতত্ব, সেই জীবিতত্বহেতু গৃহস্থায়িত্বের বাধ হওয়ায় বহিঃস্থায়িত্বের অনুমিতি হয়। যেহেতু জীবিত্বস্বরূপ হেতুতে গৃহস্থায়িত্ব ও বহিঃস্থায়িত্ব এতদন্যতরস্বরূপ সাধ্যের ব্যতিরেকব্যাপ্তির জ্ঞান হয়। কারণ, যেখানে গৃহস্থায়িত্ব ও বহিঃস্থায়িত্ব এতদন্যতররূপ সাধ্যের অভাব আছে, সেস্থানে জীবিতত্বস্বরূপ হেতুরও অভাব আছে। অর্থাৎ সাধ্যাভাবরূপ গৃহস্থায়িত্ব ও বহিঃস্থায়িত্ব এতদন্যতরাভাবটী ব্যাপ্য এবং হেত্বভাবরূপ জীবিত্বাভাবটী ব্যাপক হইতেছে। সুতরাং এখানেও অন্বয়ী অনুমানের ন্যায় ব্যাপ্যদ্বারা ব্যাপকের অনুমান হইতেছে।

অর্থাৎ মীমাংসক বা বেদান্তী বলিবেন—

গৃহে অনবস্থিত জীবিত দেবদত্ত বহির্দেশস্থিত	...	(উপপাদ্য)
নচেৎ তাঁহার জীবিতত্ব অনুপপন্ন	...	(উপপাদক)

আর এতদুদ্দেশ্যে নৈয়ায়িক বলিবেন—

গৃহে অনবস্থিত দেবদত্ত বহির্দেশস্থিত	...	(প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু তিনি জীবিত	...	(হেতু)

অথবা—

দেবদত্তঃ বহিরস্তি	...	(প্রতিজ্ঞা)
জীবিত্বে সতি গৃহে অসত্বাৎ	...	(হেতু)
যো জীবন্ যত্র নাস্তি স ততোঽন্যত্র অস্তি, যথা অহম্	...	(উদাহরণ)

বিরোধকরণক অর্থাপত্তি।

বিরোধকরণক অর্থাপত্তির দৃষ্টান্ত যেমন—"জীবিত দেবদত্ত যখন গৃহে নাই," তখন অবশ্যই বাহিরে আছে। এস্থলে যে প্রমাণদ্বারা দেবদত্ত জীবিত, সেই প্রমাণের বিরোধী প্রমাণ হইতেছে দেবদত্ত গৃহে নাই—এই প্রত্যক্ষ। এই উভয় প্রমাণের বিরোধপরিহার, দেবদত্ত বহির্দেশে অবস্থিত—এই কল্পনার দ্বারা সাধিত হইতেছে। এজন্য এস্থলে ইহাকে বিরোধকরণক অর্থাপত্তি বলা হয়।

সংশয়করণক অর্থাপত্তি।

সংশয়করণক অর্থাপত্তির দৃষ্টান্তও জীবিত দেবদত্তের বহির্দেশে অবস্থানকল্পনাই—বলা যাইতে পারে। বিশেষ এই যে, এস্থলে দেবদত্তের জীবিতত্বেই সংশয় হয়, আর সেই সংশয়নিবারণের জন্য দেবদত্তের বহির্দেশে অবস্থান কল্পনা করা হয়। পূর্ব্বস্থলেও প্রমাণদ্বয়ের বিরোধবোধ হয়, প্রথম প্রকারের ন্যায় সংশয় হয় না—ইহাই প্রভেদ।

ইহাই হইল অর্থাপত্তির পরিচয়।

অনুপলব্ধির পরিচয়।

বেদান্তী ও ভট্টমীমাংসকের মতে অনুপলব্ধিকে একটী প্রমাণ বলা হয়। কিন্তু নৈয়ায়িক বা প্রভাকর মীমাংসক ইহাকে পৃথক্ প্রমাণ বলেন না।

নৈয়ায়িক বলেন—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অভাবের প্রত্যক্ষই হয়, সুতরাং কোন অভাবের প্রতিযোগী, যে ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, সেই অভাবও সেই ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়। যেমন—চক্ষুর দ্বারা ঘটের প্রত্যক্ষ হয়, আর সেই চক্ষুর দ্বারাই ঘটের অভাবেরও প্রত্যক্ষ হয়। তবে অনুপলব্ধি জ্ঞানটী তাহার সহকারিমাত্র।

আর অভাবটী বিশেষণতা বা স্বরূপ সম্বন্ধে নিজ অধিকরণে থাকে বলিয়া অভাবের অধিকরণটীর যে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ হয়, সেই সম্বন্ধের সহিত উক্ত বিশেষণতাসম্বন্ধ মিলিত হইয়া যে একটী পরম্পরাসম্বন্ধবিশেষ হয়, সেই সম্বন্ধে অভাবের প্রত্যক্ষ হয়। যেমন ভূতলে ঘটের প্রত্যক্ষ সংযোগ সম্বন্ধে হয়, আর ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ সংযুক্তবিশেষণতা সম্বন্ধে হয়, তদ্রূপ ঘটরূপের প্রত্যক্ষ সংযুক্তসমবায় সম্বন্ধে ঘটে হয়, আর ঘটরূপাভাবের প্রত্যক্ষ সংযুক্তসমবেত বিশেষণতা সম্বন্ধে পটাদিতে হয়, ইত্যাদি। যতপ্রকার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ হয়, তাহা ২৫২ পৃষ্ঠে উক্ত হইয়াছে। অপর প্রমাণদ্বারা অভাবের যে জ্ঞান হয়, তাহা অভাবের পরোক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে।

বেদান্ত বা মীমাংসকমতে বলা হয়—অভাবের প্রত্যক্ষ হইলেও তাহার করণ ইন্দ্রিয় নহে, কিন্তু অনুপলব্ধি জ্ঞানই তাহার করণ। ন্যায়মতে ইন্দ্রিয় করণ এবং অনুপলব্ধি জ্ঞানটী সহকারী কারণ, কিন্তু বেদান্ত ও মীমাংসকমতে অনুপলব্ধিজ্ঞানই করণ, এবং ইন্দ্রিয় তাহার সহকারী কারণ। আর এই করণটী ব্যাপারশূন্যই হইয়া থাকে। বহু বেদান্তীর মতে অভাবের প্রত্যক্ষই হয় না, তাহার যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম অনুপলব্ধি মাত্র, আর সেই অনুপলব্ধি প্রত্যক্ষেরই মত বা প্রত্যক্ষজাতীয় জ্ঞানবিশেষ।

অনুপলব্ধি প্রমাণের লক্ষণ।

এই অনুপলব্ধি প্রমাণের লক্ষণ—"জ্ঞানকরণাজন্য অভাবানুভবাসাধারণ কারণ"ই অনুপলব্ধিরূপ প্রমাণ, অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানরূপ করণের, অজন্য যে অভাবানুভব, তাহার যাহা অসাধারণ কারণ, তাহাই অনুপলব্ধি প্রমাণ। এস্থলে "জ্ঞানকরণাজন্য অভাবানুভবাসাধারণ কারণ" এইটুকু লক্ষণ, এবং "অনুপলব্ধি প্রমাণ" এই অংশটুকু লক্ষ্য। অতীন্দ্রিয় অভাবের অনুমানাদিজন্য যে অনুভব, তাহার হেতু অনুমানাদিতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য "জ্ঞানকরণাজন্য" পদ। অদৃষ্টাদি সাধারণকারণে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য "অসাধারণ" পদ। অভাবস্মৃতির অসাধারণ কারণ সংস্কারে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য "অনুভব" এই বিশেষণ। আর অভাবের অনুমিতিস্থলেও অনুপলব্ধিদ্বারা অভাবের জ্ঞান হয় না। কারণ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মাদির অনুপলব্ধিনিবন্ধন ধর্ম্মাধর্ম্মাদির অভাবনিশ্চয় হয় না, এজন্য লক্ষ্যভূত অনুপলব্ধিপদে "যোগ্য" বিশেষণ আবশ্যক। অর্থাৎ অনুপলব্ধিমাত্রই অভাবজ্ঞানের করণ নহে, কিন্তু যোগ্যানুপলব্ধিই অভাবজ্ঞানের করণ হয়।

যোগ্যানুপলব্ধি বলিতে কর্ম্মধারয় সমাসদ্বারা "যোগ্য যে অনুপলব্ধি" তাহাই বুঝিতে হইবে। সুতরাং অত্যন্তাভাব, প্রাগভাব ও ধ্বংসরূপ সংসর্গাভাবের যে উপলব্ধি, তাহা, তাহাদের উপলব্ধিযোগ্য প্রতিযোগীর অনুপলব্ধিকালে ঘটে; এবং অন্যোন্যাভাবস্থলে যোগ্য যে অনুপলব্ধি, তাহা প্রতিযোগিরূপে অনুযোগীর যোগ্য অনুপলব্ধি। অর্থাৎ দর্শন-যোগ্যের অদর্শনরূপ যে দর্শনাভাব তাহাই যোগ্যানুপলব্ধি।

আর এইরূপ লক্ষণ হয় বলিয়া "যদি থাকিত তাহা হইলে উপলব্ধ হইত" এইরূপ জ্ঞান যেখানে হয়, সেই স্থানেই যোগ্যানুপলব্ধিদ্বারা অভাবের জ্ঞান হয়। সুতরাং উজ্জ্বল আলোকে ঘটাভাবের জ্ঞান অনুপলব্ধি প্রমাণদ্বারা হয়, কিন্তু অন্ধকারে ঘটাভাবের জ্ঞান অনুপলব্ধি প্রমাণগম্য হয় না। তমসেও পিশাচ থাকিলে পিশাচ স্তম্ভবৎ দেখা যাইত— এইরূপ যোগ্য অনুপলব্ধি প্রমাণদ্বারা পিশাচের ভেদরূপ অভাবের জ্ঞান হয়। ধর্ম্মাদি অতীন্দ্রিয় বলিয়া তাহার অভাবজ্ঞান অনুপলব্ধিগম্য হয় না।

অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধির মধ্যে প্রভেদ।

অনুপলব্ধিস্থলে প্রতিযোগিপ্রত্যক্ষাভাব করণ। প্রতিযোগীর আরোপ অবান্তর ব্যাপার এবং অভাবজ্ঞানটী ফল। অর্থাপত্তিস্থলে জ্ঞান করণ, উহাও নির্ব্যাপার। অর্থাপত্তি জ্ঞানটী অবান্তর ব্যাপার, উপপাদক জ্ঞানটী ফল।

আর অভাবকে স্মরণরূপ বলাও যায় না। কারণ, পূর্ব্বে তাহার অনুভব হয় না। যাহার পূর্ব্বে অনুভব হয় না, তাহার স্মরণ সম্ভবপর নয়। অতএব অভাবের স্মরণ হয়—ইহাও বলা যায় না।

প্রভাকরমতে অভাবের প্রত্যক্ষ হয়।

তাহার পর প্রভাকরমতে অভাবকে পৃথক্ পদার্থই বলা হয় না। তন্মতে উহাকে অধিকরণস্বরূপই বলা হয়। সুতরাং তাহার প্রত্যক্ষ হয়—বলা হয়। কিন্তু এ কথাও সঙ্গত নহে। কারণ অভাবকে পদার্থান্তর বলাই আবশ্যক। উহা অধিকরণস্বরূপ বলিলে "ভূতলে ঘটাভাব" এইরূপ আধার-আধেয়ভাবের প্রতীতি আর থাকে না। আরও "ঘট নাই, ইহা পট নয়" ইত্যাদি ব্যবহার ঘটবিশিষ্টেই হয় বলিয়া ভূতলমাত্রকে তাহার বিষয় বলা যায় না। আর যদি "ঘটভিন্ন" তাহার বিষয় হয়, তবে অভাবাতিরিক্ত বিবেক অসম্ভব বলিয়া অভাব সিদ্ধই হয়।

কিন্তু তাহা হইলেও বেদান্তমতে অনেক স্থলে অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলিয়াও স্বীকার করা হয়, এবং অনেক স্থলে ভাবভিন্নও বলা হয়—বুঝিতে হইবে।

ইহাই হইল অনুপলব্ধিনামক প্রমা ও প্রমাণের পরিচয়।

অযথার্থ অনুভবের পরিচয়।

বুদ্ধির পরিচয় প্রসঙ্গে বুদ্ধিকে স্মৃতি ও অনুভব এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া স্মৃতির পরিচয় দিয়া (২৩৫ পৃঃ) অনুভবের পরিচয় প্রসঙ্গে তাহাকে আবার যথার্থ ও অযথার্থ অর্থাৎ প্রমা ও অপ্রমা এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রমা অনুভবের পরিচয় প্রদত্ত হইল, এক্ষণে অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমার পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

অযথার্থ অনুভবের বিভাগ।

অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমা তিন প্রকার, যথা—বিপর্য্যয় বা ভ্রম, সংশয় এবং তর্ক। কোন মতে ইহা চারি প্রকার, আর স্বপ্ন সেস্থলে চতুর্থ প্রকার। ইহাদের মধ্যে বিপর্য্যয় বা ভ্রমের সামান্যভাবে পরিচয় ২৩৬ পৃষ্ঠে প্রদত্ত হইয়াছে। তথাপি এস্থলে অপেক্ষাকৃত বিশেষভাবে এবং অবশিষ্টগুলির সামান্যভাবে পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। ভ্রম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক।

অযথার্থজ্ঞান ভ্রমের পরিচয়।

তদভাববতে তৎপ্রকারক জ্ঞানের নাম ভ্রম বা বিপর্য্যয়। যেমন

শুক্তিকে রজত বলিয়া জ্ঞানটী ভ্রম। শুক্তিতে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে শুক্তিই থাকে, এবং সমবায় সম্বন্ধে শুক্তিত্ব জাতি থাকে। তাদাত্ম্য সম্বন্ধে শুক্তিরূপ ধর্ম্মীতে বিশেষ্য শুক্তিই হয়—"প্রকার" এবং সমবায় সম্বন্ধে শুক্তিত্বটী হয় "প্রকার"। তাদাত্ম্যসম্বন্ধে শুক্তি ধর্ম্মীতে বা বিশেষ্যে শুক্তি প্রকার জ্ঞান না হইলে, অথবা সমবায় সম্বন্ধে শুক্তি ধর্ম্মীতে বা বিশেষ্যে শুক্তিত্ব প্রকারক জ্ঞান না হইলে শুক্তিকে রজত বলিয়া জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানের নাম ভ্রম বা বিপর্য্যয়। ভ্রমের অপেক্ষাকৃত নিষ্কৃষ্ট লক্ষণ হইতেছে—তদভাববন্নিষ্ঠবিশেষ্যতানিরূপিত তন্নিষ্ঠপ্রকারতাশালিজ্ঞানত্বই ভ্রম। (২৩৬পৃঃ দ্রষ্টব্য)

বেদান্তমতে অযথার্থ ও অপ্রমা মধ্যে ভেদ আছে। (২৩৪পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কারণ, অপ্রমা ও যথার্থও হইতে পারে।

সপ্তখ্যাতি বাদ।

ন্যায়মতে ভ্রম অন্যথাখ্যাতি নামে অভিহিত হয়। অন্যরূপে ভাসমান বা প্রতীয়মান হওয়ার নামই অন্যথাখ্যাতি। ইহা পঞ্চপ্রকার বা সপ্তপ্রকার খ্যাতিবাদের মধ্যে এক প্রকার মাত্র। সেই পঞ্চম, সপ্ত প্রকার খ্যাতি বলিতে—১। আত্মখ্যাতি, ২। অসৎখ্যাতি, ৩। অখ্যাতি, ৪। অন্যথাখ্যাতি, ৫। অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি, ৬। সৎখ্যাতি এবং ৭। সদসৎখ্যাতি।

ইহার মধ্যে প্রথম পাঁচটী অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত, শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য ষষ্ঠ সৎখ্যাতির প্রচার করিয়াছেন, এবং সাংখ্যমতটী পরে সদসৎখ্যাতি বলা হয়। কিন্তু ইহা বাস্তবিক উক্ত পাঁচটীরই একরূপ অন্তর্গত বলা যায়। ইহাদের পরিচয় এই—

১। আত্মখ্যাতি।

ইহা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মত। ইহাতে বুদ্ধিই আত্মা। এই বুদ্ধি অবশ্য ক্ষণিক বিজ্ঞানের ধারাবিশেষ। 'আমি' বুদ্ধিও আলয়বিজ্ঞানধারা, ঘট পট প্রভৃতি প্রবৃত্তিবিজ্ঞান-ধারা। আমি-আমিরূপ আলয় বিজ্ঞানধারার নাম আলয়বিজ্ঞান, আর ঘট পট প্র

বিজ্ঞানধারার নাম প্রতীত্যসমুৎপাদ। ফলতঃ, সবই বুদ্ধি বা বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানরূপ অর্থই সংরূপে খ্যাত বা প্রতীত, অর্থাৎ ভ্রমবিষয়ীভূত হইতেছে, বলিয়া ইহার নাম আত্মখ্যাতি। খ্যাতি শব্দের অর্থ ভ্রম। অন্তরের বিজ্ঞানই ও বাহ্য বলিয়া জ্ঞান হয়, এজন্ত ইহা ভ্রম। বাহ্যটী অনাদি অবিদ্যাবাসনা-অারোপিত অলীক। এতাদৃশ বাহ্য অলীক শুক্তিকাদিতে জ্ঞানাকার রজতাদির আরোপপ্রযুক্ত এই মতে ভ্রমকে আত্মখ্যাতি বলা হয়। এমতে রজত অখ্যাত নহে, কিন্তু অন্তরের সবিষয়ক রজতের বহিষ্ঠরূপে প্রতীতিই ভ্রম। "অতএব ইহা রজত নহে"---এই প্রকার যে বাধ, তাহা রজতের অসত্ত্বজ্ঞাপন করে না, কিন্তু ইদন্তা-নামক বহিস্থিত্বের প্রতিষেধ করে।

২। অসংখ্যাতি।

ইহা শূন্যবাদী বৌদ্ধের মত। এমতে সকল বস্তুরই আদিতে ও অন্তে অভাবরূপ হয় বলিয়া মধ্যে যাহা তাহাও অভাবরূপ; অর্থাৎ সাংবৃত্তিকরূপে শূন্যই জগতের তত্ত্ব। যাহাই আছে বলি, তাহাই বর্ত্তমানকালযুক্ত। সেই বর্ত্তমানই কিছু নাই, কারণ, তাহা নির্দ্দেশের পূর্ব্বে ভবিষ্যৎ এবং নির্দ্দেশমাত্রই অতীত। তাহার পর কোন কিছুই নির্ণয় হয় না। অতএব সকলই শূন্যই। এমতে অসতের প্রকাশে সমর্থ জ্ঞান, অসৎ রজতাদিকে ভাসমান করে বলিয়া অসতেরই খ্যাতি হয়। এই হেতু "ইহা রজত নহে" এই বাধ-মধ্যেও রজতের অসত্ত্বই জ্ঞাপিত হয়। এক তান্ত্রিক সম্প্রদায় শুক্তিরজতের রজতত্বকে অসৎ বলেন এবং ন্যায়বাচস্পত্যকারের মতে শুক্তিরজতের সম্বন্ধটী অসৎ, অতএব ইঁহাদের মতকেও অসংখ্যাতিবাদ বলা হয়। কিন্তু শূন্যবাদী বৌদ্ধমতই যথার্থ এই নামের যোগ্য।

৩। অখ্যাতি।

ইহা প্রভাকর মীমাংসকগণের মত। এ মতে সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ। ভ্রমজ্ঞান নাই। শুক্তিতে "এই রজত" বলিয়া যে জ্ঞান হয়, যাহাকে অপরে ভ্রম বলে, সেস্থলে গ্রহণ ও স্মরণাত্মক যথার্থ জ্ঞানদ্বয় থাকে। এস্থলে শুক্তিকে যে "এই" বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহা গ্রহণাত্মক জ্ঞান, এবং "রজত" বলিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহা স্মরণাত্মক জ্ঞান। "এই" জ্ঞানটী সামান্যজ্ঞান এবং "রজত" বিশেষজ্ঞান। অর্থাৎ শুক্তি দেখিয়া "এই" জ্ঞান হইলে, শুক্তির চাকচক্য রজতের চাকচক্যের সদৃশ বলিয়া, আর রজতদ্বারা ইষ্টসাধন হয় জানা থাকায়, "এটা কি" এই অনুসন্ধানের ফলে রজতের স্মরণ হয়, তখন "এই" পদ-বাচ্য শুক্তির বিশেষজ্ঞানের অভাবে শুক্তি ও রজতের ভেদের জ্ঞান হয় না, এইজন্য শুক্তিকে

তাহার "এই" অংশে কোনরূপ অন্যথা হয় না, সুতরাং উহা সতেরই খ্যাতি, আর যে "রজত" অংশ, তাহাও ঐস্থলে নাই, সুতরাং তাহা অসতেরই খ্যাতি। অতএব শুক্তিতে "ইদং রজতং" জ্ঞানটী সদসৎখ্যাতি বলা হয়। ইহাকে বিপরীতখ্যাতিও বলা হয়। কিন্তু ইহাও ঠিক নহে; কারণ এখানে "এই" পদবাচ্য ও "রজত" পদবাচ্য বস্তুদ্বয় অভিন্নই হয়।

ভ্রম ও অধ্যাস।

বেদান্তমতে এই ভ্রম পাঁচপ্রকার, যথা—১। জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান, ২। আত্মাকে শরীরসম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া জ্ঞান, ৩। কর্ম্ম ও তৎফলের সহিত আত্মা যুক্ত—এই জ্ঞান, ৪। আত্মার কর্ত্তৃত্ব বাস্তব—এই জ্ঞান, এবং ৫। পরব্রহ্মের বিকারিত্ব জ্ঞান।

পঞ্চবিধ ভ্রমনিবৃত্তির জন্য পঞ্চবিধ দৃষ্টান্ত।

১। জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন—এই ভ্রমনিবৃত্তির জন্য বিম্বপ্রতিবিম্বের দৃষ্টান্ত, ২। জীব-কর্ত্তৃত্বাদির বাস্তবত্বভ্রান্তিনিবৃত্তির জন্য রক্তস্ফটিকের দৃষ্টান্ত, ৩। কর্ম্ম ও তৎফলের সহিত আত্মার যোগভ্রমনিবৃত্তির জন্য আতস্ পাথর ও চকমকির দৃষ্টান্ত, ৪। আত্মার কর্ত্তৃত্ব বাস্তব—এই ভ্রমনিবৃত্তির জন্য ঘটাকাশাদির দৃষ্টান্ত, এবং ৫। ব্রহ্মের বিকারিত্বভ্রমনিবৃত্তির জন্য স্বর্ণকুণ্ডলের দৃষ্টান্ত গৃহীত হয়।

অধ্যাস পরিচয়।

এক বস্তুতে অপর বস্তুর ভ্রমের নাম অধ্যাস। যাহাতে ভ্রম হয়, তাহাকে অধিষ্ঠান বলা হয়, এবং যাহার ভ্রম হয়, তাহাকে আরোপ বা আরোপ্য বলা হয়। যেমন রজ্জুতে যে সর্প ভ্রম হয়, তাহাতে রজ্জুটী অধিষ্ঠান এবং সর্প টী আরোপ বা আরোপ্য বলা হয়।

অধ্যাস বিভাগ ও তাহার পরিচয়।

এই অধ্যাস সাদি ও অনাদিভেদে দুই প্রকার। যথা—রজ্জুতে যে সর্পভ্রম সেই জাতীয় ভ্রম সাদি। আর ব্রহ্মে যে অজ্ঞান ও তজ্জন্য যে জগৎপ্রপঞ্চভ্রম তাহা অনাদি।

অনাদি দ্বিবিধ।

অনাদি দ্বিবিধ, যথা—স্বরূপতঃ অনাদি এবং প্রবাহতঃ অনাদি। যাহা জন্য নহে, তাহা স্বরূপতঃ অনাদি, যেমন ব্রহ্ম বা অবিদ্যা, আর জন্য বস্তুর যে অনাদিত্ব, তাহা প্রবাহরূপে অনাদিত্ব বুঝিতে হইবে। যেমন—সংসারপ্রপঞ্চ।

ষড়্‌বিধ অনাদিবস্তু।

বেদান্তমতে অনাদি ছয়টী বস্তু, যথা—১। জীব, ২। ঈশ্বর, ৩। বিশুদ্ধ চৈতন্য, ৪। জীবেশ্বরভেদ, ৫। অবিদ্যা এবং ৬। অবিদ্যা ও চৈতন্যের সম্বন্ধ। এই ছয়টী বেদান্তমতে অনাদি।

অন্যরূপে অধ্যাসবিভাগ ও তাহার পরিচয়।

অন্যরূপে ইহা ত্রিবিধ, যথা—স্বরূপাধ্যাস বা তাদাত্ম্যাধ্যাস, সংসর্গাধ্যাস এবং আহার্য্যাধ্যাস। "অহম্ অহম্" "অহম্ ইদম্" "অহং মনুষ্যঃ" ইত্যাদি তাদাত্ম্যাধ্যাস। "আমার শরীর" ইত্যাদি সংসর্গাধ্যাস। আর অধ্যারোপ যখন শাস্ত্রীয় বিধির দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়া ইচ্ছাপ্রযুক্ত সাধিত হয়, তখন তাহাকে আহার্য্যাধ্যাস বলে। যেমন শালগ্রামে শিলাবুদ্ধি।

অধ্যাসকে অন্যরূপেও বিভক্ত করা যায়, যথা—১। ধর্ম্মের অধ্যাস, ২। ধর্ম্মীর অধ্যাস, ৩। সম্বন্ধের অধ্যাস। তন্মধ্যে—১। ধর্ম্মের অধ্যাস, যথা—"আমি স্থূল" "আমি কৃশ" জ্ঞান। এখানে স্থূলত্ব ও কৃশত্ব ধর্ম্ম আত্মাতে অধ্যস্ত। জবাসন্নিহিত স্ফটিকে রক্তবর্ণজ্ঞান। এখানে জবার লৌহিত্য ধর্ম্ম স্ফটিকে অধ্যস্ত। ২। ধর্ম্মীর অধ্যাস, যথা—শুক্তিকাকে রজত এবং রজ্জুকে সর্প বলিয়া জ্ঞান। অথবা অন্তঃকরণকে সাক্ষিচৈতন্যে অধ্যাস করিয়া "আমি" জ্ঞান। ৩। সম্বন্ধাধ্যাস ধর্ম্মাধ্যাসকালেই ঘটিয়া থাকে। "আমার শরীর" ইত্যাদি স্থলেও সম্বন্ধাধ্যাস বলা হয়।

অধ্যাসের অন্যরূপ বিভাগ, যথা—অর্থাধ্যাস এবং জ্ঞানাধ্যাস। তন্মধ্যে অর্থাধ্যাস প্রথমতঃ দুই প্রকার, যথা—১। প্রাতীতিক এবং ২। ব্যাবহারিক। আগন্তুকদোষজন্য যে শুক্তিরজতাদি, তাহা ১। প্রাতীতিক এবং তদ্ভিন্ন, ২। ব্যাবহারিক, যথা—আকাশাদি ঘটান্তপ্রপঞ্চ।

এই অর্থাধ্যাস কিন্তু অন্যপ্রকারে আবার ছয় প্রকার, যথা—১। কেবল সম্বন্ধাধ্যাস, ২। সম্বন্ধ সহিত সম্বন্ধীর অধ্যাস, ৩। কেবলধর্ম্মাধ্যাস, ৪। ধর্ম্ম সহিত ধর্ম্মীর অধ্যাস, ৫। অন্যোন্যাধ্যাস, এবং ৬। অন্যতরাধ্যাস। অর্থাধ্যাসের লক্ষণ—"প্রমাণজন্যজ্ঞানবিষয়ঃ পূর্ব্বদৃষ্টসজাতীয়ঃ"।

১। কেবলসম্বন্ধাধ্যাস—যেমন অনাত্মাতে আত্মার অধ্যাস হইলে অনাত্মাতে আত্মার তাদাত্ম্যসম্বন্ধের অধ্যাস হয়, আত্মার স্বরূপ অধ্যস্ত হয় না।

২। সম্বন্ধ সহিত সম্বন্ধীর অধ্যাস—যখন আত্মাতে দেহাদি অনাত্মার সম্বন্ধ ও স্বরূপ উভয়ই অধ্যস্ত হয় তখন ইহা হয়—বলা হয়।

৩। কেবল ধর্ম্মাধ্যাস—যেমন আত্মাতে স্থূলদেহের ধর্ম্ম স্থানত্ব গৌরত্বাদি এবং ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম দর্শনাদির অধ্যাস হয়, কিন্তু স্বরূপাধ্যাস হয় না।

৪। ধর্ম্মসহিত ধর্ম্মীর অধ্যাস—যেমন অন্তঃকরণের ধর্ম্ম কর্তৃত্বাদি ও স্বরূপ উভয়ই আত্মাতে অধ্যস্ত হয়।

৫। অন্যোন্যাধ্যাস—তপ্ত লৌহাদির ন্যায় আত্মাতে অনাত্মার এবং অনাত্মাতে আত্মার যে অধ্যাস তাহা অন্যোন্যাধ্যাস।

৬। অন্যতরাধ্যাস—যেমন অনাত্মাতে আত্মার স্বরূপ অধ্যস্ত নহে, কিন্তু আত্মাতে অনাত্মার স্বরূপ অধ্যস্ত হইলে দুই এর মধ্যে একটী অধ্যাস হওয়ায় অন্যতরাধ্যাস বলা হয়।

জ্ঞানাধ্যাস—ইহা "অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধিঃ"। অর্থাৎ শুক্তিতে রজতটী যেমন অধ্যস্তবিষয় বলিয়া ইহাকে অর্থাধ্যাস বলা হয়, তদ্রূপ শুক্তিতে রজতের যে জ্ঞান সেই জ্ঞানটী অধ্যস্ত বিষয়ক জ্ঞান বলিয়া ইহাকে জ্ঞানাধ্যাস বলা হয়। তদ্রূপ আত্মাতে অনাত্মবুদ্ধিও জ্ঞানাধ্যাস।

ব্যবহার চতুর্ব্বিধ।

এই ব্যবহার চারিপ্রকার, যথা—১। অভিজ্ঞা, অর্থাৎ "অর্থাৎ ইহা ঘট" এই জ্ঞান, ২। অভিবদন, অর্থাৎ "ইহা ঘট" ইহা বলা, ৩। উপাদান অর্থাৎ গ্রহণ, এবং ৪। অর্থক্রিয়া, যেমন ঘটদ্বারা জলাহরণাদি।

মূলাজ্ঞান বা মূলাবিদ্যা।

মূলাজ্ঞান বা মূলাবিদ্যা অনাদি। ইহারই পরিণাম এই জগৎ সংসার। আর তুলাজ্ঞান বা তুলাবিদ্যা সাদি। ইহারই পরিণাম শুক্তিতে রজত, রজ্জুতে সর্প। এই অজ্ঞান বা অবিদ্যা পদ্মপাদ প্রভৃতির মতে ব্রহ্মাশ্রিত এবং ব্রহ্মবিষয়ক আর বাচস্পতিমিশ্রের মতে জীবাশ্রিত ও ব্রহ্মবিষয়ক। ইহা অনাদি ভাবরূপ অনির্ব্বচনীয় বস্তু, ও জ্ঞানদ্বারা বিনাশ্য।

পারমার্থিক, ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিকসত্তা।

ব্রহ্মের সত্তা পারমার্থিক সত্তা, ইহা সর্ব্বদাই অবাধিত থাকে। জগৎসংসারের সত্তা ব্যাবহারিক। ইহা ব্রহ্মস্বরূপ অধিষ্ঠানের জ্ঞানে বাধিত হয় এবং রজ্জুসর্পের সত্তা প্রাতিভাসিক। ইহা ব্যাবহারিক সত্তাসম্পন্ন রজ্জুর জ্ঞানে বাধিত হয় বা নিবৃত্ত হয়।

নিবৃত্তি বা বাধ।

অধিষ্ঠানের জ্ঞানদ্বারা কারণ সহিত কার্য্যের বিনাশের নাম বাধ, আর অধিষ্ঠান জ্ঞানদ্বারা কেবল কার্য্যের বিনাশের নাম নিবৃত্তি বলা হয়। ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা জগৎসংসারের নিবৃত্তিজ্ঞান হইবার পর তাহার বাধ হয়। ইহাই হইল ভ্রম বা বিপর্য্যয় পরিচয়।

চতুর্ব্বিধ অবিদ্যা।

অবিদ্যা অন্যরূপে চতুর্ব্বিধ, যথা—১। অনিত্যে নিত্যবুদ্ধি, ২। অশুচিতে শুচিবুদ্ধি, ৩। দুঃখে সুখবুদ্ধি এবং ৪। অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি।

সংশয় পরিচয়।

ভ্রম বা বিপর্য্যয়ের ন্যায় সংশয়ও অযথার্থ জ্ঞানের মধ্যে একটী প্রকার। এই সংশয় বলিতে একটী ধর্ম্মীতে বিরুদ্ধ নানাধর্ম্মবিশিষ্ট জ্ঞানকে বুঝায়। যেমন, "ইহা স্থাণু বা পুরুষ" বলিলে যে জ্ঞানকে বুঝায়, তাহাই সংশয়। ইহার পরিষ্কার লক্ষণ—"একধর্ম্মাবচ্ছিন্ন যে বিশেষ্যতা, সেই বিশেষ্যতা নিরূপিত যে ভাবাভাবপ্রকারক জ্ঞান" তাহাই সংশয়। কোনমতে সংশয়কে দ্বিকোটিক ও চতুষ্কোটিক ভেদে দ্বিবিধ বলা হয়। যথা—"স্থাণু কি স্থাণু নয়" ইহা দ্বিকোটিক সংশয় এবং স্থাণু কি পুরুষ ইহা চতুষ্কোটিক সংশয়। কারণ, ইহাতে "স্থাণু কি স্থাণু

নয়" এবং "পুরুষ কি পুরুষ নয়"—এইরূপ চারিটী কোটিই বিষয় হয়। সুতরাং "স্থাণু বা পুরুষ" এই স্থলে যে ভাবদ্বয়কোটিক সংশয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে ইহা "স্থাণু বা স্থাণু নয়, ইহা পুরুষ বা পুরুষ নয়" এইরূপ ভাবাভাবকোটিক একভাবকোটিক সংশয়ই বুঝিতে হইবে।

সমূহালম্বন জ্ঞানেও নানা ধর্ম্মের জ্ঞান থাকে, কিন্তু তাহাতে ধর্ম্মী একটী থাকে না, এজন্য ইহার সহিত তাহার প্রভেদ আছে।

সংশয়ের দুই পক্ষ বা কোটি।

সংশয়জ্ঞানে দুইটী পক্ষ থাকে, যেমন "স্থাণু কি, স্থাণু নয়" এস্থলে "স্থাণু" একটী কোটী এবং "স্থাণু নয়" আর একটী কোটি। প্রথম কোটিকে "ভাব" বা "বিধিকোটি" বলে, দ্বিতীয় কোটিকে "অভাব" বা "নিষেধকোটি" বলে। এই দুই জ্ঞানের কেহই নিশ্চয়রূপ নহে।

নিশ্চয়জ্ঞান সংশয়ের নাশক।

সংশয়জ্ঞানের বিরোধী নিশ্চয়জ্ঞান। যেহেতু নিশ্চয় হইলে সংশয় আর থাকে না।

সংশয়ের বিভাগ।

প্রমাণগত ও প্রমেয়গতভেদে সংশয় দ্বিবিধ। যেমন, "শ্রুতি কর্ম্ম প্রতিপাদন করে, কিংবা ব্রহ্ম প্রতিপাদন করে"—ইহা প্রমাণগত সংশয়। আর "ব্রহ্মই জগৎকারণ, কি পরমাণু জগৎকারণ"—ইহা প্রমেয়গত সংশয়।

অসম্ভবনার পরিচয়।

অসম্ভাবনা বলিতে "এক প্রকার সংশয়ই" বুঝায়। যথা, "ব্রহ্ম যদি সিদ্ধ বস্তুই হন, তবে কেন তিনি অন্য প্রমাণগম্য নহেন"—এইরূপ চিন্তাই অসম্ভাবনা। ইহাও প্রমাণগত ও প্রমেয়গতরূপে দ্বিবিধ।

বিপরীত ভাবনার পরিচয়।

বিপরীত ভাবনাও তদ্রূপ, ভ্রম বা বিপর্য্যয়ের অন্তর্গত। যথা—"ব্রহ্ম সিদ্ধ বস্তু বলিয়া শ্রুতিকর্ত্তৃক তাহার প্রতিপাদন নিষ্ফল, অতএব

সকল কর্ম্মই শ্রুতি প্রতিপাদন করে"—এইরূপ চিন্তাই বিপরীত ভাবনা। ইহাও প্রমাণ ও প্রমেয়গতভেদে দ্বিবিধ বলা হয়।

সংশয়ের কারণ।

সংশয়ের কারণ তিন প্রকার হইতে পারে; যথা—১। সাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞান, ২। অসাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞান, এবং ৩। বিপ্রতিপত্তিবাক্য শ্রবণজন্য জ্ঞান। এই তিনটী কারণের কোনটী উপস্থিত হইলে কোটিদ্বয়ের স্মরণ হয়, এবং যতক্ষণ না বিশেষ জ্ঞান হয়, ততক্ষণ এই উভয়কোটিক জ্ঞানই সংশয় নামে উক্ত হয়। বিশেষদর্শনে নিশ্চয় জ্ঞান হইলে সংশয় আর থাকে না।

নব্যমতে কোটিদ্বয়ের স্মরণ এবং ধর্ম্মীর জ্ঞান বা ধর্ম্মীতে ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষই কারণ হয়। সাধারণাদি ধর্ম্মজ্ঞান কখন কখন কোটিদ্বয়ের স্মারক হয়।

১। সাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞান হইতে যে সংশয় হয়, তাহার দৃষ্টান্ত—অন্ধকারে স্থাণু অর্থাৎ মুড়াগাছ যখন দৃষ্ট হয়, তখন যদি সেই গাছ মনুষ্যের ন্যায় উচ্চ হয়, তখন সেই উচ্চতাটি স্থাণু ও মনুষ্যের সাধারণ ধর্ম্ম হয়। এই উচ্চতার জ্ঞান হইলে এবং হস্তপদাদিযুক্ত বিশেষ জ্ঞানের অভাব হইলে আমাদের মনে "ইহা স্থাণু কি পুরুষ" বলিয়া সংশয় হয়। ইহাই সাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞানজন্য সংশয়।

২। অসাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞান হইতে যে সংশয় হয়, তাহার দৃষ্টান্ত—"শব্দ নিত্য কি অনিত্য" এই সংশয় হইলে শব্দত্ব নিত্য ও অনিত্য এই উভয় বস্তুতে অবৃত্তি হয়, এই জ্ঞানকালে শব্দত্ব অসাধারণ ধর্ম্ম হয়। শব্দের শব্দত্ব ধর্ম্মজন্য শব্দের নিত্যানিত্যবিষয়ক যে সংশয় তাহাই এস্থলে লক্ষ্য। ইহাই অসাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর জ্ঞানজন্য সংশয়।

৩। বিরুদ্ধভাবদ্বয়ের বোধক বাক্যের নাম বিপ্রতিপত্তি বাক্য। অর্থাৎ বিচারস্থলে বাদিপ্রতিবাদীর যে পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্য, তাহা

শুনিয়া মধ্যস্থ বা সভ্যগণের ভাবাভাবরূপ কোটিদ্বয়ের স্মরণজন্য সংশয় হয়। এজন্য বিপ্রতিবাক্যশ্রবণজন্য জ্ঞানও সংশয়ের প্রতি হেতু হয়।

তর্ক পরিচয়।

তর্ককে প্রায়ই অযথার্থ অনুভবের মধ্যে গণ্য করা হয়। ইহার বিষয় ২৮৯ পৃষ্ঠায় কথিত হইয়াছে।

স্বপ্নপরিচয়।

ন্যায়মতে স্বপ্ন—অনুভূত পদার্থের স্মরণদ্বারা, অদৃষ্ট এবং ধাতুদোষবশতঃ উৎপন্ন স্মরণবিশেষ। কেহ কেহ স্বপ্নকে অযথার্থ অনুভবের অন্তর্গত একটী প্রকারভেদ বলেন। কিন্তু সাধারণতঃ ইহাকে ভ্রম বা বিপর্য্যয়ের অন্তর্গতই বলা হয়, অর্থাৎ অযথার্থ অনুভব—ভ্রম, সংশয়, তর্ক ও স্বপ্ন এই চারিপ্রকার নহে।

বেদান্তমতে কিন্তু ভ্রম, সংশয় ও তর্ক এই তিন প্রকারই বলা হয়। স্বপ্ন জ্ঞেয় ও জ্ঞান অন্তঃকরণেরই পরিণাম। ইহা স্মৃতি নহে; কিন্তু অনুভববিশেষ। ইহা সোপাধিক ভ্রম। ইন্দ্রিয়ের অজন্য যে বিষয়গোচর অন্তঃকরণের অপরোক্ষ বৃত্তি, তাহার অবস্থাকে স্বপ্নাবস্থা বলে। জাগ্রৎ অবস্থাতে ইন্দ্রিয়জন্য অন্তঃকরণবৃত্তি হয়।

ন্যায়মতে মনঃ এই সময় ত্বক্‌ ইন্দ্রিয়শূন্য পুরিতত্তি নাড়ীতে প্রবেশ করে বলিয়া কোন জ্ঞান হয় না। ইহা জ্ঞানাভাববিশেষ। জাগ্রতেও "আমি জানি না" এইরূপ যে অবিদ্যাগোচরবৃত্তি, তাহা অন্তঃকরণের বৃত্তি, অবিদ্যার নহে। জাগ্রতে প্রাতিভাসিক রজতাকার বৃত্তি অবিদ্যার পরিণাম; উহা অবিদ্যার গোচর নহে। এ বিষয় তত্ত্বজ্ঞানামৃত গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

সুষুপ্তির পরিচয়।

বেদান্তমতে সুখগোচর এবং অবিদ্যাগোচর অজ্ঞানের সাক্ষাৎ পরিণামরূপ বৃত্তির অবস্থাকে সুষুপ্তি অবস্থা বলে।

অনধ্যবসায় পরিচয়।

ন্যায়মতে কেহ কেহ ইহা অযথার্থজ্ঞানের অন্তর্গত বলেন। "ইহা কিছু" এইরূপ জ্ঞানটী যখন বিশেষের অদর্শনজন্য হয়, তখন তাহা

অনধ্যবসায় পদবাচ্য হয়। কিন্তু ইহা বস্তুতঃ বিপর্য্যয়েরই অন্তর্গত বলা হয়।

প্রত্যভিজ্ঞা ও অভিজ্ঞানাত্মক জ্ঞান।

কোন পূর্ব্বদৃষ্টবিষয়ের পুনর্ব্বার দর্শনকালে ইহাকে যখন "সেই" বলিয়া স্মরণ হয়, তখন সেই জ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে। ইহার এক অংশ স্মৃতি, সুতরাং পরোক্ষ এবং অপর অংশ প্রত্যক্ষ। এই স্মৃতি ও প্রত্যক্ষ মিলিত হইয়া "প্রত্যভিজ্ঞা" হয়। আর যাহাকে "এই" বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়, তদ্বিষয়ক জ্ঞানকে "অভিজ্ঞা" বলা হয়। যেমন "এই সেই দেবদত্ত" এস্থলে "এই" অংশ প্রত্যক্ষ এবং "সেই" অংশ পরোক্ষ।

স্মৃতির পরিচয়।

ইহার পরিচয় ২৩৫ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বানুভবটী ইহার করণ এবং অনুভবজন্য সংস্কারটী ব্যাপার। নব্যমতে অনুভবের যেমন সংস্কার থাকে, স্মৃতিরও তদ্রূপ সংস্কার থাকে—বলা হয়। স্মৃতি জন্মিলে পূর্ব্বসংস্কারের নাশ হয়, কিন্তু নূতন সংস্কার জন্মে।

স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞার ভেদ।

স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞার মধ্যে প্রভেদ এই যে, ভাবনাখ্য সংস্কারটী স্মরণে পরিণত হইতে গেলে উদ্বোধক সহকারী কারণ হয়, কিন্তু সেই ভাবনাখ্য সংস্কার হইতে প্রত্যভিজ্ঞা হইবার কালে উদ্বোধক ব্যতিরেকেই বিশেষ্যে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হইতে তাহা উৎপন্ন হয়। উভয়স্থলেই সংস্কার আবশ্যক হয়। অর্থাৎ উদ্বোধক ব্যতিরেকে বিশেষ্যে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ-সহকারে ভাবনাখ্য সংস্কারজন্য যে পূর্ব্বদৃষ্টবিষয়ের পুনর্দ্দর্শন তাহাই প্রত্যভিজ্ঞা।

বেদান্তমতেও সংস্কারমাত্রজন্য জ্ঞানই স্মৃতি। ইহা দ্বিবিধ, যথা—যথার্থ ও অযথার্থ। যথার্থ স্মৃতি আবার অনাত্মস্মৃতি ও আত্মস্মৃতিভেদে দ্বিবিধ। "ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ মিথ্যা, যেহেতু দৃশ্য, যেমন শুক্তিরৌপ্য" এই অনুমানসিদ্ধ মিথ্যাত্বানুসন্ধানই যথার্থ অনাত্মস্মৃতি। তত্ত্বমস্যাদি বাক্যার্থ অনুসন্ধানই যথার্থ আত্মস্মৃতি। অযথার্থস্মৃতিও দুই প্রকার, যথা—

পূর্ব্ববৎ প্রপঞ্চের সত্যত্বানুসন্ধানই অযথার্থ অনাত্মস্মরণ, ইহা প্রথম প্রকার, এবং মিথ্যাবস্তু বলিয়া তাহার অহংকারাদিতে আত্মত্বানুসন্ধান বা আত্মাতে কর্তৃত্বানুসন্ধান—দ্বিতীয় প্রকার। বেদান্তমতে স্মৃতি জন্মিলে সংস্কারের নাশ হয় না—বলা হয়।

উদ্বোধকের পরিচয়।

সংস্কারসত্ত্বেও যাহার সদ্ভাবে ও অসদ্ভাবে স্মরণের সম্ভাব ও অসম্ভাব হয়, কিংবা করণ ভিন্ন ও ব্যাপার ভিন্ন যে স্মরণের কারণ, তাহার নাম উদ্বোধক। ইহা নানা ক্ষেত্রে নানারূপই হয়। যেমন কোনে ব্যক্তির স্মরণে তাহার অলঙ্কারাদি উদ্বোধক হয়।

জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব ও পরতঃপ্রকাশত্বের পরিচয়।

ন্যায়মতে জ্ঞান অনুব্যবসায়জ্ঞানেই প্রকাশিত হয়। ব্যবসায়াত্মক জ্ঞান বিষয়কেই প্রকাশ করে। বিষয় ব্যতীত এই জ্ঞানের প্রকাশ বা উৎপত্তি হয় না। বিষয়কে প্রকাশ করিয়াই জ্ঞানের প্রকাশ বা উৎপত্তি। ঘট পট মঠের জ্ঞান সকলই সবিষয়ক জ্ঞান। নির্ব্বিষয় জ্ঞান নাই। সবিকল্পক বা নির্ব্বিকল্পক সকল জ্ঞানেরই বিষয় থাকে, ঈশ্বরের জ্ঞানেরও বিষয় থাকে। এজন্য ন্যায়মতে জ্ঞানকে পরতঃপ্রকাশ বলা হয়।

বেদান্ত, প্রাভাকর ও মীমাংসকমতে কিন্তু জ্ঞান সূর্য্যবৎ স্বতঃপ্রকাশ বলা হয়; অর্থাৎ বিষয় না থাকিলেও জ্ঞানের প্রকাশ থাকে। জ্ঞানের প্রকাশ বিষয়সাপেক্ষ নহে; বেদান্তমতে এই জ্ঞানস্বরূপই ব্রহ্ম বা আত্মা। এই জ্ঞান অন্তঃকরণবিশিষ্ট হইলে অন্তঃকরণও জ্ঞানময় হয় এবং জ্ঞানটীও নিজে নিজেকে মানিতে থাকে, তখনই "অহং জ্ঞানের" উদয় হয়। অন্তঃকরণবিশিষ্ট জ্ঞানের অপর নাম বৃত্তিজ্ঞান। এই বৃত্তিজ্ঞানই ঘট পট মঠাদি যাবৎ বস্তুর আকার ধারণ করে। এই বৃত্তিজ্ঞানই সবিষয়ক জ্ঞান। এই বৃত্তিজ্ঞানের প্রকাশে বিষয় কারণ হয়। কিন্তু তাহা হইলে জ্ঞানবস্তুটী স্বরূপতঃ স্বতঃপ্রকাশ। ভট্টমীমাংসকমতে জ্ঞাততালিঙ্গক অনুমানই জ্ঞানের প্রকাশক। ইঁহাদিগকে এজন্য পরতঃপ্রকাশবাদী বলা হয়।

জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য ও পরতঃপ্রামাণ্যের পরিচয়।

ন্যায়মতে জ্ঞানটী উৎপন্ন হইবার পর সেই জ্ঞানটী প্রমাণ অর্থাৎ যথার্থ কি না—সংশয় হয়, তৎপরে অনুমানদ্বারা তাহার যথার্থতা বা প্রামাণ্যের জ্ঞান হয়। এজন্য ন্যায়মতে জ্ঞানের *প্রামাণ্য পরতঃ স্বীকার*

করা হয়। অর্থাৎ নৈয়ায়িক জ্ঞানের পরতঃপ্রামাণ্যবাদী। অর্থাৎ প্রথমে ঘটের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষবশতঃ "ঘট ও ঘটত্ব" এইরূপ নির্বিকল্পক জ্ঞান হয়, তৎপরে "অয়ং ঘটঃ" অর্থাৎ "ঘটত্ববান্ ঘটঃ" এইরূপ বিশিষ্ট জ্ঞান হয়। ইহার নাম ব্যবসায়াত্মক জ্ঞান। তৎপরে "আমি ঘটকে জানিতেছি" অথবা "ঘটজ্ঞানবান্ আমি" এইরূপ অনুব্যবসায় জ্ঞান হয়। তাহার পর প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য এই কোটিদ্বয়ের স্মরণ হয়, তাহার পর "এই জ্ঞানটী প্রমা কি না" এইরূপ প্রামাণ্যসংশয় হয়। তাহার পর বিশেষদর্শনান্তর প্রামাণ্যের জ্ঞান হয়। এই সময় যে অনুমানটী হয়, তাহা এইরূপ—

ইদং জ্ঞানং প্রমা .. (প্রতিজ্ঞা)
সমর্থপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ, .. (হেতু)
জ্ঞানান্তরবৎ ... (দৃষ্টান্ত)

কিন্তু প্রাভাকর, ভট্ট ও মুরারী মিশ্র এই তিন মীমাংসকমতেই জ্ঞানের প্রামাণ্যজ্ঞানটী স্বতঃই হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে সামগ্রী হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই সামগ্রী হইতেই জ্ঞানের প্রামাণ্যেরও জ্ঞান হইয়া থাকে। তন্মধ্যে—

প্রভাকরমতে "অয়ং ঘটঃ" এই জ্ঞানটীই ঘটরূপ বিষয়, ঘটজ্ঞান, ঘটজ্ঞানের জ্ঞাতা ও ঘটজ্ঞানের প্রামাণ্য—এই চারিটীকেই প্রকাশ করে, আর—

মুরারী মিশ্রমতে "অয়ং ঘটঃ" এই ব্যবসায়জ্ঞানের পর "আমি ঘটকে জানিতেছি" এইরূপ যে অনুব্যবসায়জ্ঞান হয়, সেই অনুব্যবসায়জ্ঞানেই উক্ত ব্যবসায়জ্ঞানের প্রামাণ্যেরও জ্ঞান হয়। আর—

ভট্টকুমারিলমতে "জ্ঞান অতীন্দ্রিয়" বলিয়াই তাহা অনুমেয় এবং তাহার প্রামাণ্যও অনুমেয়। অতএব "অয়ং ঘটঃ" ঘটের এই প্রত্যক্ষজ্ঞানের পর ঘটে একটী জ্ঞাততা জন্মে. তৎপরে "ঘট আমার জ্ঞাত" এইরূপের জ্ঞাততার প্রত্যক্ষ হয়, তৎপরে ব্যাপ্যরূপ হেতুর প্রত্যক্ষের পর জ্ঞানের অনুমান হয়। সেই অনুমানটী এই—

আমি ঘটত্বপ্রকারক জ্ঞানবান্ ... (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু আমাতে ঘটত্বপ্রকারক জ্ঞাততাবত্তা রহিয়াছে ... (হেতু)

আর এই অনুমানের ফলে যেমন জ্ঞানের জ্ঞান হয়, তদ্রূপই জ্ঞানের প্রামাণ্যেরও জ্ঞান হয়। অতএব এই তিন মতেই যে সামগ্রীর দ্বারা জ্ঞান হয়, সেই সামগ্রীর দ্বারাই জ্ঞানের প্রামাণ্যেরও জ্ঞান হয়। কিন্তু জ্ঞানের অপ্রামাণ্যবিষয়ে আবার আচার্য্যগণের মধ্যে মতভেদ আছে। যাহা হউক, জ্ঞানের প্রকাশত্ব, প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য সম্বন্ধে ইহাদের মতভেদ এইরূপ—

মতের নাম	প্রকাশবিষয়ে	প্রামাণ্যবিষয়ে	অপ্রামাণ্যবিষয়ে
নৈয়ায়িক ...	পরতঃ প্রকাশবাদী ...	পরতঃ প্রামাণ্যবাদী ...	পরতঃ অপ্রামাণ্যবাদী
ভট্টমীমাংসক ...	" ...	স্বতঃ প্রামাণ্যবাদী ...	"
প্রাভাকর ও মুরারি-মিশ্র মীমাংসক ...	স্বতঃ প্রকাশবাদী ...	" ...	"
বেদান্তী ও সাংখ্য ...	" ...	" ...	"
বৌদ্ধ ...	" ...	পরতঃ প্রামাণ্যবাদী ...	স্বতঃ অপ্রামাণ্যবাদী

ইহাই হইল বুদ্ধি বা জ্ঞানসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ পরিচয়। বেদান্তমত-স্থূলভাবে আরও জানিতে হইলে তত্ত্বজ্ঞানামৃত, বেদান্তসংজ্ঞাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ দেখা যাইতে পারে। অতঃপর অবশিষ্ট গুণগুলির বিষয় আলোচ্য।

অবশিষ্ট গুণগুলির পরিচয়।

সুখ—যাহা সকলের অনুকূল বেদনা উৎপাদন করে, অর্থাৎ যাহা অনুকূল বা একান্ত রুচ্য বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহাই সুখ। কিন্তু ইহার নিকৃষ্ট লক্ষণ—"ইতরেচ্ছার অনধীন যে ইচ্ছা সেই ইচ্ছার বিষয়ত্ব"। ধর্ম্ম হইতে সুখ জন্মে। সুখের কোন বিষয় নাই। ইহার যে বিষয়, তাহা ইচ্ছারই বিষয় হয়, এজন্য ইহার বিষয় বলিয়া যে অভিহিত হয়, তাহা "বাচিক-মণ্ডন" ভাবেই বলা হয়। এই সুখ গুণটী আত্মাতেই উৎপন্ন হয়। সুখের ইচ্ছা—সুখত্বপ্রকারক জ্ঞানমাত্রফল হয়। ইহা বৈষয়িক ও মানোরথিকভেদে দ্বিবিধ বলা হয়। ঈশ্বরে ইহা নাই।

বেগজন্য বেগাখ্যসংস্কার, যথা—প্রথমতঃ অশ্বাদির চরণাদিতে বেগ জন্মে, পশ্চাৎ অশ্বাদিতে যখন বেগ হয়, তখন সেই বেগকে বেগজন্য বেগাখ্যসংস্কার বলা হয়।

স্থিতিস্থাপকাখ্যসংস্কার কেবল পৃথিবীতে থাকে। শাখাদিকে আকর্ষণ করিয়া ছাড়িয়া দিলে যে পূর্ব্বস্থানে গমন করে, তাহা এই স্থিতিস্থাপকাখ্য সংস্কারবশতঃ হয়। ইহা অতীন্দ্রিয় এবং আকৃষ্ট শাখাদির স্পন্দনের হেতু।

ভাবনাখ্যসংস্কার—ইহা জীবমাত্রবৃত্তি ও অতীন্দ্রিয়। অর্থাৎ আত্মমাত্রবৃত্তি অথচ স্মরণের কারণ যে অতীন্দ্রিয় সংস্কার, তাহাই ভাবনাখ্যসংস্কার। উপেক্ষা ভিন্ন যে নিশ্চয়জ্ঞান বা অনুভব, তাহাই ইহার কারণ। ইহা হইতে স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞানামক জ্ঞান জন্মে। এই স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞার প্রতি পূর্ব্বানুভব করণ, তজ্জন্য যে ভাবনাখ্যসংস্কার তাহা ব্যাপার বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই সংস্কার হইতে স্মৃতি জন্মিলে ইহার নাশ হয়। নব্যমতে স্মৃতি হইতেও সংস্কার জন্মে।

বেদান্তমতে ইহা স্মৃতি জন্মিলে নষ্ট হয় না। দৃঢ়তর ও দৃঢ়তম সংস্কার পৃথক্ সংস্কার। ইহারা বিলক্ষণ কারণ হইতে জন্মে, অথবা পুনঃ পুনঃ স্মরণ হইতেও জন্মে। মূলগ্রন্থে তৃতীয় মিথ্যাত্ব লক্ষণমধ্যে বিশেষ দ্রষ্টব্য।

অদৃষ্ট—বলিতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বুঝায়। ইহা জীবাত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহার অপর নাম অপূর্ব্ব। ধর্ম্ম—বলিতে যাহা হইতে স্বর্গাদি বা সুখ হয়, তাহাই বুঝিতে হইবে। ইহা হইতে স্বর্গের সাধনীভূত শরীরাদিও জন্মিয়া থাকে। অর্থাৎ স্বর্গাদির সাধন যে অদৃষ্ট তাহাই ধর্ম্ম। স্বর্গাদির প্রতি গঙ্গাস্নানাদি ও অশ্বমেধযাগাদি করণ এবং ধর্ম্মই ব্যাপার হয়। ধর্ম্মের কীর্ত্তনাদি করিলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়। ইহা জীবাত্মারই গুণ। পরমাত্মা ধর্ম্মরহিত। যাগাদির ফল যখন বহুদিন পরে ফলে, তখন ইহার অস্তিত্ব অনুমান করিতেই হয়।

বুঝিতে হইবে। নিন্দিত কর্ম্মটী করণ এবং তজ্জন্য যে অধর্ম্ম তাহা ব্যাপার। নরকাদির সাধন যে অদৃষ্ট, তাহাই অধর্ম্ম। প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা অধর্ম্মের নাশ হয়। প্রায়শ্চিত্ত অর্থ পাপের খ্যাপন, অনুতাপ, তীর্থভ্রমণ, দান ও দণ্ডাদি। ইহাও জীবাত্মারই গুণ। পরমাত্মা অধর্ম্ম-রহিত। ইহাও ধর্ম্মবৎ অনুমেয়।

এই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বাসনাজন্য হয়, এজন্য জ্ঞানীর কৃত কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্মের জনক হয় না। বাসনা অর্থ—ভাবনাখ্য সংস্কার। এজন্য ধর্ম্মাধর্ম্মনাশের প্রতি তত্ত্বজ্ঞান ও ভোগ কারণ হয়।

বেদান্তমতেও প্রায় এইরূপই বলা হয়।

এই গুণ সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যে থাকে। গুণত্বজাতি আবার সমবায় সম্বন্ধে গুণে থাকে। গুণের উপর গুণ থাকে না।

বেদান্তমতে গুণ, তাদাত্ম্য সম্বন্ধে দ্রব্যে থাকে। গুণের সঙ্গে গুণীর ভেদাভেদ সম্বন্ধ। তজ্জন্য মূলগ্রন্থ ১ম লক্ষণ ৪২ বাক্য ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

ইহাই হইল গুণ পরিচয়।

কর্ম্ম পরিচয়।

কর্ম্মের লক্ষণ ও বিভাগ ২২৪ পৃষ্ঠায় কথিত হইয়াছে। তথাপি ইহার আর একটু বিশেষ পরিচয় এই—বেগবিশিষ্ট দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমান যে পদার্থবিশেষ, তাহাই কর্ম্ম, অথবা পঞ্চক্ষণবৃত্তি ধ্বংসের প্রতিযোগী যে পদার্থ, তাহাই কর্ম্ম। যেহেতু প্রথমতঃ অভিঘাত কিংবা নোদনপ্রযুক্ত কর্ম্ম জন্মে, তৎপরে বিভাগ, তৎপরে পূর্ব্বসংযোগনাশ, তৎপরে উত্তরসংযোগ, তৎপরে কর্ম্মনাশ হয়। প্রত্যক্ষ কর্ম্মে প্রত্যক্ষই প্রমাণ, অপ্রত্যক্ষ কর্ম্মে অনুমানাদি প্রমাণ।

বেদান্তমতে কর্ম্ম তাদাত্ম্য সম্বন্ধে দ্রব্যেই থাকে। দ্রব্যের সহিত গুণের ন্যায় ইহার ভেদাভেদ সম্বন্ধ।

সামান্য পরিচয়।

ইহারও বিষয় ২২৪ পৃষ্ঠায় কথিত হইয়াছে। নিত্য হইয়া যাহা

অনেক সমবেত তাহাই জাতি। ইহা ত্রিবিধ, যথা—পরা, অপরা এবং পরাপরা। দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম—এই তিনটীতে থাকে, যে সত্তা তাহাই পর সামান্য বা পরা জাতি। কারণ, দ্রব্যবৃত্তি যে দ্রব্যত্বজাতি, গুণবৃত্তি যে গুণত্বজাতি এবং কর্ম্মবৃত্তি যে কর্ম্মত্বজাতি, সেই সকল জাতি অপেক্ষা ইহা বড় অর্থাৎ ব্যাপকজাতি। "দ্রব্য আছে" "গুণ আছে" "কর্ম্ম আছে"—এই প্রতীতিই উক্ত সত্তাজাতির প্রমাণ। এই দ্রব্যত্ব জাতির অন্তর্গত আবার পৃথিবীত্ব ও জলত্বাদি জাতি থাকায়, আর সেই পৃথিবীত্বাদি জাতির অন্তর্গত আবার ঘটত্ব পটত্ব জাতি থাকায়, দ্রব্যত্বাদি ও পৃথিবীত্বাদি জাতিকে পরাপরা জাতি বলা যায়, এবং ঘটত্ব পটত্বাদি জাতি অপরা জাতি বলা যায়। নচেৎ সত্তার তুলনায় দ্রব্যত্বজাতি অপরাজাতি, আবার দ্রব্যত্বের তুলনায় পৃথিবীত্ব অপরাজাতি এবং পৃথিবীত্বের তুলনায় ঘটত্ব অপরাজাতি। ঘটত্বের অপেক্ষা অপরাজাতি আর নাই। প্রত্যক্ষজাতির প্রত্যক্ষই প্রমাণ, অপ্রত্যক্ষ জাতির অনুমানাদিই প্রমাণ।

বেদান্তমতে ইহাকে নিত্য বলা হয় না, এবং তাহারা সম্বন্ধে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম থাকে। ইহার সঙ্গে জাতিবিশিষ্টের গুণাদির ন্যায় ভেদাভেদ সম্বন্ধ।

উপাধির পরিচয়।

যাহা নিত্য অথচ অনেক সমবেত নহে বা অনুগত ধর্ম্মমাত্র, তাহাই উপাধি। ইহা নিত্য ও অনিত্য উভয়ই হইতে পারে। দ্রব্যত্ব পৃথিবীত্ব ঘটত্বাদি জাতি, কিন্তু আকাশত্ব, দিক্ত্ব, কালত্ব প্রভৃতি উপাধি। সামান্যত্ব, বিশেষত্ব, সমবায়ত্ব ও অভাবত্ব—ইহারা উপাধি।

জাতির বাধক।

জাতির বাধক ছয়টী, যথা—১। ব্যক্তির অভেদ, ২। তুল্যত্ব, ৩। সঙ্কর, ৪। অনবস্থা, ৫। রূপহানি এবং ৬। অসম্বন্ধ। ইহা থাকিলে কোন ধর্ম্মবিশেষকে আর জাতি বলা যায় না।

১। ব্যক্তির অভেদ বলিতে নিজের আশ্রয়ব্যক্তির ঐক্য। যেমন আকাশত্ব। ইহার আশ্রয়ব্যক্তি একই হয়।

২। তুল্যত্ব বলিতে অন্যূনানতিরিক্তব্যক্তিকত্ব। যেমন ঘটত্ব ও কলসত্ব ভিন্ন জাতি নহে।

৩। সঙ্কর বলিতে পরস্পর অত্যন্তাভাবসমানাধিকরণ ধর্ম্মদ্বয়ের একত্র সমাবেশ। যেমন—ভূতত্ব ও মূর্ত্তত্ব জাতি নহে। ভূতত্ব থাকে—ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুদ্ ও ব্যোমে, এবং মূর্ত্তত্ব থাকে—ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুদ্ ও মনে। ব্যোমে মূর্ত্তত্ব থাকে না, মনেও ভূতত্ব থাকে না। এজন্য ভূতত্ব ও মূর্ত্তত্ব পরস্পরের অত্যন্তাভাবসমানাধিকরণ হয়, আর তজ্জন্য সঙ্কর দোষ হওয়ায় ভূতত্ব কিংবা মূর্ত্তত্ব জাতি হইল না।

৪। অনবস্থা বলিতে যাহার শেষ নাই। যেমন জাতির জাতিত্ব জাতি নহে।

৫। রূপহানি বলিতে নিজের ব্যাবর্ত্তকতাত্মক রূপের হানি। যেমন বিশেষের বিশেষত্ব জাতি নহে।

৬। অসম্বন্ধ বলিতে অসমবেত। যেমন অভাবের অভাবত্ব জাতি নহে। কারণ, অভাবত্ব ধর্ম্ম অভাবের উপর সমবায় সম্বন্ধে থাকে না, পরন্তু স্বরূপসম্বন্ধেই থাকে।

বেদান্তমতে এবিষয়ে মতভেদ নাই।

বিশেষের পরিচয়।

ইহার বিষয় ২২৪ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে। নিত্য বিভু, অর্থাৎ—আত্মা আকাশাদি ও নিত্য পরমাণু সমূহের মধ্যে পরস্পরের ভেদের জন্য এই বিশেষ স্বীকার করা হয়। সংক্ষেপে ইহার লক্ষণ "জাতিজাতিমদ্‌ভিন্ন হইয়া, সমবেত যে, পদার্থ তাহাই বিশেষ। ইহা যোগীদিগের প্রত্যক্ষ হয় বলা হয়।

বেদান্তমতে ইহা স্বীকার করা হয় না। কারণ বস্তুর স্বরূপদ্বারাই ইহার উপপত্তি হয়।

/

সমবায় পরিচয়।

ইহার বিষয় ২২৫ পৃষ্ঠায় কথিত হইয়াছে। অবয়বে অবয়বীর, গুণবানে গুণের, ক্রিয়াবানে ক্রিয়ার নিত্যদ্রব্যে বিশেষ পদার্থের এবং দ্রব্যগুণ ও কর্ম্মে জাতির যে সম্বন্ধ তাহাই সমবায় সম্বন্ধ। নিত্য অথচ বিশেষণতাসম্বন্ধ ভিন্ন যে বৃত্তিনিয়ামক এক সম্বন্ধ, তাহাই সমবায়। "এই কপালে ঘট আছে, এই ঘটে ঘটত্ব আছে, এই দ্রব্যে গুণ আছে" ইত্যাদি প্রতীতিই সমবায়ের প্রমাণ। সমবায় সম্বন্ধ এক হইলে বায়ুতে স্পর্শের সমবায় আছে, এবং তেজে রূপের সমবায় আছে বলিয়া বায়ুতে রূপের প্রত্যক্ষ হইবে না কেন, এরূপ বলা যায় না। কারণ, বায়ুতে রূপ নাই বলিয়া বায়ুতে রূপবত্তাজ্ঞান হয় না। অর্থাৎ বায়ুতে কেবল সমবায় থাকিলেও রূপের সমবায় নাই।

বেদান্তমতে ইহা স্বীকার করা হয় না। ইহার স্থলে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়। আর সমবায় স্বীকার না করায় ফলতঃ ন্যায়মতের পদার্থবিভাগও স্বীকার করা হয় না। ব্যবহারসম্পাদনের জন্য উহার উপযোগিতা স্বীকার্য্য মাত্র। সমবায় অস্বীকারে যুক্তি বহুর মধ্যে একটী যথা—

সমবায়টী সমবায়িদ্বয় হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন? ভিন্ন বলিলে সমবায় কোন্ সম্বন্ধে সমবায়িতে থাকে? সংযোগসম্বন্ধে থাকিতে পারে না; কারণ, সংযোগসম্বন্ধে দ্রব্যই থাকে। সমবায় সম্বন্ধেও থাকিতে পারে না, কারণ, তাহা হইলে অনবস্থাদোষ হয়। স্বরূপসম্বন্ধ অপ্রামাণিক বলিয়া অন্যসম্বন্ধেও থাকিতে পারে না। ইত্যাদি বহু কথাই আছে, শাঙ্করভাষ্য ব্রহ্মসূত্রে দ্রষ্টব্য।

সম্বন্ধের পরিচয়।

সমবায়টী ন্যায়মতে একটী সম্বন্ধ বিশেষ। সমবায় ভিন্ন এই সম্বন্ধ নানারূপ হইয়া থাকে। যেমন সংযোগ একটী সম্বন্ধ, ইহা কিন্তু গুণ। ইহার কথা বলা হইয়াছে। তদ্রূপ—

বিশেষণতা একটী সম্বন্ধ। ইহা আবার দৈশিক, দিক্‌কৃত ও কালিকভেদে ত্রিবিধ। দৈশিকবিশেষণতা আবার দুই প্রকার, যথা— অভাবীয় বিশেষণতা ও স্বরূপ বিশেষণতা।

অভাবীয় বিশেষণতা সম্বন্ধে অভাব পদার্থ টী থাকে।

স্বরূপবিশেষণতা সম্বন্ধে গগণত্বাদি গগনাদিতে থাকে।

দিকৃকৃত বিশেষণতাসম্বন্ধে সকল বস্তু দিকে থাকে।

কালিকবিশেষণতাসম্বন্ধে সকল বস্তু কালে থাকে।

তাদাত্ম্য ও একটী সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধে নিজে নিজের উপর থাকে।

বেদান্তমতে বিশেষণতা সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় না। কারণ, সম্বন্ধ যেমন দুইটীতে থাকে, ইহা সেরূপ নহে, কিন্তু ইহা একটীতেই থাকে। তাহার পর যাহা বিশেষণ হয়, তাহা অন্য কোন সম্বন্ধেই বিশেষ্যের উপর থাকে; যেমন দণ্ড দণ্ডীর বিশেষণ, উহা সংযোগ সম্বন্ধে দণ্ডীপুরুষে থাকে। এইরূপ বিশেষণটী কোন না কোন একটী সম্বন্ধেই থাকে। আর তজ্জন্য বিশেষণতা একটী সম্বন্ধ নহে।

বৃত্তিনিয়ামক এবং বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধ।

যে সম্বন্ধে থাকা কল্পিত নহে, সেই সম্বন্ধের নাম বৃত্তিনিয়ামক সম্বন্ধ। যেমন সংযোগ, সমবায় এবং স্বরূপ।

যে সম্বন্ধে থাকা কল্পিত তাহাকে বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধ বলে। যেমন তাদাত্ম্য। কারণ, নিজে কখন নিজের উপর থাকে না।

সম্বন্ধের প্রতিযোগী ও অনুযোগীর পরিচয়।

যে সম্বন্ধে যে থাকে, সে সেই সম্বন্ধের প্রতিযোগী এবং যাহাতে থাকে, তাহা অনুযোগী। এই প্রতিযোগী ও অনুযোগীর যাহা ধর্ম, সেই ধর্মটী সেই প্রতিযোগীর ধর্ম যে প্রতিযোগিতা তাহার এবং সেই অনুযোগীর ধর্ম যে অনুযোগিতা তাহার অবচ্ছেদক হয়, যেমন সংযোগ সম্বন্ধে ঘট ভূতলে আছে, এখানে ঘট প্রতিযোগী আর ভূতল অনুযোগী। আর—ঘটত্ব সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক, ভূতলত্ব অনুযোগিতার অবচ্ছেদক। তদ্রূপ সংযোগ সম্বন্ধটীও উক্ত অনুযোগিতা ও প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক।

অবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকতার পরিচয়।

কোন অবচ্ছেদকের সহিত যে ধর্ম থাকে তাহা সেই অবচ্ছেদকের

ধর্ম্ম যে অবচ্ছেদকতা, তাহার অবচ্ছেদক হয়। স্থূল কথায়—বিশেষণ হয় অবচ্ছেদক এবং বিশেষণের যে বিশেষণ তাহা অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক হয়। যেমন "নীলঘটবদ্ আর্দ্র ভূতলম্" স্থলে ঘটত্ব যেমন ঘটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক এবং ভূতলত্ব ভূতলনিষ্ঠ অনুযোগিতার অবচ্ছেদক, তদ্রূপ নীলত্বটী ঘটনিষ্ঠপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বের অবচ্ছেদক। আর আর্দ্রত্বটী ভূতলনিষ্ঠ অনুযোগিতাবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক।

অধিকরণতার বা আধারতা ও আধেয়তার পরিচয়।

যে থাকে তাহা আধেয়, আর যাহাতে থাকে তাহা আধার বা অধিকরণ। আধেয়ের যে ধর্ম্ম তাহা আধেয়তা, এবং আধার বা অধিকরণের যে ধর্ম্ম তাহা আধারতা বা অধিকরণতা। উক্ত "ঘটবদ্ ভূতলম্" স্থলে ঘটত্বটী আধেয়তাবচ্ছেদক এবং ভূতলত্বটী আধারতা বা অধিকরণতার অবচ্ছেদক। তদ্রূপ "নীলঘটবদ্ আর্দ্রভূতলম্" স্থলে নীলত্বটী ঘটনিষ্ঠ আধেয়তাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক এবং আর্দ্রত্বটী ভূতলনিষ্ঠ আধারতা বা অধিকরণতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক বলা হয়।

বিশেষ্যতা, প্রকারতা, ধর্ম্মতা প্রভৃতির পরিচয়।

এইরূপ প্রকারের ধর্ম্মপ্রকারতা, বিশেষ্যের ধর্ম্ম বিশেষ্যতা, ধর্ম্মীর ধর্ম্ম ধর্ম্মিতা, বিশেষণের ধর্ম্ম বিশেষণতা বলা হয়। প্রকারাদির বিশেষণ থাকিলে সেই বিশেষণের ধর্ম্মগুলি উক্ত প্রকারতাদির অবচ্ছেদক হয়, এবং সেই অবচ্ছেদকের আবার অবচ্ছেদক থাকিতে পারে। বিশেষণকে প্রকার বলে। বিশেষ্যকে ধর্ম্মী বলে। যাহার বিষয় বলা হয় তাহাকে উদ্দেশ্য বলে, যাহা বলা হয় তাহাকে বিধেয় বলে, জ্ঞানের যাহা জ্ঞেয় তাহাকে বিষয় বলে, জ্ঞানকে বিষয়ী বলে। আর ইহাদের বিশেষণগুলির যে ধর্ম্ম তাহারা উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক, বিধেয়তাবচ্ছেদক, বিষয়তাবচ্ছেদক বা বিষয়িতাবচ্ছেদক নামে অভিহিত হয়।

অভাবের পরিচয়।

অভাবের বিষয় ২২৫ পৃষ্ঠায় কিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে। এস্থলে আর একটু বিশেষভাবে বলা যাইতেছে। যাহা ভাব পদার্থ হইতে ভিন্ন তাহাই অভাব, সেই অভাব দুই প্রকার যথা—সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব।

• প্রভাকর মীমাংসকের মতে ভাবান্তরই অভাব। অভাব কোন পদার্থ নহে।

সংসর্গাভাব পরিচয় ও বিভাগ।

সংসর্গাভাব বলিতে প্রাগভাব ধ্বংস ও অত্যন্তাভাব বুঝায়। যে অভাবের প্রতিযোগিতা ভেদসম্বন্ধে অর্থাৎ তাদাত্ম্যভিন্ন সম্বন্ধদ্বারা অবচ্ছিন্ন বা পরিচিত হয়, তাহাই সংসর্গাভাব।

প্রাগভাব পরিচয়।

প্রাগভাব—প্রতিযোগীর জন্ম হইলে যে অভাবের নাশ হয়, তাহা প্রাগভাব। ইহা, অনাদি কিন্তু সান্ত। "এই কপালে ঘট হইবে", এই প্রতীতি ইহার প্রমাণ। এই ঘটপ্রাগভাবের অধিকরণ কপাল।

ধ্বংস পরিচয়।

ধ্বংস—প্রতিযোগীর নাশরূপ যে অভাব তাহাই ধ্বংস। ইহা সাদি কিন্তু অনন্ত। "এই কপালে ঘট নষ্ট হইয়াছে"—এই প্রতীতি ইহার প্রমাণ। এই ঘটধ্বংসের অধিকরণ কপাল।

অত্যন্তাভাব পরিচয়।

অত্যন্তাভাব—ত্রৈকালিক সংসর্গাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবই অত্যন্তাভাব। "এই ভূতলে ঘট নাই" এইরূপ প্রতীতিই ইহার প্রমাণ। এই ঘটাভাবের অধিকরণ ভূতলাদি।

সাময়িকাভাব পরিচয়।

প্রাচীনমতে "ভূতলে ঘট নাই" ইহা সাময়িক অত্যন্তাভাব। কারণ, ভূতলে ঘট আনিলে ভূতলে ঘট থাকে, আর ঘট অপসরণের পূর্ব্বে ভূতলে ঘট ছিল—দেখা যায়। এযন্ত বায়ুতে যে রূপাভাব, তাহাই প্রকৃত অত্যন্তাভাব। যেহেতু বায়ুতে রূপ ছিল না, নাই এবং থাকিবেও না।

অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী।

প্রাচীনমতে ঘটাত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী তিন প্রকার, যথা—ঘট, ঘটধ্বংস ও ঘটপ্রাগভাব। নবীনমতে কেবল ঘটই প্রতিযোগী। প্রাচীনমতে ঘটের অত্যন্তাভাবের জ্ঞানের প্রতি যেমন ঘটবত্ত্বজ্ঞান প্রতিবন্ধক হয়, তদ্রূপ ঘটধ্বংস ও ঘটপ্রাগভাবও প্রতিবন্ধক হয়। এজন্ত ঘট, ঘটধ্বংস ও ঘটপ্রাগভাব এই তিনটিই প্রতিযোগী বলা হয়।

অভাবের স্বরূপ।

ভাবভিন্নত্বই অভাবের স্বরূপ। অর্থাৎ যাহা নিষেধবুদ্ধির বিষয় তাহাই অভাব। প্রাভাকরমতে যে অভাব যেখানে থাকে, সেই অভাব সেই অধিকরণেরই স্বরূপ হয় বলিয়া, অভাবকে অতিরিক্ত পদার্থ বলা হয় না, কিন্তু তাহা উচিত নহে। কারণ, নানা অধিকরণের স্বরূপ কল্পনা অপেক্ষা অতিরিক্ত অভাব স্বীকার করায় লাঘব হয় বলিয়া এবং আধার আধেয়ভাবের উপপত্তির জন্তও অভাব অতিরিক্তই বলা হয়।

অন্যোন্যাভাবের পরিচয়।

অন্যোন্যাভাব বা ভেদ বলিতে তাদাত্ম্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব বুঝায়। যেমন "ঘট পট নয়" বলিলে বুঝায়। ঘটভেদ পটে থাকে, আর পটভেদ ঘটে থাকে। আর তজ্জন্য পটভেদই ঘটস্বরূপও নহে। পটভেদ ও ঘট পৃথক্। উহারা একত্র থাকে বটে, কিন্তু পৃথক্।

অভাবপ্রত্যক্ষে সহকারি কারণ।

অভাবের প্রত্যক্ষে যোগ্যানুপলব্ধি সহকারি কারণ এবং ইন্দ্রিয়াদি করণ হইয়া থাকে। ইহা না থাকিলে অভাবের প্রত্যক্ষ হয় না।

ভট্ট, মীমাংসক বা বেদান্তমতে ইহা অনুপলব্ধি প্রমাণগম্য, ইন্দ্রিয়াদি সহকারিকারণ। কেহ বলেন অভাব অনুপলব্ধিপ্রমাণগম্য হইলেও প্রত্যক্ষই হয়।

অভাবের বহুত্বের হেতু।

প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক এবং আরোপ্য সংসর্গের ভেদপ্রযুক্ত এক প্রতিযোগিক অত্যন্তাভাব বা অন্যোন্যাভাবও বহু হইয়া থাকে।

কেবলাভাব ও বিশিষ্টাভাব ইত্যাদি প্রকার ভেদ।

"ঘটাভাব" বলিলে যে অভাব বুঝায় তাহা কেবলাভাব। এখানে ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব বুঝায়। ইহার অন্য নাম সামান্যাভাব। "নীলঘটাভাব" বলিলে—বিশিষ্টাভাব বুঝায়। ইহাতে কিন্তু ঘটাভাবকেবুঝায় না; যেহেতু ঘটাভাবটী এস্থলে সামান্যাভাব। কারণ, "নীলঘটো নাস্তি" বলিলে রক্ত ঘটের নিষেধ হয় না। সামান্যাভাব বিশিষ্টাভাব হইতে অতিরিক্ত। এখানে ঘটত্ব—প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক এবং নীলত্ব—প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক।

বিশিষ্টাভাবের নিষেধের অর্থ।

বিশিষ্টাভাবস্থলে অর্থাৎ বিশিষ্টের নিষেধ করিলে বিশেষ্য বাধা থাকিলে বিশেষণেরই অভাব বুঝায়, নচেৎ বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয়েরই নিষেধ বুঝায়। বস্তুতঃ, বিশেষ্যাভাবপ্রযুক্ত বিশিষ্টাভাব হয়, বিশেষণাভাবপ্রযুক্ত বিশিষ্টাভাব হয়, এবং উভয়ের অভাবপ্রযুক্ত বিশিষ্টাভাব হয়।

সম্বন্ধাবচ্ছিন্নাভাব পরিচয়।

যে ভূতলে সংযোগ সম্বন্ধে ঘট আছে, সেখানে সমবায় সম্বন্ধে ঘট নাই বলা যায়,—এরূপ স্থলে সম্বন্ধাবচ্ছিন্নাভাব বুঝায়। অন্যোন্যাভাব সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

অন্যতরাভাব ও উভয়াভাব পরিচয়।

"ঘটো বা পটো নাস্তি" বলিলে অন্যতরাভাব বুঝায়। এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্ব বা পটত্ব বা অন্যতরত্ব।

"ঘটপটোভয়ং নাস্তি" বলিলে উভয়াভাব বুঝায়। ইহার প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্ব, পটত্ব এবং উভয়ত্ব—এই তিনটীই হয়।

সমানাধিকরণ এবং ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাব।

ঘটত্বরূপে ঘট থাকে না বা থাকে—ইহাই সাধারণতঃ বলা হয়। পটত্ব বা মঠত্বরূপে ঘট কখনই থাকে না। কিন্তু "পটত্বরূপে ঘট নাই" বলিলে ব্যধিকরণ ধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব বলা হয়। কারণ

পটত্বের অধিকরণই পট, আর পটত্বের ব্যধিকরণ হয় ঘট। ন্যায়মতে ইহা স্বীকার করা হয় না। তন্মতে "ঘটত্বেন পটো নাস্তি" বলিলে "পটে ঘটত্বং নাস্তি" ইহাই বুঝায়।

আর যদি ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে তাহা কেবলান্বয়ী হয়, অর্থাৎ সর্ব্বত্র স্থায়ী হয়। অর্থাৎ যেখানে ঘট থাকে সেখানেও তাহা থাকে। কিন্তু "ঘটত্বেন ঘট" যেখানে থাকে সেখানে "ঘটত্বেন ঘটাভাব" থাকে না।

ঘটত্বেন ঘটাভাব অর্থাৎ ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবকে সমানাধিকরণ অভাব বলা হয়। সমানাধিকরণ অভাব প্রতিযোগিসত্তার বিরোধী, কিন্তু ব্যধিকরণ অভাব প্রতিযোগীর সত্তার বিরোধী নহে।

অভাবের অভাবের পরিচয়।

অভাবের অভাব ভাবই হয়, অর্থাৎ প্রতিযোগী যে ভাব, সেই ভাবস্বরূপই হয়। অতিরিক্ত নহে, কারণ অনবস্থাদোষ হয়। যেমন ঘটাভাবাভাব—ঘটস্বরূপ। ধ্বংসের প্রাগভাব প্রতিযোগীর স্বরূপ, যেহেতু ঘটধ্বংসের পূর্ব্বে ঘটই থাকে। আর প্রাগভাবের ধ্বংসও প্রতিযোগীর স্বরূপই হয়, যেহেতু প্রাগভাব নষ্ট হইয়াই ঘট উৎপন্ন হয়।

নবীনমতে অভাবের অভাব ভাবই নহে, কিন্তু অতিরিক্ত অভাবস্বরূপ। তৃতীয় অভাবটী প্রথম অভাবের স্বরূপ হয়। যেমন ঘটাভাবাভাব ঘটস্বরূপ নহে, কিন্তু অতিরিক্ত। আর ঘটাভাবাভাবাভাবটী ঘটাভাবের স্বরূপ।

ধর্ম্মীর ভেদ ও ধর্ম্মের অত্যন্তাভাব ভিন্ন নহে। যেমন ঘটভেদ ও ঘটত্বাত্যন্তাভাব অভিন্ন। ধ্বংসের প্রাগভাব ধ্বংসের প্রতিযোগীর স্বরূপ। যেমন ঘটধ্বংসের পূর্ব্বের অভাব ঘটস্বরূপ। প্রাগভাবের ধ্বংস প্রাগভাবের প্রতিযোগীর স্বরূপ। যেমন ঘটপ্রাগভাবের ধ্বংস ঘটস্বরূপ।

অভাবের প্রতিযোগী ও অনুযোগী।

সম্বন্ধের প্রতিযোগীও অনুযোগীর ন্যায় "যাহার অভাব" তাহা প্রতিযোগী ; কিন্তু অভাব যেখানে থাকে তাহাই অনুযোগী। প্রতিযোগিতা বা অনুযোগিতার সহিত একত্রাবস্থিত ধর্ম্ম প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বা অনুযোগিতাবচ্ছেদক হয়। অবশিষ্ট কথা সম্বন্ধের ন্যায় বুঝিতে হইবে।

বেদান্তমতে অভাবের বিভাগাদি ন্যায়মতানুরূপই। তবে যাহা বিশেষ তাহা এই—

ধ্বংস নিত্য নহে ; কারণ, তাহার অধিকরণ যে কপাল তাহার নাশে ধ্বংসেরও নাশ হয়—বলা হয়। আর ঘটধ্বংসের ধ্বংসে হইলে ঘট হইতে পারে না ; কারণ, সে ধ্বংসেরও প্রতিযোগী ঘটই হয়। ইহা না মানিলে ঘটপ্রাগভাবের ধ্বংসাত্মক ঘটের বিনাশে প্রাগভাবের পুনরাবির্ভাব হইবে।

অন্যোন্যাভাবটী ভেদরূপ বা পৃথক্‌ত্বরূপ। পৃথকত্ব গুণ নহে। ইহার অধিকরণ সাদি হইলে ইহা সাদি, যেমন ঘটে পটভেদ, আর অধিকরণ অনাদি হইলে ইহা অনাদি, যেমন জীবে ব্রহ্মভেদ বা ব্রহ্মে জীবভেদ। এই দ্বিবিধ ভেদই ধ্বংসপ্রতিযোগিকই হয়। অবিদ্যার নিবৃত্তিতে অবিদ্যাপরতন্ত্রসমূহের নিবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী।

অন্যরূপে এই ভেদ দ্বিবিধ, যথা—সোপাধিক ও নিরুপাধিক। তন্মধ্যে উপাধিসত্তার ব্যাপ্যসত্তাকত্ব সোপাধিক, আর তাহা না থাকিলে নিরুপাধিক।

সোপাধিকভেদ বলিতে উপাধিসত্তার ব্যাপ্য যে সত্তা, তাদৃশ সত্তাকত্ব বুঝায়। যেমন একই আকাশের ঘটাদি উপাধিভেদে ভেদ হয়। অথবা এক সূর্য্যের জলপাত্রভেদে ভেদ, বা এক ব্রহ্মের অন্তঃকরণভেদে ভেদ।

নিরুপাধিকভেদ বলিতে তৎশূন্যত্ব বুঝায়। যেমন ঘটে পটভেদ।

ইহাই হইল পদার্থ পরিচয়, এক্ষণে ইহাদের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য বিষয়টী আলোচ্য। ইহা হইলেই আত্মার জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে সম্ভব হইতে পারিবে। যেহেতু আত্মজ্ঞানের জন্যই এই ন্যায়শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। অভ্যুদয় তাহার আনুষঙ্গিক ফল।

পদার্থপ্রভৃতির সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য পরিচয়।

পদার্থ ও তাহার সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যজ্ঞানদ্বারা নিঃশ্রেয়স লাভ হয়, ইহা মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন। তদনুসারে পদার্থপরিচয়ের দিঙ্মাত্র প্রদর্শন করা হইল, এক্ষণে তাহাদের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের বিষয় আলোচনা করা যাউক।

পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য।

দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব—এই সাতটী পদার্থের সাধর্ম্ম্য—জ্ঞেয়ত্ব, প্রমেয়ত্ব, বাচ্যত্ব, বস্তুত্ব এবং অভিধেয়ত্ব প্রভৃতি। এই ধর্ম্মগুলি কেবলান্বয়ী, অর্থাৎ অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী ধর্ম্ম অর্থাৎ সর্ব্বত্রস্থায়ী। জ্ঞেয়ত্ব অর্থ—জ্ঞানবিষয়ত্ব, বাচ্যত্ব অর্থ—ঈশ্বরের ইচ্ছার বিষয়ত্ব, প্রমেয়ত্ব অর্থ—প্রমাজ্ঞানের বিষয়ত্ব, অভিধেয়ত্ব অর্থ—অভিধারূপ শক্তির বিষয়ত্ব। ইহাদের বৈধর্ম্ম্য নাই।

ভাবত্ব, অনেকত্ব ও সমবায়িত্ব।

দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়—এই ছয়টীর সাধর্ম্ম্য—ভাবত্ব, অনেকত্ব ও সমবায়িত্ব। সমবায়িত্ব অর্থ সমবায়সম্বন্ধে বর্ত্তমানত্ব। আর তজ্জন্য অভাবত্ব, একত্ব ও অসমবায়িত্ব ইহাদের বৈধর্ম্ম্য।

সত্তাবত্ব।

দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম—এই তিনটীর সাধর্ম্ম্য—সত্তাবত্ত্ব বা সত্তাশ্রয়ত্ব। অর্থাৎ ইহাতে সত্তানামক পরসামান্যটী সমবায়সম্বন্ধে থাকে। সুতরাং ইহাদের বৈধর্ম্ম্য অসত্তাবত্ব। "দ্রব্য আছে" "গুণ আছে" "কর্ম্ম আছে" বলিলে সত্তা জাতি ইহাদের উপর সমবায়সম্বন্ধে থাকে বুঝায়। অতএব "সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব আছে বলিলে" দ্রব্যাদির ন্যায় আছে বুঝায় না। কারণ, ইহাদের সত্তাজাতি নাই। সামান্যাদিকে স্বরূপসম্বন্ধে "আছে" বলা হয়।

নির্গুণত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব।

গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব—এই ছয়টীর সাধর্ম্ম্য নির্গুণত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব। সুতরাং বৈধর্ম্ম্য সগুণত্ব ও সক্রিয়ত্ব।

সামান্যরহিতত্ব।

সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব—এই চারিটীর সাধর্ম্ম্য সামান্যরহিতত্ব। সুতরাং সামান্যবত্ব ইহাদের বৈধর্ম্ম্য।

কারণত্ব।

পারিমাণ্ডল্য অর্থাৎ পরমাণুর পরিমাণ ভিন্ন সমস্ত পদার্থেরই সাধর্ম্য—কারণত্ব। অর্থাৎ উহারাই কারণপদবাচ্য হয়। সুতরাং বৈধর্ম্য—কারণহীনত্ব। পারিমাণ্ডল্যটী কাহারও কারণ হয় না। দ্ব্যণুকের পরিমাণের কারণ—পরমাণুর পরিমাণ নহে, কিন্তু পরমাণুর সংখ্যাই তাহার কারণ। কিন্তু বিষয় জ্ঞানের কারণ হয় বলিয়া সেই অর্থে সকল পদার্থেরই সাধর্ম্য "কারণতা" হয়। পারিমাণ্ডল্যভিন্ন পদার্থের যে কারণতা তাহা জ্ঞানের কারণতাভিন্ন কারণতা বুঝিতে হইবে।

দ্রব্যপদার্থের সাধর্ম্য বৈধর্ম্য সমবায়িকারণত্ব।

দ্রব্যমাত্রের সাধর্ম্য—সমবায়িকারণত্ব এবং বৈধর্ম্য অসমবায়িকারণত্ব। অর্থাৎ দ্রব্যই কেবল সমবায়সম্বন্ধে কারণ হয়। অথবা দ্রব্যই সমবায়িকারণ হয়, অসমবায়িকারণ হয় না।

অসমবায়িকারণত্ব।

গুণ ও কর্ম্মের সাধর্ম্য—অসমবায়িকারণত্ব। বৈধর্ম্য—সমবায়িকারণত্ব। অর্থাৎ গুণ ও কর্ম্ম অসমবায়িকারণই হয়, সমবায়িকারণ হয় না।

আশ্রিতত্ব।

নিত্য দ্রব্য ভিন্ন পদার্থের, অর্থাৎ অন্য অনিত্য পদার্থের সাধর্ম্য—আশ্রিতত্ব। অর্থাৎ নিত্য দ্রব্য কাহারও আশ্রিত হয় না, কিন্তু আশ্রয় হয়। সুতরাং অনিত্য পদার্থের বৈধর্ম্য অনাশ্রিতত্ব। এই আশ্রিতত্ব সমবায়সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। নচেৎ নিত্যদ্রব্যেও কালিকাদি সম্বন্ধে কালাদির আশ্রিতত্ব থাকে।

নিত্যত্ব।

পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা—ইহাদের সাধর্ম্য নিত্যত্ব, সুতরাং বৈধর্ম্য অনিত্যত্ব। 'নিত্য দ্রব্যভিন্ন' সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অত্যন্তাভাবও নিত্য।

তেজের গুণ—রূপ ও স্পর্শ এই দুইটী বিশেষগুণ এবং সংখ্যা পরিমাণ পৃথকত্ব সংযোগ বিভাগ পরত্ব অপরত্ব দ্রবত্ব ও বেগাখ্য-সংস্কার—এই নয়টী সামান্যগুণ, উভয়ে—১১টী।

বায়ুর গুণ—স্পর্শ একটী বিশেষগুণ এবং সংখ্যা পরিমাণ পৃথকত্ব সংযোগ বিভাগ পরত্ব অপরত্ব ও সংস্কার এই আটটী সামান্যগুণ; উভয়ে—৯টী।

আকাশের গুণ—শব্দটী বিশেষগুণ ও সংখ্যা পরিমাণ পৃথকত্ব সংযোগ ও বিভাগ এই পাঁচটী সামান্যগুণ; উভয়ে—৬টী।

কালের গুণ—সংখ্যা পরিমাণ পৃথকত্ব সংযোগ ও বিভাগ এই ৫টী সামান্যগুণ।

দিকের গুণ—সংখ্যা পরিমাণ পৃথকত্ব সংযোগ ও বিভাগ এই ৫টী।

জীবাত্মার গুণ—সংখ্যা পরিমাণ পৃথকত্ব সংযোগ বিভাগ এ পাঁচটী সামান্যগুণ এবং বুদ্ধি সুখ দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ প্রযত্ন ধর্ম অধর্ম ও ভাবনাখ্য সংস্কার—এই নয়টী বিশেষগুণ; উভয়ে ১৪টী।

সামান্যগুণ—সংখ্যা পরিমাণ পৃথক্ত্ব সংযোগ বিভাগ, পরত্ব অপরত্ব গুরুত্ব নৈমিত্তিক-দ্রবত্ব, বেগ ও স্থিতিস্থাপকাখ্য সংস্কার —এই ১০টী ; সুতরাং ইহাদের সাধর্ম্য সামান্যগুণত্ব।

নিত্যগুণ—জল, তেজ ও বায়ুর পরমাণুতে বৃত্তি বিশেষগুণ অর্থাৎ রূপ, রস, স্নেহ স্পর্শ ও সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব, এবং ক্ষিতি জল তেজ ও বায়ুর পরমাণুতে বৃত্তি স্থিতিস্থাপকাখ্য সংস্কার, বিভুর অর্থাৎ দিক্ কাল ও আত্মার এবং পরমাণুর —একত্ব পরিমাণ ও পৃথক্ত্ব এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা জ্ঞান ও কৃতি। অর্থাৎ এই সকল গুণের সাধর্ম্য নিত্যত্ব।

অপ্রত্যক্ষগুণ—গুরুত্ব, ধর্ম, অধর্ম এবং ভাবনা ও স্থিতিস্থাপকাখ্য সংস্কার, পরমাণু ও দ্ব্যণুকবৃত্তি গুণ, অতীন্দ্রিয় সামান্য-গুণ এবং ত্রসরেণুর রূপ ভিন্ন অন্য অতীন্দ্রিয় গুণ। ইহাদের সাধর্ম্য সুতরাং অপ্রত্যক্ষত্ব।

প্রত্যক্ষগুণ—উক্ত অপ্রত্যক্ষ গুণ ভিন্ন গুণগুলি।

মূর্ত্তগুণ—রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ব, গুরুত্ব, স্নেহ ও বেগাখ্য সংস্কার। সুতরাং মূর্ত্তগুণত্ব ইহাদের সাধর্ম্য।

অমূর্ত্তগুণ—ধর্ম্ম ও অধর্ম অর্থাৎ অদৃষ্ট, ভাবনাখ্য সংস্কার, শব্দ বুদ্ধি সুখ দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ ও যত্ন। সুতরাং ইহাদের সাধর্ম্য অমূর্ত্তগুণত্ব।

মূর্ত্তামূর্ত্তগুণ—সংখ্যা পরিমাণ পৃথক্ত্ব সংযোগ ও বিভাগ। অর্থাৎ দ্রব্যমাত্রের গুণ। সুতরাং ইহাদের সাধর্ম্য—মূর্ত্তামূর্ত্তগুণত্ব।

উভয়াশ্রিতগুণ—সংযোগ বিভাগ দ্বিত্বাদি সংখ্যা ও দ্বিপৃথক্ত্ব। সুতরাং ইহাদের সাধর্ম্য—উভয়াশ্রিতগুণত্ব।

একাশ্রিতগুণ—অবশিষ্ট গুণগুলি।

দ্বি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণ—সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব অপরত্ব, দ্রবত্ব ও স্নেহ—ইহারা দুই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ। অর্থাৎ চাক্ষুষ ও ত্বাচ প্রত্যক্ষের বিষয়।

বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণ—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ—ইহারা একএকটী পাঁচটী বহিরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যগুণ। যথা—রূপ চক্ষুর, রস রসনার, গন্ধ ঘ্রাণের, স্পর্শ ত্বকের এবং শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়।

কারণগুণ হইতে অনুৎপন্নগুণ—বুদ্ধি সুখ দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ যত্ন ধর্ম্ম অধর্ম্ম ভাবনাখ্য সংস্কার ও শব্দ। যেহেতু সমবায়িকারণের গুণ হইতে কার্য্যের গুণের উৎপত্তি হয়। যেমন ঘটের রূপ তাহার সমবায়িকারণ কপালের রূপ হইতে জন্মে। বুদ্ধ্যাদি সেরূপ নহে।

কারণগুণ হইতে উৎপন্নগুণ—অপাকজ অথচ জন্য যে রূপ রস গন্ধ অনুষ্ণস্পর্শ, দ্রবত্ব, স্নেহ, স্থিতিস্থাপক এবং বেগাখ্য সংস্কার, গুরুত্ব, একত্বসংখ্যা, একপৃথক্ত্ব ও পরিমাণ —ইহারা কারণের গুণ হইতে উৎপন্ন হয়। যেমন কপালের রূপ হইতে ঘটের রূপ হয়। পাকজ রূপাদি অগ্নিসংযোগজন্য হয়।

কর্ম্মজন্যগুণ—সংযোগ বিভাগ ও বেগাখ্য সংস্কার—ইহারা কর্ম্মজন্য।

অসমবায়িকারণ গুণ—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, পরিমাণ, একত্বসংখ্যা, একপৃথক্ত্ব, স্নেহ ও শব্দ—এই নয়টী গুণ অসমবায়িকারণ হয়।

নিমিত্তকারণ গুণ—আত্মার বিশেষ গুণ, অর্থাৎ বুদ্ধি, সুখ দুঃখ, ইচ্ছা দ্বেষ যত্ন ধর্ম্ম অধর্ম্ম ও ভাবনাখ্য সংস্কার—ইহারা

কেবলই নিমিত্তকারণ হয়। ইহারা কাহারও অসমবায়ি-
কারণ হয় না। বুদ্ধি কিন্তু সুখ, দুঃখ ও ইচ্ছাদির
নিমিত্তকারণ হয়। ইচ্ছাদিও অন্যের নিমিত্তকারণ হয়।

নিমিত্ত ও অসমবায়িকারণ গুণ—উষ্ণস্পর্শ, গুরুত্ব, বেগ, দ্রবত্ব,
সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্বিত্বাদি ও দ্বিপৃথক্ত্বাদি
—ইহারা নিমিত্ত এবং অসমবায়ি উভয় কারণই হয়।

অব্যাপ্যবৃত্তিগুণ—বিভুর বিশেষগুণ, সংযোগ ও বিভাগ—ইহারা
অব্যাপ্যবৃত্তি হয়, অর্থাৎ স্বসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবের
প্রতিযোগী হয়।

ইহাই হইল সাধর্ম্য বৈধর্ম্য পরিচয়। এক কথায় যে যাহার সাধর্ম্য, অপরের পক্ষে তাহা বৈধর্ম্য বুঝিতে হইবে।

ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞানে আত্মজ্ঞান।

এইরূপে পদার্থজ্ঞান ও তাহার সাধর্ম্য বৈধর্ম্য জ্ঞানদ্বারা আত্মা যে আত্মভিন্ন হইতে ভিন্ন, তাহার অনুমান হয়, আর তাহার ফলে আত্মার জ্ঞান হয়। ইতরভেদসহকারে আত্মার জ্ঞান না হইলে, আত্মা বলিতে দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন বুদ্ধি অজ্ঞান প্রভৃতি বলিয়া বুঝিবার সম্ভাবনা থাকিত, এবং প্রকৃতপক্ষে তাহাই ঘটিয়াও থাকে। কিন্তু দেহাদি, আত্মা হইতে ভিন্ন, সুতরাং অনাত্মা ইহা জানায় "দেহাদি আমি" এইরূপ মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হয়, আর তাহার ফলে আত্মা আর দেহাদির সুখদুঃখে সুখীদুঃখী হইতে পারিবে না, এবং পরিশেষে নিঃশ্রেয়সলক্ষণ মুক্তিলাভ ঘটে। এইজন্য মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন—"দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ" ১।১।২ অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞাননাশে দোষ নাশ পায়, দোষনাশে প্রবৃত্তি নাশ পায়, প্রবৃত্তি নাশে জন্ম নাশ পায়, আর জন্ম নাশে দুঃখ নাশ পায়। দেহাদিজন্য সুখও দুঃখেরই রূপান্তর।

তবে এরূপ আত্মার জ্ঞানসত্ত্বেও যে সুখদুঃখানুভব হয়, তাহার কারণ, দেহাত্মবোধের সংস্কার যতদৃঢ়, আত্মার ইতরভেদের জ্ঞানের সংস্কার ততদৃঢ় নহে। অতএব আত্মার ইতরভেদের জ্ঞান হইবার পর তাহার ধ্যান করিতে হইবে, এবং এই ধ্যানের সংস্কার দৃঢ়তর হইলে সুখদুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ ঘটিবে—ইহাই ন্যায়শাস্ত্রের অভিপ্রায়। এ বিষয়ে ন্যায়ের সহিত বেদান্তের বিরোধ নাই।

মুক্তির স্বরূপ পরিচয়।

মহর্ষি কণাদের মতে এই মুক্তির স্বরূপ আত্মার নয়টী বিশেষ গুণের প্রাগভাবাসংবৃত্তিপ্রধ্বংসরূপ ; সুতরাং ভবিষ্যতে দুঃখসম্ভাবনা থাকে না। ইহা পদার্থতত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত ঈশ্বরোপাসনাসহিত আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার হইতে হইয়া থাকে।

মহর্ষি গৌতমের মতে ইহার স্বরূপ—পদার্থতত্ত্বজ্ঞানের পর শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন হইতে আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইলে এবং তৎপরে বাসনা সহিত মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে, তাহার কার্য্য পরম্পরার নিবৃত্তি হইয়া কায়ব্যূহদ্বারা পূর্ব্বকর্ম্মভোগশেষে শরীরান্তরের জন্ম হয় না। তৎপরে একবিংশতি প্রকার দুঃখের বাধলক্ষণ অত্যন্তনাশে মুক্তি হয়। মতান্তরে, কাম্যাদি কর্ম্মত্যাগ ও নিত্যনৈমিত্তিকের অনুষ্ঠানে আগামী কর্ম্মের উচ্ছেদ ও বিদ্যমান কর্ম্মের ক্ষয়রূপ সর্ব্বকর্ম্মের উচ্ছেদই মোক্ষ।

নিবর্ত্তক হয়। অবিদ্যানিবৃত্তি উপলক্ষিত আত্মাই এ মতে মোক্ষ। মোক্ষ সদাই বিদ্যমান, তাহার জ্ঞানই তাহার লাভ।

ইহাই হইল ন্যায়শাস্ত্রের পরিচয়মুখে বেদান্ত ও মীমাংসামতের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

কতিপয় মতবাদের পরিচয়।

গ্রন্থারম্ভে আমাদের প্রতিজ্ঞানুসারে ন্যায় ও মীমাংসাশাস্ত্রের পরিচয়ের সঙ্গে এই গ্রন্থের মতবাদের অনুকূল ও প্রতিকূল মতবাদের পরিচয়দান করিবার কথা ছিল, কিন্তু ভূমিকার কলেবর এতই বিস্তৃত হইয়াছে যে, এস্থলে তাহা আর সম্ভবপর নহে, এবং সঙ্গতও নহে। অতএব এস্থলে কতিপয় মতবাদের নামমাত্র পরিচয় দিয়া বিরত হইলাম।

অসৎকার্য্যবাদ—যে মতে কারণ নিত্যই হউক বা অনিত্যই হউক, কিন্তু সৎ, আর কার্য্যটী উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ, উৎপত্তির পর সৎ বলা হয়, তাহার নাম অসৎকার্য্যবাদ। যেমন ন্যায়মতে ঘটের কারণ কপাল অনিত্য ও 'থাকে' বলিয়া সৎ, কিন্তু ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে ঘট 'থাকে না' বলিয়া সেই ঘটরূপ কার্য্যটী অসৎ। এমতে জগৎ সত্য, মিথ্যা নহে, কিন্তু অনিত্য। ইহা দ্বৈতবাদ।

সৎকার্য্যবাদ—যে মতে কার্য্য ও কারণ অভিন্ন বলিয়া কারণের ন্যায় কার্য্যও সৎ বলা হয়, তাহার নাম সৎকার্য্যবাদ। যেমন সাংখ্যমত। এমতেও জগৎ সৎ, মিথ্যা নহে, কিন্তু অনিত্য। ইহাও দ্বৈতবাদ। সৎকার্য্যবাদী বলেন—কার্য্যটী উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণে অব্যক্ত থাকে, কার্য্যাবস্থায় কেবল ব্যক্তভাব ধারণ করে মাত্র। যাহা অসৎ তাহার উৎপত্তি অসম্ভব।

সৎকারণবাদ—যে মতে কারণই সৎ বলা হয়, এবং কার্য্যসম্বন্ধে কিছু বলা হয় না, যেহেতু তাহা অনির্ব্বচনীয়, তাহাকে সৎকারণবাদ বলা হয়। যেমন বেদান্তমত। এমতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মভিন্ন নহে।

বলা বাহুল্য যত দার্শনিক মত আছে, সমুদায়ই অসৎকার্য্যবাদ, সৎকার্য্যবাদ এবং সৎকারণবাদ এই তিনটী মতবাদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আরম্ভবাদ—ইহা অসৎকার্য্যবাদেরই নামান্তর।

অনির্ব্বচনীয়বাদ—ইহা সৎকারণবাদেরই নামান্তর। ইহার অপর নাম অদ্বৈতবাদ বা বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ বা নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদ বা নির্গুণ ব্রহ্মবাদ।

মায়াবাদ—যেমতে জগতের মূলকারণ কেবলই মায়া বলা হয়, তাহার নাম মায়াবাদ। ইহা শূন্যবাদী বৌদ্ধমত। অনেকে বেদান্তের অদ্বৈতমতকে মায়াবাদ বলেন। তাহা ভুল। কারণ, তন্মতে মূল জগৎকারণ ব্রহ্ম, অতএব অদ্বৈত-বেদান্তমত ব্রহ্মবাদ, মায়াবাদ নহে। ব্রহ্মবাদ দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মবাদ—যে মতে ব্রহ্মই জগতের মূলকারণ বলা হয়, তাহাই ব্রহ্মবাদ। জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত এবং মায়ার পরিণাম বলিয়া, এবং জ্ঞান হইলে সেই মায়াও থাকে না বলিয়া এবং তাহা সদসদ্ভিন্ন অনির্ব্বচনীয় বলিয়া জগতের নিত্য মূলকারণ মায়া নহে, কিন্তু ব্রহ্মই। অদ্বৈতবেদান্তমতকে যে মায়াবাদ বলা হয়, তাহা মায়ার পরিণাম জগৎ বলিয়া প্রতিপক্ষগণকর্তৃক নিন্দার উদ্দেশ্যেই বলা হয়। বস্তুতঃ, মায়া জগতের মূলকারণ নহে। ব্রহ্মই জগতের মূলকারণ। এই মায়া মিথ্যা বলিয়া জগৎও মিথ্যা।

হয়; অর্থাৎ স্বগত স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদশূন্য বলা হয়। ইহা ও অনির্ব্বচনীয়বাদ বা ব্রহ্মবাদ অভিন্ন। এমতে জ্ঞানেই মুক্তি। ইহার অপর নাম শাঙ্কর মত। জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মই, জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান নষ্ট হইলেই মুক্তি হয়। মুক্তিতে আর জগতাদি থাকে না। অজ্ঞান অনাদি, কিন্তু সান্ত, জগৎ মিথ্যা, কিন্তু অসৎ নহে। ব্রহ্ম সৎ অথচ দৃশ্য হয় না, বন্ধ্যাপুত্র অসৎ অথচ দৃশ্য হয় না, আর মিথ্যা না থাকিয়াও দৃশ্য হয়। এ মতে ভ্রমজ্ঞান স্বীকার্য্য।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—এ মতে জগতের মূলকারণ সবিশেষ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। জীব ও জগৎ সগুণ অদ্বিতীয়ব্রহ্মের শরীর বলিয়া সবই ব্রহ্ম শব্দবাচ্য। এই সগুণ ব্রহ্মের নাম ঈশ্বর। অদ্বিতীয় ব্রহ্মে স্বগতভেদ আছে, সজাতীয় বিজাতীয় ভেদ নাই। জীব ও জগৎ সূক্ষ্মাবস্থা হইতে স্থূলাবস্থাপন্ন হওয়াই সৃষ্টি, আর স্থূলাবস্থা হইতে সূক্ষ্মাবস্থাপ্রাপ্তিই প্রলয়। জীব ঈশ্বরের নিত্যদাস। অদ্বিতীয় ব্রহ্মে জীব ও জগৎরূপ বিশেষ থাকায় ইহার নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। ঈশ্বরকৃপাতেই মুক্তি। মুক্তিতেও বিশেষ থাকে। ইহার প্রচারকর্ত্তা রামানুজাচার্য্য। ঈশ্বর, অন্তর্য্যামী, অবতার ও অর্চ্চাবিগ্রহ এই চারিরূপে ঈশ্বর বিদ্যমান। জগৎ সত্য তবে অনিত্য, কিন্তু মিথ্যা নহে। ভ্রমও সত্যজ্ঞান। ইহাদের মতে নারায়ণই পরমতত্ত্ব।

দ্বৈতবাদ—এ মতে জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সকলই বিভিন্ন। জীব ও ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ হইলেও প্রভেদ আছে। জগৎ জড়। ঈশ্বর কৃপায় মুক্তি হয়। এ মতের প্রচারক মধ্বাচার্য্য। জীব জগৎ সবই সত্য, তবে জগৎ অনিত্য, মিথ্যা নহে।

সঙ্গেও অচিন্ত্যভেদাভেদই সম্বন্ধ। ভগবানের শক্তি ত্রিবিধ, যথা—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা এবং তটস্থা। অন্তরঙ্গা আবার হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সম্বিৎভেদে ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধ শক্তির জন্য ভগবান্‌কে আনন্দ, সৎ ও চিৎ বলা হয়। তটস্থা শক্তি জীব এবং বহিরঙ্গা শক্তি মায়া। রাধিকার ভাব প্রাপ্তিই এ মতে চরম মুক্তি। এ মতে কৃষ্ণই পরম তত্ত্ব। জগৎ সত্য, তবে অনিত্য, মিথ্যা নহে।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদ—এ মতে সগুণ এক শুদ্ধ ব্রহ্মই জগৎকারণ, জীব তাহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় আবির্ভূত। সগুণ শুদ্ধ অদ্বৈত ব্রহ্ম হইতেই জগতাদির উৎপত্তি হয় বলিয়া ইহার নাম শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বলা হয়। শাঙ্কর শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ইহা নহে। মুক্তিতে সম্পূর্ণ ঐক্য হয় না, কৃষ্ণই পরমতত্ত্ব। প্রীতিমার্গই সাধন। ইহা বল্লভাচার্য্যের মত।

আভাসবাদ—অজ্ঞানোপহিত আত্মা, অজ্ঞানতাদাত্ম্যাপন্ন হইয়া স্বচিদাভাসের অবিবেকবশতঃ অন্তর্য্যামী সাক্ষী ও জগৎকারণ নামে অভিহিত হন। আর বুদ্ধির উপহিত আত্মা বুদ্ধির সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন হইয়া স্বচিদাভাসের অবিবেকবশতঃ কর্ত্তা ভোক্তা প্রমাতা নামক জীব নামে কথিত হন। ইহা বার্ত্তিককারের মত। ইহাও অদ্বৈতমত।

প্রতিদেহে বুদ্ধি বিভিন্ন বলিয়া সেই সেই বুদ্ধিগত চিদাভাসভেদে সেই সেই বুদ্ধি হইতে অতিরিক্ত চৈতন্যও ভিন্নের ন্যায় প্রতীত হয়। অজ্ঞান সর্ব্বত্র অভিন্ন বলিয়া তদ্‌গত চিদাভাসের ভেদাভাবপ্রযুক্ত তাহা হইতে অপৃথক্ যে সাক্ষিচৈতন্য তাহার কখনও ভেদভান হয় না। ইহা সংক্ষেপশারীরকের মত। ইহাও অদ্বৈতমত।

জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদ—যে মতে জ্ঞান ও কর্ম্ম একই কালে একই ব্যক্তিকর্ত্তৃক অনুষ্ঠেয় হইলে মুক্তি হয়—বলা হয়। ইহা মীমাংসক ও রামানুজাচার্য্যাদির মত।

জ্ঞানকর্ম্মক্রমসমুচ্চয়বাদ—এ মতে কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে জ্ঞানদ্বারা মুক্তি হয়। ইহা অদ্বৈতবাদী বেদান্তীর মত।

এইরূপ মতভেদ বা মতবাদ অসংখ্য আছে এবং নূতন হইতেও পারে। উপরে সর্ব্বদা ব্যবহৃত কয়েকটী মাত্রের দুই এক কথায় পরিচয় দেওয়া হইল। অদ্বৈতচিন্তাস্রোতের ইতিহাসে ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

মাধ্বমতের বিশেষ পরিচয়।

এইবার দেখা যাউক—মাধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্তটী কিরূপ? ন্যায়মতে যেরূপ পদার্থবিভাগ আছে, তদ্রূপ পদার্থবিভাগ যদি এই মতেও করা যায়, তাহা হইলে এই মতটীর প্রধান বিশেষত্ব বা বৈলক্ষণ্য বেশ বুঝা যাইতে পারে। ন্যায়মতের যে পদার্থবিভাগ, তাহাতে ন্যায়মতে সকল-বিষয়েরই যেমন জ্ঞান হইবার সম্ভাবনা, তদ্রূপ অন্যমতেও সেই পথে পদার্থবিভাগ করিতে পারিলে, সেই মতের সকল বিষয়েরই জ্ঞান হইবার সম্ভাবনা। মঃ মঃ পণ্ডিত বাসুদেব অভ্যঙ্কর সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের ভূমিকায় মাধ্বমতের একটী উত্তম পদার্থবিভাগ প্রদান করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত করিলাম। ন্যায়মতের সঙ্গে ইহা মিলাইয়া, অদ্বৈতমতাদি অন্য মতের পদার্থবিভাগের সহিত মিলাইলে মাধ্বমতের বিশেষত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে আর বিলম্ব হইবে না। সেই পদার্থবিভাগটী এই—

এমতে পদার্থ দশটী, যথা—১। দ্রব্য, ২। গুণ, ৩। কর্ম্ম, ৪। সামান্য, ৫। বিশেষ, ৬। বিশিষ্ট, ৭। অংশী, ৮। শক্তি, ৯। সাদৃশ্য এবং ১০। অভাব।

ইহাদের মধ্যে ১। দ্রব্য আবার বিংশতি প্রকার, যথা—১। পরমাত্মা ২। লক্ষ্মী, ৩। জীব, ৪। অব্যাকৃত আকাশ, ৫। প্রকৃতি, ৬। গুণত্রয়, ৭। মহৎতত্ত্ব, ৮। অহংকারতত্ত্ব, ৯। বুদ্ধি, ১০। মন, ১১। ইন্দ্রিয়, ১২। মাত্রা, ১৩। ভূত, ১৪। ব্রহ্মাণ্ড, ১৫। অবিদ্যা, ১৬। বর্ণ, ১৭। অন্ধকার, ১৮। বাসনা, ১৯। কাল এবং ২০। প্রতিবিম্ব।

২। গুণ আবার প্রধানতঃ ৪১ প্রকার, যথা—১। রূপ, ২। রস, ৩। গন্ধ, ৪। স্পর্শ, ৫। সংখ্যা, ৬। পরিমাণ, ৭। সংযোগ, ৮। বিভাগ, ৯। পরত্ব, ১০। অপরত্ব, ১১। দ্রবত্ব, ১২। গুরুত্ব, ১৩। লঘুত্ব, ১৪। মৃদুত্ব, ১৫। কাঠিন্য, ১৬। স্নেহ, ১৭। শব্দ, ১৮। বুদ্ধি, ১৯। সুখ, ২০। দুঃখ, ২১। ইচ্ছা, ২২। দ্বেষ, ২৩। প্রযত্ন, ২৪। ধর্ম্ম, ২৫। অধর্ম্ম, ২৬। সংস্কার, ২৭। আলোক, ২৮। শম, ২৯। দম, ৩০। কৃপা, ৩১। তিতিক্ষা, ৩২। বল, ৩৩। ভয়, ৩৪। লজ্জা, ৩৫। গাম্ভীর্য্য, ৩৬। সৌন্দর্য্য, ৩৭। ধৈর্য্য, ৩৮। স্থৈর্য্য, ৩৯। শৌর্য্য, ৪০। ঔদার্য্য, ৪১। সৌভাগ্য ইত্যাদি।

৩। কর্ম্ম ত্রিবিধ, যথা—১। বিহিত, ২। নিষিদ্ধ, ৩। উদাসীন।

৪। সামান্য দ্বিবিধ, যথা—১। নিত্য, ২। অনিত্য।

৫। বিশেষ—অনন্ত। ইহা ভেদব্যবহার নির্ব্বাহক।

৬। বিশিষ্ট— „ । বিশেষণ সম্বন্ধে বিশেষ্যের আকার।

৭। অংশী— „ । হস্ত বিতস্তি আদি পরিমিত ঘট পটাদি ও গগনাদি।

৮। শক্তি ইহা চারি প্রকার, যথা—১। অচিন্ত্যশক্তি, ২। আধেয় শক্তি, ৩। সহজশক্তি এবং ৪। পদশক্তি।

৯। সাদৃশ্য—অনন্ত, একনিরূপিত অপরবৃত্তি, দ্বিষ্ঠ নহে।

১০। অভাব চারি প্রকার, যথা—১। প্রাগভাব, ২। প্রধ্বংসাভাব, ৩। অন্যোন্যাভাব, ৪। অত্যন্তাভাব।

এক্ষণে ইহাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা যাউক।

দ্রব্যমধ্যে (১) পরমাত্মা সগুণ ঈশ্বর, নারায়ণ। (২) লক্ষ্মী নারায়ণের শক্তি (৩) জীব বহু ও নিত্য। দিক্‌ই অব্যাকৃত আকাশ (৪)। ইহা সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যেও নির্বিকার থাকে এবং ইহা ভূতাকাশ হইতে ভিন্ন। বিশ্বের যে উপাদান তাহাই প্রকৃতি (৫)। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের যে সমুদায়, তাহাই গুণত্রয় (৬)। যাহা সাক্ষাদ্‌ভাবে গুণত্রয়ের উপাদান তাহাই মহত্তত্ত্ব (৭)। মহত্তত্ত্ব হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা অহংকার-তত্ত্ব (৮) বুদ্ধি দুইরূপ, যথা—তত্ত্বরূপ এবং জ্ঞানরূপ (৯)। তন্মধ্যে যাহা তত্ত্বরূপা বুদ্ধি তাহাই দ্রব্য। মনঃ (১০) দ্বিবিধ, যথা—তত্ত্বরূপ এবং তদন্যরূপ। বৈকারিক অহংকার হইতে যাহা জন্মে, তাহা তত্ত্বরূপ মনঃ। অন্যপ্রকার যে মনঃ তাহা ইন্দ্রিয়। তত্ত্বরূপ মনঃ আবার পাঁচ প্রকার, যথা—মনঃ, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত ও চেতন। ইন্দ্রিয় (১১)—জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটী ও কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটী মিলিয়া দশটী। মাত্রা (১২) বলিতে বিষয়। উহা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ভেদে পাঁচ প্রকার। সেই মাত্রা হইতে ক্রমে পাঁচটী ভূত উৎপন্ন হইয়াছে। (১৪) ব্রহ্মাণ্ড এই ভূত হইতে উৎপন্ন। (১৫) অবিদ্যাটী মোহ, মহামোহ, তামিস্র, অন্ধতামিস্র এবং তমোভেদে পঞ্চ প্রকার। অন্য প্রকারে ইহা আবার চারি প্রকার, যথা—জীবাচ্ছাদিকা, পরমাচ্ছাদিকা, শৈবলা এবং মায়া। এই সকল প্রকার অবিদ্যাই জীবাশ্রিতা। (১৬) বর্ণ অকারাদি ৫১টী। (১৭) অন্ধকার প্রসিদ্ধ বস্তু, ইহা তেজের অভাবরূপ নহে। (১৮) বাসনা স্বাপ্নপদার্থের উপাদানভূত। (১৯) কাল আয়ুর ব্যবস্থাপক। (২০) প্রতিবিম্বটী বিম্বের অবিনাভূত অথচ বিম্বসদৃশ।

গুণ বলিতে বৈশেষিক বুঝিতে হইবে। রূপাদির স্বরূপ ও অবান্তর-ভেদ প্রায়ই বৈশেষিকেরই মত। তথাপি প্রভেদ এই—পরিমাণ ত্রিবিধ, যথা—অণু, মহৎ ও মধ্যম। উভয়ের যে সংযোগ তাহা একটী নহে,

কিন্তু ভিন্নই। ঘটনিরূপিত পটে এবং পটনিরূপিত ঘটে, এইরূপে ঘট ও পটমধ্যে যে সংযোগ তাহা দুইটী। সংযোগজ সংযোগ নাই। বেগ-হেতু যে গুণ তাহাই লঘুত্ব। মৃদুত্ব ও মার্দ্দব একই কথা। কাঠিন্য অন্য গুণ, ইহা নিবিড় অবয়ব সংযোগ নহে। যেহেতু সম্বন্ধিদ্বয়ের প্রতীতি বিনাই "ইহা কঠিন" এইরূপ প্রতীতি হয়। পৃথক্ত্বই অন্যোন্যা-ভাব বা ভেদ। শব্দটী ধ্বনি, উহা পঞ্চভূতেরই গুণ। বুদ্ধি অর্থ—জ্ঞান। অনুভবটী ত্রিবিধ, যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি ও শাব্দ। বুদ্ধি হইতে প্রযত্ন পর্যান্ত, অর্থাৎ বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন (১৮—২৩) মনের ধর্ম্ম এবং অনিত্য। সংস্কারটী চারি প্রকার, যথা—বেগ, ভাবনা, যোগ্যতা ও স্থিতিস্থাপকতা। আলোক অর্থ—প্রকাশ। বুদ্ধির যে ভগবন্নিষ্ঠতা তাহাই শম। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দম। কৃপা অর্থ—দয়া। সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতাই তিতিক্ষা। পরের অপেক্ষা ব্যতিরেকে কার্য্যানু-কূল যে গুণ তাহাই বল। ভয়াদি প্রসিদ্ধ। ৪১ সংখ্যক সৌভাগ্য-গুণের পরও সত্য ও শৌচাদিকে গুণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এখানেও আদিপদে নিয়মের অন্তর্গত তপস্যাদি গ্রাহ্য। ফলতঃ, গুণ মাধ্বমতে বহু। ইহার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই।

কর্ম্ম—উদাসীন কর্ম্ম চলনাত্মক, উৎক্ষেপণাদি।

সামান্য—ব্রাহ্মণত্ব, মনুষ্যত্বাদিরূপ যে সামান্য তাহা প্রতি ব্যক্তিতে ভিন্ন এবং অনিত্য। কারণ, তাহারা ব্যক্তির সহিত উৎপন্ন হয় এবং বিনষ্ট হয়। আরও, ব্যক্তি বিদ্যমান থাকিলেও সুরাপানাদিদ্বারা ব্রাহ্মণত্বাদি নষ্ট হয় এবং তপস্যাদ্বারা বিশ্বামিত্রে ব্রাহ্মণত্ব উৎপন্নও হইয়াছিল বলিয়া ইহা উৎপন্নও হয়। জীবত্বাদি যে সামান্য, তাহা জীব নিত্য বলিয়া নিত্য। অন্যরূপে সামান্য দ্বিবিধ, যথা—জাতিরূপ এবং উপাধিরূপ। সর্ব্বজ্ঞত্ব ও প্রমেয়ত্বাদি উপাধিরূপ সামান্য। ঈশ্বর নিত্য বলিয়া তদ্গত সর্ব্বজ্ঞত্ব নিত্য। ঘটপটাদিগত যে প্রমেয়ত্ব তাহা অনিত্য।

সম্বন্ধ হইয়া থাকে। শক্তি ও সাদৃশ্য মীমাংসকমতে স্বীকৃত হয়, ন্যায়মতে স্বীকৃত হয় না।

অদ্বৈতমতে পদার্থ এবং তাহার অবান্তর বিভাগাদি প্রায়ই ভট্টমীমাংসকের মতানুরূপ। এজন্য "ন্যায়শাস্ত্রের পরিচয়" পরিচ্ছেদের যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

মাধ্বমতে স্থূলভাবে পদার্থবিভাগ প্রদর্শিত হইল, কিন্তু ইহার সঙ্গে অপর বহু বিষয়ই জ্ঞাতব্য আছে। নিম্নে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব সম্বন্ধে আর একটী চিত্র প্রদত্ত হইল, এতদ্দ্বারা অবশিষ্ট অনেক কথাই জানিতে পারা যাইবে।

এই চিত্রটী টি, সুব্বারাও মহোদয়ের ব্রহ্মসূত্রের ভূমিকা হইতে সংগৃহীত। এই চিত্রদ্বারা মাধ্বমত অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে। তবে এই সব অংশ ন্যায়মতের পদার্থবিভাগ চিত্রের * সহিত মিলাইয়া আলোচনা করিলে মাধ্বমতের অবশিষ্ট অনেক কথা এতদ্দ্বারাই জানিতে পারা যাইবে।

অদ্বৈতমতের সহিত মাধ্বমতের প্রধান প্রভেদ।

অদ্বৈতমতের সঙ্গে ইহার অনেক বিষয়ে সাম্য এবং অনেক বিষয়ে বৈষম্য থাকিলেও সর্বপ্রধান বৈষম্য এই যে,—

মাধ্বমতের সার সম্প্রদায়মধ্যে একটী শ্লোকদ্বারা প্রচারিত করা হয়। সেই শ্লোকটী এই—

> শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতরঃ, সত্যং জগৎ, তত্ত্বতো
> ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা, নীচোচ্চভাবং গতাঃ।
> মুক্তির্নৈজসুখানুভূতিরমলা, ভক্তিশ্চ তৎ সাধনং
> হ্যক্ষাদি ত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ॥

* এই চিত্র আমার ন্যায়পরিচয়ের ব্যাখ্যার গ্রন্থের ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

- পদার্থ
  - সৎ
    - স্বাধীন সৎ (একমাত্র বিষ্ণু)
    - অধীন সৎ
      - ভাব
        - চেতন (আত্মা)
          - মুক্ত (লক্ষ্মী নিত্যমুক্ত)
          - দুঃখী জীব
            - স্বর্গে মুক্ত
              - দেব
              - ঋষি
              - পিতৃ
              - পা (সম্রাট্)
              - নর
            - সংসারী জীব
              - স্বর্গযোগ্য
                - দেব
                - ঋষি
                - পিতৃ
                - পা (সম্রাট্)
                - নর
              - স্বর্গসুখভোগ ব যোগ্য
                - তমোলোকযোগ্য জীব
                  - তমোলোকে পতিত জীব
                  - যাহারা তমোলোকে পতিত হইবে এতাদৃশ জীব
                - যাহারা অনন্তকাল সংসারী এতাদৃশ জীব
        - অচেতন (অনাত্মা)
          - নিত্য
            - বেদ
            - বর্ণাত্মক শব্দ
            - অব্যাকৃত আকাশ
          - নিত্যানিত্য
            - পুরাণাদি
            - কাল: মহাকাল নিত্য, খণ্ডকাল অনিত্য
            - ভূতপ্রকৃতি: কারণ নিত্য, কার্য অনিত্য
          - অনিত্য
            - অসংসৃষ্ট (অত্যন্ত পরিবর্তনশীল)
              - বুদ্ধি
              - মন
              - ইন্দ্রিয়
                - জ্ঞানেন্দ্রিয়
                - কর্মেন্দ্রিয়
              - বিষয়
                - শব্দ
                  - বর্ণজাত শব্দ (বাক্যাদি)
                  - ধ্বন্যাত্মক শব্দ
                - স্পর্শ
                - রূপ
                - রস
                - গন্ধ
              - মূলভূত
                - ক্ষিতি
                - অপ্
                - তেজঃ
                - মরুৎ
                - ব্যোম
            - সংসৃষ্ট (সম্পূর্ণ পরিবর্তনশীল যথা—ব্রহ্মাণ্ড)
      - অভাব
        - প্রাগভাব
        - ধ্বংস
        - অত্যন্তাভাব
  - অসৎ (যথা—বন্ধ্যাপুত্র, রজ্জুসর্প প্রভৃতি)

অর্থাৎ মাধ্বমতে শ্রীহরিই পরতত্ত্ব, জগৎ সত্য, ভেদও সত্য, জীবগণ হরির অনুচর, তাহাদের মধ্যে উচ্চনীচভাব আছে, অমলা নিজসুখানুভূতিই মুক্তি, তাহার সাধন ভক্তি, প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ এই তিনটী প্রমাণ, হরি একমাত্র বেদগম্য।

প্রত্যক্ষ ও শব্দ—অনুমান অপেক্ষা প্রবল। ঈশ্বরবিষয়ে বেদই প্রমাণ। বেদ অপৌরুষেয়। জীব অণু, ঈশ্বর বিভু; জীব ঈশ্বরের নিত্যদাস। পরমাণুও বিভাজ্য, দুঃখের অভাব সুখ নহে। মোক্ষে দুঃখাভাবও সুখ। ভক্তি ও ভগবৎকৃপা মুক্তির হেতু। কর্মক্ষয় ভগবদ্দর্শনে হয়। জীব ঈশ্বর নিত্য বিম্বপ্রতিবিম্ব সম্বন্ধে সম্বন্ধ। বিষয়হীন জ্ঞান নাই। দেশ ও কাল সাক্ষীর বেদ্য। ঈশ্বর নিমিত্তকারণ। লক্ষ্মী প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ঈশ্বরকর্তৃক সৃষ্টিকালে তাঁহার সহকারিণী। প্রকৃতিই জীবের বন্ধের হেতু ও অনাদি অজ্ঞানের কারণ। অজ্ঞান বা অবিদ্যা দ্বিবিধ। একটী জীবাচ্ছাদিকা, অপরটী পরমাচ্ছাদিকা। প্রথমটীর জন্য আত্মজ্ঞান হয় না, দ্বিতীয়টীর জন্য ভগবদ্দর্শন ঘটে না। এই অজ্ঞান ভাবরূপ ও নিত্য। রামানুজমতে কিন্তু অভাবরূপ। উক্ত প্রকৃতি হইতে মহৎ, অহংকার, বুদ্ধি, মনঃ, দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বিষয় এবং পঞ্চভূত এই ২৪টী উৎপন্ন হইয়াছে। তৎপরে ব্রহ্মাণ্ড জন্মিয়াছে। প্রকৃতি হইতে প্রথমে সত্ত্বাদি ত্রিগুণ জন্মে। শ্রী, ভূ এবং দুর্গা তিন গুণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তৎপরে মহত্তের জন্ম। ইহা চতুর্মুখ ব্রহ্মার শরীরের উপাদান। মহৎ হইতে অহংকারের উৎপত্তি। ইহা রুদ্রের দেহ। অহংকার হইতে বুদ্ধির জন্ম। মনও অহংকার হইতে উৎপন্ন। অহংকার ত্রিবিধ, যথা—বৈকারিক, তৈজস ও তামস। বৈকারিক হইতে মন ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা জন্মগ্রহণ করেন। তৈজস হইতে দশ ইন্দ্রিয় জন্মে। তামস হইতে শব্দাদি পঞ্চ বিষয়ের ও পঞ্চভূতের জন্ম হয়। যথা—শব্দ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে

বায়ু, বায়ু হইতে রূপ, রূপ হইতে তেজ, তেজ হইতে রস, রস হইতে জল, জল হইতে গন্ধ, গন্ধ হইতে ক্ষিতি হয়। অতঃপর ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। যথা—ভূ পৃথিবীপ্রধান, ভুব জলপ্রধান, স্বর্ ও মহঃ অগ্নিপ্রধান, জন ও তপঃ বায়ুপ্রধান, সত্য আকাশপ্রধান। স্থূলশরীর অন্নময়-কোশ, সূক্ষ্মশরীর প্রাণ, মন ও বিজ্ঞানময়কোশ, কারণশরীর আনন্দময়-কোষ। স্থূলশরীর ভূর্লোক, সূক্ষ্মশরীর ভুব, স্বর্ ও মহর্লোক এবং জন, তপঃ ও সত্য আনন্দময়কোশ। এমতে স্বপ্ন সত্য, তবে অনিত্য।

অদ্বৈতমতের সারসংক্ষেপ।

অদ্বৈতমতের সার যে একটী শ্লোকদ্বারা ব্যক্ত করা হয় তাহা এই—

শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥

অর্থাৎ যাহা কোটি কোটি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, তাহাই অর্দ্ধ শ্লোকে বলিতেছি, যথা—ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মই, অপর কিছু নহে।

অতএব ব্রহ্ম ও জীবের ভেদভ্রান্তিনিবারণই মুক্তি। এ মতে প্রমাণ ছয়টী, যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি। বেদরূপ শব্দপ্রমাণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। অপর প্রমাণের মধ্যে যাহা পরীক্ষাসিদ্ধ তাহাই প্রবল।

পদার্থ—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, শক্তি, সাদৃশ্য ও অভাব সাতটী।

দ্রব্য একাদশটী, যথা—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, বুদ্ধি, বর্ণাত্মক শব্দ ও অন্ধকার। গুণ—২৪টী, কর্ম্ম—৫টী, সামান্য—৩টী, শক্তি—৩টী, সাদৃশ্য বহু, অভাব চারিটী বা পাঁচটী। ইহাদের বিবরণ ২২৩, ২২৪, এবং ২২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্বিশেষ, মিথ্যা মায়াযোগে সগুণ ও সবিশেষবৎ হন। অনাদি ত্রিগুণাত্মক মায়া সমষ্টি ও ব্যষ্টিভেদে এক ও বহু। সমষ্টিতে শুদ্ধ সত্ত্বের প্রাধান্য থাকে, ব্যষ্টিতে মলিন সত্ত্বের প্রাধান্য থাকে।

সমষ্টি মায়োপহিত ব্রহ্মই ঈশ্বর এবং ব্যষ্টি মায়োপহিত ব্রহ্মই প্রাজ্ঞ জীব। এজন্য প্রাজ্ঞসমষ্টিই ঈশ্বর। এই মায়া, অনাদি, কিন্তু অধিষ্ঠান ব্রহ্মের জ্ঞানে বিলীন হয় বলিয়া অনন্ত নহে।

মায়ার দুইটী শক্তি, একটী—আবরণ শক্তি, অপরটী—বিক্ষেপশক্তি। আবরণশক্তির ফলে ব্রহ্মের প্রকাশ হয় না, বিক্ষেপশক্তির দ্বারা জগৎ-সংসার ও আমিত্বের আবির্ভাব হয়। অনাদি ভ্রমই এই মায়া।

এই মায়া বিকৃত হইয়া আকাশাদি সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয়। এই সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূতও তাহার কারণ ত্রিগুণাত্মক মায়ার ন্যায় ত্রিগুণাত্মক হয়। এই পঞ্চভূতের সমষ্টি সত্ত্বগুণ হইতে অন্তঃকরণ ও দেবতাদি উৎপন্ন হন।

এক অন্তঃকরণ—চিত্ত, বুদ্ধি, অহংকার ও মনঃ-ভেদে চতুর্বিধ।

অন্তঃকরণের অন্তর্গত চিত্তের অধিষ্ঠাতৃদেবতা বিষ্ণু, বুদ্ধির ব্রহ্মা, অহংকারের রুদ্র এবং মনের চন্দ্র।

সূক্ষ্ম পঞ্চ ভূতের সমষ্টি রজোগুণ হইতে পঞ্চপ্রাণ ও তাহাদের অধিষ্ঠাতৃদেবতাগণ উৎপন্ন হন।

সূক্ষ্ম পঞ্চ ভূতের সমষ্টি তমোগুণ হইতে সমষ্টিভাবে ভূতগণ পঞ্চীকৃত হইয়া স্থূলভূতে পরিণত হয়।

ব্যষ্টি পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের সত্ত্বগুণ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, যথা—আকাশ হইতে শ্রোত্রেন্দ্রিয়, বায়ু হইতে ত্বগিন্দ্রিয়, তেজঃ হইতে চক্ষুরিন্দ্রিয়, জল হইতে রসনেন্দ্রিয় এবং ক্ষিতি হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় হয়।

শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা দিক্, ত্বগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতা বায়ু, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতা সূর্য্য, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতা অশ্বিনীকুমার এবং রসনেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতা বরুণ।

উক্ত ব্যষ্টি সূক্ষ্মপঞ্চভূতের রজোগুণ হইতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় হয়, যথা—আকাশের রজোগুণ হইতে বাগিন্দ্রিয়, বায়ুর রজোগুণ হইতে হস্তেন্দ্রিয়,

মাধ্বমতে অসৎ—যাহা কোনকালেই নাই এবং যাহার জ্ঞান হয়। যেমন বন্ধ্যাপুত্র, আকাশকুসুম ও শশবিষাণ ইত্যাদি এবং রজ্জুসর্প, শুক্তিরজত প্রভৃতি।

বেদান্তমতে মিথ্যা—যাহা কোনকালেই নাই কিন্তু প্রতীত হয় অর্থাৎ যাহার ব্যাবহারিক বা প্রাতিভাসিক সত্তা আছে। যেমন জগৎপ্রপঞ্চ এবং রজ্জুসর্প, শুক্তিরজত প্রভৃতি।

মাধ্বমতে মিথ্যা—মাধ্বমতের অসৎ পদার্থ। অর্থাৎ বেদান্তমতের মিথ্যা মাধ্বমতে স্বীকৃত হয় না।

মাধ্বমতে অনিত্যই মিথ্যাপদবাচ্য হয়, কিন্তু তাহা বস্তুতঃ সৎ। যাহা অনিত্য তাহা তাঁহার মতে সৎ হইতে বাধা নাই।

কিন্তু বেদান্তমতে যাহা অনিত্য তাহা সৎ নহে, তাহা মিথ্যাই। সৎ কখন অনিত্য হইতে পারে না। আর যাহা অনিত্য অর্থাৎ নিয়ত পরিবর্তনশীল, তাহার প্রকৃত স্বরূপ অনির্বচনীয়ই হয়। এই অনির্বচনীয় ও মিথ্যা একার্থক।

মাধ্বমতে বন্ধ্যাপুত্রেরও জ্ঞান হয় বলিয়া রজ্জুসর্পাদিকেও বন্ধ্যাপুত্রবৎ বলা হয়। কিন্তু—

বেদান্তমতে বন্ধ্যাপুত্রের জ্ঞান হয় না—ইহাই বলা হয়। বন্ধ্যাপুত্রের জ্ঞান বলিয়া যাহা বলা হয়, তাহা অন্তঃকরণের ইচ্ছাদ্বেষাদির ন্যায় একটা বৃত্তিবিশেষ। ইহার নাম বিকল্পবৃত্তি।

মাধ্ব বলেন—"বন্ধ্যাপুত্র" এই শব্দ যখন রহিয়াছে, তখন ঘট পটাদি শব্দ হইতে যেমন একটা জ্ঞান হয়, "বন্ধ্যাপুত্র" শব্দ হইতেও তদ্রূপ জ্ঞানই হয়। উহা জ্ঞান ভিন্ন নহে।

বেদান্তী বলেন—ঘট পটাদি শব্দ হইতে যেমন একটা পদার্থের উপস্থিতি মনোমধ্যে হয়, "বন্ধ্যাপুত্র" শব্দে তদ্রূপ কোন পদার্থের উপস্থিতি হয় না, প্রত্যুত বন্ধ্যা ও তাহার পুত্রের উপস্থিতি হইয়া তাহাদের সম্বন্ধ-

বিষয়ে একটা অসম্ভাবনারই বোধ হয়, ঘট পটাদি এক একটা বস্তুর ন্যায় কোন এক বস্তুর জ্ঞান হয় না। অতএব উহা জ্ঞান নহে। যুক্তির দিক্ দিয়া উভয় মতের ইহাই প্রধান বৈলক্ষণ্য।

শাস্ত্রার্থনির্ণয়োপায়ে মতভেদ।

কিন্তু শাস্ত্রার্থনির্ণয়ের উপায়মধ্যেও উভয় মতের বৈলক্ষণ্য আছে। যথা—

শাস্ত্রতাৎপর্য্যনির্ণয়ে অভিজ্ঞের উক্তি এই যে—ষড়্বিধ তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক লিঙ্গের দ্বারা শাস্ত্রের তাৎপর্য্যনির্ণয় করিতে হইবে। সেই লিঙ্গ ছয়টী—উপক্রমোপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, অর্থবাদ, উপপত্তি ও ফল। এই ছয়টীর দ্বারা শাস্ত্রের তাৎপর্য্যনির্ণয় করিলে কোন ভুল হয় না। এই নিয়মটী লৌকিক ও অলৌকিক উভয় শাস্ত্রেই প্রযোজ্য।

অদ্বৈতবাদী বেদার্থনির্ণয়ে এই ছয়টীরই প্রয়োগ করিয়া নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন। তন্মতে এই ছয়টীই আবশ্যক।

মাধ্বমতে কিন্তু এই ছয়টীর আবশ্যকতা নাই। তন্মতে উপপত্তি ও অর্থবাদ, বাদে অবশিষ্ট চারিটীর উপযোগিতা স্বীকার করা হয়। এ কথাও এই গ্রন্থপাঠকালে অবগত হইতে পারা যাইবে।

এস্থানে অনুভূতির সাহায্য আবশ্যক করে না। অঙ্কশাস্ত্র যেমন নির্দ্দিষ্ট নিয়মবদ্ধ বলিয়া সর্ব্বদা একটী অঙ্কের একই ফল সর্ব্ববাদিসম্মত হয়, এই ছয়টীর প্রয়োগে তদ্রূপ সর্ব্বদা শাস্ত্রের একই তাৎপর্য্য লভ্য হইয়া থাকে। সুতরাং বেদার্থ একটীই নির্ণীত হইয়া থাকে।

অতএব প্রাচীনের শাস্ত্র—প্রাচীন বেদে প্রাচীনের আবিষ্কৃত এবং অনুসৃত কৌশল মাধ্বগণ অবলম্বন না করায়—ছয়টী তাৎপর্য্যনির্ণায়ক-লিঙ্গের সকলগুলি গ্রহণ না করায়, বেদের প্রাচীন অর্থই গ্রহণ করেন নাই, অর্থাৎ মাধ্বগণ নিজাভিমত নবীন অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন—এরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক। বস্তুতঃ, ইহা তাঁহার জীবনীকার পদ্মনাভাচার্য্যও লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থের ৪২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মাধ্ব বলিবেন—এই ছয়টী যে মানিতে হইবে, ইহা ত আর বেদের আদেশ নহে, যে না মানিলে দোষ হইবে, ইহা যুক্তির ফল। সুতরাং যুক্তির দ্বারা দেখা যায়—ছয়টী অনাবশ্যক, চারিটীই আবশ্যক।

তদুত্তরে বেদান্তী বলেন যে, শাস্ত্রার্থনির্ণয়ে ছয়টীরই আবশ্যকতা আছে, ইহা চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। লৌকিকশাস্ত্রে দেখা যায়, প্রতিপাদ্যবিষয় যুক্তিদ্বারা বুঝাইবার জন্য উপপত্তি ও তাহাতে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য অর্থবাদ, লেখকের স্বভাববশেই গ্রন্থমধ্যে আপনা আপনি প্রকটিত হয়। অবশ্য ইহা এক মাধ্বভিন্ন প্রায় সকলেরই নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এজন্য ছয়টীর প্রত্যেকেরই যখন উপযোগিতা অনেকেই স্বীকার করিবেন, তখন ছয়টীর মধ্যে দুইটীকে অনাবশ্যক বলা সঙ্গত নহে। প্রাচীন বিষয়ে প্রাচীনের পথ উপেক্ষা করা কখনই সমীচীন নহে।

তথাপি যদি এ বিষয়ে আমাদের কোন মতামত প্রকাশ করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে যে দুইটী বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া অদ্বৈতমত ও দ্বৈতমত সিদ্ধ হইতেছে, সেই রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্ত এবং শ্রুতিতাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গ সংখ্যা সম্বন্ধে মাধ্বমতটী আমরা ঠিক্ বুঝিতে পারি না। আমাদের মনে হয়, অদ্বৈতমতে যে রজ্জুসর্পকে মিথ্যা বলা হয় এবং মাধ্বমতে যে বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় তাহাকে অসৎ বলা হয়, এই পক্ষদ্বয়ের মধ্যে প্রথম পক্ষটীই সঙ্গত। এ বিষয়ে অদ্বৈতবাদীর কথাই ঠিক্। কারণ, রজ্জুসর্প না থাকিলেও প্রতীত হয় বলিয়া তাহা ঠিক্ বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় নহে। বন্ধ্যাপুত্রও নাই রজ্জুসর্পও নাই—এইরূপে উভয়ে অভিন্ন হইলেও রজ্জুসর্প প্রতীত হয়, আর বন্ধ্যাপুত্র প্রতীত হয় না—এই প্রভেদটুকু অস্বীকার করিলে অনুভববিরুদ্ধ কথা বলা হয়। অতএব এ বিষয়ে মাধ্বমত ঠিক্ নহে মনে হয়। তদ্রূপ শ্রুতিতাৎপর্য্যনির্ণয়ের জন্য যে ছয়টী লিঙ্গ সকলে স্বীকার করেন, তাহার দুইটী মাধ্ব স্বীকার না করায় এস্থলেও মাধ্বমত অনুভববিরুদ্ধ হইতেছে। আমরা ছয়টীরই উপযোগিতা আছে মনে করি। অতএব অনুভব যুক্তি ও শ্রুতি অনুসারে মাধ্বমত আমাদের নিকট সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না।

উভয়মতদ্বয়ের মীমাংসার অন্য উপায়।

এখন যদি শাঙ্কর ও মাধ্বমতের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে একদিকে যেমন ন্যায়ামৃত ও অদ্বৈতসিদ্ধিপাঠ আবশ্যক, অন্যদিকে আচার্য্যশঙ্কর ও আচার্য্যমধ্বের জীবনবৃত্ত তুলনা করাও আবশ্যক। জীবনের সঙ্গে মতের যথেষ্ট ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকে। এজন্য নিম্নলিখিত যে কয়েকটী বিষয়ের উপর লক্ষ্য করিলে অনেকটা মীমাংসায় উপনীত হইতে পারা যায়, তাহা এই—

৬। মাধ্বমতের যদি প্রাচীন সম্প্রদায় না পাওয়া যায়, প্রত্যুত তিনি শঙ্করমতেই যদি দীক্ষিত হইয়া থাকেন ও সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া থাকেন—

৭। মধ্ব ও শঙ্কর উভয়েই বেদব্যাসের দর্শন যদি পাইয়া থাকেন, ও নিজ সম্মত সূত্রার্থবিষয়ে যদি বেদব্যাসের সম্মতিলাভ হইয়া থাকে,—

৮। শঙ্করের সহিত বেদব্যাসের এই দর্শনের সাক্ষ্য যদি শঙ্করশিষ্য-প্রভৃতি বহু ব্যক্তি হন, আর—

৯। মধ্বাচার্য্যের সহিত বেদব্যাসের এই দর্শনের সাক্ষ্য যদি অপর কেহই না থাকে—

১০। শঙ্করমতে যদি শ্রুতিপ্রমাণ অধিক হয়,—

১১। মাধ্বমতে যদি পুরাণপ্রমাণ অধিক হয়,—

১২। শ্রুতি অপেক্ষা পুরাণের বিকৃতিসম্ভাবনা যদি পরবর্ত্তীকালে উত্তরোত্তর অধিক হয়,—

১৩। মধ্ব যদি শঙ্কর হইতে ৫।৬ শত বৎসর পরবর্ত্তী হন,—

১৪। শঙ্করের সময় যদি ম্লেচ্ছাক্রমণ না হইয়া থাকে,—

১৫। মধ্বাচার্য্যের সময় যদি ম্লেচ্ছরাজ্য ভারতের অর্দ্ধেকের উপর বিস্তৃত হইয়া থাকে, এমন কি মধ্বাচার্য্যকে ম্লেচ্ছভাষা যদি শিক্ষা করিতে হইয়া থাকে এবং ম্লেচ্ছগণ যদি শাস্ত্র ও সম্প্রদায়ের ধ্বংসকারী হয়,—

১৬। ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করকৃত ব্যাখ্যা ও মধ্বকৃত ব্যাখ্যা যদি পরস্পর-বিরোধী হয়, মধ্ব যদি নিজ গুরুর সঙ্গে বিবাদ পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন—

১৭। মধ্বাচার্য্যের গুরুর গুরু ও আচার্য্য শঙ্করমতাবলম্বী পুণ্ডরী স্বামী বিদ্যাশঙ্করের সহিত বিচারে নিজমতের প্রামাণ্যপ্রদর্শনের জন্য যদি মধ্বাচার্য্যের মনে ব্রহ্মসূত্রার্থরচনা করিবার দৃঢ় সংকল্প হয়, আর তাহার ফলে যদি মধ্বাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরচনা করিয়া থাকেন—

১৮। শঙ্কর যদি গুরু বা বিশ্বনাথের আদেশে ভাষ্যরচনা করিয়া থাকেন—

১৯। মধ্বাচার্য্য যদি ঘোর্‌ভাবিত নিজমত প্রচলিত করিয়া থাকেন,

কারণ, তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত মধ্বাচার্য্যের জীবনীকার পদ্মনাভাচার্য্য ২৫৯ পৃষ্ঠায় স্পষ্টই বলিয়াছেন, যে, "Sri Madva built his system on his own interpretations of the Upanishad, Geeta and Sootra Prasthans." আর—

২০। শঙ্করমত যদি শুকদেব ও তৎপুত্র গৌড়পাদপ্রভৃতি ব্যাস-সম্প্রদায়ের মত হয়, কারণ, তিনি "যথোক্তং সম্প্রদায়বিদ্ভিঃ আচার্য্যৈঃ" ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্ট করিয়াই ইহা বলিয়াছেন—এরূপ হয়; আর—

২১। "সম্প্রদায়বিহীনাঃ যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ" এই পুরাণবাক্য যদি উভয় মতেই বিশ্বাস করা হয়,—

২২। শঙ্করমতে দ্বৈতবাদেরও স্থান আছে, উহা মিথ্যা হইলেও উহার উপযোগিতা আছে, কিন্তু মাধ্বমতে শঙ্করমতের স্থান নাই, উহা মিথ্যা এবং উহার অবলম্বনে নরক হয়—এইরূপ যদি হয়—

তাহা হইলে কোন্ মতটী গ্রাহ্য এবং কোন্ মতটী ত্যাজ্য, কোন্ মতটী প্রমাণ ও কোন্ মতটী অপ্রমাণ, তাহা সুধীগণই নির্ণয় করিবেন।

ব্যাসাচার্য্য ও মধুসূদনের তুলনা।

আর যদি ন্যায়ামৃতকার ব্যাসাচার্য্য ও মধুসূদনের জীবনচরিত আলোচনা করা যায়, তাহা হইলেও ব্যাসাচার্য্যের জীবনবৃত্ত মধুসূদনের জীবনবৃত্তের ন্যায় মহনীয় বলিয়া বোধ হয় না। মধুসূদন ধনরত্ন স্পর্শ করিতেন না, সম্রাট্ আকবরপ্রদত্ত সুবর্ণমুদ্রা তিনি স্পর্শও করেন নাই, গোরক্ষনাথপ্রদত্ত চিন্তামণি তিনি গঙ্গাজলে নিক্ষেপই করিয়াছিলেন, আর ব্যাসাচার্য্যকে বিজয়নগরের রাজা রত্নাভিষেক করিয়াছিলেন, আর ব্যাসাচার্য্য তাহা উপভোগই করিয়াছিলেন। মধুসূদন দিগ্বিজয় করেন নাই ব্যাসাচার্য্য তাহা করিয়াছিলেন। মধুসূদন, সম্রাট্ আকবরের সভায় বিচার করিয়া যে "মধুসূদনসরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরস্বতী" ইত্যাদি প্রশস্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অনুরুদ্ধ হইয়াই করিয়াছিলেন। মধুসূদন পরমত খণ্ডন না করিয়া স্বমত স্থাপন ও পরের আক্রমণ নিরাকরণ করিয়াছিলেন, ব্যাসাচার্য্য পরমতখণ্ডনেই শক্তিক্ষয় অধিক করিয়াছিলেন। তিনি তর্কতাণ্ডব গ্রন্থে নব্য-ন্যায়ের চিন্তামণিগ্রন্থ খণ্ডন করায় পণ্ডিত সমাজের শ্রদ্ধা হারাইয়াছিলেন। ইহা তাঁহাদের দেশের সংবাদপত্রে আজ পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনুরক্তব্যক্তিগণকর্তৃক প্রকাশিত করা হইয়া থাকে। এরূপ বহুবিষয় আছে যে, মনে হয় মধুসূদনের শাস্ত্রজ্ঞান বুদ্ধিমত্তা ও ভগবন্নিষ্ঠা-প্রভৃতি ব্যাসরাজাচার্য্যের অপেক্ষা অনেক অধিক। মধুসূদন যখন ব্যাসাচার্য্যের আক্রমণ

প্রতিহত করিয়া সামর্থ্য সত্ত্বেও তাঁহাকে আক্রমণ করেন নাই, তখন ব্যাসাচার্য্য হইতে মধুসূদনকে শ্রেষ্ঠাসনই দিতে হয়। অতএব মধুসূদন ও ব্যাসাচার্য্যের জীবনদৃষ্টেও ব্যাসাচার্য্যের মত সমানশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না।

মাধ্বসম্প্রদায়কর্ত্তৃক অদ্বৈতমতের উপকার।

কিন্তু তাহা হইলেও মাধ্বসম্প্রদায় অদ্বৈতবেদান্তের যে উপকার করিয়াছেন, তাহা আপাতদৃষ্টিতে শত্রুভাবে উপকার হইলেও তাহা অতুলনীয় প্রকৃত উপকার বলা যাইতে পারে। কারণ, ইহার ফলে অদ্বৈতবেদান্তের এমন অনেকটা সূক্ষ্ম যুক্তি ও তত্ত্বসকল আবির্ভূত হইয়াছে, যাহা অন্যথা আবির্ভূত হইতে পারিত না। এই সকল যুক্তি হৃদয়ঙ্গম হইলে অদ্বৈতবেদান্তে আর সংশয়ের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত থাকে না। ইহার ফলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার অনিবার্য্য হয়, ব্রহ্মজ্ঞান বলপূর্ব্বক আত্মপ্রকাশ করে। ভগবান্, শঙ্কররূপে যে জ্ঞানসূর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, বায়ুর অবতার মধ্বাচার্য্য বায়ুর ন্যায় ধূলিপটলের কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করিয়া সেই জ্ঞানসূর্য্যকে নিষ্প্রভ করিলে ভগবানের বিপদভঞ্জনরূপ মধুসূদন অমৃতবারি সিঞ্চন করিয়া তাহা নিবারণ করিলেন। এই কুজ্ঝটিকা নিবারণের ফলে স্নিগ্ধশীতল ধরাতলে জ্ঞানসূর্য্যের অধিকতর মিষ্ট উজ্জ্বলরূপও প্রকাশিত হইল। এজন্য মাধ্বচেষ্টায় অদ্বৈতমতের প্রকৃত উপকারই সাধিত হইয়াছে। কারণ, ব্যাসাচার্য্য ন্যায়ামৃতে যে ভাবে পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছেন, তাহার উপর আর পূর্ব্বপক্ষ হয় না, আর মধুসূদন যে উত্তর দিয়াছেন, তাহার উপর আপত্তিও আর চলে না। যাহা চলিয়াছে, তাহা বিদ্যাবিনোদ মাত্র।

ইহাই হইল বেদান্তমতের অনুকূল ও প্রতিকূল মতবাদের পরিচয়। বস্তুতঃ, ইহাদের একটী মতও ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে সকল মতেরই বিশেষ জ্ঞান প্রয়োজন হয়। আর তাহার জন্য কত যে পুস্তকাদি পড়িতে হয়, তাহার তালিকাপ্রদানও সহজ ব্যাপার নহে। আজ কাল ভারতে যে কয়টী দার্শনিকমত স্বীয় প্রভাবে মহিমান্বিত হইয়া বিরাজ করিতেছে, তাহা অন্ততঃপক্ষে ২৫টী, যথা—

১ চার্ব্বাক	৯ পাশুপত	১৭ পাণিনি
২ মাধ্যমিক বৌদ্ধ	১০ শৈব	১৮ সাংখ্য
৩ যোগাচার বৌদ্ধ	১১ প্রত্যভিজ্ঞা	১৯ যোগ (পাতঞ্জল)
৪ সৌত্রান্তিক বৌদ্ধ	১২ রসেশ্বর	২০ বেদব্যাস
৫ বৈভাষিক বৌদ্ধ	১৩ বৈশেষিক	২১ শাঙ্কর
৬ জৈন	১৪ নৈয়ায়িক	২২ ভাস্কর
৭ রামানুজ	১৫ ভট্টমীমাংসক	২৩ নিম্বার্ক
৮ মাধ্ব	১৬ প্রভাকর মীমাংসক	২৪ বল্লভ ২৫ চৈতন্য

প্রথম ছয়টী মতবাদ নাস্তিক মতবাদ, আর সপ্তম হইতে অবশিষ্ট আস্তিক মতবাদ। চার্ব্বাক মতটী বস্তুতঃ পাঁচ প্রকার, যথা—পুত্রাত্মবাদ, দেহাত্মবাদ, ইন্দ্রিয়াত্মবাদ, প্রাণাত্মবাদ ও মনআত্মবাদ। বেদপ্রামাণ্যের অস্বীকারই নাস্তিকতার লক্ষণ। তন্মধ্যে ৭ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ; ৮, ১৩, ১৪, ১৮ দ্বৈতবাদ; ৯, ১০, ১১, ১২ শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ১৫, ১৬, ২০, ২২, ২৩ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ; ২৪ শুদ্ধাদ্বৈতবাদ; ২৫ অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ এবং ১৭, ২১ অদ্বৈতবাদ।

ইহাদের মধ্যে মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহোক্ত ১৬খানি দর্শনের পরস্পর সম্বন্ধ মঃ মঃ শ্রীযুক্ত বাসুদেব অভ্যঙ্কর মহাশয় যেরূপ প্রদান করিয়াছেন তাহা চিত্রমত (৪২৭ পৃঃ) প্রদর্শিত হইল।

ইহাদের সকলের মতে সকল গ্রন্থ আর এখন পাওয়া যায় না। যাহাও পাওয়া যায়, তাহাও দুর্লভ। বস্তুতঃ, এই সকল মতেরই পরিচয় থাকিলে অদ্বৈতসিদ্ধি বুঝিবার পক্ষে সহায়তা হয়। ইহার কারণ অদ্বৈতসিদ্ধি অদ্বৈতবেদান্তমতের চরম গ্রন্থ, এবং ইহা সকল মতের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া বিরাজিত রহিয়াছে। যাহা হউক, এই সকল মতের সামান্যভাবে পরিচয়ের জন্য শঙ্করাচার্য্যকৃত সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ, মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থ দুখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তথাপি ইহাতে ২৩ নিম্বার্কমত, ২৪ বল্লভমত, ২৫ চৈতন্যমত এবং ২২ ভাস্করমতের কোন উল্লেখ নাই, অথচ ইহাদের মতে ব্রহ্মসূত্রাদিরই ভাষ্য এখনও বর্ত্তমান।

১। চার্ব্বাক—আবাহ্যিক নাস্তিক দর্শন।

২। বৌদ্ধ—ক্ষণিকবাদী তার্কিক নাস্তিক দর্শন।

৩। জৈন—স্যাদ্‌বাদী তার্কিক নাস্তিক দর্শন।

৪। রামানুজ—প্রচ্ছন্নদ্বৈতবাদী, প্রচ্ছন্নতার্কিক, সগুণাত্মবাদী আস্তিক দর্শন।

৫। মধ্ব—স্পষ্টদ্বৈতবাদী, প্রচ্ছন্নতার্কিক, সগুণাত্মবাদী আস্তিক দর্শন।

৬। নকুলীশপাশুপত—কর্ম্মানপেক্ষ ঈশ্বরবাদী, আত্মভেদবাদী, বিদেহমুক্তিবাদী, ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী, স্পষ্টতার্কিক, সগুণাত্মবাদী আস্তিক দর্শন।

৭। শৈব—কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরবাদী, আত্মভেদবাদী, বিদেহমুক্তিবাদী, ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী, স্পষ্টতার্কিক, সগুণাত্মবাদী আস্তিকদর্শন।

৮। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন—আত্মৈক্যবাদী, বিদেহমুক্তিবাদী, ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী, স্পষ্টতার্কিক, সগুণাত্মবাদী আস্তিক দর্শন।

৯। রসেশ্বরদর্শন—জীবন্মুক্তবাদী, ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী, স্পষ্টতার্কিক, সগুণাত্মবাদী আস্তিক দর্শন।

১০। বৈশেষিকদর্শন—শব্দপ্রমাণান্তর অনঙ্গীকারী, উৎপত্তিসাধনাদৃষ্টবাদী, স্পষ্টতার্কিক, সগুণাত্মবাদী আস্তিক দর্শন।

১১। ন্যায়দর্শন—শব্দপ্রমাণান্তর অঙ্গীকারী, উৎপত্তিসাধনাদৃষ্টবাদী, স্পষ্টতার্কিক, সগুণাত্মবাদী আস্তিক দর্শন।

১২। মীমাংসক—বাক্যার্থবাদী, শ্রৌত, সগুণাত্মবাদী আস্তিক দর্শন।

১৩। বৈয়াকরণ—পদার্থবাদী, শ্রৌত, সগুণাত্মবাদী আস্তিক দর্শন।

১৪। সাংখ্য—নিরীশ্বর, তার্কিক, নির্গুণাত্মবাদী আস্তিক দর্শন।

১৫। পাতঞ্জল—সেশ্বর, তার্কিক, নির্গুণাত্মবাদী আস্তিক দর্শন।

১৬। শাঙ্করবেদান্ত—শ্রৌত নির্গুণাত্মবাদী আস্তিক দর্শন।

অবশ্য এতদ্দ্বারাই যে এই ১৬ খানি দর্শনের সব কথা বলা হইল, তাহা নহে। যেহেতু রামানুজমতে জীবন্মুক্তি নাই, কিন্তু শাঙ্করমতে তাহা স্বীকার করা হয়। অথচ এদৃষ্টিতে এই দুই মতের সম্বন্ধ প্রদর্শিত হয় নাই। যাহা হউক, তথাপি ইহাতে ইহাদের একটা সম্বন্ধ বেশ জানা যায়।

এক্ষণে যাঁহারা অতি অল্প পরিশ্রম করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির রসাস্বাদ করিতে চাহেন, তাঁহাদের জন্য কতিপয় প্রবেশিকা গ্রন্থের একটী অতি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিলাম, যথা—

(১) ন্যায়মতের জন্য—
১। সিদ্ধান্তমুক্তাবলী বা তর্কসংগ্রহসটীক।

(২), বেদান্তমতের জন্য—
১। বেদান্তসার
২। বেদান্তপরিভাষা
৩। অদ্বৈতচিন্তাকৌস্তুভ
৪। পঞ্চদশী
৫। বেদান্তসংজ্ঞাবলী
৬। শঙ্করভাষ্য ব্রহ্মসূত্র রত্নপ্রভাটীকাসহ
৭। সিদ্ধান্তবিন্দু

(৩) মীমাংসামতের জন্য—
১। মীমাংসাপরিভাষা বা আপোদেবী।
২। মানমেয়োদয়।

(৪) বেদান্তের অন্যমতের জন্য
(ক) রামানুজমতে—
১। যতীন্দ্রমতদীপিকা
২। বেদান্তসার
(খ) মাধ্বমতে—
১। মাধ্বমতসংগ্রহ
২। মাধ্বভাষ্য।

(৫) অপরাপর মতের জন্য—

গ্রন্থকলেবর বৃদ্ধিভয়ে এই স্থানেই বিরত হইতে হইল। এখন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মধুসূদনের কৃপা ভরসা।

উপসংহার।

যাহা হউক, এতদূরে ভূমিকার কি আলোচ্যবিষয়, তাহা এক প্রকার আলোচনা করা গেল। আর তদনুসারে গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তিসম্পাদনের জন্য (১) গ্রন্থপরিচয়, (২) গ্রন্থকারপরিচয় (৩) গ্রন্থপ্রতিপাদ্যপরিচয় ও (৪) গ্রন্থপাঠের ফলপরিচয় আলোচনা করিয়া, গ্রন্থপাঠে সামর্থ্য উৎপাদন করিবার জন্য সংক্ষেপে (১) ন্যায়শাস্ত্রের পরিচয় ও তদুপলক্ষে (২) বেদান্ত ও (৩) মীমাংসামত এবং অতি সংক্ষেপে (৪) অপরাপর দার্শনিকমত আলোচনা করা হইল। এখন এতদ্দ্বারা যদি কথঞ্চিৎও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়—তাহা হইলে শ্রম সফল।

এখন এই আলোচনা হইতে কি জানা গেল, তাহা যদি ভাবা যায়, তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে,—

১। অদ্বৈতমতই বেদান্ত বা উপনিষদের মত। অপর যত মত তাহা ইহার প্রতিকূলতা করিয়া অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষরূপে থাকিয়া ইহারই পুষ্টি ও উজ্জ্বলতা সাধন করে। উচ্চাধিকারীর পক্ষে ইহাই উৎকৃষ্ট মত। অনুভব, যুক্তি ও শ্রুতি—তিনরূপেই ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে। আর বৈদিক যুগ হইতে ইহার ধারা অবিচ্ছিন্নই রহিয়াছে। আর সেই অদ্বৈতমত জানিতে হইলে অদ্বৈতসিদ্ধির সমকক্ষ গ্রন্থ আর নাই।

২। সেই অদ্বৈতমতের সার এক কথায় এই যে, (ক) একমাত্র ব্রহ্মই সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ বস্তু, (খ) জগৎপ্রপঞ্চ তাহাতে অধ্যস্ত হইয়া সৎ, চিৎ ও আনন্দরূপ বোধ হয়। (গ) এই ব্রহ্মের অনাদি ও অচিন্ত্য শক্তিবলে এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল জীব ও জগতের আবির্ভাব। (ঘ) এই ব্রহ্মশক্তির নিত্য পরিবর্ত্তন ঘটিলেও ব্রহ্ম যাহা তাহাই আছেন, এজন্য এই শক্তি মিথ্যাবস্তু এবং ব্রহ্মই সত্যবস্তু। বস্তুতঃ, যাহা নিত্য

পরিবর্ত্তনশীল কখন একরূপে থাকে না, তাহাই অনির্ব্বচনীয়, তাহাই মিথ্যা, এজন্য যাহা দৃশ্য হয়, অথচ নাই, তাহাই মিথ্যা এবং যাহা নিত্য সৎ অথচ দৃশ্য হয় না, তাহাই সত্য। (ঙ) ব্রহ্মজ্ঞানে অর্থাৎ এই শক্তির আধার নির্গুণ নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞানে, এই শক্তির খেলা আর থাকে না, শক্তিও আর থাকে না। আর এই শক্তির খেলা বন্ধ না হইলে দুঃখও দূর হয় না। জগতের সুখ দুঃখমিশ্রিত। জগতে দুঃখশূন্য সুখ নাই। দুঃখশূন্য সুখ আর সুখস্বরূপ অভিন্ন বস্তু। (চ) ব্রহ্মলোক, শিবলোক, বৈকুণ্ঠ বা গোলোক—সকলই দুঃখশূন্য নহে এবং সকলই অনিত্য।

৩। এইরূপ ব্রহ্মপ্রভৃতি সম্বন্ধে প্রমাণ একমাত্র শ্রুতি। প্রত্যক্ষাদি অপর প্রমাণ শ্রুতিপ্রমাণের নিকট দুর্ব্বল। সুতরাং তাহারা অনুকূল হইলেই গ্রাহ্য, নচেৎ ত্যাজ্য।

৪। বেদ নিত্য অপৌরুষেয় অভ্রান্ত এবং পরস্পর অবিরুদ্ধ। আবৃত্তিশূন্য নিঃশ্রেয়স মুক্তি বেদোক্ত জ্ঞানসাহায্যেই লভ্য, অন্য উপায়ে নহে। ইত্যাদি।

এই সত্য সিদ্ধান্তগুলি পরপক্ষের যাবতীয় উদ্ভাবিত ও সম্ভাবিত যুক্তিতর্ক নিরস্ত করিয়া বুঝিতে গেলে অদ্বৈতসিদ্ধির আলোচনা অনিবার্য্য আবশ্যক। ইহার আলোচনায় নিদিধ্যাসন পূর্ণ হয় এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়। ইহার আলোচনায়—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

ইহার আলোচনায়—

"বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ" "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" "স্বেন রূপেণ অভিসম্পদ্যতে"। ইতি হরিঃ ওম্।

কলিকাতা
১৩৩১ সাল

সম্পাদক
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

द्वितीयादि मिथ्यात्वसामान्योपपत्तिपर्यन्ता ॥ ५॥३)

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-

শ্রীমন্‌মধুসূদনসরস্বতীবিরচিতা

অদ্বৈতসিদ্ধিঃ

এতন্নিরস্যমানন্যায়ামৃতগ্রন্থসহিতা

মিথ্যাত্বদ্বিতীয়লক্ষণাদিমিথ্যাত্বসামান্যোপপত্তিপর্য্যন্তা

[দ্বিতীয়োভাগঃ]

কলিকাতা রাজকীয়-সংস্কৃতবিদ্যালয়স্থ-সাংখ্যবেদান্তমীমাংসাদি-

বিবিধ-শাস্ত্রাধ্যাপক-পণ্ডিতপ্রবর-

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ-

পরিশোধিতা, তৎকৃত-টীকা-বঙ্গানুবাদ-তাৎপর্য্যসমেতা

ন্যায়বেদান্তাদি নানাশাস্ত্রানুবাদক-

পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ-

সম্পাদিতা, তৎকৃত-ভূমিকাসহিতা চ।

প্রকাশক—শ্রীক্ষেত্রপাল ঘোষ

৬নং পার্শিবাগান লেন, কলিকাতা।

কলিকাতা

১৮৫৩ শকাব্দ, ১৩৩৮ সাল,

১৯৩১ খৃষ্টাব্দ।

কলিকাতা
৬নং পাশিবাগানলেনস্থিত কমার্সিয়ালগেজেট প্রেস হইতে
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ লাহিড়ী কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

উৎসর্গ

যাঁহাদিগকে
জগতের জনকজননীস্বরূপ বলিয়া
ভাবিতে পারিলে জীবগণ
পরমাভীষ্টলাভ করে
আমাদিগের সেই জনকজননী
৺শ্রীহীরালাল ঘোষ
এবং
৺শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর
প্রীতির উদ্দেশ্যে
এই অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থখানি
উৎসর্গীকৃত হইল।

সানুজ—
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

নিবেদন।

করুণাময় শ্রীমধুসূদনের অপার কৃপায় অদ্বৈতসিদ্ধির দ্বিতীয় ভাগ সংবৎসরের মধ্যেই প্রকাশিত হইল। ইহাতে মিথ্যাত্বের দ্বিতীয় লক্ষণ হইতে মিথ্যাত্বমিথ্যাত্ব পর্য্যন্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় বিদ্বন্মণ্ডলী এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে, আমার এই অকিঞ্চন প্রয়াসে কৃপাকটাক্ষপাত করিয়া আমাকে যেরূপ উৎসাহিত করিয়াছেন, তাহারই ফলে এতশীঘ্র এই দ্বিতীয় ভাগটী সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছি। এজন্য তাঁহাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। কিন্তু যে পরমপূজ্য-শ্রীচরণ মহানুভব লক্ষণশাস্ত্রী মহোদয়ের কৃপায় এই গ্রন্থের দুই এক অক্ষরের জ্ঞানলাভ করিয়াছিলাম—যাঁহার চেষ্টায় এই বঙ্গদেশে অদ্বৈত-সিদ্ধির প্রচার হয়, এবং যাঁহার আশীর্ব্বাদ আমাকে বিশেষভাবে এই দুষ্কর কার্য্যে সাহস প্রদান করিয়াছিল, তাঁহার শ্রীচরণে এই ভাগটী আর আমি নিবেদন করিতে পারিলাম না, এ ক্ষোভ হইতে আর আমি মুক্ত হইতে পারিব না। এই গ্রন্থসমাপ্তির অল্পদিন পূর্ব্বেই তিনি নশ্বরাধার ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলীন হইয়াছেন।

কিন্তু এই দুঃখের মধ্যেও উৎসাহের কথা এই যে, সাধারণ বিদ্বোৎ-সাহিবর্গ ইহার প্রতি যেরূপ সমাদর প্রদর্শন করিতেছেন—তাহাতে মনে হয়—সাধারণের মধ্যেও ক্রমে ক্রমে শাস্ত্রানুরাগ ফিরিয়া আসিবে, অদ্বৈতসিদ্ধিজাতীয় গ্রন্থেরও আবার পঠনপাঠন প্রবর্ত্তিত হইবে, পরমপূজ্য শ্রীচরণ-শাস্ত্রীমহোদয়ের উদ্দেশ্য কতকটা সিদ্ধ হইবে।

অদ্বৈতবেদান্তসিদ্ধান্তাবগতির জন্য অদ্বৈতসিদ্ধি যেরূপ উপযোগী এবং তত্ত্ববহুল চরমগ্রন্থ, এরূপ আর কোন গ্রন্থ নাই। এই অদ্বৈত-সিদ্ধিগ্রন্থের পূর্ব্বে এই জাতীয় যে সব গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল, এই অদ্বৈত-সিদ্ধিতে তাহাদেরই চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। কারণ, দ্বৈতবাদী

মাধ্বমতাবলম্বী পূজ্যপাদ ব্যাসাচার্য্য অদ্বৈতবাদের গ্রন্থ সমুদ্রমন্থন করিয়া ন্যায়ামৃত রচনা করিয়া অদ্বৈতমত খণ্ডন করিলে এই অদ্বৈতসিদ্ধি সেই ন্যায়ামৃত খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতমতের নির্দ্দোষতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

অনেকে মনে করেন—ন্যায়ামৃতের অনুকরণে অদ্বৈতসিদ্ধি রচিত, কিন্তু ঠিক্ তাহা নহে। কারণ, ন্যায়ামৃতও অদ্বৈতসিদ্ধিজাতীয় কোন এক পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থের অনুকরণে রচিত, তাহা এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে। এই বিলুপ্ত গ্রন্থ ব্রহ্মসিদ্ধি, কি ইষ্টসিদ্ধি, কি বেদান্তকৌমুদী, কি অন্য কিছু, তাহা গ্রন্থাভাবে এখনও নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। ফলতঃ বিপক্ষের যাবতীয় আক্রমণ প্রতিহত করায় অদ্বৈতসিদ্ধি যে এ বিষয়ে চরমগ্রন্থ তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথমভাগপাঠে, আশা করি, পাঠকবর্গ, এই গ্রন্থের পরিচয় কিঞ্চিৎ পাইয়াছেন। এক্ষণে এই দ্বিতীয়-ভাগ দেখিয়া, আশা করি পাঠকবর্গের সেই ধারণা আরও সুদৃঢ় হইবে। বিদ্যার্থিগণ যাহাতে অনায়াসে গ্রন্থমধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য ইহার টীকাটী যথাসাধ্য সরল এবং অনুবাদ ও তাৎপর্য্য তত্ত্ববহুল করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে ইহার পঠনপাঠন যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব। তথাপি বলিয়া রাখি, এ শাস্ত্র সন্ন্যাসীরই শাস্ত্র, আমরা ইহার অধিকারী নহি।

পরিশেষে, যাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, যত্ন ও অর্থব্যয়ে এই গ্রন্থের সম্পাদন ও প্রকাশকার্য্য সম্পন্ন হইল, সেই পরমকল্যাণভাজন শ্রীমান্ রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ এবং শ্রীমান্ ক্ষেত্রপাল ঘোষ মহাশয়দ্বয়কে আশীর্ব্বাদ করি স্বস্থশরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এই শ্রেণীর অমূল্য শাস্ত্রপ্রচার করিয়া দেশবাসীর এবং নিজের কল্যাণ সাধন করিতে থাকুন।

সম্পাদকের নিবেদন।

ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহে অদ্বৈতসিদ্ধির দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে প্রথমভাগেরই ন্যায় মূল, টীকা, অনুবাদ ও তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে, এবং পরিশেষে এই অদ্বৈতসিদ্ধি যে দ্বৈতবাদী শ্রীমদ্ব্যাসাচার্য্যপ্রণীত ন্যায়ামৃতগ্রন্থের প্রত্যুত্তর প্রতিবাদ, সেই ন্যায়ামৃত গ্রন্থের মূল ও অনুবাদ পরিশিষ্টাকারে প্রদত্ত হইয়াছে। পরমশ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয় এ ভাগেও পরিশ্রমের কোনরূপ ত্রুটী করেন নাই।

এই ভাগে মিথ্যাত্বের শেষ চারিটী লক্ষণ, অর্থাৎ দ্বিতীয় লক্ষণ হইতে পঞ্চম লক্ষণ এবং মিথ্যাত্বমিথ্যাত্বোপপত্তি অর্থাৎ মিথ্যাত্বটী মিথ্যা কি সত্য, এই পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইল। এইরূপে এই ভাগে সেই সুবিশাল অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থের যতটুকু অংশ প্রকাশিত হইল, তাহাতে অদ্বৈততত্ত্ব প্রমাণিত করিবার জন্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকর্তৃক জগতের মিথ্যাত্বসাধক অনুমানের অর্থাৎ—

প্রপঞ্চঃ মিথ্যা	... ...	(প্রতিজ্ঞা)
দৃশ্যত্বাৎ, জড়ত্বাৎ, পরিচ্ছিন্নত্বাৎ, অংশিত্বাৎ		(হেতু)
যথা—শুক্তিরজতম্	... ...	(উদাহরণ)

এই অনুমানের সাধ্য যে মিথ্যাত্ব তাহারই বিবরণ এবং তদ্বিরুদ্ধে দ্বৈতবাদীর যাবতীয় আপত্তির খণ্ডন সমাপ্ত হইল। অদ্বৈতসিদ্ধির এই অংশমাত্রে প্রবেশলাভ করিতে পারিলে অবশিষ্ট অংশ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়, এজন্য সাধারণতঃ কৃতবিদ্য বিদ্যার্থিগণ অধ্যাপকের নিকট এই অংশটুকু অতি যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। ভগবানের

বিশেষ কৃপায় এবং পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত তর্কতীর্থ মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টায় সেই অংশটুকু আজ যথাসম্ভব সহজবোধ্য হইয়া প্রকাশিত হইল। বলা বাহুল্য, অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থখানি অধিগত হইলে বেদান্তসিদ্ধান্তসম্বন্ধে আর অজ্ঞাত কিছুই থাকে না।

এই ভাগেও প্রথমভাগের ন্যায় একটী ভূমিকা সংযোজিত করা হইল। ইহাতে বর্ত্তমান শিক্ষার প্রভাবে শাস্ত্রচর্চ্চাসম্বন্ধে আমাদের অনেকের যেরূপ প্রতিকূল বা উদাসীন মনোভাব জন্মিতেছে, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা আছে। বর্ত্তমানের এই ভাবটী, আমাদের জাতীয় ভাবধারার যেরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটন করিতে বসিয়াছে, তাহাতে এ বিষয়ে আর দৃষ্টিহীন হইয়া থাকা উচিত নহে। ইহজগতের উন্নতিই যেমন জীবনের লক্ষ্য নহে, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ইহজগতের উন্নতি বিসর্জ্জন করাও উচিত নহে। আমরা যদি কেবল ইহজগৎ লইয়া বিব্রত হই, তাহা হইলে আমরা ঠিক্ লাভবান্ হইতে পারিব না। এজন্য শাস্ত্রচর্চ্চা বর্জ্জন করা কোনমতেই উচিত নহে। আর এজন্য এ বিষয়ের সময়োচিত কিঞ্চিৎ আলোচনা এই ভূমিকামধ্যে প্রদত্ত হইল।

শারদীয় দুর্গাপূজা ১লা কার্ত্তিক, সন ১৩৩৮ সাল। ৩নং পার্শিবাগান লেন, কলিকাতা।	সম্পাদক শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

ভূমিকা (দ্বিতীয় ভাগ)।

এই ভূমিকার আবশ্যকতা।

এই গ্রন্থের প্রথমভাগে এই গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি-উৎপাদন এবং সামর্থ্য-সম্পাদনের জন্য কিঞ্চিৎ চেষ্টা করা হইয়াছে। এক্ষণে সেই সম্পর্কে আরও দুই একটী প্রয়োজনীয় কথার অবতারণা করা আবশ্যক মনে হইতেছে। কারণ, প্রথমভাগের ভূমিকামধ্যে এই গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি-উৎপাদনের সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া শাস্ত্রীয় রীতিতে তাদৃশ প্রবৃত্ত্যুৎপাদনে বাধার নিরাকরণ করা হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানের প্রচলিত পাশ্চাত্ত্যশিক্ষাসংস্কৃত রীতিতে এই গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত্যুৎপাদনে যে সব বাধা উপস্থিত হয়, তাহার নিরাকরণ করা হয় নাই। এজন্য এই ভূমিকামধ্যে এতাদৃশ বাধার নিরাকরণে কিঞ্চিৎ চেষ্টা করা যাইতেছে।

হইবার কথা। অতএব এই দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকামধ্যে এই সকল মতবাদ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহাই বলা যাইতেছে।

১। ক্রমোন্নতিবাদসংক্রান্তবাধা।

এই জাতীয় গ্রন্থ আলোচনায় প্রথম বাধা ক্রমোন্নতিবাদ সংক্রান্ত বাধা। এই বাদের মূলমন্ত্র অনন্ত উন্নতি, সুতরাং অনন্তসুখসম্প্রাপ্তি। এই মতবাদটী আমাদের দেশে যে আকারে ছিল বা বর্ত্তমান, তাহাতে আমাদের কোন বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশে ইহা যে আকার ধারণ করিয়াছে এবং তাহার পর ইহা ভারতে আসিয়া যে রূপ আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে, এবং ভবিষ্যতে হইবারও সম্ভাবনা। ইহাই আপাততঃ আমাদের এই জাতীয় গ্রন্থালোচনায় বাধা উৎপাদন করিতেছে। অতএব এই ভারতীয় পাশ্চাত্য ক্রমোন্নতিবাদই এস্থলে আমাদের আলোচ্য ক্রমোন্নতিবাদ।

আমাদের দেশের ক্রমোন্নতিবাদের পরিচয়।

আমাদের দেশে ক্রমোন্নতিবাদ কর্ম্মমীমাংসকদিগের মধ্যে এবং দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী প্রভৃতি উপাসকসম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায়। এই ক্রমোন্নতিবাদ ঠিক্ পাশ্চাত্ত্য ক্রমোন্নতিবাদ না হইলেও সুখের অনন্ত বিবৃদ্ধি অংশে বড় বেশি প্রভেদ নাই। এজন্য নিম্নে আমাদের দেশীয় ক্রমোন্নতিবাদের পরিচয় দিয়া পরে পাশ্চাত্ত্য ক্রমোন্নতিবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

কর্ম্মমীমাংসকমতে ক্রমোন্নতিবাদ।

আমাদের দেশে কর্ম্মমীমাংসকদিগের মধ্যে ক্রমোন্নতিবাদ যে আকারে বর্ত্তমান, তাহা এই—বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি করিলে মানবের স্বর্গসুখ হইয়া থাকে। এই স্বর্গে সর্ব্ববিধ সুখসম্ভোগ হয়, যাহাই কামনা হয়, তাহাই পূর্ণ হইয়া থাকে, মানবের কোন অভাব থাকে না, মানব সুখসাগরে ডুবিয়া বা ভাসিতে ভাসিতে আত্মহারা হইয়া যায়। অবশ্য

কর্ম্মফলের ক্ষয় হইলে পতন অবশ্যম্ভাবী বটে, কিন্তু তাহাতে আবার উন্নত জন্মই লাভ হয়। তাহার পর একবার যাগবিশেষের ফলে যদি একশত বৎসর স্বর্গ হয়, তাহা হইলে, এখানকার এক বৎসর দেবলোকের একদিন বলিয়া এখানকার অনুপাতে ৩৬৫০০ ছত্রিশ হাজার পাঁচ শত বৎসরই সেই যাগবিশেষের ফলে স্বর্গ হইয়া থাকে। এইরূপে যাঁহারা নিত্য বা পুনঃ পুনঃ এইরূপ যাগাদি অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের তাদৃশ স্বর্গ একপ্রকার অক্ষয় স্বর্গই হইয়া যায়। আর কর্ম্মফলশেষে পতন হইলেও আবার তাদৃশ যাগের অনুষ্ঠানে আবার সেইরূপ স্বর্গ হয়। আর এই সঙ্গে যোগবিদ্যার অনুশীলন থাকিলে ইচ্ছামৃত্যু, নিরোগ শরীর প্রভৃতিও হইতে পারে। সুতরাং যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মবিশেষের ফলে মানবের উন্নতি অনন্ত উন্নতিতে পরিণত হয়। মানবের যেমন আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই, তদ্রূপ মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার উন্নতিরও শেষ থাকে না, তাহার সুখের সমাপ্তি হয় না।

কর্ম্মমীমাংসার বিরুদ্ধে আপত্তি ও খণ্ডন।

এমতে আপত্তি করিয়া যদি কেহ বলেন যে, এই যাগাদির অনুষ্ঠানে ত দুঃখও কিছু থাকে, আর সময়বিশেষে পতন ঘটায়, তাহাতে দুঃখও অনিবার্য্য হয়, অতএব দুঃখশূন্য সুখলাভ ত আর হইল না, ইত্যাদি; তাহা হইলে এই মতে বলা হয় যে, দুঃখশূন্য সুখ নাই, উহা অসম্ভব কথা। সুতরাং কৌশলে দুঃখের মাত্রা কমাইয়া সুখের মাত্রা বর্দ্ধিত করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। বস্তুতঃ বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারাই তাহা হইয়া থাকে। অতএব ইহাই পুরুষার্থ, ইহারই জন্য জীবমাত্রের যত্ন করা কর্ত্তব্য। সুখ যদি প্রাণিমাত্রের অভীষ্ট হয়, আর সেই সুখ যদি দুঃখশূন্য না হয়, এবং সেই সুখ যদি বেদোক্ত কর্ম্মদ্বারা যথাসম্ভব অধিকমাত্রায় লভ্য হয়, তাহা হইলে সেই বেদোক্ত কর্ম্মই মানবমাত্রের অনুষ্ঠেয়। ইহাই মানবের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার কথা।

নাই। এজন্য ইহাতে আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। বস্তুতঃ এই নিমিত্তই এই প্রসঙ্গের আলোচনা আরম্ভক হইয়াছে।

পাশ্চাত্যক্রমোন্নতিবাদ।

পাশ্চাত্যদেশে যে ক্রমোন্নতিবাদ প্রকটিত হইয়াছে, তাহার মূল কতকটা গ্রীকদর্শনে এবং খৃষ্টীয় ধর্মমতের মধ্যে থাকিবার কথা। আর তাহা কতকটা ভারতীয় উপাসকসম্প্রদায়ের ক্রমোন্নতিবাদেরই অনুরূপ। কারণ, খৃষ্টীয় ধর্মমতে ভগবৎসকাশে জীবের শেষবিচারের পর জীব ভগবানের রাজ্যের প্রজা হইয়া উত্তরোত্তর সুখের অধিকারী হইয়া থাকে, অথবা পাপী হইলে অনন্ত নরক ভোগ করিতে থাকে। কিন্তু পরবর্তী পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে এই মতবাদটী ক্রমে অন্য আকার ধারণ করে। আর এজন্য মহাত্মা ডারুইনের নাম প্রথম গ্রহণ করা যাইতে পারে। মহাত্মা ডারুইন প্রথমে বৈজ্ঞানিক ক্রমোন্নতিবাদ প্রচার করেন। ইহাতে তিনি জীবজাতির অভিব্যক্তি কিরূপে হয়, তাহাই প্রদর্শন করেন। ইহারই মতাবলম্বনে বলা হয়—বানর ও বনমানুষের জাতি হইতে মানবজাতির অভিব্যক্তি হইয়াছে। ইহার পর এই অভিব্যক্তি-বাদ বৈজ্ঞানিকগণ জগতের সকল বিষয়ে সকল ব্যাপারে লক্ষ্য এবং অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই অনুসন্ধানে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও প্রবৃত্ত হইলেন। আর তাহারই ফলে বর্ত্তমান দার্শনিক পাশ্চাত্য ক্রমোন্নতিবাদ আবির্ভূত হইয়াছে। আর তাহাই আবার ভারতীয় শিক্ষিতসমাজে প্রবেশলাভ করিয়া কথঞ্চিৎ অভিনব দার্শনিক ক্রমোন্নতিবাদে অর্থাৎ অনন্তক্রমোন্নতিবাদে পরিণত হইয়াছে। আর তাহাই—আমাদের নিকট শাস্ত্রানুশীলনের পক্ষে মহান্ অন্তরায় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। যেহেতু এই মতে প্রাচীনের জ্ঞানভাণ্ডার সবই আজ প্রায় বাতিল হইয়া গিয়াছে। এইজন্য এই প্রবন্ধে এই অনন্ত-ক্রমোন্নতিবাদের বিষয়ই আলোচিত হইবে।

পাশ্চাত্যক্রমোন্নতিবাদের সামান্যপরিচয়।

এমতে সকলেরই উন্নতি অনন্ত স্বীকার করা হয়। এই উন্নতির সীমা নাই, ইহার আদিও নাই। জগতের প্রত্যেক বস্তুরই অনন্তকাল হইতে উন্নতি হইয়া আসিতেছে, এবং অনন্তকালই এই উন্নতি হইতে থাকিবে। ইহার বিরাম কখনও হইবে না।

পাশ্চাত্যক্রমোন্নতিতে জাতি ও ব্যক্তির উন্নতি।

কেহ বলেন—এই উন্নতি জাতি ও ব্যক্তি উভয়েরই হইতেছে। এই জাতি যেমন মনুষ্যত্ব, গোত্ব, অশ্বত্ব, এবং ব্যক্তি যেমন কোন একটী মনুষ্য, কোন একটী গো বা কোন একটী অশ্ব। জাতির উন্নতি—যেমন বানর বা বনমানুষ জাতি হইতে মনুষ্যজাতির অভিব্যক্তি, আর ব্যক্তির উন্নতি অর্থ—প্রত্যেক ব্যক্তির সুখসম্পদ্, জ্ঞান, বল প্রভৃতির বৃদ্ধি এবং দেহ, মন ও আত্মা প্রভৃতির স্বরূপেরও উৎকর্ষলাভ বুঝায়।

পাশ্চাত্যক্রমোন্নতিতে জাতির উন্নতি।

কেহ বলেন—এই উন্নতি কেবল জাতিরই হয়, ব্যক্তির নহে। জাতির উন্নতিবশতঃ ব্যক্তির সুখসম্পদ্বৃদ্ধি হইলেও আত্মা যেমন তেমনই থাকে। অন্যে কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন না, এই মতে কেবল জাতিরই উন্নতি হয়—বলা হয়।

জাতির উন্নতির ফল।

মানবজাতির উন্নতির ফলে পূর্ব্বেকার সাধারণ মানব হইতে বর্ত্তমানের সাধারণ মানব—সুখ শান্তি জ্ঞান বল ও ঐশ্বর্য্যে উন্নত। অতীতের সাধারণ মানুষের এত সুখ শান্তি জ্ঞান বল ও ঐশ্বর্য্য ছিল না। বর্ত্তমানের ব্যক্তিবিশেষ হইতে অতীতের ব্যক্তি বিশেষের হয় ত কখন কখন অধিক সুখশান্তি, স্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু সাধারণভাবে মানবজাতির উন্নতি অতীত হইতে বর্ত্তমানে অধিক মনে করা যাইতে পারে। আর ব্যক্তির উন্নতির ফলে প্রত্যেক জীবের,

নাই। এজন্য ইহাতে আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। বস্তুতঃ এই নিমিত্তই এই প্রসঙ্গের আলোচনা আবশ্যক হইয়াছে।

পাশ্চাত্যক্রমোন্নতিবাদ।

পাশ্চাত্যদেশে যে ক্রমোন্নতিবাদ প্রকটিত হইয়াছে, তাহার মূল কতকটা গ্রীকদর্শনে এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতের মধ্যে থাকিবার কথা। আর তাহা কতকটা ভারতীয় উপাসকসম্প্রদায়রে ক্রমোন্নতিবাদেরই অনুরূপ। কারণ, খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতে ভগবৎসকাশে জীবের শেষবিচারের পর জীব ভগবানের রাজ্যের প্রজা হইয়া উত্তরোত্তর সুখের অধিকারী হইয়া থাকে, অথবা পাপী হইলে অনন্ত নরক ভোগ করিতে থাকে। কিন্তু পরবর্ত্তী পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে এই মতবাদটী ক্রমে অন্য আকার ধারণ করে। আর এজন্য, মহাত্মা ডারুইনের নাম প্রথম গ্রহণ করা যাইতে পারে। মহাত্মা ডারুইন প্রথমে বৈজ্ঞানিক ক্রমোন্নতিবাদ প্রচার করেন। ইহাতে তিনি জীবজাতির অভিব্যক্তি কিরূপে হয়, তাহাই প্রদর্শন করেন। ইহারই মতাবলম্বনে বলা হয়—বানর ও বনমানুষের জাতি হইতে মানবজাতির অভিব্যক্তি হইয়াছে। ইহার পর এই অভিব্যক্তি-বাদ বৈজ্ঞানিকগণ জগতের সকল বিষয়ে সকল ব্যাপারে লক্ষ্য এবং অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই অনুসন্ধানে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও প্রবৃত্ত হইলেন। আর তাহারই ফলে বর্ত্তমান দার্শনিক পাশ্চাত্য ক্রমোন্নতিবাদ আবির্ভূত হইয়াছে। আর তাহাই আবার ভারতীয় শিক্ষিতসমাজে প্রবেশলাভ করিয়া কথঞ্চিৎ অভিনব দার্শনিক ক্রমোন্নতিবাদে অর্থাৎ অনন্তক্রমোন্নতিবাদে পরিণত হইয়াছে। আর তাহাই—আমাদের নিকট শাস্ত্রানুশীলনের পক্ষে মহান্ অন্তরায় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। যেহেতু এই মতে প্রাচীনের আনন্তাবোর সবই আজ প্রায় বাতিল হইয়া গিয়াছে। এইজন্য এই প্রবন্ধে এই অনন্ত-ক্রমোন্নতিবাদের বিষয়ই আলোচিত হইবে।

বলেন; অর্থাৎ তাঁহাদের মধ্যে আরও কিছু বিশেষ পরিচয় লইবার চেষ্টা করা যাউক।

পুনর্জ্জন্ম স্বীকার ও অস্বীকারে ফলভেদ।

ইহাদের মতে কাহারও আর অবনতি স্বীকার করা হয় না। যাঁহাদের মতে আত্মার পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করা হয়, তাঁহাদের মতে আত্মার উত্তরোত্তর উন্নতজন্মই হইতে থাকে। আর যাঁহারা পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে ইহজন্মের উন্নতির পর মৃত্যুর পরে সূক্ষ্মদেহের ন্যায় কোন দেহে আত্মার উত্তরোত্তর উন্নতিই হইতে থাকে। ফলতঃ সর্ব্বথাই আত্মার উন্নতিই হয়, সে উন্নতির আর বিরাম নাই। ইহা জগতের স্বভাব বলিয়া জগতের অন্তর্গত জীবেরও তাহা স্বভাব। জীব জগতের অপরাপর বস্তুর ন্যায় স্বভাবতঃই উত্তরোত্তর উন্নত হইতে থাকে, অন্য কথায় স্বভাববশেই জীব অনন্ত উন্নতির পথে পথিক হয়।

দৃষ্টান্তদ্বারা ক্রমোন্নতির অর্থনির্দ্ধারণ।

এই উন্নতির অর্থ যদি আরও ভাল করিয়া বলিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে—মানবাত্মা বিশ্বাত্মার ভাব উত্তরোত্তর পাইতে থাকে, অর্থাৎ বিশ্বাত্মা মানবাত্মার মধ্যে নিয়ত অনন্তকাল ধরিয়া প্রকটিত হইতেছে। অন্য কথায় মানব অপূর্ণ অবস্থা হইতে পূর্ণাবস্থা লাভ করিতেছে, অর্থাৎ পূর্ণাবস্থা হইতে পূর্ণতর অবস্থাপ্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু কখনই পূর্ণতম অবস্থা প্রাপ্ত হইবে না। পূর্ণতম অবস্থা একমাত্র সেই বিশ্বাত্মারই অবস্থা। এই জীবেশ্বরের সম্বন্ধের একটী দৃষ্টান্ত, যেমন—কোন একটী বৃহৎ জলপূর্ণ পাত্রমধ্যে যদি একটী সচ্ছিদ্র ক্ষুদ্র ভাণ্ড রক্ষিত হয়, তাহা হইলে যেমন ক্ষুদ্র ভাণ্ডটী উক্ত বৃহৎপাত্রের জলেই পূর্ণ হইয়া যায়, এবং তৎপরে সেই ক্ষুদ্রভাণ্ড হইতে যদি জল তুলিয়া বৃহৎপাত্রে ফেলা যায়, তাহা হইলে ক্ষুদ্রভাণ্ডটী যতই খালি হইবে, ততই সেই বৃহৎপাত্রের জল তাহাকে পূর্ণ করিয়া দিতে থাকে।

এমন কি প্রত্যেক উদ্ভিজ্জাদি পদার্থের ও আকৃতি প্রকৃতি ক্রিয়াকলাপের মধ্যে উন্নতভাব দেখা যায়। ফলতঃ অতীত হইতে বর্ত্তমান, মোটের উপর সর্ব্ববিষয়েই উন্নত বা ভাল।

উক্ত ক্রমোন্নতির বিরুদ্ধে আপত্তিপরিহার।

ইঁহাদের এই কথার বিরুদ্ধে যদি কেহ বলেন—সকল জাতিরই প্রাচীন কাহিনী দেখিলে মনে হয়, তাঁহারা বর্ত্তমানের অবস্থা হইতে উন্নতই ছিলেন, সুতরাং ক্রমোন্নতিবাদ স্বীকার্য্য নহে, তাহা হইলে তদুত্তরে ইঁহারা বলিয়া থাকেন যে, প্রাচীনের উক্ত কাহিনী সত্য নহে, উহা কবিকল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে, মানবের আদর্শের উন্নতির জন্য উহা কল্পিতমাত্র। যেহেতু আদর্শানুসারেই মানবের ভবিষ্যৎ হইয়া থাকে। অতএব অতীত অপেক্ষা বর্ত্তমান উন্নতই বটে, ইহাতে কোন সন্দেহ করাই উচিত নহে।

উক্ত ক্রমোন্নতিবাদীর বিভাগ।

যাহা হউক এই ক্রমোন্নতিবাদী প্রধানতঃ দুই প্রকার, যথা—প্রথম—জাতি ব্যক্তি উভয়ের ক্রমোন্নতিবাদী এবং দ্বিতীয়—জাতিমাত্রের ক্রমোন্নতিবাদী। ইঁহাদের মধ্যে জাতিব্যক্তি উভয়ের ক্রমোন্নতিবাদী আবার দুই প্রকার হয়, যথা—প্রথম প্রকার বলেন—ব্যক্তির উন্নতিতে আত্মারও উন্নতি হয়, দ্বিতীয় প্রকার বলেন—আত্মার উন্নতি হয় না, কিন্তু আত্মধর্ম্ম সুখাদির উন্নতি অর্থাৎ বিবৃদ্ধি হয়—এইমাত্র। এই উভয় দলই আবার দুই প্রকার হইয়া থাকে, যথা—একদল বলেন—আত্মার পুনর্জ্জন্ম হয় এবং অপর দল বলেন—আত্মার পুনর্জ্জন্ম হয় না। ইহাই হইল ভারতীয় পাশ্চাত্যক্রমোন্নতিবাদীর শ্রেণী বিভাগ।

ক্রমোন্নতিবাদের বিশেষ পরিচয়।

এখন দেখা যাউক—জাতি ও ব্যক্তির ক্রমোন্নতিবাদিগণ আরও কি

বলেন, অর্থাৎ তাঁহাদের মধ্যে আরও কিছু বিশেষ পরিচয় লইবার চেষ্টা করা যাউক।

পুনর্জ্জন্ম স্বীকার ও অস্বীকারে ফলভেদ।

ইহাদের মতে কাহারও আর অবনতি স্বীকার করা হয় না। যাঁহাদের মতে আত্মার পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করা হয়, তাঁহাদের মতে আত্মার উত্তরোত্তর উন্নতজন্মই হইতে থাকে। আর যাঁহারা পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে ইহজন্মের উন্নতির পর মৃত্যুর পরে সূক্ষ্মদেহের ন্যায় কোন দেহে আত্মার উত্তরোত্তর উন্নতিই হইতে থাকে। ফলতঃ সর্ব্বথাই আত্মার উন্নতিই হয়, সে উন্নতির আর বিরাম নাই। ইহা জগতের স্বভাব বলিয়া জগতের অন্তর্গত জীবেরও তাহা স্বভাব। জীব জগতের অপরাপর বস্তুর ন্যায় স্বভাবতঃই উত্তরোত্তর উন্নত হইতে থাকে, অন্য কথায় স্বভাববশেই জীব অনন্ত উন্নতির পথে পথিক হয়।

দৃষ্টান্তদ্বারা ক্রমোন্নতির অর্থনির্দ্ধারণ।

এই উন্নতির অর্থ যদি আরও ভাল করিয়া বলিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে—মানবাত্মা বিশ্বাত্মার ভাব উত্তরোত্তর পাইতে থাকে, অর্থাৎ বিশ্বাত্মা মানবাত্মার মধ্যে নিয়ত অনন্তকাল ধরিয়া প্রকটিত হইতেছে। অন্য কথায় মানব অপূর্ণ অবস্থা হইতে পূর্ণাবস্থা লাভ করিতেছে, অর্থাৎ পূর্ণাবস্থা হইতে পূর্ণতর অবস্থাপ্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু কখনই পূর্ণতম অবস্থা প্রাপ্ত হইবে না। পূর্ণতম অবস্থা একমাত্র সেই বিশ্বাত্মারই অবস্থা। এই জীবেশ্বরের সম্বন্ধের একটী দৃষ্টান্ত, যেমন—কোন একটী বৃহৎ জলপূর্ণ পাত্রমধ্যে যদি একটী সছিদ্র ক্ষুদ্র ভাণ্ড রক্ষিত হয়, তাহা হইলে যেমন ক্ষুদ্র ভাণ্ডটী উক্ত বৃহৎপাত্রের জলেই পূর্ণ হইয়া যায়, এবং তৎপরে সেই ক্ষুদ্রভাণ্ড হইতে যদি জল তুলিয়া বৃহৎপাত্রে ফেলা যায়, তাহা হইলে ক্ষুদ্রভাণ্ডটী যতই খালি হইবে, ততই সেই বৃহৎপাত্রের জল তাহাকে পূর্ণ করিয়া দিতে থাকে।

এইরূপ জীবভাব যত ঈশ্বরভাবের দিকে অগ্রসর হইবে, ততই তাহার জীবভাবও থাকিবে এবং ঈশ্বরভাবও লব্ধ হইতে থাকিবে। এইরূপে জীবের পূর্ণতালাভের সুখ অনন্ত হয়। জীবের উন্নতি অনন্ত হয়, কিন্তু জীব কখনই ঈশ্বর হয় না।

ক্রমোন্নতিতে অনন্তসুখ এবং তত্ত্বতঃ তাহাতে ভেদাভেদ।

এইরূপে মানব সেই পূর্ণতমের দিকে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া মানব উত্তরোত্তর অধিক সুখপ্রাপ্ত হইতেছে। আর এই অগ্রগতি অনন্ত বলিয়া জীবের সুখও অনন্তই হইয়া থাকে। আর এই সুখ যে কেবল এক রকম সুখ হয়, তাহা নহে, ইহাতে অনন্ত রকমেরই সুখই হয়, সুতরাং জীব অপূর্ণ থাকিয়াও পূর্ণ। তদ্রূপ বিশ্বাত্মাও পূর্ণতমরূপ বলিয়া তাঁহারও সুখ সর্বরূপে অনন্তসুখ। আর জীবাত্মার ভিতর দিয়া তাঁহার পূর্ণতার বিকাশ হয় বলিয়া তিনিও পূর্ণতম হইয়াও অপূর্ণ। সুতরাং কি জীবাত্মা কি বিশ্বাত্মা উভয়ের মধ্যেই পূর্ণতা ও অপূর্ণতা বিজড়িত। জীবভিন্ন বিশ্বাত্মা পূর্ণতম নহে, আর বিশ্বাত্মা ভিন্ন জীবাত্মা পূর্ণ বা পূর্ণতর নহে। সুতরাং উভয়সাধারণ আত্মতত্ত্বমধ্যে পূর্ণতা ও অপূর্ণতার অপূর্ব সমাবেশ। অন্য কথায় পূর্ণতার মধ্যে অপূর্ণতা ও অপূর্ণতার মধ্যে পূর্ণতা চিরবিদ্যমান। এজন্য বলা হয়—এই আত্মতত্ত্বমধ্যে ভেদও আছে, অভেদও আছে, অর্থাৎ কেবল ভেদই নাই বা কেবল অভেদই নাই। আর এই ভেদাভেদভাব আছে বলিয়া অনন্ত উন্নতি, অনন্ত সুখ সম্ভবপর হইয়াছে। বস্তুতঃ, এই মতে অনন্ত সুখের জন্যই ভেদাভেদবাদ স্বীকার করা হয়।

এই মতে অদ্বৈতমতের অসারতা।

যাঁহারা বলেন—পূর্ণতা বলিতে সর্ববিধ অভাবশূন্যতা বুঝায়; যাহা সর্ববিধ অভাবশূন্য তাহাই পূর্ণ, পূর্ণতায় দ্বৈতগন্ধ থাকিতে পারে না ও নির্বিশেষ নির্গুণ স্বগত সজাতীয় বিজাতীয় ভেদশূন্য এক

অদ্বিতীয় বস্তুই পূর্ণ; দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছেদশূন্য অসঙ্গ ব্রহ্মই পূর্ণ, সুতরাং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন; আর এই ব্রহ্ম সুখস্বরূপ, সুখবোধ বা সুখভোগ ব্রহ্মে নাই, ইত্যাদি—তাঁহারা মহাভ্রান্ত। ইঁহারা মহা অসত্য কথা প্রচারে বদ্ধপরিকর। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি এই মতবাদের প্রচারক। এই মত মহাভ্রান্ত মত। ইঁহারা জগৎতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব প্রভৃতি সম্যক্ আলোচনা না করিয়াই এই সব কথা বলিয়া থাকেন। ক্রমোন্নতির ফলে মানবের জ্ঞান বৃদ্ধি পাইয়াছে, আর তাহার ফলে এ মতের ভুল ধরা পড়িয়াছে। এজন্য এ মতের অনুসরণ আর সঙ্গত নহে। বস্তুতঃ ক্রমোন্নতিবাদই সত্য, ইহাই সঙ্গত মতবাদ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ক্রমোন্নতিবাদের তুলনা।

এখন যদি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যক্রমোন্নতিবাদের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে—

প্রথম—উভয়মতেই অনন্তসুখপ্রাপ্তি স্বীকার করা হয়, কিন্তু প্রাচ্য-মতে পাপের ফলে পশু প্রভৃতি নীচজন্ম ঘটে এবং কর্ম্মফলভোগান্তে আর পূর্ব্বের ন্যায় মানবজন্ম লাভ হয়। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যমতে এরূপ নীচজন্ম ঘটে না। ইঁহাদের মতে পাপের ফল ইহ জন্মেই শেষ হইয়া যায়। আর জন্ম হইলে উন্নতজন্মই হয়, এবং জন্ম না হইলে সূক্ষ্মদেহের ন্যায় কোন দেহে থাকিয়া উত্তরোত্তর উন্নতিই হইতে থাকে।

দ্বিতীয়—প্রাচ্যমতে সত্যজ্ঞানের মূল বেদ—তাহাই ধ্রুব সত্য। তাহার আর পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে। তাহারই সাহায্যে মানবের উন্নতির শেষ লব্ধ হয়, অর্থাৎ মুক্তি হয়। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য মতে জ্ঞানেরও ক্রমোন্নতি আছে। সুতরাং পূর্ব্ব হইতে এখন জ্ঞান অনেক সত্যের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবে। কিন্তু সত্যবিষয়ক জ্ঞানের শেষ কখনই হইবে না। প্রাচ্যমতে প্রাচীন বৈদিক সত্যই প্রকৃত সত্য বটে, কালবশে তাহার উপর কখন

কখন আবরণ আসিয়া পড়ে এবং কখন কখন তাহা অপসারিত হইয়া যায় এই মাত্র, তাহাতেই সত্যবিষয়ক জ্ঞানের শেষ আছে।

ক্রমোন্নতিবাদের অসারতা।

এইবার দেখা যাউক—এই পাশ্চাত্য ক্রমোন্নতিবাদটী কতদূর যুক্তিসহ। বলাবাহুল্য এই ক্রমোন্নতিবাদের পক্ষপাতী বহু গণ্যমান্য অগাধ বুদ্ধিসম্পন্ন গভীর চিন্তাশীল প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিই আছেন, এবং ইঁহারা এ বিষয়ে বহু সূক্ষ্ম বিচারপূর্ণ অতি বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থাদিও লিখিয়াছেন। ইঁহাদের সকল কথা আলোচনা এ ক্ষেত্রে সম্ভবপর নহে, এজন্য এই মতের যাহা মূল তত্ত্ব, তাহাই এস্থলে অতি সংক্ষেপে বিচারিত হইতেছে।

জাতিমাত্রের ক্রমোন্নতিবাদ খণ্ডন অনাবশ্যক।

আমরা দেখিতে পাই যাঁহারা জাতিমাত্রের উন্নতি স্বীকার করেন, তাঁহাদের কথার প্রতিবাদ অনাবশ্যক। কারণ, ব্যক্তির উন্নতি ব্যতীত জাতির উন্নতি সম্ভবপর নহে। অথচ তাঁহারা ব্যক্তি সম্বন্ধে কোন কথা বিশেষভাবে বলেন না। এজন্য এই উন্নতিকে অভিব্যক্তি বলাই সঙ্গত। যেহেতু যাহার উন্নতি স্বীকার করা হয়, তাহার উন্নত অবস্থায় তাহার নিজত্ব রক্ষিত হওয়া আবশ্যক। যেমন বানর জাতির উন্নতি বলিলে বানর জাতীয় নিজত্ব রক্ষিত হইয়া তাহার যে শক্তিপ্রভৃতির আধিক্য, তাহাকে বুঝায়। কিন্তু বানর জাতির উন্নতি "মনুষ্যজাতি"—বলিলে বানর জাতির উন্নতি বুঝায় না। এস্থলে বানর জাতি হইতে মনুষ্যজাতির অভিব্যক্তি হইয়াছে বলিলে সে দোষ হয় না। যাহা হউক এইরূপ জাতিমাত্রের উন্নতিবাদীর কথায় প্রতিবাদ অনাবশ্যক। কারণ, একজাতি হইতে অন্যজাতির অভিব্যক্তি শাস্ত্রদৃষ্টিতেও স্বীকার করা হয়। অতএব যাঁহারা জাতি ও ব্যক্তি উভয়ের ক্রমোন্নতি স্বীকার করেন, তাঁহাদের কথাই এস্থলে আলোচ্য।

জাতি ও ব্যক্তি উভয়ের ক্রমোন্নতিবাদের খণ্ডন আরম্ভ।

এই জাতি ও ব্যক্তি উভয়ের ক্রমোন্নতিবাদিগণের মূল কথা এই যে, জগতের প্রকৃতির নিয়মেই ক্রমশঃই আমাদের উন্নতি হইতেছে। এই উন্নতির শেষ নাই। এজন্য আমরা অনবরত পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইতেছি, কিন্তু কখন সম্পূর্ণভাবে পূর্ণতা বা পূর্ণতমত্ব প্রাপ্ত হইব না। আর, তজ্জন্য অনন্তকাল ধরিয়া উত্তরোত্তর সুখবৃদ্ধি আমাদের অবশ্যম্ভাবী। অনন্তকাল উত্তরোত্তর অধিক সুখপ্রাপ্তির অনুরোধে অর্থাৎ অনন্ত উন্নতির অনুরোধে আমরা কস্মিন্ কালেও পূর্ণতমতাপ্রাপ্ত হইব না, এবং অবনতিগ্রস্তও হইব না।

পূর্ণশব্দের অর্থনির্ণয়দ্বারা খণ্ডন।

কিন্তু এই কথাটী যারপরনাই অসঙ্গত। কারণ, প্রথমতঃ পূর্ণশব্দের প্রকৃত অর্থ—সর্ব্বতোভাবে অভাবশূন্যতা। সেই পূর্ণের যখন তারতম্য উক্ত হয়, তখন পূর্ণশব্দে সর্ব্বতোভাবে অভাবশূন্যতা বুঝায় না, কিন্তু কোন এক ভাববিশেষে অভাবশূন্য বুঝায়। সুতরাং পূর্ণতম হইতে পূর্ণতর কিঞ্চিৎ অভাববিশিষ্ট এবং পূর্ণতর হইতে পূর্ণ আরও অধিক অভাববিশিষ্ট বুঝাইয়া থাকে। এজন্য পূর্ণের যখন তারতম্য উক্ত হয়, তখন পূর্ণশব্দের প্রকৃত যে অর্থ যে সর্ব্বতোভাবে অভাবশূন্যতা, তাহা বুঝায় না। অর্থাৎ পূর্ণ তখন অপূর্ণ হইতে আর পৃথক্ হয় না। পূর্ণ ও অপূর্ণ তখন একদৃষ্টিতে অভিন্ন পদার্থই হয়। পূর্ণশব্দের সর্ব্বতোভাবে অভাবশূন্য অর্থ গৃহীত হইলে আর পূর্ণের তারতম্য সম্ভবপর হয় না।

পূর্ণের তারতম্যস্বীকারের ফল।

এখন অনন্ত সুখের সম্ভাবনার অনুরোধে যদি অনন্ত ক্রমোন্নতি স্বীকার করা হয় এবং সেই ক্রমোন্নতির অনুরোধে যদি আমরা পূর্ণ হইতে পূর্ণতর অবস্থাপ্রাপ্ত হইতেছি—বলা হয়, তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে আমরা একপ্রকার অপূর্ণতা হইতে অন্যপ্রকার অপূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছি

বলিতে হয়। কারণ, পূর্ণশব্দের যে অর্থে পূর্ণের তারতম্য স্বীকার করা হয়, সে অর্থে পূর্ণ অপূর্ণেরই নামান্তর মাত্র। যে অর্থে পূর্ণ সর্ব্বতোভাবে অভাবশূন্য বস্তু বুঝায় না। সুতরাং আমরা জগতের প্রকৃতিবশে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর অবস্থাপ্রাপ্ত হইতেছি, বলিলে আমরা এক অপূর্ণ অবস্থা হইতে অন্য অপূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছি বুঝায়। অর্থাৎ পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইতেছি কথাটাই, পূর্ণশব্দের প্রকৃত অর্থের দৃষ্টিতে একটা ভুল কথা।

পূর্ণতার প্রাপ্তি অসম্ভব হইলে অপূর্ণতাই ঘটে।

তাহার পর দ্বিতীয়তঃ—জগতের প্রকৃতিবশে আমাদের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে বলিয়া আমরা পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছি—একথা বলিলেও ভুল বলা হয়। কারণ, আমরা যদি পূর্ণতার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছি—এরূপ হয়, তাহা হইলে একদিন আমরা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইব—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু যাহার দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহা যদি কোন কালেও প্রাপ্ত না হওয়া যায়, বা কোন কালেও তাহা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনাও না থাকে, তাহা হইলে তাহার দিকে কেহ অগ্রসর হইতেছে—একথা বলাই যায় না। যেমন আমি যদি বলি "আমি কাশীর দিকে চলিয়াছি" অথচ যদি বলি—"আমি কস্মিন্‌কালেও কাশীতে পহুছিতে পারিব না" বা "কোন কালেও কাশী পহুছিবার সম্ভাবনা আমার নাই", তাহা হইলে "আমি কাশীর অভিমুখে চলিয়াছি" এই কথাটাই আমার ভুল হয়। অতএব আমরা অনন্তকাল ক্রমাগত পূর্ণতার অভিমুখে চলিতেছি—বা পূর্ণ হইতে পূর্ণতর অবস্থাপ্রাপ্ত হইতেছি—এই কথাটাই ভুল।

ক্রমোন্নতি স্বীকারে পূর্ণতার দিকে গতি সিদ্ধ হয় না।

যদি বলা যায়, আমাদের যখন দিন দিন উন্নতি হইতেছে এবং ইহা যখন আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তখন আমাদের পূর্ণতার

অভিমুখে গতি হইতেছে—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আমরা বাল্যে গাড়ি, পাল্কি চড়িয়াছি, আর আজ মোটর, ব্যোমযান চড়িতেছি, আমরা ক্রমেই গাড়ি পাল্কি চড়া পরিত্যাগই করিতেছি, আর, পূর্ব্বে মোটর ব্যোমযানও ছিল না, তখন এ উন্নতি যে প্রত্যক্ষদৃষ্ট উন্নতি, তাহা কে অস্বীকার করিবে? অতএব উন্নতির অনুরোধে পূর্ণতার অভিমুখে গতি অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহা হইলে বলিব—হাঁ, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য বটে, যদি এই উন্নতির শেষ স্বীকার করা হয়, —যদি এই পূর্ণতার অভিমুখে গতির ফলে পূর্ণতার প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। কিন্তু ক্রমোন্নতিবাদে ত তাহা স্বীকার করা হয় না। তাহাদের মতে এই ক্রমশঃ উন্নতি—অনন্ত, এবং যথার্থ পূর্ণতা বা পূর্ণতমতা কখনই আমরা প্রাপ্ত হইব না—ইহাই স্বীকার করা হয়। অতএব অনন্ত ক্রমোন্নতিবাদ বা অনন্ত পূর্ণতাপ্রাপ্তিবাদই একান্ত অসঙ্গতবাদ। ইহা আদতেই উন্নতি নহে, ইহা কখনই যথার্থ পূর্ণতার অভিমুখে গতি নহে, প্রত্যুত ইহা পরিবর্ত্তনমাত্র এবং ইহা অপূর্ণতারই অভিমুখে গতিমাত্র।

পূর্ণতার প্রাপ্তিতেই সুখ।

যদি বলা যায়—মানব অনন্ত সুখসম্ভোগই চাহে, ইহা মানবের প্রকৃতিগত সংস্কার। সুতরাং অনন্ত সুখসম্ভোগের অনুরোধে অনন্ত উন্নতিই স্বীকার্য্য, অর্থাৎ পূর্ণতার অভিমুখে অনন্ত গতিই অঙ্গীকরণীয়। অনন্ত উন্নতি না হইলে অনন্ত সুখসম্ভোগ সম্ভাবিত হয় না। উন্নতির শেষ হইয়া গেলে সুখেরও শেষ হইয়া গেল। অনন্ত সুখ আর হইল না। অতএব মানবপ্রকৃতি অনুসারে এবং অনন্ত সুখসম্ভোগের অনুরোধে অনন্ত উন্নতি, অর্থাৎ পূর্ণতার অভিমুখে অনন্তগতিই অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহা হইলে বলিব—মানব অনন্ত সুখ চাহে—ইহা সত্য বটে। কিন্তু এই অনন্ত শব্দের অর্থ কি, তাহা একবার দেখা উচিত কি নহে? অনন্ত শব্দের অর্থ—যাহার অন্ত নাই, বা যাহার বিচ্ছেদ নাই। অর্থাৎ

যাহার দেশ, কাল ও বস্তু কোনরূপ অভাব নাই, তাহাই অনন্ত। এখন এই সুখ যদি অনন্ত হয়, তবে যাহাকে পাইয়া অনন্ত সুখ হয়, তাহাও অনন্ত হওয়া আবশ্যক হয়। অর্থাৎ তাহার যদি অন্ত না থাকে—তাহার যদি অভাব না থাকে, অর্থাৎ তাহা যদি দেশ, কাল ও বস্তুতঃ পূর্ণ বস্তু হয়, তবে তাহাকে পাইয়া যে সুখ হয়, সেই সুখও অনন্ত হইতে পারে, নচেৎ নহে। পরিচ্ছিন্ন সুতরাং জন্মনাশশীল ও সংখ্যায় অনন্ত বস্তুলাভেও অনন্তসুখ হইতেই পারে না। সুতরাং পূর্ণতার অভিমুখে অনন্ত গতিতে বা অনন্ত উন্নতিতে অনন্ত সুখ—এই কথাই সিদ্ধ হইতেছে না। প্রত্যুত ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে পূর্ণতাপ্রাপ্তিতেই অনন্ত সুখ, উন্নতির শেষেই অনন্ত সুখ। উন্নতির পথে কখন সুখ অনন্ত হয় না।

পরিচ্ছিন্নে সুখ নাই।

যদি বলা হয়, জন্মনাশশীল পরিচ্ছিন্ন অসংখ্য অভীষ্ট বস্তুলাভেও কেন সুখ অনন্ত: হইবে না? ধন পরিচ্ছিন্ন ও জন্মনাশশীল বটে, কিন্তু ইচ্ছামত ধনৈশ্বর্য্য ক্রমাগত অনন্তকাল ধরিয়া পাইলে কেন তাহাতে অনন্ত সুখ হইবে না? তাহা হইলে বলিব—পূর্ব্বধননাশজন্য দুঃখ তাহার হইবেই হইবে। তাহার পর, যতই লাভ হইবে, ততই লাভের আকাঙ্ক্ষাবশতঃ দুঃখবোধও থাকিবে। কারণ, অনন্ত বস্তুর লাভ একাধিকবার সম্ভব হয় না। সুতরাং ইচ্ছামত ধনৈশ্বর্য্য অনন্তকাল ধরিয়া পাইলেও অনন্ত সুখ সম্ভবপর হয় না, যেহেতু তাহার নাশ ও তাহার আকাঙ্ক্ষাবশতঃ তাহাতে দুঃখও দূর হয় না। আর দুঃখ থাকিলেই সুখের অন্ত থাকে। অতএব জন্মনাশশীল পরিচ্ছিন্ন অসংখ্য বস্তুলাভেও সুখ অনন্ত হয়—ইহাও বলা যায় না।

সুখভোগ স্বীকারে অনন্ত সুখলাভ হয় না।

যদি বলা হয়—সুখভোগে ভোক্তৃভোগ্যভাবরূপ দ্বৈতভাব অবশ্যম্ভাবী। এই দ্বৈতভাব না থাকিলে-অর্থাৎ পূর্ণ অদ্বৈতভাব হইলে

সুখভোগই সম্ভবপর হয় না। অতএব সর্ব্ববিধ অভাবশূন্য পূর্ণতার লাভ হইলে সুখভোগই সম্ভবপর হয় না। এজন্য পূর্ণতার লাভ অভীষ্ট নহে, কিন্তু পূর্ণতার অভিমুখে গতিই অভীষ্ট। তাহা হইলে বলিব— পূর্ণতার অভিমুখে গতিতে অপূর্ণতাই স্বীকার্য্য হয়, আর অপূর্ণতা হইলে অভাব থাকে, আর তজ্জন্য দুঃখ অবশ্যম্ভাবী হয়। দুঃখ কখন জীবের অভীষ্ট হইতে পারে না। বস্তুতঃ সর্ব্ববিধ অভাবশূন্য হওয়াই সুখ, সেই সুখের অনুরোধে যদি ভোক্তৃভোগ্যভাব না থাকে, তাহা হইলে তাহাও অভীষ্ট হইবে। যেমন সুষুপ্তিকালের ভোক্তৃভোগ্যভাবশূন্য সুখ সকলেরই অভীষ্ট হইয়া থাকে। আর ভোক্তৃভোগ্যভাব না থাকিলে যে সব শূন্য হইয়া যায়, অর্থাৎ "কিছু নাই" ভাব হয়, তাহা ত নহে। এরূপ ভাব ত স্বীকার করা হয় না। পূর্ণতার প্রাপ্তি ঘটিলে ত একটা ভাবরূপ অদ্বৈতবস্তুই থাকে—এরূপ বুঝায়, সুতরাং সুখভোগ না হইলে যে অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না, তাহা ত বলা যায় না। কারণ, সুখভোগ না হইয়া অভাবশূন্যভাব হইলেও ত সুখ হয়। এই সুখ ভোক্তৃভোগ্যভাব থাকে না বলিয়া অসুখ বলা যায় না। অতএব ইহাও সুখ, ইহাও অভীষ্ট বলিতে হইবে।

সুখ অপেক্ষা দুঃখনিবৃত্তি অভীষ্ট।

তাহার পর লোকে কি চায়—যদি দেখা যায়, তাহা হইলে, বুঝা যায়, লোকে দুঃখনিবৃত্তি ও সুখ দুইটীই চায়। কিন্তু যদি সুখভোগেও অভাব থাকায় দুঃখ অনিবার্য্য হয়, আর তজ্জন্য এই দুইটীর মধ্যে একটী নির্ব্বাচন করিতে বলা হয়, তাহা হইলে দুঃখনিবৃত্তিই প্রার্থনীয় হয়। দুঃখনিবৃত্তি না হইয়া সুখ—লোকে চাহে না। সাধারণ লোকের মধ্যে কেহ কেহ চাহিলেও যখনই সে একটু পর্য্যালোচনা করিয়া দেখে, তখন সেই ব্যক্তিই আর দুঃখমিশ্রিত সুখ চাহে না, কিন্তু দুঃখনিবৃত্তিই তখন চাহিয়া থাকে। কারণ, অত্যধিক সুখী ব্যক্তির অত্যল্প দুঃখও

মহাদুঃখ বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহাই মনুষ্যের স্বভাব। অতএব অনন্তসুখ, অপূর্ণ অবস্থায় সুখভোগে হয় না, কিন্তু পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া সুখস্বরূপতা বা অভাবশূন্যতা অবস্থায় অর্থাৎ সম্পূর্ণ অদ্বৈত অবস্থাতেই তাহা সম্ভব। সুতরাং সুখভোগের প্রবৃত্তিচরিতার্থতার অনুরোধে ভেদাভেদবাদ সিদ্ধ হয় না।

পূর্ণতার অভিমুখে গতি অসম্ভব।

তাহার পর পূর্ণতা অভিমুখে গতিই সম্ভবপর হয় না। কারণ, যাহার গতি হইবে, তাহা পূর্ণ হইতে পৃথক্ হওয়ায় পূর্ণ আর পূর্ণপদবাচ্যই হইল না। দুইটী বস্তু স্বীকারে একটীও পূর্ণ হয় না। অতএব উন্নতির অনুরোধে পূর্ণতা অভিমুখে গতিই অসম্ভব হয়। আর তাহার ফলে ভেদাভেদবাদই অসিদ্ধ হয়।

প্রবৃত্তিসিদ্ধবস্তু অপেক্ষা যুক্তিসিদ্ধবস্তুই গ্রাহ্য।

যদি বলা হয়—মানুষ চাহে অনন্ত উন্নতি, অনন্ত সুখভোগ। পূর্ণতার অনুরোধে সুখভোগবিসর্জন করিতে চাহে না। এজন্য বস্তুগতির অনুসরণ করিয়া যুক্তির দ্বারা তাহাকে অসম্ভব প্রমাণ করা সঙ্গত হয় না। অতএব অনন্ত উন্নতির অনুরোধে ভেদাভেদবাদই স্বীকার্য্য। তাহা হইলে বলিব—মানবের আকাঙ্ক্ষানুরূপই যে বস্তুও থাকিবে—এমন ত কোন নিয়ম নাই। সুতরাং মানব অসম্ভব বস্তু চাহিলে তাহা পাইবে কেন? বস্তুতঃ মানব যুক্তির দ্বারা প্রবৃত্তির সংযমই করিয়া থাকে। লোকমুখে শুনিয়া কোন বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু কল্পনা করিলে সেই বস্তু দর্শন করিয়া নিজ কল্পনার ভ্রম সংশোধন করিয়াই লয়। যেমন কাশী সম্বন্ধে লোকমুখে শুনিয়া লোকে যেরূপ ধারণা করে, তাহা কাশী যাইয়া যখন অন্যথা দর্শন করে, তখন তাহার সেই ধারণার সংশোধনই সেই ব্যক্তি করিয়া থাকে এবং শ্রুতবিষয়ক জ্ঞান হইতে যে দৃষ্টবিষয়ক জ্ঞান পৃথক্ ও যথার্থ হয়, তাহাও লোকে বুঝিয়াই

থাকে। অতএব প্রমাণসিদ্ধই বস্তুই স্বীকার্য্য, প্রবৃত্তির অনুরূপ বস্তু স্বীকার্য্য হয় না। আর তাহা হইলে ভেদাভেদবাদমূলক অনন্ত উন্নতিবাদ যুক্তিসহ হয় না।

অনন্ত উন্নতিতে দুঃখের মাত্রা অল্পও হয় না।

যদি বলা যায়—অনন্ত উন্নতির ফলে সুখের মাত্রা বর্দ্ধিত হইতে থাকে, আর দুঃখের মাত্রা কমিতে থাকে, তবে দুঃখ একেবারে যায় না। অতএব পূর্ণতার অভিমুখে গতি সম্ভব হইবে না কেন? তাহা হইলে বলিব—দুঃখ ও সুখ যদি নিত্য বিজড়িত হয়, দুঃখশূন্য সুখ যদি অসম্ভব হয়, তবে দুঃখ কমিবে—এরূপ কল্পনাই করা যায় না। দুঃখের অল্পতা কল্পনা করিলে সুখের দুঃখশূন্যতাই প্রকারান্তরে স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ একটুও কমিলে একদিনে কিছুই থাকিবে না—ইহাই স্বীকার করা হয়। সুতরাং এ পথেও ভেদাভেদবাদমূলক অনন্ত উন্নতিবাদ সিদ্ধ হয় না।

জলপূর্ণপাত্রের দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ।

যদি বলা হয়—বৃহৎ জলপূর্ণপাত্রে সচ্ছিদ্র ক্ষুদ্রজলপূর্ণপাত্রের দৃষ্টান্তানুসারে জীবের পূর্ণতার প্রতি গতি ত অসঙ্গত হয় না। কারণ, ক্ষুদ্র ভাণ্ডের জল বৃহৎপাত্রের জলে পতিত হওয়াই জীবাত্মার বিশ্বাত্মারূপ পূর্ণতার অভিমুখে গতি এবং বৃহৎপাত্রের জল ছিদ্র দিয়া ক্ষুদ্রভাণ্ডে আসাতেই এই গতি অনন্তগতি হইতেছে। আর ইহাই জীবাত্মার ভিতর দিয়া বিশ্বাত্মার নিজ পূর্ণতার অনন্ত আস্বাদগ্রহণ বলা যাইতে পারে। আর ইহাতেই জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদসম্বন্ধই সিদ্ধ হয়, ইত্যাদি। তাহা হইলে বলিব—এ দৃষ্টান্তদ্বারা ভেদাভেদ সিদ্ধ হয় না। কারণ, এখানে ক্ষুদ্রভাণ্ডের জল বৃহৎপাত্রের জলে মিশিয়া যাওয়ায় পূর্ণতার অভিমুখে গতি আর সিদ্ধ হইতেছে না, পরন্তু পূর্ণতার প্রাপ্তিই সিদ্ধ হইতেছে। আর তজ্জন্য ভেদাভেদ সিদ্ধ হয় না, প্রত্যুত অভেদই

সিদ্ধ হয়।, যেহেতু এস্থলে যে ভেদ তাহা কাল্পনিক বা ঔপাধিক ভেদ, বস্তুতঃ ভেদ নহে। ক্ষুদ্র ভাণ্ডের অবয়বটাই সেই উপাধি। সুতরাং এতদ্দ্বারা বাস্তবিক ভেদাভেদ সিদ্ধ হয় না। পরন্তু কাল্পনিক ভেদ। ভেদই সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ বাস্তবিক অভেদই সিদ্ধ হয়। তাহার পর ক্ষুদ্রভাণ্ডারের জল বৃহৎপাত্রে পতিত হইবার হেতুটী কাহার ধর্ম? এই পতনকার্য্যের প্রয়োজনীয়তাই বা কি? প্রয়োজনীয়তা থাকিলে উভয়ই অপূর্ণ। আর স্বাভাবিক হইলেও অপূর্ণই হয়। যেহেতু গতিই অভাবের বোধক। আর পতনের হেতু একের ধর্ম হইলে উভয়েরই ধর্ম্ম হইবে। যেহেতু উভয় জলই বাস্তবিকপক্ষে একই পদার্থ। অতএব এ দৃষ্টান্তের কোন সার্থকতা নাই। ইহাতে অনন্ত উন্নতি বা ভেদাভেদ কিছুই সিদ্ধ হয় না। প্রত্যুত উন্নতির শেষ ও অভেদই সিদ্ধ হয়।

পূর্ণমধ্যে অপূর্ণতা পূর্ণতারই পরিচায়ক সংশয়।

যদি বলা যায়—পূর্ণ বলিলে যেমন অভাবশূন্যতা বুঝায়, তদ্রূপ অভাব থাকাও বুঝায়। কারণ, পূর্ণ হইলে তাহাতে যেমন পূর্ণতা থাকে, তদ্রূপ অপূর্ণতা থাকাও আবশ্যক। যেহেতু তাহা না হইলে অর্থাৎ পূর্ণমধ্যে অপূর্ণতা না থাকিলে, অপূর্ণতা না-থাকা-রূপ অভাবই থাকিল। আর অভাব থাকিলে যাহাতে অভাব থাকে, তাহাকে আর পূর্ণ বলা যায় না। অতএব পূর্ণমধ্যে পূর্ণতা ও অপূর্ণতা উভয়ই থাকা আবশ্যক। আর তাহা হইলে একই বস্তুতে ভেদ ও অভেদ উভয়ই সিদ্ধ হইল। যেহেতু পূর্ণে পূর্ণতা থাকায় একই বস্তু স্বীকার করা হয়, সুতরাং অভেদ সিদ্ধ হয়, এবং পূর্ণে অপূর্ণতা থাকায়, অর্থাৎ একাধিক বস্তু থাকায় ভেদও সিদ্ধ হয়। সুতরাং পূর্ণ ব্রহ্মবস্তুমধ্যে অপূর্ণ জীব ও জগৎ থাকায় পূর্ণ ব্রহ্মের পূর্ণত্ব সিদ্ধ হয়, নচেৎ জীব ও জগৎশূন্য ব্রহ্ম অপূর্ণই হয়। তদ্রূপ অপূর্ণ জীব ও জগৎ পূর্ণ ব্রহ্মমধ্যে থাকায় অপূর্ণ

জীব ও জগৎ পূর্ণই হয়। যেহেতু যে যাহার মধ্যে থাকে, তাহাকে এক দৃষ্টিতে তদ্বস্তু, এবং অন্য দৃষ্টিতে তদ্ভিন্নও বলা হয়। সুতরাং ব্রহ্ম নিজরূপে পূর্ণ এবং ব্রহ্মমধ্যে জীব ও জগৎ থাকায় ব্রহ্মও জীব ও জগৎ রূপে অপূর্ণ, এবং জীব ও জগৎ নিজরূপে অপূর্ণ এবং ব্রহ্মমধ্যে থাকায় ব্রহ্মরূপে পূর্ণ। আর এইরূপ হওয়ায় পূর্ণের সহিত অপূর্ণের ভেদাভেদ সম্বন্ধই সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ জীবে জীবে ভেদাভেদ, জীব ও ব্রহ্মে ভেদাভেদ; জগৎ ও ব্রহ্মে ভেদাভেদ, জীব ও জগতে ভেদাভেদ, ইত্যাদি সিদ্ধ হয়। আর ইহার ফলে জীবের পূর্ণতাভিমুখে গতি, পূর্ণ হইতে পূর্ণতরতা-প্রাপ্তি, অনন্ত উন্নতি, অনন্তসুখভোগবাসনা এবং তাহার পরিপূর্তি সবই সম্ভবপর হয়। অতএব পূর্ণ বলিলে তাহাতে যেমন পূর্ণতা থাকে, তদ্রূপ অপূর্ণতাও স্বীকার্য। পূর্ণে পূর্ণতার সঙ্গে অপূর্ণতা না থাকিলে পূর্ণকে পূর্ণ বলাই যায় না।

পূর্ণমধ্যে অপূর্ণতা পূর্ণতার পরিপোষক নহে—সিদ্ধান্ত।

এরূপ বলিলে বলিতে হইবে—এরূপ কল্পনা নিতান্ত অসঙ্গত। পূর্ণে পূর্ণতার সহিত অপূর্ণতা স্বীকার করা কখনই সঙ্গত হয় না। কারণ, পূর্ণতা যদি অপূর্ণতার বিরোধী হয়, এবং অপূর্ণতা যদি পূর্ণতার বিরোধী হয়, তাহা হইলে এই পরস্পরবিরুদ্ধ পূর্ণতা ও অপূর্ণতা একত্র থাকিতে পারে না। কারণ, অপূর্ণতা না থাকাই পূর্ণতা, অর্থাৎ অপূর্ণতার অভাবই পূর্ণতা এবং পূর্ণতার অভাবই অপূর্ণতা। যেমন ঘট যেখানে থাকে, সেখানে "ঘট নাই", আর বলা যায় না। এস্থলেও তদ্রূপ হইয়া থাকে। অতএব যে অপূর্ণতার অভাবদ্বারা পূর্ণতা সিদ্ধ হয়, সেই পূর্ণতার সঙ্গে অপূর্ণতা স্বীকার করা কখনই সঙ্গত হয় না। পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম একটী ধর্মীতে স্বীকার করা, আর তদ্বিষয় কিছুই না বলা—একই কথা। যেমন কোন বিষয়ে আমরা যদি একবার "হাঁ" বলিয়া পরক্ষণে "না" বলি, তাহা হইলে যেমন তদ্বিষয়ে কিছুই বলা

অভিন্নও বটে। অতএব পূর্ণতাভিমুখে গতি ও অনন্তসুখাদি সবই সম্ভব হইবে না কেন? জীব ও জগৎ ব্রহ্মরূপে ব্রহ্মের সহিত এবং পরস্পরে অভিন্ন এবং নিজনিজরূপে ব্রহ্ম ও জীব জগতের সহিত ভিন্ন। তদ্রূপ ব্রহ্মও নিজরূপে জীব জগৎ ও ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন এবং জীব ও জগৎ-রূপে বিভিন্ন হইয়া থাকে। অতএব পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্ম একত্র থাকে—ইহাই সিদ্ধ হইয়াছে।

ভেদবাদিকর্ত্তৃক উক্ত মতবাদের খণ্ডন।

এতদুত্তরে ভেদবাদী বলেন—ভেদাভেদবাদী যে ঘটশরাব ও মৃত্তিকার দৃষ্টান্তদ্বারা একই বস্তুতে পরস্পরবিরোধী ভেদ ও অভেদ প্রদর্শন করেন, তাহা অসঙ্গত। কারণ, একই মৃত্তিকাখণ্ড এককালে ঘটাকার ও অন্যকালে শরাবাকার হওয়ায় সেই মৃত্তিকাতে মৃত্তিকারূপে মৃত্তিকার অভেদ থাকিলেও ঘট ও শরাবের মধ্যে যে পরস্পরের ভেদ, তাহা সেই মৃত্তিকারূপী মৃত্তিকাতে থাকে না, কিন্তু ঘটশরাবরূপী মৃত্তিকাতে থাকে, অর্থাৎ ঘটরূপবিশিষ্ট মৃত্তিকার ভেদ শরাবরূপবিশিষ্ট মৃত্তিকাতে থাকে এবং শরাবরূপবিশিষ্ট মৃত্তিকার ভেদ ঘটরূপবিশিষ্ট মৃত্তিকাতে থাকে। মৃত্তিকারূপী মৃত্তিকা ও ঘটশরাবরূপী মৃত্তিকা এক বস্তু নহে। মৃত্তিকারূপী মৃত্তিকা ঘটশরাবরূপী মৃত্তিকার মধ্যে থাকিলেও অর্থাৎ মৃন্ময় ঘটশরাবে থাকিলেও উভয়ের মধ্যে ভেদ আছে। বিশিষ্টের সহিত সামান্যের যে ভেদ, তাহা এখানে থাকেই, যেমন নীলরূপবিশিষ্ট ঘটের সহিত ঘটত্ববিশিষ্ট ঘটের ভেদ থাকে, অথবা "ক" যুক্ত "খ" যেমন "ক" হইতে ভিন্ন হয়, এস্থলেও তদ্রূপ হয়। এস্থলে ঘটশরাবরূপী মৃত্তিকা ঘটশরাবেই থাকে, আর মৃত্তিকারূপী মৃত্তিকা ঘট শরাব, পিণ্ড ক্ষেত্র সর্ব্বত্রই থাকে। ইহা যেন আকারনিরপেক্ষ মৃত্তিকা। একই কালে একই মৃত্তিকাখণ্ড ঘটশরাবপিণ্ডক্ষেত্রাদির আকার গ্রহণ করে না বলিয়া ঘটাদি-আকারবিশিষ্ট মৃত্তিকা, মৃত্তিকাত্ববিশিষ্ট মৃত্তিকা হইতে

ভিন্নই হয়। অতএব ঘটশরাবাদির মৃত্তিকামধ্যে যে অভেদ থাকে, তাহা মৃত্তিকারূপী মৃত্তিকাতে থাকে, তাহা ঘটশরাবাদিরূপী মৃত্তিকাতে থাকে না। আর ঘটশরাবাদির ভেদ যে মৃত্তিকাতে থাকে, বলা হয়, তাহা ঘটশরাবরূপী মৃত্তিকাতেই থাকে, তাহা মৃত্তিকারূপী মৃত্তিকাতে থাকে না। অর্থাৎ অভেদ থাকে—মৃত্তিকারূপী মৃত্তিকাতে, আর ভেদ থাকে—ঘটশরাবাদিরূপী মৃত্তিকাতে। একই রূপের মৃত্তিকাতে ভেদ ও অভেদ উভয়ই থাকে না। আর ভিন্নভিন্নরূপী মৃত্তিকা ভিন্নভিন্নরূপী হয় বলিয়া একধর্ম্মীতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মও থাকে না। থাকে—বলিলে একটী ধর্ম্মকেও অন্ততঃপক্ষে মিথ্যা বা ভ্রম বলিতে হয়। অতএব পরস্পরবিরোধী ভেদাভেদবাদই সিদ্ধ হয় না। আর বিভিন্ন ধর্ম্ম-পুরস্কারে একধর্ম্মীতে ভেদাভেদ স্বীকার করিলে ভেদবাদই সিদ্ধ হয়। এইরূপ ভেদাভেদবাদ ভেদবাদেরই নামান্তর।

ভেদাভেদবাদকে ভেদবাদ বলাই সঙ্গত।

যদি বলা হয়—তাহা হইলে ভেদাভেদবাদেরই নামান্তর ভেদবাদ হউক না? ভেদাভেদবাদকে অপ্রধান বলিয়া ভেদবাদকে প্রধান বলিবার অভিপ্রায় কি? তাহা হইলে বলিব—দুইটী বস্তুর মধ্যে ভেদ যতটা স্পষ্ট হয়, অভেদ তত স্পষ্ট হয় না; যেমন দুইটী মৃন্ময় ঘটের মধ্যে ঘটদ্বয়ের ভেদ যত সহজবোধ্য হয়, তাহাদের মৃত্তিকা অনুসারে তাহাদের অভেদ তত সহজবোধ্য হয় না। এই ভেদ একটী বালকেও নিজে নিজে বুঝে, কিন্তু এই অভেদ না শিখাইলে তাহার সহজে বোধগম্য হয় না। এজন্ত এতাদৃশ ভেদাভেদবাদকে প্রসিদ্ধ ভেদবাদ বলাই সঙ্গত।

ভেদঅবিবর্তক ভেদাভেদের খণ্ডন।

এইরূপ ঘট ও শরাবাদি মৃত্তিকারূপে অভিন্ন এবং এবং নিজ নিজ রূপে ভিন্ন বলাও সঙ্গত হয় না, অর্থাৎ পূর্ব্বপ্রদর্শিত মৃত্তিকাতে ঘট-শরাবাদির ভেদাভেদের ন্যায় ঘটশরাবাদিতেই ভেদ ও অভেদ উভয়ই

সিদ্ধ হয় না। মৃত্তিকারূপী ধর্ম্মীতে যেমন ভেদ ও অভেদ উভয়ই সিদ্ধ হয় না—দেখান হইল, তদ্রূপ ঘটশরাবরূপী ধর্ম্মীতেও ভেদ ও অভেদ উভয়েই সিদ্ধ হয় না। কারণ, ঘট ও শরাব নিজনিজ রূপে যে ভিন্ন, তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য, আর তখন ঘটের ভেদ শরাবে থাকে এবং শরাবের ভেদ ঘটে থাকে। কিন্তু ঘট ও শরাবের সহিত মৃত্তিকার ত অভেদ হয় না। যেহেতু ঘট ও শরাবের যে জ্ঞান হয়, তাহাতে ঘটস্বরূপে ঘট ও শরাবস্বরূপে শরাবের জ্ঞান হয়, এবং মৃত্তিকার যে জ্ঞান হয়, তাহাতে মৃত্তিকাস্বরূপে মৃত্তিকার জ্ঞান হয়। সুতরাং ঘটস্বরূপে ঘটজ্ঞানের বিষয় যে ঘট, তাহা মৃত্তিকাস্বরূপে মৃত্তিকাজ্ঞানের বিষয় যে মৃত্তিকা, তাহার সহিত অভিন্ন হয় না। এস্থলে ঘটশরাবজ্ঞানে যদি মৃত্তিকাস্বরূপে মৃত্তিকা বিষয় হয়, এবং মৃত্তিকার জ্ঞানে যদি মৃত্তিকাস্বরূপে মৃত্তিকা বিষয় হয়, তাহা হইলে ঘটশরাবের সহিত মৃত্তিকার অভেদ জ্ঞান হইতে পারিত। তাহা কিন্তু হয় না। অতএব ঘটশরাবাদি মৃত্তিকারূপে অভিন্ন এবং নিজনিজরূপে ভিন্ন বলিয়া ঘট ও শরাবে পরস্পরবিরোধী ভেদ ও অভেদ থাকে—ইহা আর বলা যায় না। সুতরাং পরস্পরবিরোধী ভেদ ও অভেদ একধর্ম্মীতে থাকে না, অর্থাৎ ভেদাভেদবাদ সিদ্ধ হয় না। যাহারা ভেদবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহারাও ঘট ও শরাব নিজনিজরূপে ভিন্ন এবং মৃত্তিকারূপে অভিন্ন ইহা স্বীকারই করেন। অতএব এতাদৃশ মতবাদকে ভেদাভেদবাদ বলিলে এই ভেদাভেদবাদ ভেদবাদেরই নামান্তর হয়। এক ধর্ম্মীতে যদি একইরূপে ভেদ ও অভেদ স্বীকার করা হইত, তবেই ভেদবাদাতিরিক্ত ভেদাভেদবাদ স্বীকারের ফল হইত। অতএব এতাদৃশ ভেদাভেদবাদ ভেদবাদেরই নামান্তর মাত্র।

ভেদাভেদবাদিকৃত খণ্ডন।

ইহার উত্তরে ভেদাভেদবাদী বলেন—ভেদবাদী যে, মৃত্তিকারূপী মৃত্তিকা হইতে ঘটশরাবাদিরূপী মৃত্তিকার ভেদমাত্র স্বীকার করেন,

তাহা অসঙ্গত। উভয় মৃত্তিকামধ্যে অভেদও স্বীকার্য্য। কারণ, মৃত্তিকা কখনই আকার-বিরহিতরূপে থাকে না। মৃত্তিকারূপী মৃত্তিকাতেও কোন না কোন আকারের জ্ঞানও থাকে, এবং সেই মৃত্তিকাতে অন্যরূপ আকার ধারণ করিবার সামর্থ্যই আছে—এই জ্ঞানও থাকে। অতএব মৃত্তিকারূপী মৃত্তিকা আকারনিরপেক্ষ মৃত্তিকা নহে। মৃত্তিকারূপী মৃত্তিকা ও ঘটশরাবাদিরূপী মৃত্তিকার জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মৃত্তিকারূপী মৃত্তিকাতে মৃত্তিকার আকারটী গৌণভাবে এবং অন্য ধর্ম্ম-গুলি মুখ্যভাবে প্রতিভাত হয়, আর ঘটশরাবাদিরূপী মৃত্তিকাতে ঘট-শরাবের আকারটী মুখ্যভাবে এবং অন্য ধর্ম্মগুলি গৌণভাবে প্রতিভাত হয় মাত্র। আকারশূন্য মৃত্তিকার জ্ঞানই হয় না। যাহা পরিচ্ছিন্ন সাকার বস্তু, তাহার কি কখন অপরিচ্ছিন্ন নিরাকার ভাবের জ্ঞান হয়? কখনই হইতে পারে না। অতএব মৃত্তিকারবিশিষ্ট মৃত্তিকাতে আর ঘটশরাবাদিরূপবিশিষ্ট মৃত্তিকাতে অভেদও আছে এবং ভেদও আছে। এজন্য একই মৃত্তিকাখণ্ডে ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে। অর্থাৎ এক ধর্ম্মীতে একইরূপে পরস্পরবিরুদ্ধ ভেদাভেদই থাকে।

ভেদবাদিকর্তৃক খণ্ডন।

এতদুত্তরে ভেদবাদী বলেন—ভেদাভেদবাদী যখন গৌণমুখ্যভাব স্বীকার করিলেন, তখনই ত এক ধর্ম্মীতে একইরূপে ভেদাভেদ স্বীকার হইল না। গৌণমুখ্যভাব স্বীকার করায় বিভিন্ন ধর্ম্মই স্বীকার করা হইল। যেহেতু গৌণঘটশরাবস্বরূপ এবং মুখ্যমৃত্তিকাস্বরূপ—এই ধর্ম্মদ্বয় আর মুখ্যঘটশরাবস্বরূপ এবং গৌণমৃত্তিকাস্বরূপ—এই ধর্ম্মদ্বয় ঠিক একই ধর্ম্ম হয় না। যেমন গৌণ "ক"যুক্ত মুখ্য "খ" এবং মুখ্য "ক"যুক্ত গৌণ "খ" কখন অভিন্ন হয় না—এস্থলেও তদ্রূপই হইবে। অতএব ঘটশরাব-রূপী মৃত্তিকা ও মৃত্তিকারূপী মৃত্তিকা কখন অভিন্ন হয় না। অর্থাৎ একই মৃত্তিকাতে ভেদ ও অভেদ উভয়ই থাকে না। এক ধর্ম্মীতে একই

ধর্ম্মরূপে ভেদ ও অভেদ স্বীকার করিলে পরস্পর ব্যাঘাত হয়, আর ইহা যদি স্বীকার না করিতে পারা যায়, তাহা হইলে এতাদৃশ ভেদাভেদবাদ ভেদবাদেরই নামান্তর মাত্র হয়।

ভেদাভেদবাদিকর্তৃক খণ্ডন।

এতদুত্তরে ভেদাভেদবাদী বলেন যে, একই ধর্ম্মীতে যখন ভিন্ন ধর্ম্ম-পুরস্কারেরও ভেদ ও অভেদ থাকে এবং সেই ভেদাভেদ পরস্পরবিরুদ্ধও বটে, তখন বস্তুর স্বরূপনির্ণয়কালে কেবল ভেদ স্বীকার করিলে চলিবে কেন? কেবল ভেদ বলিলে এক ধর্ম্মের দ্বারা তাহার পরিচয় দেওয়া হয়, যে ধর্ম্মে অভেদ আছে তাহার ত পরিচয় দেওয়া হয় না। ভেদাভেদ বলিলে তাহা বলা হয়। অতএব সকল ধর্ম্মীতেই এই ভেদাভেদ বর্ত্তমান —ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

ভেদবাদিকর্তৃক খণ্ডন।

ইহাতে ভেদবাদী বলেন যে, এস্থলেও ভেদই প্রধানভাবে লক্ষিত হয়, অভেদজ্ঞান বিচারসাপেক্ষ। অতএব যাহা প্রধানভাবে লক্ষিত হয়, তাহারই দ্বারা মতবাদের নামকরণ করাই উচিত। বিচারসাপেক্ষ অভেদজ্ঞান পরে স্বতঃই উদিত হইবে। আর ভিন্ন ধর্ম্মে ভেদাভেদ স্বীকারে আমাদের কোন আপত্তিও নাই। আমরা ত একই ধর্ম্মে ভেদাভেদ স্বীকারে আপত্তি করিয়া থাকি। ভেদাভেদবাদী যদি একই ধর্ম্মে ভেদাভেদপক্ষ পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে এতক্ষণ যে অর্থে ভেদাভেদ অসিদ্ধ হয়, আমরা বলিয়া আসিতেছিলাম, সেই অর্থে ভেদাভেদ অসিদ্ধই থাকিল। অর্থাৎ ভেদাভেদবাদীর পূর্ব্বোক্ত মত অসিদ্ধই রহিল।

স্বর্ণ প্রভৃতি দৃষ্টান্তদ্বারা ভেদাভেদস্থাপন চেষ্টা।

যদি বলা যায়—মৃত্তিকা ও ঘটশরাবাদির দৃষ্টান্তে ভেদাভেদ সিদ্ধ না হইলেও অংশের সহিত অংশীর, গুণের সহিত গুণীর, জাতির সহিত

ব্যক্তির ও ক্রিয়ার সহিত ক্রিয়াবানের ভেদাভেদ সম্বন্ধ সিদ্ধ হইয়া থাকে। যেমন শাখার সহিত বৃক্ষের, নীলগুণের সহিত নীলদ্রব্যের, মনুষ্যের সহিত মনুষ্যত্বের, রূপের সহিত রূপবত্ত্বের, গমনক্রিয়ার সহিত গমনকর্ত্তার যে সম্বন্ধ, তাহাকে ভেদ ও অভেদ উভয়ই বলা যায়। কারণ, নীল বলিলে নীল বর্ণরূপ গুণকেও যেমন বুঝায়, তদ্রূপ নীলবর্ণযুক্ত নীল-দ্রব্যকেও বুঝায়। বৃক্ষশাখাকে যেমন শাখাও বলা যায়, তদ্রূপ বৃক্ষও বলা যায়। এই সকল স্থলে নীল ও নীলদ্রব্যের মধ্যে, শাখা ও বৃক্ষের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয় স্বীকার্য্য হয়। সুতরাং জীব ও জগৎকে ব্রহ্মের শরীর বা অঙ্গ বলিয়া অথবা গুণ বলিয়া কিংবা ক্রিয়া বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের ভেদাভেদ সম্বন্ধ সিদ্ধ করিতে পারা যাইবে।

ভেদবাদিকর্ত্তৃক খণ্ডন।

এতদুত্তরে ভেদবাদী বলেন—এই সকল স্থলেও অর্থাৎ অংশে অংশীর, গুণে গুণীর, ব্যক্তিতে জাতিরও ভেদই সিদ্ধ হয়, ভেদাভেদ সিদ্ধ হয় না। এই সকল স্থলেও অভেদ জ্ঞানটী মৃত্তিকা ও ঘটাদির মধ্যে অভেদ জ্ঞানের ন্যায় ভ্রমবিশেষ বা ব্যবহার মাত্র। কারণ, দৃষ্টান্তস্বরূপে যদি গুণ ও গুণীর মধ্যবর্ত্তী সম্বন্ধটী বিচার করিবার জন্য "নীল-উৎপলকে" গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে—নীল গুণের সহিত উৎপল-দ্রব্যের ভেদসম্বন্ধই ঠিক, ভেদাভেদ সম্বন্ধটী ঠিক নহে। ইহার কারণ, নীলগুণ বলিতে যাহা যাহা বুঝায়, উৎপল বলিতে ঠিক সেই সকলই বুঝায় না। আবার উৎপল বলিতে যাহা যাহা বুঝায়, নীল বলিতেও তাহা ঠিক ঠিক বুঝায় না। যেহেতু নীল বলিলে কোন দ্রব্যের আশ্রিত ধর্ম্মবিশেষ বুঝায় এবং সেই দ্রব্যটী আকাশ, বস্ত্র, উৎপল প্রভৃতি নানাবিধই হয়—ইহাও সঙ্গে সঙ্গেই বুঝায়, আর উৎপল বলিলে নীল রক্ত ও শ্বেতাদি নানাগুণের আশ্রয় এবং উহা একটী পুষ্প-

বিশেষ ইহাও বুঝায়। সুতরাং নীল ও উৎপল সম্পূর্ণরূপে সমানার্থক নহে। আর সম্পূর্ণরূপে সমানার্থক না হওয়ায় উহারা অভিন্নও হয় না। নীল ও উৎপল অভিন্ন হইতে গেলে উহাদের সম্পূর্ণরূপে সমানার্থক হওয়া আবশ্যক। কিয়দংশে সমানার্থক হইলে তাহাদিগকে অভিন্ন বলা যায় না। অতএব নীল উৎপলাদিস্থলে ভেদই সিদ্ধ হয়, অভেদ সিদ্ধ হয় না। এ অবস্থায় নীলোৎপলে অভেদ বলা ভ্রম ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

ভেদাভেদবাদিকর্তৃক খণ্ডন।

ইহাতে ভেদাভেদবাদী বলেন—নীল ও উৎপল কিয়দংশে সমানার্থক এবং কিয়দংশে অসমানার্থক হওয়াতেই ইহাদিগকে ভিন্নাভিন্ন বলা হয়। অতএব নীলোৎপলমধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধটী ভেদসম্বন্ধ কেন হইবে? বরং এইরূপ বলাই ঠিক, ভিন্ন বলাই ভ্রম। নীলোৎপলকে লক্ষ্য করিয়া নীল বলিলে যখন উৎপলই বুঝায় এবং উৎপল বলিলে যখন নীলবর্ণ বুঝায়, তখন নীল ও উৎপলের মধ্যে ভেদ সত্ত্বেও অভেদ সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার্য্য। অতএব ভেদাভেদবাদই বস্তুর স্বরূপকীর্ত্তনে যথার্থ উপযোগী।

ভেদবাদিকর্তৃক খণ্ডন।

এতদুত্তরে ভেদবাদী বলেন যে, নীলোৎপলের নীলবর্ণ যখন উৎপলের ন্যায় স্থায়ী হয় না, তখন নীলবর্ণ ও উৎপল যে ভিন্ন বস্তু, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এ অবস্থায় নীল বলিতে ঠিক্ উৎপল বুঝা ভ্রম ভিন্ন আর কি হইতে পারে? নীল যখন অন্যত্রও থাকে এবং উৎপলও যখন অন্য বর্ণও হয়, এবং একই উৎপল যখন নীলবর্ণহীন হইলেও উৎপল নামে অভিহিত হইতে পারে, তখন ইহাদিগকে অভিন্ন বলা নিশ্চয়ই ভ্রম হইবে। আর যদি বলা যায়—যে "নীল" উৎপলে আছে, আর যে উৎপলটী নীল, সেই নীল ও সেই উৎপল অভিন্ন, তাহা হইলে বলিব—"নীল" ও "উৎপলের নীল" ঠিক্ একবস্তু নহে, এবং "উৎপল"

তাহার ফলে দেখা যাইবে যে, জগতে সর্ব্বত্র ভেদাভেদ সম্বন্ধই বিদ্যমান। কারণ, জ্ঞেয় বস্তুটী জ্ঞানেরই রূপান্তর, অর্থাৎ জ্ঞানবস্তুটী নিয়ত জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপে অভিব্যক্ত হইতেছে। যেমন, আমি যখন ঘটকে জানি, তখন আমি আমার ঘটাকার অন্তঃকরণবৃত্তিকেই জানি, ঠিক্ ঠিক্ কেবল ঘটকে জানি না। কারণ, কোনরূপ দোষবশতঃ অন্তঃকরণটী ঘট দেখিয়া ঘটাকার ধারণ না করিলে আর আমাদের ঘটজ্ঞান হয় না। আর আমি যখনই ঘটের জ্ঞান করি, তখনও আমি যে জ্ঞাতা, তাহাও জ্ঞান করি না, এবং আমার যে ঘটজ্ঞান হইয়াছে, তাহাও জ্ঞান করি না, কিন্তু "ইহা ঘট" এই জ্ঞানের পরক্ষণেই সেই জ্ঞানটী হয়, অর্থাৎ "আমি ঘটকে জানিতেছি" এইরূপ একটী জ্ঞান হয়। প্রথম জ্ঞানে 'ঘট, বিষয় হয়, আর দ্বিতীয় জ্ঞানে 'ঘট, ঘটজ্ঞান ও আমি'—এই তিনটীই বিষয় হয়। শাস্ত্রে এই প্রথম জ্ঞানের নাম "ব্যবসায়াত্মক জ্ঞান" এবং দ্বিতীয় জ্ঞানের নাম "অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞান" বলা হয়। আর সকল-জ্ঞানেই এইরূপ দুইটী ক্ষণের দুইটী জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। ইহা জ্ঞানেরই স্বভাব। তাহার পর আরও দেখা যায়, উক্ত দ্বিতীয় জ্ঞানের সময় প্রথম জ্ঞানটী এবং প্রথম জ্ঞানের জ্ঞাতা আমিও দ্বিতীয় জ্ঞানের বিষয় হয় বলিয়া জড়রূপই হয়, অর্থাৎ যেমন "আমি ভিন্ন" বলিয়া বিষয় জড়রূপই হয়, তদ্রূপ সেই প্রথম জ্ঞানটী ও প্রথম জ্ঞানের জ্ঞাতটী দ্বিতীয় জ্ঞানের জ্ঞাতৃরূপ আমি ভিন্ন হইয়া জড়মধ্যে পরিগণিত হয়। আর যতক্ষণ প্রথম জ্ঞানের জ্ঞাতা এবং প্রথম জ্ঞানটী দ্বিতীয় জ্ঞানের বিষয় না হয়, ততক্ষণ দ্বিতীয় জ্ঞানের জ্ঞাতা 'আমি' হইতেও উহা পৃথক্ বলিয়া বোধ হয় না। আর এই যে, আমি বস্তুটী, এটী একটী "আমি আমাকে জানি" এইরূপ একটী ভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব দেখা যাইতেছে—দ্বিতীয় জ্ঞানের জ্ঞাতা উক্ত জ্ঞানময় অনভিব্যক্ত "আমি ভাব" হইতে "প্রথম জ্ঞানের জ্ঞাতা আমি" "প্রথম জ্ঞান" এবং সেই

প্রথম জ্ঞানের বিষয় জড়বস্তুটীর অভিব্যক্তি হইতেছে। অর্থাৎ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, বা চেতন ও জড়, বা বিষয় ও বিষয়ী—এই উভয়ই একটী জ্ঞানময় আমিভাব হইতে অনবরত বিনির্গত বা অভিব্যক্ত হইতেছে। তাহার আর ক্ষয় হইতেছে না। আমি-জ্ঞানটী অনবরতই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় হইতেছে। আর সকল জ্ঞানের বা সকল বিষয়ের ইহাই মূলতত্ত্ব বলিয়া বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধই বিরাজমান। বস্তুতঃ আমির বিষয় আমি হয় বলিয়া, আমির মধ্যেই ভেদাভেদ অবশ্যই বিদ্যমান। অতএব ভেদাভেদবাদই সঙ্গত মতবাদ। এই মতবাদিগণ এই মতবাদটী বিশেষভাবে আজকাল প্রচার করিয়া অনন্তক্রমোন্নতিবাদেরই সমর্থন করেন এবং অদ্বৈতবাদের খণ্ডন করেন।

উক্ত ভেদাভেদবাদ খণ্ডন।

কিন্তু এই মতবাদটীও যুক্তিসহ নহে। কারণ, জ্ঞানের এইরূপ যে বিষয়বিষয়িভাবাতিরিক্ত প্রকৃতিনির্দ্ধারণ, ইহাও বহির্জ্জগতের প্রকৃতির অনুসরণ করিয়াই করা হইয়া থাকে। আর এইরূপ নির্দ্ধারণকর্ত্তা যে নিয়ত একরূপ, তাহাও স্বীকৃত হইয়া থাকে। বহির্জ্জগতে অভিব্যক্তি-ব্যাপারের জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া সেই অভিব্যক্তিব্যাপারটী অন্তর্জ্জগতে প্রয়োগ করিয়া উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া হইয়াছে। আর বহির্জ্জগতের নিয়ম প্রয়োগ করিয়াও তাহারই আবার বিপরীত পথে সিদ্ধান্ত করাও হইয়া থাকে। যেহেতু বহির্জ্জগতে যাহা হইতে কোন কিছু অভিব্যক্ত হয়, তাহা, অভিব্যক্তি সত্য হইলে বিকৃত হইতে বাধ্য—এই নিয়মটী দৃষ্ট হয়। কিন্তু উক্ত মূল জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে সে নিয়মের অস্বীকার করা হইতেছে। "আমি আমাকে জানিতেছি" এইরূপ একটী জ্ঞানবস্তু হইতে নিয়ত জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ভাব সত্যসত্যই অভিব্যক্ত হইতেছে, অথচ মূলভাবটীর পরিবর্ত্তন হইতেছে না—ইহা অসঙ্গত কল্পনা। কারণটী অবিকৃত থাকিয়া কার্য্য উৎপন্ন হইলে উৎপত্তিই বাস্তব হয় না।

কি অন্তর্জগৎ, কি বহির্জগৎ উভয় জগতেই ইহা প্রযোজ্য। অতএব এই মতবাদটী যুক্তিসহ নহে।

তাহার পর 'আমি আমাকে জানিতেছি' এই ভাবটী মূলতত্ত্বই নহে। কারণ, আমি আমাকে যখন জানি, তখন উভয় আমি পৃথক্ হইয়া যায়, এজন্য আমি আমাকে ঠিক্‌ঠিক্ জানিতেই পারে না। এস্থলে "কর্ম্মভূত আমি" "কেবল আমি" থাকে না। আমি আমাকে জানিবার কালে দেশ ও কালের সম্বন্ধ আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং "কেবল আমি" জ্ঞেয়ও হয় না। সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্ত "কেবল আমি" কেবল আমিকে জানিতেই পারে না। জানিতে গেলেই উপাধিবিশিষ্ট হয়। অর্থাৎ আমিকে জানিতে গেলেই আমি আর ঠিক্ সেই আমি থাকে না। বস্তুতঃ, আমিকে জানিতে গেলে দুইটী আমিবস্তুই হারাইয়া যায়—ইহাই অনুভব হয়। চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকিলে কখন জ্ঞাতৃভাব, কখন জ্ঞেয়ভাব প্রবল হয় মাত্র, আমিকে ঠিক জানা হয় না।

তাহার পর এই দ্বিতীয় জ্ঞানের কর্ম্মভূত আমি, আমি-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হয়। ঘটজ্ঞান যেমন ক্ষণস্থায়ী, এই আমি জ্ঞানও তদ্রূপ ক্ষণস্থায়ী। অন্য জ্ঞানোদয়ে যেমন ঘটজ্ঞান নষ্ট হয়, আমি-জ্ঞানও তদ্রূপই নষ্ট হয়। এরূপ অবস্থায় 'জ্ঞাতা আমি' ও 'জ্ঞেয় আমি' মিলিত যে "আমি আমাকে জানিতেছি" ভাব, সেই ভাবটীকে নিত্য মূলবস্তু কি করিয়া বলা সঙ্গত হয়? বস্তুতঃ ইহা নিতান্তই অনুভববিরুদ্ধ কথা।

তাহার পর কোন বস্তুর উৎপত্তিবিলয়াদি ব্যাপার, অপরের উৎপত্তিবিলয়াদি ব্যাপার দেখিয়া অর্থাৎ অন্যের উৎপত্তিবিলয়ের সম্বন্ধ শিক্ষা করিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, জ্ঞানবস্তুর এই উৎপত্তিবিলয়াদি ব্যাপারও ঘটপটাদি বহির্বস্তুর উৎপত্তিবিলয়াদি ব্যাপার দেখিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। এখন বহির্জ্জগতে নষ্ট বস্তু যেমন পুনরায় আসে না, জ্ঞানের বিষয় আমি-ভাবেরও তদ্রূপ পুনরাগমন না হইবারই কথা কি নহে? কিন্তু এই

মতে জ্ঞানের বিষয় "জ্ঞেয় আমি" বস্তুটীকে নষ্ট হইলেও নিত্য বলা হইয়া থাকে। অতএব "আমি আমাকে জানিতেছি", এই ভাবটীকে নিত্য বলা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। অন্তর্জ্জগতের বা জ্ঞানরাজ্যের ব্যাপার বলিয়া তাহা একেবারে বহির্জ্জগতের ব্যাপারবিলক্ষণ হইবে, এমন কোন্ নিয়ম নাই। বেদান্তিগণের মিথ্যাবস্তু নাই, অথচ দৃশ্য হয়—বলায় উভয় জগতেরই নিয়ম রক্ষিত হয়। অতএব এই মতে জ্ঞানবস্তুটী জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপে প্রকটিত হইয়াও নিত্য অবিকৃত বলা যায় না, বলিতে গেলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ভাবকে মিথ্যা বলিতে হইবে। আর তজ্জন্য সেই জ্ঞানবস্তুর সহিত জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ভাবের ভেদাভেদসম্বন্ধও স্বীকার করা যায় না।

তাহার পর প্রথম জ্ঞানের জ্ঞাতা ও দ্বিতীয় জ্ঞানের জ্ঞাতার মধ্যে কালভেদ থাকায় এই উভয় জ্ঞাতার মধ্যে অভেদ থাকে না, ভেদই থাকে, সুতরাং ভেদাভেদ সিদ্ধ হয় না। যেহেতু কোন দুইটীর মধ্যে অভেদ অনুভব হইতে গেলে তাহাদিগের এককালেই থাকা আবশ্যক হয়, ভিন্ন কালে থাকিলে তাহাদের অভেদ কি করিয়া অনুভূত হইতে পারে? নীলোৎপলে বা ঘটশরাবে যে অভেদ জ্ঞান হয়, তাহারা ত উভয়েই একই কালে থাকিলেই হয়। বস্তুতঃ, উক্ত দুইটী জ্ঞানের জ্ঞাতা একই কালে থাকে না বলিয়া ইহাদের অভেদ জ্ঞান সম্ভবপর হয় না।

তাহার পর দ্বিতীয় জ্ঞানের জ্ঞাতাকে দ্বিতীয় জ্ঞানকালে জ্ঞাতা বলিয়াই বোধ হয় না, তাহা তখন জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কিছুই হয় না। প্রত্যুত প্রথম জ্ঞানের জ্ঞাতাকেই দ্বিতীয় জ্ঞানোদয়ে জ্ঞাতা বলিয়া বোধ হয়। এজন্য জ্ঞানরাজ্যের নিয়মানুসারেও এই উভয় জ্ঞাতার মধ্যে ভেদই অনুভূত হয়, অভেদ অনুভূত হয় না। অতএব প্রথম জ্ঞানের জ্ঞাতা ও দ্বিতীয় জ্ঞানের জ্ঞাতার মধ্যে ভেদাভেদ সম্ভবপর নহে।

যদি বলা হয়, প্রথম জ্ঞানের জ্ঞাতাই জ্ঞেয় হইয়া আবার দ্বিতীয়

জ্ঞানের জ্ঞাতৃরূপে প্রকাশ পায়, সুতরাং কালগত ভেদ থাকিলেও বস্তুগত ভেদ থাকে না। অতএব উভয় জ্ঞাতার মধ্যে ভেদাভেদ সিদ্ধ হইবে না কেন? তাহা হইলে বলিব—ইহা অনুভববিরুদ্ধ কথা। প্রথম জ্ঞানের জ্ঞাতা যে ফিরিয়া আসিয়া দ্বিতীয় জ্ঞানের জ্ঞাতা হয়, ইহা ত অনুভব হয় না। জ্ঞান ক্ষণস্থায়ী বলিয়া প্রথম জ্ঞানের সহিত তাহার জ্ঞাতাও চিরতরে বিলীন হয়। বস্তুতঃ, এক বস্তুর কালভেদে অবস্থাভেদ স্বীকার করিলে সেই অবস্থাভেদবশতঃ তাহাদিগকে আর প্রকৃতপ্রস্তাবে অভিন্ন বলা যায় না। তবে অবস্থাভেদ মিথ্যা হইলেই তাহা বলা যায়। এইজন্য অদ্বৈতবাদী এই অবস্থাভেদকে মিথ্যা বলিয়া তাহার অধিষ্ঠান আত্মবস্তুকে এক অদ্বৈত বলিয়াছেন।

যদি বলা হয়, প্রথম জ্ঞানে যে "আমি" জ্ঞাতা ছিলাম, দ্বিতীয় জ্ঞানেও সেই "আমি" জ্ঞাতা—এইরূপই ত জ্ঞান হয়, সুতরাং প্রথম জ্ঞানের জ্ঞাতাই দ্বিতীয় জ্ঞানের জ্ঞাতা হইতে পারিবে না কেন? তাহার উত্তর এই যে, এই কথা যিনি আলোচনা করেন, তাঁহার নিকট প্রথম জ্ঞানের ন্যায় দ্বিতীয় জ্ঞানটীও একটী তৃতীয় জ্ঞানের জ্ঞেয় হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ এটী তৃতীয় জ্ঞানের কথা হয়। সুতরাং এই দ্বিতীয় জ্ঞানের জ্ঞাতাটীও তৃতীয় জ্ঞানের অনভিব্যক্ত আমিরূপ জ্ঞাতার বিষয় হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে—যখন যে জ্ঞান হয়, তখন সে জ্ঞানের জ্ঞাতা অনভিব্যক্ত আমিরূপে থাকে, আর সেই জ্ঞানটী যখন আবার জ্ঞেয় হয়, তখন সেই জ্ঞেয়-জ্ঞানের জ্ঞাতাও জ্ঞেয় হয়। এই জ্ঞেয়রূপ জ্ঞাতা এবং তাহাদের জ্ঞাতা পৃথক্ই থাকে। জ্ঞেয়রূপ জ্ঞাতা ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার জ্ঞাতৃরূপ অনভিব্যক্ত জ্ঞাতার রূপধারণ করিতেছে—এরূপ অনুভবই হয় না। সুতরাং জ্ঞেয়রূপ জ্ঞাতা আবার ফিরিয়া আসিয়া সেই জ্ঞেয়রূপ জ্ঞাতার জ্ঞাতা হয়—একথা অপ্রমাণ, একথা অনুভববিরুদ্ধ কথা।

আর যদি একই বস্তু হইতে কোন কিছু উৎপন্ন হইয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই নিজ পূর্ব্বরূপই ধারণ করে, তাহা হইলে তাহার উৎপত্তি ও ফিরিয়া আসা—উভয়ই মিথ্যা বলিতে হয়, আর মিথ্যা বলিলে ভেদাভেদও মিথ্যা হয়। আর সত্য বলিলে ভেদাভেদ সিদ্ধ হয় না, কিন্তু ভেদই সিদ্ধ হয়।

তাহার পর এই যে "জ্ঞাতা আমি" ইহা জাগ্রত স্বপ্নে যেরূপ হয়, সুষুপ্তিতে সেরূপ নহে। সেখানে 'আমি আমাকে জানিতেছি', এই ভাবই থাকে না। সুতরাং জ্ঞাতার যে প্রকৃত স্বরূপ, তাহা এই তিন অবস্থা ভিন্ন অন্য একটী রূপ। আর বস্তুতঃ, জাগ্রতস্বপ্নেও যখনই জ্ঞান হয়, তখনই সেই জ্ঞানের জ্ঞাতা সুষুপ্তির জ্ঞাতার ন্যায় অনভিব্যক্তই থাকে। জ্ঞানের জ্ঞানকালেই কেবল জ্ঞাতার জ্ঞান হয়, অর্থাৎ "আমি আমাকে জানিতেছি", এই জ্ঞান হয়। অতএব "আমি আমাকে জানিতেছি", এইটীই যে মূল তত্ত্ব, তাহাও বলা সঙ্গত হয় না। আর এই সকল কারণে জ্ঞানের স্বরূপমধ্যেও যে ভেদাভেদভাব বর্ত্তমান—এই সিদ্ধান্তই ভুল। ইহা বিক্ষিপ্তচিত্তের ভ্রান্ত অনুভবমাত্র। অবশ্য এ বিষয়ে উভয়পক্ষে বহু কথাই আছে, কিন্তু সে সব যতই আলোচনা করা যাইবে ততই ভেদাভেদবাদের অসারতাই পরিলক্ষিত হইবে।

অবশ্য এই বিপক্ষদলের পক্ষপাতী পণ্ডিতগণ সুষুপ্তিকালেও 'আমি আমাকে অনুভব করিতেছি' এই ভাবটীকে স্বীকার করিবার জন্য আগ্রহ করেন। তাঁহারা বলেন—কোন বস্তুতে গাঢ় মনোনিবেশ করিলে যেমন অন্য বিষয়ের জ্ঞান থাকে না, সুষুপ্তিকালেও সেইরূপ উক্ত "আমি আমাকে অনুভব করিতেছি" এই ভাবটী অনুভূত হয় না মাত্র, ইত্যাদি। কিন্তু এ কথাও অসঙ্গত। কারণ, গাঢ় মনোনিবেশ-কালে যে বিষয়টীর জ্ঞান হয়, তাহার অব্যবহিত পরে সেই বিষয় ও তাহার জ্ঞাতা, ও জ্ঞানেরও জ্ঞান হয়, কিন্তু সুষুপ্তিকালে যে জ্ঞান হয়,

তাহার অনুব্যবসায়ে কোন জ্ঞাতা বা জ্ঞানের ত আর ভান হয় না। তখন 'আমি কিছুই জানি নাই', এমন কি 'আমি আমাকেও জানি নাই'—এইরূপ জ্ঞানই হয়। অতএব ইহা নিতান্ত অনুভববিরুদ্ধ কথা। "আমি আমাকে জানিতেছি" এই ভাবটী জ্ঞানের মূলতত্ত্ব নহে। জ্ঞানের যাহা মূলতত্ত্ব, যাহা হইতে সকল জ্ঞাতা ও সকল জ্ঞেয় অভিব্যক্ত, তাহাই স্বপ্রকাশতত্ত্ব। তাহা বেদান্তেরই অদ্বৈততত্ত্ব। তাহা "অবেদ্য হইয়া অপরোক্ষব্যবহারের যোগ্যত্ব"।

যাহা হউক, উভয়বাদেই এত কথা আছে যে, ইহার অন্ত হয় না বলিতেও পারা যায়। এই অবস্থায় অদ্বৈতবাদী বলেন—ইহাদের উভয়ের উভয়কে খণ্ডনই ঠিক, অর্থাৎ উভয়ের কথাই অন্য দিক্ দিয়া ভুলই বটে। সুতরাং ইহাকে অনির্ব্বচনীয় বলাই সঙ্গত। ইহার কারণ, পরস্পরবিরোধী ভেদাভেদ একই স্থলে থাকিলে উহা ভেদও নহে, অভেদও নহে বলিতে হয়। অথবা একটীকে সত্য, অপরটীকে ভুল বলিতে হয়। কিন্তু দুইটী মতেই সত্য থাকায় উহা বস্তুতঃ ভেদও নহে, অভেদও নহে—এইরূপই সিদ্ধ হয়। আর তজ্জন্য ইহা অনির্ব্বচনীয়ই বলিতে হয়। বৈষ্ণবাচার্য্যগণও অদ্বৈতবাদখণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ স্বীকার করিয়া এই অনির্ব্বচনীয়বাদেরই বিজয় ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহারা ভেদ ও অভেদ উভয়কে অনির্ব্বচনীয় বলায় তাহাদের মিলিতাবস্থাকেও যে তাঁহারা অনির্ব্বচনীয় বলিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। বস্তুতঃ যুক্তিবিচারদ্বারা এই অনির্ব্বচনীয়বাদ ভিন্ন আর কোন বাদই স্থির হয় না। মহামতি নাগার্জ্জুনও যুক্তির ফলে কিছুই নির্ব্বচন করা যায় না বলিয়া তত্ত্বকে শূন্যই বলিয়াছেন। তাঁহার শূন্য সৎ নহে, অসৎ নহে, সদসৎ নহে, এবং সদসদ্ভিন্নও নহে, অর্থাৎ চতুষ্কোটীবিনির্ম্মুক্ত। কিন্তু এই সৎ অর্থক্রিয়াকারী হইলে ইহা বেদান্তের সৎ নহে। অর্থক্রিয়াকারী না হইলে এই শূন্যকে বেদান্তের সৎ বলিতে হইবে, অথবা বেদান্তের

অসৎ অথবা বেদান্তের মিথ্যা বলিতে হইবে। বেদান্তের সৎ যাহা তিনকালে একরূপ থাকে, আর বেদান্তের অসৎ যাহা কোন কালেই থাকে না, যেমন বন্ধ্যার পুত্র। আর বেদান্তের মিথ্যা—, এই সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন, অর্থাৎ নাই অথচ জ্ঞেয়। এখন শূন্যকে, যদি বেদান্তের সৎ বলা হয়, তাহা হইলে তাঁহারা বেদান্তবাদী, আর যদি বেদান্তের সৎ না বলা হয়, তবে শূন্যকে বেদান্তের অসৎ বা বেদান্তের মিথ্যা বলিতে হইবে। আর যদি বেদান্তের অসৎ বলা হয়, তাহা হইলে তাহার জ্ঞান অসম্ভব বলিয়া তাহা স্বীকার্যই হয় না। মহামতি বিদ্যারণ্য পঞ্চদশীতেও বলিয়াছেন—শূন্যবাদী যদি শূন্যকে সৎ বলেন, তবে আমাদের সঙ্গে বিরোধ নাই, আর বিজ্ঞানবাদী যদি নির্বিষয় বিজ্ঞানকে নিত্য বলেন, তাহা হইলেও আমাদের সঙ্গে বিরোধ নাই। কিন্তু বৌদ্ধমতে বেদান্তীর সম্মত অসৎ শূন্যের বা চতুষ্কোটীবিনির্মুক্ত শূন্যের প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া তাহাকে মিথ্যাই বলা সঙ্গত। আর তজ্জন্য বৌদ্ধমতে অসঙ্গ সদ্ব্রহ্মের সন্ধান পাওয়া যায় নাই—ইহাই বলা হয়।

যাহা হউক, এখন দেখা যাউক, ভেদবাদ বা ভেদাভেদবাদটী প্রকৃত-প্রস্তাবে অনির্ব্বচনীয়বাদ কিরূপে সিদ্ধ হয়। সকলেই দেখিয়াছেন—

ভেদাভেদও সত্য নহে।

এক মৃত্তিকারই ভিন্ন ভিন্ন রূপই ঘট, শরাব ও পিণ্ডাদিরূপ বলিয়া উপলব্ধি হওয়ায় এবং সেই বিভিন্নরূপ অনিত্য বা সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল হওয়ায় ঘটশরাবপিণ্ডাদিনিরপেক্ষ, শুক্র পীতত্বের ন্যায়, মৃত্তিকারূপে যে মৃত্তিকার উপলব্ধি, তাহাই অপেক্ষাকৃত নিত্য ও অপরিবর্ত্তনশীলের উপলব্ধি হইতেছে। অর্থাৎ একই বস্তু বিভিন্নরূপ ধারণ করিলেও যেমন নিজরূপে সে নিত্য, আর বিভিন্নরূপটী তাহার খেলা বা লীলাবিশেষ হয়, অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় বা মিথ্যা রূপই হয়—এস্থলেও, তাহাই হইবে। অতএব দ্বৈতাদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈত কোনবাদই সত্যপদবীপদবর্ত্তী

নহে। এক বস্তুর নিজরূপ অক্ষুন্ন থাকিয়া যদি তাহার নিয়ত বিভিন্নরূপ হয়, তবে সেই বিভিন্নরূপই অনির্ব্বচনীয় হয়। যাহা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল তাহাকে অনির্ব্বচনীয় ভিন্ন আর কি বলা যাইবে। আর অনির্ব্বচনীয়ই মিথ্যা। আর এই মিথ্যার অভাববিশিষ্ট সেই সত্য অদ্বৈত হওয়ায়, দ্বৈতাদ্বৈতভাবও মিথ্যাই হয়। মিথ্যাসম্পর্কে যাহা দ্বৈতাদ্বৈত, তাহা মিথ্যা দ্বৈতাদ্বৈত। আমরা দেখিতে পাই—যাহাই আমরা জানিতে পাই, অর্থাৎ দেখিতে শুনিতে পাই, তাহাই পরিবর্ত্তনশীল, আর সেই পরিবর্ত্তনশীল পদার্থের যাহা নিজ অপরিবর্ত্তনীয়রূপ, তাহা আমরা দেখিতে বা জানিতে পাই না। কোন বস্তুরই পরিবর্ত্তনশীল রূপটী স্থায়ী নহে, তাহার জ্ঞানের পরই তাহা আর থাকে না। এজন্য তাহা, নাই অথচ জ্ঞানের বিষয় হয়—ইহাই বলা হয়। আর ইহাই মিথ্যার লক্ষণ। পরিবর্ত্তনশীলের নিজ অপরিবর্ত্তনশীল রূপটী অবশ্য সত্য, অর্থাৎ সর্ব্বকালেই আছে, কিন্তু তাহা আমরা জানিতে পারি না। এই জন্যই এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের নিজ অপরিবর্ত্তনশীল রূপটী বৈশেষিকাদিমতে পরমাণু প্রভৃতি স্বীকার করা হয়, আর সাংখ্যাদির মতে প্রকৃতি স্বীকার করা হইয়াছে। কেহই পরিবর্ত্তনশীলের মধ্যগত নিজ অপরিবর্ত্তনশীলরূপের অস্বীকার করেন নাই। এখন অপরিবর্ত্তনশীলের পরিবর্ত্তনশীলরূপটী অসম্ভব, অথচ দৃশ্য হইতেছে বলিয়া এই পরিবর্ত্তনশীলরূপকে অনির্ব্বচনীয় বা মিথ্যাই বলা ভিন্ন—যেমন আর উপায় নাই, তদ্রূপ অপরিবর্ত্তনশীল অদ্বৈতভাবকেও সত্য বলা ভিন্ন আর উপায় নাই। অদ্বৈতবাদী দ্বৈতাদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত স্বীকার করেন, কিন্তু তাহা মিথ্যা বলিয়াই স্বীকার করেন। বস্তুতঃ এস্থলেও অদ্বৈতবাদী ইহাকে অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া উভয়ের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দেন, এবং স্বমতের দৃঢ়তাসাধন করেন। কারণ, তাঁহাদের উভয়কেই ভ্রম বলা হয়, অন্য কথায় উভয়ের খণ্ডনকেই সত্য বলা হয়। ভেদাভেদবাদীর অভেদ যখন

ভেদের বিরোধী নহে, তখন ভেদাভেদবাদকে ভেদবাদ বলিতে কোন আপত্তিই হওয়া উচিত নহে। অদ্বৈতবাদীর অভেদ ভেদের বিরোধী, সুতরাং তাঁহাদের মতে, হয়—ভেদ সত্য, না হয়—অভেদ সত্য হইবে। কিন্তু ভেদ অনির্ব্বচনীয় বলিয়া অভেদই সত্য বলিতে হয়। অতএব কি ভেদভাব অথবা কি অভেদভাব—সকলই জ্ঞেয় হয় বলিয়া সে সকলগুলিই মিথ্যা. জ্ঞানস্বরূপ এক অভেদ অদ্বৈতই সত্য—বলিতে হইবে।

মিথ্যার সত্তাবিচার।

যদি বলা হয়—অদ্বৈতের উপর এই দ্বৈতাভাব বা বিশিষ্টাদ্বৈতভাবটী যখন প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন তাহার সত্তা ত অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহা হইলে বলিব—তাহা উপলব্ধ হইতেছে বলিয়া তাহার প্রাতিভাসিক সত্তাই স্বীকার্য্য, অর্থাৎ তাহা দেখা যায় বলিয়া "আছে" বলা হয়, কিন্তু "আছে" বলিয়া দেখা যায়—এরূপ নহে। এজন্য তাহার সত্তা অদ্বৈতের সত্তার ন্যায় নহে। বস্তুতঃ, যাহা ব্রহ্মবৎ সত্য নহে, তাহাই মিথ্যা। মিথ্যাবস্তু উপলব্ধ হয়, কিন্তু উপলব্ধির অতিরিক্ত কালে তাহার সত্তা নাই।

অদ্বৈতভিন্ন সবই মিথ্যা।

এখন ইহাই যদি তত্ত্ব হয়, তবে পূর্ণতার অভিমুখে গতি, অনন্ত উন্নতি, অনন্তসুখসম্ভোগ—সবই অনির্ব্বচনীয় বা মিথ্যা। ইহা যে একেবারে হয় না, তাহাও নহে, আর ইহাই যে চিরকাল হইতে থাকিবে, তাহাও নহে। ইহা সদসদ্‌ভিন্নস্বরূপ, ইহাকেই আমাদের দেশের উপাসকসম্প্রদায় ভগবানের লীলা নামে অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ লীলা ও মিথ্যা বা বিবর্ত্ত একই কথা। কারণ, এই সকলের মধ্যেই একটী অবিকৃত মূলরূপ স্বীকার করা হয়, আর তাহার উপর একটী আরোপিতরূপ স্বীকার করা হয়। বালকবালিকার খেলারূপ লীলার মধ্যে, নটের অভিনয়রূপ লীলার মধ্যে, রজ্জুতে প্রতীয়মান সর্পমধ্যে মূল-

রূপটী অবিকৃত স্বীকার করা হয়। বালকবালিকা খেলার সময় জানে যে, সত্যসত্য তাহারা রাজারাণী হয় নাই, নটনটী জানে যে সত্যসত্য তাহারা রাজারাণী হয় নাই, রজ্জুসর্পমধ্যে রজ্জুটী সত্যসত্য সর্প হয় নাই। অতএব নিরবচ্ছিন্ন এক চির অবিকৃত নিষ্ক্রিয় নিত্য অদ্বৈত-তত্ত্বের স্বরূপে থাকিয়াই যে এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল বিচিত্ররূপ ধারণ, তাহাই এই জীবজগতের ব্যাপার। সুতরাং ইহাই মিথ্যা—আর অদ্বৈতরূপই সত্য। আর তজ্জন্য অনন্ত উন্নতি অনন্তসুখসম্ভোগ, পূর্ণতার অভিমুখে অনন্তগতি—সবই অনুভূত হয়, সবই সম্ভবপর হয়। ইহা অনুভূত হয়, অথচ নাই অর্থাৎ মিথ্যা, অর্থাৎ অসৎ নহে, সৎও নহে। এইজন্য ক্রমোন্নতিবাদী যাহা বলিতেছেন, তাহা অদ্বৈত-বেদান্তমতে যতটা চরিতার্থ হয়, যতটা সম্ভব হয়, এতটা আর অন্যমতে হয় না। এইজন্য জগৎতত্ত্ব যতটা অদ্বৈতমতে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হয়, এতটা আর অন্য কোন মতে ব্যাখ্যাত হয় না। যাঁহারা বলেন, অদ্বৈতমতে জগৎতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয় না, তাঁহারা অদ্বৈতমত না বুঝিয়াই বলেন। যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত কারণে অনন্তক্রমোন্নতিবাদ নিতান্ত অসঙ্গত মতবাদ।

মিথ্যাও সত্য নহে।

যদি বলা যায়, অদ্বৈতের উপর এই যে, মিথ্যার খেলা, এই মিথ্যা খেলাকেও নিত্য বলিলে দোষ কি? তাহা হইলে বলিব—সেই মিথ্যার মিথ্যাত্বের অপলাপ করা হয়। অদ্বৈততত্ত্বটী যদি মিথ্যাবিশিষ্টরূপে নিত্য হয়, তবে মিথ্যা আর মিথ্যা থাকিল না। অতএব অদ্বৈত-তত্ত্বের এই মিথ্যা বিশেষণটী অদ্বৈততত্ত্ব অপেক্ষা ন্যূনসত্তাক বলিতে হইবে। আর ন্যূনসত্তাক হইলে সর্ব্বকালে এই মিথ্যা বিশেষণটী থাকিবে না ইহাই—বুঝাইল। শুধু ইহাই নহে, যে কালে এই মিথ্যা বিশেষণটীকে 'আছে' বলা হয় সে কালেও তাহা সত্যই নাই বুঝিতে হইবে।

কারণ, যাহা সত্যসত্য কোনকালে থাকে, তাহাকে অন্যকালে 'নাই' বলা যায় না। অতএব মিথ্যা কোন কালেই নাই, অথচ এককালে প্রতিভাত মাত্র হয়। অতএব মিথ্যারূপ বিশেষবিশিষ্টও অদ্বৈততত্ত্ব হইতে পারে না। যাহা অদ্বৈত তাহাতে বিশেষণ সম্ভবপর নহে।

ভেদাভেদবাদীর আপত্তি।

ইহাতে ভেদাভেদবাদী বলেন—অনির্ব্বচনীয় বলিলেও ত কিছুই বলা হয় না, বরং নীলঘটের স্থলে নীলের সহিত ভেদ ও অভেদ উভয় বলিলে কিছু বলা হয়। কারণ, "নীল কি" জিজ্ঞাসা করিলে নীলঘটটী দেখাইলে লোকে নীল কি বুঝিতে পারে, তদ্রূপ "ঘট কি" বলিলে লোকে নীলঘট দেখাইলেও লোকে 'ঘট কি' বুঝিতে পারে। এজন্য নীল ও ঘট অভিন্ন এবং নীলপদে নীল থাকে বলিয়া লোকে নীলের সহিত ঘটের ভেদও বুঝিতে পারে। অতএব গুণ ও গুণী, ভিন্ন ও অভিন্ন উভয়ই—আর ইহাই সত্য। আর ইহাতেই বস্তুর স্বরূপের পরিচয় দেওয়া হয়। অতএব অনির্ব্বচনীয় বা অদ্বৈতবাদ সঙ্গত নহে।

অদ্বৈতবাদীকর্তৃক উত্তর প্রদান।

এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদী বলিবেন এই যে, ভেদাভেদব্যবহার, ইহা ভ্রমাত্মক ব্যবহার। কারণ, "নীল কি" বলিলে যে নীলঘট দেখিয়া লোকে নীলজ্ঞান লাভ করে, সে তৎকালে নীলপদের নীলের জ্ঞান করে না। তদ্রূপ ঘটজ্ঞানকালে নীলঘট দেখিয়া ঘটজ্ঞান হইলে তাহাও ভ্রম হয়। যেহেতু এ উভয় স্থলেই যে যেরূপ ঠিক্‌ঠিক্‌ নহে, তাহাকে সেইরূপেই জানা হইল। ব্যবহার সম্ভব হয় বলিয়া তাহাকে সত্য বলা সঙ্গত হয় না। যেহেতু ভ্রমজ্ঞানদ্বারাও ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়। অতএব সত্য কথা বলিতে গেলে অনির্ব্বচনীয়ই বলিতে হয়। দ্বৈতাদ্বৈতমতে বিরোধও সত্য; অদ্বৈতমতে দ্বৈত পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং অসত্যাত্মক ও অনির্ব্বচনীয়, অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া তাহাদের বিরোধও মিথ্যা।

সকল মতবাদীই যদি স্বমতের দোষস্খালনের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অদ্বৈতমতেই আসিতে হয়।

এইরূপ যতই আলোচনা করা যাইবে, দেখা যাইবে, অনন্ত ক্রমোন্নতিবাদ সর্ব্বথা দুষ্ট মতবাদ। ইহা কোন ক্রমেই সিদ্ধ হয় না। বিচারের দ্বারা যাহা সিদ্ধ হয়, তাহাতে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, এক অদ্বিতীয় সত্যতত্ত্বের উপর একটা মিথ্যার খেলা অনাদিকাল হইতে চলিয়াছে। আর এই খেলাও যে অনন্তকালব্যাপী তাহাও নহে। কারণ, এই খেলাকে সত্যজ্ঞান করিলে ইহা অনন্ত হয়, আর মিথ্যাজ্ঞান করিলে সান্ত হয়, অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় হয়। বস্তুতঃ ইহাই অদ্বৈতবাদ। ইহাই এই অদ্বৈতসিদ্ধির মতবাদ। এই অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থে এই অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে যত আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, তাহা উত্থাপিত করিয়া তাহার খণ্ডনপূর্ব্বক অদ্বৈত সিদ্ধ করা হইয়াছে।

বস্তুতঃ জগৎসম্বন্ধে উক্ত অনির্ব্বচনীয়বাদই আজ বিজ্ঞানেরও লক্ষ্য। মহাত্মা আইনষ্টাইনের সাপেক্ষত্ববাদের ফলে যাহা দৃশ্য তাহাই সাপেক্ষ, অর্থাৎ প্রকৃতপ্রস্তাবে অনির্ব্বচনীয়—ইহাই প্রমাণিত হয়। বৈজ্ঞানিকের একটী ইলেক্‌ট্রন মধ্যে যখন সৌর জগতের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, তখন বিজ্ঞানও সেই "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানের" দিকে অগ্রসর হইতেছে। এইরূপে সেই বৈদিক সত্যই আবার মেঘবিনির্ম্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে। মনে হয়, ক্রমোন্নতিবাদই ক্রমোন্নত হইয়া সেই পুরাতন সত্যই আবার বেদনাদাবোই প্রচার করিবে। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজ সনাতন অদ্বৈতমত ততদিন সেবা করিলে অধিক লাভবানই হইবেন—ইহাতে আর সন্দেহ কি?

ক্রমোন্নতিবাদের প্রমাণ নাই।

এইবার দেখা যাউক, এই ক্রমোন্নতিবাদের প্রমাণ কিছু আছে কিনা। অবশ্য ক্রমোন্নতিবাদিগণ জগতের সকল দিকেই সকল বিষয়েই

ক্রমোন্নতি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কি জীবজগৎ, কি উদ্ভিজ্জ-জগৎ, কি জড়জগৎ, কি নৈতিকজগৎ, কি ধর্ম্মজগৎ, কি জ্ঞানজগৎ সকল ক্ষেত্রেই তাঁহারা ক্রমোন্নতির লক্ষণ আবিষ্কারে অশেষ প্রযত্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রযত্ন দেখিলে নিতান্তবিস্ময়সাগরে নিমগ্নই হইতে হয়। মনে হইবে, তাঁহারা বাস্তবিকই অসাধ্যসাধন করিতে বসিয়াছেন। তাঁহাদের প্রযত্নের বর্ণনা করাও যেন অসাধ্য বিষয়। ইতিহাস, ভূতত্ত্ব, জীববিজ্ঞান, জড়বিজ্ঞান, রসায়নবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান সকল বিজ্ঞানই তাঁহারা মন্থন করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রযত্নের আর তুলনা নাই বলিলেই হয়।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, তাঁহারা ক্রমোন্নতি প্রমাণ করিবার জন্যই এই পরিশ্রম করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা সর্ব্বত্র ক্রমোন্নতি দেখিয়াছেন। কেবল তত্ত্বনির্ণয় লক্ষ্য হইলে তাঁহারা এই ক্রমোন্নতি দেখিতেন না, তাঁহারা নিশ্চিতই অপর কিছু দেখিতেন। তাঁহারা পরিবর্ত্তনই দেখিতেন।

আমরা দেখিতে পাই, মনুষ্যসমাজে অতীতে যে উন্নতি হইয়া গিয়াছে, বর্ত্তমানে তাহা নাই। বর্ত্তমান যেমন একদিকে মহান্, অতীতও তদ্রূপ অন্যদিকে মহান্ই ছিল এবং মোটের উপর মনে হয়, মহত্তরই ছিল। বর্ত্তমানের দূরদর্শন, দূরশ্রবণ, দূরগমনজন্য সুখ বর্ত্তমানে যে ভাবে সর্ব্বসাধারণে উপভোগ করিতে পারে, অতীতে সে ভাবে সর্ব্বসাধারণে উপভোগ করিতে পারিত না বটে, অতীতে যোগী ঋষিগণের মধ্যে কেহ কেহ মাত্র এতাদৃশ শক্তি সম্পন্ন হইতেন। কিন্তু তাঁহাদের দূরশ্রবণ, দূরদর্শন প্রভৃতি শক্তির সহিত তাঁহাদের যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিজড়িত থাকিত, তাহা আর বর্ত্তমানে কৈ? তাঁহাদের সত্য সরলতা দয়া দাক্ষিণ্য ঔদার্য্য ও ত্যাগশীলতা, তাঁহাদের অদ্বিষ্টবুদ্ধি, অন্তর্দৃষ্টি তাঁহাদের

বাক্‌সিদ্ধি, শাপবরদানের শক্তি, ইত্যাদি যে তাঁহাদের অলৌকিক শক্তি তাঁহাদের উক্ত দূরশ্রবণাদি যোগশক্তির সহিত বিকশিত হইত তাহা আজ কোথায়? এদৃষ্টিতে বর্তমান অবনতই বটে। এখন এই দুইটী একত্র করিয়া যদি তুলনা করা যায়, তাহা হইলে জড়ীয় উন্নতি অপেক্ষা আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল্য অধিক বলিয়া অতীতকেই উন্নততর বলিতে হয়। অতীতে যুদ্ধাস্ত্রদ্বারা সমগ্র দেশ ধ্বংস করিবার শক্তি হইত, আজ বর্তমানে গ্যাসদ্বারাও তাহাই হইতে পারে বটে, কিন্তু অতীতে সেই সব অস্ত্র প্রয়োগে যে সংযম ছিল, আজ বর্তমানে সে সংযম কোথায়? আজ যে নিরস্ত্র অসহায় আবাল বৃদ্ধ বণিতার উপর বোমা নিক্ষেপ ও মেসিন গানের গুলিগোলা নিঃসংকোচে নিক্ষেপ করা হইতেছে। কিন্তু অতীতে নিরস্ত্র অসহায়ের উপর, এমন কি সাধারণ যোদ্ধারও উপর কখন মন্ত্রপূত অস্ত্র ত্যাগ করা হইত না। অতীতে এক একজন ব্যক্তি (যথা—পরশুরাম) ক্রোধবশে বা দৈত্যপ্রকৃতিবশে, আবাল বৃদ্ধ বণিতা নিধন করিয়াছেন বটে, কিন্তু আজকাল কি সমগ্রদেশের প্রতিনিধি ব্যক্তি ঐ কার্য্য বুদ্ধি-পূর্ব্বকই করিতেছেন না? অতীতের সেই ব্যক্তির মৃত্যুতে শান্তি হইত, আর আজ এক প্রতিনিধি যাইলে অপর প্রতিনিধি আসিয়া সেই কার্য্যই করিতে থাকেন। অতীতে অত্যাচারের বিরাম ছিল, সীমা ছিল, আজ আর তাহার বিরাম নাই, সীমাও নাই। অতীতে কোন জাতির উচ্ছেদ চেষ্টা হইত না, আজ কিন্তু তাহা হইয়া থাকে। অতীতের ভোগস্পৃহা ও ত্যাগের সহিত আজকার ভোগস্পৃহা ও ত্যাগের তুলনা করিলে অতীতই উন্নত ছিল বলিতে হয়। আজ কোন্ দেশে কোন্ শিক্ষিতসমাজে বানপ্রস্থ সন্ন্যাস দৃষ্ট হয়? অতীতে একে অপরের দেশ অধিকার করিলে কর লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিত, আর আজ তাহাকে ক্রীতদাস করিয়া কৌশলে প্রকারান্তরে তাহাকে নিধন করা

হইয়া থাকে। অতীতে মৃতের উপর অত্যাচার শুনা যায় নাই, আর বহু বৎসরের সমাধি হইতে মৃতদেহ উৎখানিত করিয়া তাহাকে ফাঁসি কাঠে ঝুলান হয়। অতীতে জীবন্তের ত্বকোন্মোচন করিয়া নিহত করা শুনা যায় না, আর আজ লোকে দল বাধিয়া অপরাধীকে সর্ব্বসমক্ষে এই ভাবে নিধন করে। অতীতে কখন নরমুণ্ড কাটিয়া সর্ব্বসমক্ষে সাজাইয়া বিদ্রোহী প্রজাবর্গকে ভয় দেখান হইত বলিয়া শুনা যায় না, কিন্তু আজ তাহা হয়। অতীতে কখন সর্ব্বসমক্ষে জননীকুলের অতি ঘৃণিত ভাবে সম্ভ্রম নষ্ট করা হইত বলিয়া শুনা যায় না, কিন্তু আজ তাহা হয়, এবং তদ্দেশবাসী সেই সব কর্ম্মচারীকে প্রকারান্তরে পুরস্কৃত করিয়া থাকেন। শিক্ষার ছলে, উন্নত করিবার ভান করিয়া আজ যেমন এক জাতি অপর জাতির সত্তা পর্য্যন্ত লোপ করেন, এমন অতীতে ছিল না। বিচারপতির আসনে বসিয়া স্বজাতি বলিয়া অপরাধীকে মুক্তিদান পূর্ব্বে ছিল না। ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিব না বলিয়া মাদকদ্রব্যের প্রচারে বদ্ধপরিকর হইতে অতীতের রাজন্যবর্গকে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় না। কৌশলে স্বদেশে আনিবার প্রবৃত্তি আজকালই দেখা যায়। যাঁহারা অতীত ও বর্ত্তমানের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা অপক্ষপাত চিত্তে বিবেচনা করিলে অতীত হইতে বর্ত্তমানকে মনুষ্যত্বের দিক্ দিয়া মোটের উপর অবনতই বলিবেন। অতীতের চিকিৎসাশাস্ত্র, অতীতের যোগবিদ্যা অতীতের মেধা স্মৃতি, অতীতের শারীরিক বল আজ কোথায়? হুয়েনসঙই বলিয়াছেন, তাঁহাতে সেই সময় একজন লোক দশলক্ষ শ্লোক পর্য্যন্ত কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে পারিত। সহস্র বৎসর জীবিত থাকিবার কৌশল অবগত ছিল। আজ সে শক্তি কোথায়? এখনও প্রাচীন কৌশলে একজন বালক শতাবধানী হইতেছে, দেখা যায়। শতসহস্রাঙ্ক সংখ্যার গুণন মনে মনে করিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানের উন্নতিতে তাহা কোথায়? এখনও প্রাচীন পদ্ধতিতে

চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বহুপূর্ব্বে রোগীর মৃত্যুসময় নিশ্চয় করিয়া বলিয়া দেয়, বর্ত্তমান প্রথায় তাহা কোথায়? আমরা যতই দেখিতেছি বর্ত্তমান, অতীতের সমকক্ষ নহে, প্রত্যুত অনেক পরিমাণেই অবনত—ইহাই মনে হয়।

অতীতের উন্নতি অস্বীকার করা যায় না।

অবশ্য এস্থলে ক্রমোন্নতিবাদী বলিবেন যে, অতীতের যে সব উন্নতির কথা, সুখসম্পদের কথা আমরা শুনিতে বা গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাই, তাহা সম্পূর্ণভাবে অতিরঞ্জিত এবং কল্পিত কথা, তাহা কবির কল্পনা, তাহা মিথ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু একথা ক্রমোন্নতি-বাদীর সঙ্গত নহে। অতীতের বিষয় কালবশেই বিনষ্ট, বিকৃত ও বিস্মৃত হইতে বাধ্য। সুতরাং অতীতের ধ্বংসাবশেষ হইতে অতীতের প্রকৃত চিত্র কখনই সম্পূর্ণরূপে অঙ্কিত করিতে পারা যায় না। অতীতের বর্ণনাবিশিষ্ট গ্রন্থাদিতে অনেক ভুলচুক, অনেক অসম্ভব কথা থাকিলেও কোন্‌টী ভুল, কোন্‌টী ভুল নহে, কোন্‌টী সম্ভব, কোন্‌টী সম্ভব নহে, তাহা বুঝা যাইবে কি দিয়া? অতীতের অবস্থা বর্ত্তমানের বুদ্ধিশক্তির দ্বারা তাহা নির্ণয় করিতে গেলে, তাহা কখনই অভ্রান্ত হইতে পারে না। এখনও পর্য্যন্ত ব্যক্তিবিশেষে যে সব যোগশক্তি ও মন্ত্রশক্তির কার্য্য দেখা যায়, তাহা দেখিয়া কোন পক্ষপাতহীন ব্যক্তি কখনই অতীতকে অনুন্নত বলিতে পারেন না। একথা অস্বীকার করা বলপ্রকাশভিন্ন আর কিছুই নহে। এই বিষয়ে এত দৃষ্টান্ত আছে যে, সে সব কথার অবতারণা করিতে গেলে একটা পৃথক্ পুস্তকই হইয়া যায়। অতএব অতীতের তুলনায় বর্ত্তমান উন্নত—একথা দুরাগ্রহ ভিন্ন কিছুতেই সহজবুদ্ধির কথা বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

কার্য্যকারণমধ্যে ক্রমোন্নতি নাইক

অনেকে বলেন—দেখ, বীজ হইতে বৃক্ষ হইতেছে, শাখাপল্লব

হইতে পুষ্প, ফল হইতেছে, নিহারিকা হইতে জ্যোতিষ্কমণ্ডল হইতেছে, ইলেকট্রন ও আয়ন হইতে এই স্থূল জগৎ হইতেছে, ছোট হইতে বড় হইতেছে, অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইতেছে, তখন অতীতের অনুন্নত অবস্থা হইতে উন্নত অবস্থাই হইতেছে—এই উন্নতি সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয়ে দেখা যায়। জড়জগৎ, উদ্ভিজ্জ-জগৎ, প্রাণিজগৎ সর্ব্বজগতেই দেখা যায়। অতএব ক্রমোন্নতি কেন স্বীকার করিব না? তাহা হইলে বলিতে হইবে—যাহাই উৎপন্ন হইতেছে, তাহারই যখন বিনাশ আছে, —জরা বার্দ্ধক্য আছে, তখন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অবনতিও আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির উৎপত্তির পর বৃদ্ধি এবং পরিশেষে নাশ আছে, তখন ক্রমোন্নতি কি করিয়া স্বীকার করা যায়? অতএব ক্রমোন্নতিই অসিদ্ধ। আর ব্যক্তিতে যখন উন্নতি অবনতি দুইই দেখা যাইতেছে; তখন সেই ব্যক্তির আশ্রিত জাতিতেই বা তাহা ঘটিবে না কেন? প্রত্যুত তাহা ঘটাই স্বাভাবিক। কে না জানে, জগতে কত জাতীয় কত জীব, কত জাতীয় কত উদ্ভিদ্ বিলুপ্ত হইয়াছে। এ পৃথিবীও একদিন নষ্ট হইবে।

অবশ্য এ কথায় ক্রমোন্নতিবাদী বলিবেন—ব্যক্তির ভাগ্যেও ওরূপ হইলেও জাতির ভাগ্যে তাহা ঘটে না। জাতির ক্রমশঃই উন্নতি হইতেছে। যেমন, নদীর প্রত্যেক জলকণা চলিয়া গেলেও নদী বর্ত্তমান থাকে, এবং কালক্রমে সেই নদীর গভীরতা ও বিস্তৃতি হইতে দেখা যায়, তদ্রূপ ব্যক্তির উৎপত্তিবিলয় দেখিয়া জাতির পক্ষে তাহার স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একথাও সঙ্গত নহে। কারণ, জাতি ব্যক্তিনিষ্ঠ। সকল ব্যক্তির যে স্বভাব তাহা জাতিরও স্বভাব হইয়া থাকে। নদীর জলকণারূপ ব্যক্তির গমনাগমন দেখিয়া নদীর গমনাগমন সর্ব্বদা দৃষ্ট না হইলেও নদীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নদীরও যে বিলয় আছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? সেই অতীতের সরস্বতী,

সুপ্রশস্তা সরস্বতী দৃষদ্বতী আজ কোথায়? অতএব জাতির অভিব্যক্তি দেখিয়া জাতির উন্নতি স্বীকার করা ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ ক্রমোন্নতি কোথাও দেখান যায় না। যাহা দেখান যায়, তাহা পরিবর্ত্তনশীলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। পরিবর্ত্তনের কোন অংশ উৎপত্তি, কোন অংশ স্থিতি বা বৃদ্ধি বা উন্নতি, আর কোন অংশ ক্ষয় বা বিনাশ—এইমাত্র। একটী চক্রের একদেশ দেখিয়া তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা কখনই সঙ্গত হয় না। বস্তুতঃ আমরা যাহাই দেখি, তাহার একদেশই দেখি, কোন বস্তুর সমগ্র এককালে দেখিই না। অতএব জগতের ক্রমোন্নতি যাঁহারা দেখেন, তাঁহারা জগতের একটী ভাবই দেখিয়া তাহা বলেন। জগৎসম্বন্ধে যদি কিছু বলিতেই হয়, তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, তাহা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। অতএব ক্রমোন্নতিই সিদ্ধ হয় না, আর সেই ক্রমোন্নতি স্বীকার করিয়া মানবাত্মার সহিত বিশ্বাত্মার অনন্ত মিলনোদ্যমরূপ অনন্তসুখ-প্রাপ্তিই জীবের পূর্ণতার অভিমুখে গতি, জীবের অনন্ত উন্নতি প্রভৃতি যাহা বলা হয়, তাহা ভিত্তিহীন অট্টালিকাবিশেষ। অতএব ক্রমোন্নতি-বাদই অসঙ্গত বাদ। ক্রমোন্নতিবাদের কোন প্রমাণ নাই।

ক্রমোন্নতির পরিণামশীলতা।

বস্তুত- জগৎপ্রকৃতি দেখিলে জগতে উন্নতি ও অবনতি উভয়ই দেখা যায়। সময়বিশেষে উন্নতি প্রধানরূপে লক্ষিত এবং সময়বিশেষে অবনতি প্রধানরূপে লক্ষিত হয়—এইমাত্র। এজন্য জগতের স্বভাব যদি নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে ইহাকে এককথায় পরিবর্ত্তন বলিয়াই নির্দ্দেশ করা যায়, ক্রমোন্নতি বলা কোন ক্রমেই সঙ্গত হয় না।

ক্রমোন্নতিবাদের ফল।

এইবার দেখা যাউক, এই ক্রমোন্নতিবাদের ফল কি? জগতের সকল বস্তুতেই যেমন তারতম্য থাকে, ইহারও তদ্রূপ তারতম্য উচ্চ-

বিধ ফলই আছে। ইহার ভাল ফলের মধ্যে দেখা যায়—এই বাদে জড়ত্ব খুব উত্তমরূপে দূর হয়। কারণ, সকলই যখন ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে, তখন যে ব্যক্তি উন্নতির জন্য যত্ন করিতেছে, তাহার উন্নতি অধিকই হইবে। স্থিরভাবে অবস্থান করিলে, অপরে যাহারা উন্নতির চেষ্টা করিতেছে, তাহারা অগ্রগামী হইবে, আর নিশ্চেষ্ট ব্যক্তি পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে। অতএব উন্নতির জন্য সতত চেষ্টা করিবার প্রবৃত্তি এই ক্রমোন্নতিবাদে যত হয়, এত আর অন্যবাদে হয় না। কারণ, উন্নতির শেষবাদীদিগের মধ্যে যাহারা উপাসক তাঁহারা উপাস্যের রাজ্যে উপনীত হইবার জন্য জগতের সুখসমৃদ্ধির চেষ্টায় বিরত হন, এবং যাঁহারা জগৎকে মিথ্যা বলেন, তাঁহারা জগতের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। অতএব ইহারা ইহলৌকিক উন্নতির প্রতি কিছু উদাসীন হন, কিন্তু ক্রমোন্নতিবাদী এই জগতের উন্নতিকে উপেক্ষা করেন না। এজন্য তাঁহারা অনন্ত চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য জগৎ এই ভাবে ভাবিত হইয়া সতত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কারে উৎসাহিত এবং প্রাচ্য জগৎ, তাঁহাদের ভোগস্থানে পরিণত হইয়াছে। এই দিকটা ক্রমোন্নতিবাদের ভাল দিক্ বলিতে পারা যায়।

ক্রমোন্নতিবাদের দোষ।

কিন্তু অন্যদিকে ইহাতে অনেক দোষ আছে। সেই দোষের সহিত ইহার এই গুণের তুলনা করিলে কিন্তু ইহার দোষই অধিক বলিয়া বোধ হইবে। অতএব সেই দোষের বিষয় অবগত হইয়া প্রকৃত সত্য পথের পথিক হইবার চেষ্টা করা উচিত। আজকাল পাশ্চাত্যের প্রলোভনে আমাদের মধ্যে অনেক ক্রমোন্নতিবাদের পক্ষপাতী হইয়া প্রকৃত সত্য পথ হইতে বিচ্যুত হইতেছেন। কিন্তু অনাদিকাল হইতে প্রচলিত আমাদের সত্য পথে যে সমস্ত আবর্জ্জনা

আসিয়াছে, তাহা বিদূরিত করিতে পারিলেই লাভের মাত্রা অধিক হইবার কথা। পরমত গ্রহণ করা অপেক্ষা স্বমতের সংস্কারই শ্রেয়ঃ। এজন্য পাশ্চাত্ত্যের প্রলোভননিবারণ করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে তাহার দোষপ্রদর্শন আবশ্যক, পশ্চাতে স্বমতের সংস্কারসাধনে যত্নবান হওয়াই উচিত। ক্রমোন্নতিবাদের সেই দোষ এই—

ক্রমোন্নতিবাদের প্রথম দোষ—এই মতবাদটী যুক্তিসহ নহে। এ কথা ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। অতএব তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে যুক্তিহীন বিষয়ে আগ্রহ হইলে মানব ক্রমে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে অন্ধ হইয়া পশুত্বপ্রাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় দোষ—এমতে পাপ হইতে নিবৃত্তির জন্য প্রযত্নাভাব প্রবল হয়। কারণ, আমরা ভালমন্দ যাহাই করি না, জগতের নিয়মে আমাদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী মনে করা হয়। জন্মান্তরে অধোগতি হইবার আশঙ্কা এমতে নাই। এই সব কারণে এমতে পাপ হইতে নিবৃত্তির ইচ্ছা প্রবল হয় না, পাপের ভয় থাকে না। কিন্তু যাহাদের অবনতি ভয় থাকে, তাহাদের পাপভয়ও থাকে। বস্তুতঃ ইহার ফলে এই মতবাদীর সমাজে যত স্বার্থপরতা, লোভ, নিষ্ঠুরতা, কপটতা প্রভৃতি প্রবল হয়, এত আর অপর সমাজে দেখা যায় না। পাপভয় না থাকিলে মানবে ও পশুতে কোন পার্থক্যই থাকে না।

তৃতীয় দোষ—এমতে জ্ঞানেরও উন্নতি হইতেছে বলিয়া আজ যাহা সত্য বলিয়া নির্ণীত হইতেছে, কালবশে তাহারও পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহার ফলে অভ্রান্ত অপরিবর্ত্তনীয় সত্য বলিয়া এমতে কিছুই নির্ণীত হইতে পারে না। বস্তুতঃ ইহার ফল অতি ভীষণ। কারণ, এরূপ ভাবিলে মানব দৃষ্টবিষয় ব্যতীত কোন কিছুরই উপর অবস্থাসম্পন্ন হইতে পারে না। তাহার ফলে পারলৌকিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছু থাকে না। সে ব্যক্তি

ইহলোকের ভোগসুখের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে। আর এরূপ হইলে পশুত্বের সহিত বড় বেশি পার্থক্য থাকে না।

উক্ত দোষস্খালনের চেষ্টা ব্যর্থ।

যদি বলা যায়—ক্রমোন্নতির যখন যে স্তরে থাকা যাইবে, তখন তাহার সত্যই যথার্থ সত্য বলিয়া গৃহীত হইবে। আর তাহার ফলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সবই নির্ণীত হইবে—কিন্তু একথাও সম্ভবপর নহে। কারণ, সত্যবিষয়ক জ্ঞানের যখন ক্রমাগত উন্নতি হইতে বাধ্য, তখন কোন এককালের সত্যকে ধ্রুবসত্য বলিয়া বিশ্বাস হইতে পারে না। সুতরাং অদৃষ্টবিষয়ক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে প্রবৃত্তিনিবৃত্তি জন্মিতে পারে না।

যদি বলা যায়—ভবিষ্যতের সত্য বর্ত্তমানের সত্যের অবিরোধী হয়, সুতরাং বর্ত্তমানের সত্যে অনাস্থা জন্মিবে কেন? আর সেই অনাস্থাজন্ত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে প্রবৃত্তিনিবৃত্তি থাকিবে না কেন? কিন্তু একথাও সঙ্গত নহে। কারণ, পূর্ব্ব সত্য হইতে পরবর্ত্তী সত্য কিঞ্চিৎ নূতন না হইলে সত্যের আর উন্নতি হইল কোথায়? আর নূতন সত্য বলিলেই তাহা পূর্ব্ব সত্যের কিঞ্চিৎ বিরোধী—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। অতএব বর্ত্তমান সত্যের অবিরোধী হইয়া পরবর্ত্তী সত্যের উন্নতি স্বীকার করা যায় না।

যদি বলা যায়—সত্যের উন্নতি বলায় পূর্ব্ব সত্যের বিরোধী সত্যলাভ বুঝায় না, কিন্তু পূর্ব্ব সত্যের অন্তর্নিক প্রকাশ পায় মাত্র। অর্থাৎ উন্নতিতে অপেক্ষাকৃত বিশেষ জ্ঞানই হয় মাত্র। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই। কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী বিশেষজ্ঞান হইতে পরবর্ত্তী বিশেষ জ্ঞান যদি নূতন হয়, তবে সেই নূতনত্ব অংশেই আবার পূর্ব্ববর্ত্তীবিশেষজ্ঞানের সহিত পরবর্ত্তী বিশেষজ্ঞানের কিঞ্চিৎ বিরোধ স্বীকার্য্য হয়। নচেৎ নূতনত্বই সিদ্ধ হয় না।

যদি বলা যায়—নূতনত্বমধ্যে বিরোধ কেন স্বীকার্য্য হইবে?

অবিরুদ্ধ পরিবর্তনমাত্রই স্বীকার্য্য হউক। তাহা হইলে বলিব—ভবিষ্যতের যে বিশেষ বর্ত্তমানে প্রকাশিত থাকে না, সেই বিশেষ-সম্বন্ধে অজ্ঞান ও বিপরীত ধারণা এই উভয়েরই থাকিবারই সম্ভাবনা থাকে। অতএব জ্ঞানের উন্নতিতে পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানের বিরুদ্ধ জ্ঞান কিছু-না-কিছু থাকেই থাকে। আর তাহা যদি হয়, তবে বর্ত্তমানের জ্ঞান সম্পূর্ণ সত্যজ্ঞান নহে বলিয়া তাহার উপর আস্থা জন্মে না, আর তাহার ফলে অদৃষ্ট কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে প্রবৃত্তিনিবৃত্তির অভাবই পরিলক্ষিত হইবে। অর্থাৎ দৃষ্টমাত্রসেবী হইয়া আমরা একপ্রকার পশুত্বের অনুগামী হইতে থাকিব, সন্দেহ নাই।

চিকিৎসাশাস্ত্রে ইহার একটী বেশ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আজকাল আনুমানিক চিকিৎসা প্রায় উঠিয়া যাইতেছে, এখন প্রত্যক্ষের উপযোগী যন্ত্রাদির সাহায্যে রোগনির্ণয় হইতেছে। কিন্তু তাহাতে যে কত বিষময় ফল ফলিতেছে, তাহা আনুমানিক চিকিৎসার ভুলভ্রান্তি হইতে কম নহে। পক্ষান্তরে আনুমানিক চিকিৎসার যে উপকারিতা তাহাও লাভ হইতেছে না। তাহা লোকে ক্রমেই বিস্মৃত হইতেছে। যেমন নাড়ী দেখিয়া রোগীর মৃত্যুনির্ণয়ে পাশ্চাত্ত্যগণ একরূপ অসমর্থ, কিন্তু বৈদ্যগণ এখনও অনেকটা সমর্থ হইয়া থাকেন। ইহা প্রত্যক্ষানুরাগেরই ফল। ফলতঃ ক্রমোন্নতিবাদে মানবের মনুষ্যত্ব হারাইতে হয়।

চতুর্থ দোষ—চিরশান্তির আশা এমতে বর্জ্জন করিতে হয়। অথচ মানবপ্রকৃতিমধ্যে ইহার জন্য একটা লালসা দেখা যায়। এ লালসার চরিতার্থতা এ মতে আশা করা যায় না। বস্তুতঃ চিন্তা করিয়া দেখিলে—ইহাই প্রতীত হয় যে, অনিত্যই সকল দুঃখের মূল। ইহাকে পূর্ণমধ্যে বিলীন না করিতে পারিলে নিস্তার নাই।

পঞ্চম দোষ—স্মরণাতীত কাল হইতে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ যে বেদবাণীকে ধ্রুবসত্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া আসিয়াছেন, আম

ক্রমোন্নতির অনুরোধে তাহা আর ধ্রুবসত্য নহে বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এই বেদ জগতের যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে প্রাচীন, ইহার সভ্যতাও জগতের আদি সভ্যতা বলা হয়। এই বেদের জন্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। এই বেদের উপরই আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম সবই নির্ভর করিতেছে। ক্রমোন্নতির অনুরোধে এই বেদ ভ্রান্ত এবং প্রাচীনের চাষার গান বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় আমরা কেবল যে আমাদের পারলৌকিক পরম অবলম্বন হইতে বঞ্চিত হইলাম, তাহা নহে, কিন্তু যাঁহারা ইহা শিখাইতেছেন, তাঁহারাও ইহার উপকারিতা হইতে বঞ্চিত হইলেন। ক্রমোন্নতিবাদে মনুষ্যসমাজের এই বিষয়ে যে ক্ষতি হইতেছে, তাহার আর তুলনা হয় না।

ইহার ফলের একটী নিদর্শন।

আজকাল অনেককেই বলিতে শুনা যায়—বেদান্তশাস্ত্রের অবলম্বনে শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণকর্ত্তৃক যে অদ্বৈততত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা বেদে নাই। তাহা ক্রমোন্নতির প্রভাবের ফল। বৌদ্ধগণকর্ত্তৃক বৈদিকমতের উপর আক্রমণ হইলে, গৌড়পাদাচার্য্য প্রভৃতি কর্ত্তৃক ইহা আবিষ্কৃত। যেমন, যে রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্ত শাঙ্করমতের প্রধান সহায়, সেই রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্ত বেদ বেদান্ত ও ব্রহ্মসূত্রগ্রন্থমধ্যে নাই। জগতের মিথ্যাত্বও সেই বেদাদিমধ্যে নাই। এমন কি গীতা মহাভারত প্রভৃতির মধ্যেও নাই। এই সিদ্ধান্তটী দার্শনিকচিন্তার ক্রমোন্নতির ফল; ইত্যাদি। কিন্তু কথাটী বড়ই অসঙ্গত। কারণ, মহাভারত শান্তিপর্ব্ব বৰ্দ্ধমানরাজ সংস্করণের ১৬১৮ পৃষ্ঠা, ১৬২১ পৃষ্ঠার রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। জগৎমিথ্যার কথা উক্ত ১৬২১ পৃষ্ঠাতেই আছে। তাহার পর উপনিষদ্‌মধ্যে ঐ সকল শব্দ না থাকিলেও ঐ তাৎপর্য্যের অন্য শব্দ আছে। সেই অন্য শব্দদ্বারা সেই একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। প্রকারান্তরে

মিথ্যাশব্দ থাকিয়াও যদি তাৎপর্য্য প্রকৃত মিথ্যাত্ব না হইত, তাহাতেও ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না। অতএব বেদাদিতে মিথ্যাশব্দ নাই বলিয়া যে আপত্তি, তাহা বালকোচিত আপত্তি। আচ্ছা "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ" "মৃত্যোঃ স মৃত্যুম্ আপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" "বাচারম্ভণং বিকারনামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" এ সকল শ্রুতির অর্থদ্বারা কি ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না? এস্থলে মিথ্যা শব্দ না থাকিলেও এতদ্দ্বারা মিথ্যাশব্দপ্রয়োগের উদ্দেশ্যসিদ্ধি অতি উত্তমরূপেই হইয়া থাকে। বরং মিথ্যা শব্দের 'অভাব' অর্থগ্রহণে যে দোষের সম্ভাবনা থাকে, তাহা এস্থলে হয়ই না। গীতামধ্যে জগৎমিথ্যাত্ব আচার্য্যগণ অতি উত্তমরূপেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। অন্যান্য পুরাণাদিমধ্যে ইহার দৃষ্টান্ত প্রচুরই আছে। বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না। বস্তুতঃ এই জাতীয় আপত্তি করিবার প্রবৃত্তি ক্রমোন্নতিবাদসেবার অতীব বিষময় ফল বলিতে হইবে।

কিন্তু দেখা গিয়াছে—এরূপ উত্তরেও এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, মহাভারতে ঐ সকল অংশ প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু তাহা বলিলে যদি কেহ বলে যে, রজ্জুসর্পের বহু উল্লেখ ছিল, কিন্তু কালবশে উহা উৎক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। যেহেতু মহাভারতের সব শ্লোক এখন পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ এরূপ বিবাদের সমাধান নাই। অতএব ক্রমোন্নতিবাদ নানা কারণে সৎপথের সঙ্গী নহে, বলিতে হইবে।

অবশ্য যাঁহারা বলেন, ক্রমোন্নতিবাদে সমাজের উন্নতি যেরূপ অধিক হয়, সেরূপ যখন অন্য মতবাদে হয় না, তখন ইহা উপেক্ষণীয় নহে। কারণ, জড়বিজ্ঞানের উন্নতি না হইলে স্বাধীনতা থাকে না, আর পরাধীনতা ঘটিলে সে জাতির বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। তাঁহাদের প্রতি বক্তব্য এই যে, ক্রমোন্নতিবাদ না থাকার ফলে আমাদের পরাধীনতা হয় নাই। তাহা হইলে বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ অনেকে স্বাধীন থাকিতে

পারিতেন না। অধিক কি, হিন্দুও নেপালে এখনও স্বাধীন রহিয়াছে। খৃষ্টাদি অন্য ধর্ম্মও ক্রমোন্নতিবাদ নহে। অতএব পরাধীনতার কারণ, অন্য কিছু; তাহা বিদূরিত করিলেই ইহলৌকিক উন্নতি ও স্বাধীনতা সকলই হইতে পারিবে। আমাদের মনে হয়, আমাদের ধর্ম্মাচরণের অভাবেই আমাদের অবনতি ঘটিয়াছে, অন্য কারণে আমাদের অবনতি ঘটে নাই। ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে।

যাহা হউক, এতদূরে দেখা গেল, ক্রমোন্নতিবাদটী প্রথমতঃ যুক্তিতে অসিদ্ধ, দ্বিতীয়তঃ ইহার প্রমাণ নাই, তৃতীয়তঃ ইহার ফল মানবসমাজের প্রকৃত হিতসাধনের পরম পরিপন্থি। আর তজ্জন্য ইহার ফলে বেদাদি অতীতের বস্তু বলিয়া অনাস্থেয়, অগ্রাহ্য ও অনাদরণীয় হওয়ায় তন্মূলক এই অদ্বৈতসিদ্ধি জাতীয় গ্রন্থও আস্থেয়, গ্রাহ্য ও আদরণীয় হইতে পারে না—ইত্যাদি যে ধারণা উৎপন্ন হয়, তাহা নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা, তাহা নিতান্ত অহিতকর ধারণা। এই অদ্বৈতসিদ্ধির সাহায্যে যে তত্ত্ব নিশ্চয় হয়, তাহাতে মানব চিরশান্তির অধিকারী হইয়া থাকে। কিন্তু ক্রমোন্নতির প্রহেলিকায় পতিত হইলে সেই চিরশান্তির পথ হইতে অতি দূরে আসিয়া পড়িতে হয়। অতএব এই ইহপারলৌকিক অকল্যাণকর মতবাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য আমাদের খুব সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

(২) বেদের পৌরুষেয়তাবাদ নিরাকরণ।

এইবার দেখা যাউক, বেদ নিত্য কি অনিত্য? পৌরুষেয় কি অপৌরুষেয়, ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত? আজকালকার মনীষীবৃন্দ, বেদকে অতি প্রাচীন মানবের গানগাথা প্রভৃতি বলিয়া প্রচার করিতেছেন। আর তাহাতে সত্য মিথ্যা সকলই আছে, সুতরাং অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা, আর উপহাসাস্পদ হওয়া একই কথা। আর এইরূপ বলেন বলিয়া, যে বেদ অবলম্বনে এই অদ্বৈতসিদ্ধি সত্য আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন,

সেই বেদ অভ্রান্ত না হওয়ায় এই অদ্বৈতসিদ্ধিও অভ্রান্ত হইতে পারে না। আর তাহার ফলে বেদ যেমন উপেক্ষণীয় বস্তু, এই অদ্বৈতসিদ্ধিও তদ্রূপ উপেক্ষণীয় বস্তু। অতএব অদ্বৈতসিদ্ধিপাঠে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনাই থাকিতেছে না।

এখন তাহা হইলে আমাদিগকে প্রথমে দেখিতে হইবে, বেদ অভ্রান্ত কিনা? যেহেতু, বেদ অভ্রান্ত হইলে অদ্বৈতসিদ্ধিরও উপযোগিতা সিদ্ধ হইবে।

প্রথম দেখা যায়, মানব কখন স্বভাবতঃ সর্ব্বজ্ঞ বা অভ্রান্ত হয় না। সর্ব্বজ্ঞ না হইলে ভ্রম থাকিতে বাধ্য। কারণ, আমরা যাহার দ্বারা জ্ঞান অর্জ্জন করি, সে গুলি আমাদের ইন্দ্রিয় ও মনঃ। ইহারা যখন যে বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন তাহার জ্ঞান হয়, আর সেই জ্ঞানদ্বারা অন্য জ্ঞান হয়। কিন্তু ইহারা সসীম ও অল্পশক্তিসম্পন্ন পদার্থ বলিয়া ইহারা কখনও সকল বস্তুর সহিত ও সকল বস্তুর সকল দিকের সহিত সংযুক্ত হয় না। এজন্য কোন বস্তুরই জ্ঞান আমাদের সম্পূর্ণ হয় না। আর জ্ঞান সম্পূর্ণ না হওয়ায় তাহা ভ্রমসঙ্কুলই হয়। এই কারণে বেদ যদি মনুষ্যরচিত হয়, তাহা হইলে ইহা অভ্রান্ত হইতে পারে না। এখন দেখা যাউক, বেদ মনুষ্যরচিত কিনা।

ভাষাতত্ত্বদ্বারা বেদের অপৌরুষেয়তা সিদ্ধি।

আমরা দেখিতে পাই, আমাদের দুই প্রকারের ভাষা আছে। একটী বর্ণাত্মক শব্দের ভাষা, আর একটী হাসি কান্না প্রভৃতি ধ্বনির ভাষা, অথবা হস্তপদাদি সঞ্চালন দ্বারা ইঙ্গিতের ভাষা। এই ধ্বন্যাত্মক ভাষা বা ইঙ্গিতের ভাষা প্রাণিবর্গের স্বতঃ প্রকাশিত হয়, কিন্তু বর্ণাত্মক ভাষা আপনা আপনি প্রকাশিত হয় না। ইহা শিক্ষা না পাইলে মানুষে আপনা আপনি প্রকাশিত হয় না।

ইহার কারণ, আমরা দেখিতে পাই, যে ব্যক্তি মনুষ্যের ভাষা

শুনিতে পায় নাই, তাহার ইহা বিকসিত হয় নাই। বহু শিশু ব্যাঘ্র-কর্তৃক পালিত হইয়াছে, জানা গিয়াছে, তাহারা মনুষ্যের ভাষা না শুনা পর্য্যন্ত তাহাদের মনুষ্যের ভাষা প্রকাশ পায় নাই। রোমনগরের প্রতিষ্ঠাতা রুমাস এবং রোমিউলাসের জীবনে ইহা জানা গিয়াছে। মেদিনীপুরে দুইটী বালিকা এবং আগ্রায় দুইটী বালক সম্বন্ধে এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সম্রাট্ আকবর এই বিষয়টী পরীক্ষার জন্য দুইটী বালককে মনুষ্যভাষা শুনিবার সুযোগবিরহিত করিয়া মানুষ করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, তাহাদের কোন বর্ণাত্মক ভাষারই বিকাশ হয় নাই। এইরূপ টাইফয়েড জ্বরের পর যে ভাষা শিখান হইয়াছে, তাহার সেই ভাষারই বিকাশ হইয়াছে, দেখা গিয়াছে। অতএব বর্ণাত্মক ভাষা শিক্ষিত ভাষা।

এখন এই ভাষা আদি মানবকে শিখাইল কে? বানর বা বন-মানুষ হইতে মানবের উৎপত্তি হইলে তাহারা শিখাইয়াছে, বলিতে হয়; কিন্তু তাহাদের বর্ণাত্মক ভাষা নাই। অতএব কোনও মানবই শিখাইয়াছে, বলিতে হয়। আচ্ছা, এই মানব কে? ইনি কি উহা জানিতেন, না—কাহারও নিকট শিখিয়াছেন। যাঁহার নিকট শিখিয়াছেন, তিনি তাহা হইলে কাহার নিকট শিখিলেন? এইরূপে প্রথম যে ব্যক্তি শিখাইয়াছে, সে ব্যক্তি কাহারও নিকট শিখেন নাই বলিতে হয়। আর তাহা হইলে তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞই বলিতে হয়। কারণ, না শিখিয়া যাঁহার জ্ঞানের বিকাশ সর্ব্বদাই রহিয়াছে, তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? এই সর্ব্বজ্ঞ ত মানুষ হয় না। কারণ, মানুষ স্বভাবতঃই অল্পজ্ঞ—ইহা দেখাই যায়।

যদি বলা যায়, বর্ণাত্মক ভাষা যদি অনাদি সর্ব্বজ্ঞের ভাষা হয়—হবে তাহা সর্ব্বজ্ঞের রচিত ভাষা হউক বা সর্ব্বজ্ঞের আবিষ্কৃত ভাষা হউক। আর সেই ভাষায় বেদ হওয়ায়, বেদ অপৌরুষেয় সুতরাং নিত্য

হইবে কেন? তাহা হইলে বলিব যে, সর্ব্বজ্ঞের রচিত বা আবিষ্কৃত কোন কিছুই হয় না। যেহেতু রচনার পূর্ব্বে সর্ব্বজ্ঞ তাহা জানিলে আর তাহারও রচনা সম্ভব হয় না, কারণ, রচনার পূর্ব্বে রচনাকর্ত্তার সেই বিষয়ক জ্ঞান থাকে না। থাকিলে আর তাহা রচনা হয় না। যেমন একটি গান জানা থাকিলে তাহার কথনে তাহার রচনা বলা হয় না। কিন্তু তাহা না জানিয়া তাহার কথনেই তাহার রচনা হইয়া থাকে। আর যদি সর্ব্বজ্ঞ রচনার পূর্ব্বে জানিতেন না বলা হয়, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বেরই হানি হয়। অতএব সর্ব্বজ্ঞের রচনা বা বর্ণাত্মক ভাষার আবিষ্কার সম্ভবপর হয় না। আর সেই ভাষায় বেদ হওয়ায় বেদ অপৌরুষেয় সুতরাং নিত্যই হইবে।

আর যদি বলা হয়—বর্ণাত্মক ভাষা কোন সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি মানবকে শিখান নাই, কিন্তু উহা অনাদি অল্পজ্ঞ মানব অনাদিকাল হইতে পরবর্ত্তীকে শিখাইয়া আসিতেছে। তাহা হইলে বলিব—উহা তাহা হইলে নিত্যই হইতেছে, সুতরাং অপৌরুষেয়ও হইতেছে। আর সেই ভাষায় বেদ হইলে বেদ মনুষ্যের অরচিত বলিয়া ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব প্রভৃতি মানবদোষ উহাকে স্পর্শ করে নাই। উহার ভ্রান্ততার কোন সম্ভাবনাই থাকিতেছে না। কিন্তু পৃথিবীর আদি থাকায় মানবেরও আদি আছে, সুতরাং বেদ বা বর্ণাত্মক ভাষা অনাদি অল্পজ্ঞ মানব অনাদিকাল হইতে পরবর্ত্তীকে শিখাইয়া আসিয়াছে—ইহা বলাই যায় না। অতএব বর্ণাত্মকভাষা নিত্য ও অপৌরুষেয়, আর সেই ভাষায় বেদ হওয়ায় বেদও নিত্য, অপৌরুষেয় এবং অভ্রান্ত।

যদি বলা হয়, কালক্রমে অবস্থার গুণে মানবজাতি যেমন বানর ও বনমানুষ প্রভৃতি জাতি হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ আদিম অসভ্য মানবের ধ্বন্যাত্মক ভাষা হইতে কালক্রমে বর্ণাত্মক ভাষার অভিব্যক্তি হইয়াছে। তাহা হইলে বলিতে হইবে—অসভ্য মানবের

সন্তানকে যদি না শিখাইলে তাহাদের কোনরূপ বর্ণাত্মক ভাষার বিকাশ হয় না, তখন আদিম অসভ্য মানুষের সন্তানের তাহা কিরূপে বিকাশ হইবে? অতএব জাতির স্বতঃ অভিব্যক্তির ন্যায় ধ্বন্যাত্মক ভাষা হইতে বর্ণাত্মক ভাষার স্বতঃবিকাশ হয় নাই।

যদি বলা যায়, অবস্থার পীড়নে কোন বানরজাতি হইতে মনুষ্যজাতির যেমন বিকাশ হয়, সমগ্র বানরজাতিটা যেমন মনুষ্যজাতিতে পরিণত হয় নাই, তদ্রূপ কোন বিশেষ আদিম অসভ্য মানবসন্তানের বাঁচিয়া থাকিবার জন্য বর্ণাত্মক ভাষা কিঞ্চিৎ বিকাশ হইয়াছে, তৎপরে বহুকালে জীবনযাত্রার অনুরোধে উহা মানবজাতির বর্ণাত্মক ভাষায় পরিণত হইয়াছে। তাহা হইলে বলিব—মানব বর্ণাত্মক ভাষার ব্যবহার ব্যতীতও বাঁচিয়া থাকে। অবস্থার পীড়নে তাহার এরূপ ভাষার উদ্ভাবনে প্রবৃত্তি হইবার কারণ দেখা যায় না। পশুপক্ষী সকল ধ্বন্যাত্মক ভাষার সাহায্যে মনুষ্যের অপেক্ষা বড় কম বুদ্ধির কার্য্য সাধন করে না। হাসি কান্না, সভাসমিতি করা, ভালবাসা, চতুরতা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি বহুপ্রকার বিশেষ বিশেষ বুদ্ধিরই কার্য্য তাহারা ধ্বন্যাত্মক বা ইঙ্গিতের ভাষার দ্বারা সমাধা করিয়া থাকে—ইহা একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। অতএব অবস্থার পীড়নে জীবনযাত্রানির্ব্বাহের জন্য আদিম মনুষ্যের বর্ণাত্মক ভাষার প্রয়োজনীয়তাবোধ হইবে বলিয়া বোধ হয় না। আর তজ্জন্য কোন বিশেষজাতীয় বনমানুষ হইতে তাহাদের সন্তানপরম্পরায় বর্ণাত্মক ভাষার স্বতঃবিকাশ হইয়াছে বলা যায় না।

যদি বলা যায়—প্রাণিবর্গবিশেষের যেমন নিজভাষা আপনা-আপনি বিকাশ পায়, তদ্রূপ বর্ণাত্মকভাষা মানবের আপনা আপনি বিকাশ পাইবে না কেন? তাহা হইলে বলিব—বর্ত্তমানের সুসভ্য ব্যক্তির সন্তানেরও তাহা আপনা আপনি বিকাশ পায় না কেন?

যেহেতু তাহা হয় না, সেই হেতু উহা মানবের স্বভাবসিদ্ধ ভাষা নহে—ইহাই বলিতে হইবে।

যদি বলা যায়—দেশভেদে মানবভাষা যেমন আপনা আপনি বিকৃত হইয়া নূতন ভাষায় পরিণত হয়, তদ্রূপ মানবের মধ্যেও আপনা আপনি ধ্বনন্যাত্মক ভাষা বিকৃত হইয়া বর্ণাত্মক ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। তাহা হইলে বলিব—যে ব্যক্তি একবার একটা বর্ণাত্মক-ভাষা শিক্ষা করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই ওরূপ ভাষাবিকৃত করিয়া নূতন ভাষার উৎপত্তি করিতে পারে। একটা ভাষা না শিখিলে তাহা পারা যায় না। অতএব বর্ণাত্মক ভাষা আপনা আপনি বিকশিত হয় নাই। বস্তু না থাকিলে তাহার বিকৃতি সম্ভবপর হয় না। ধ্বন্যাত্মকভাষা বর্ণাত্মক ভাষার সজাতীয় নহে বলিয়া তাহার বিকৃতি বর্ণাত্মকভাষা হয় না।

ধ্বন্যাত্মকভাষা হইতে বর্ণাত্মক ভাষার আবির্ভাব বলিলেও, তাহা আপনা আপনি হয় না। যেমন ঘট মৃত্তিকা হইতে আবির্ভূত হয়, কিন্তু তজ্জন্য কুম্ভকারের প্রয়োজন হয়। এস্থলেও তদ্রূপ সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। এমন কি, সংস্কার থাকিলেও উদ্বোধকের প্রয়োজন হয় বলিয়া, পূর্ব্বজন্মের বর্ণাত্মক ভাষার সংস্কারসত্ত্বেও পিতামাতার ন্যায় উদ্বোধকের আবশ্যকতা হয়। পিতামাতা প্রভৃতি, সন্তানকে ভাষা না শিখাইলে মানবসন্তানের ভাষার বিকাশ হয় না। অতএব বর্ণাত্মকভাষা আপনা আপনি কখনই বিকাশিত হয় না।

যদি বলা যায়—এই ভাষা অনাদি ভাষা হইলেও উহার মধ্যে ভ্রান্ত বিষয়ের সমাবেশ থাকিবে না কেন? তাহা হইলে বলিব—পৃথিবীর উৎপত্তির পর মনুষ্যের বিকাশ হইয়াছে। তাহাকে শিখাইবার জন্য সর্ব্বজ্ঞ অমানব ব্যক্তিরই অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। তিনিই মানবকে বর্ণাত্মকভাষা শিক্ষা দিয়াছেন। অতএব সর্ব্বজ্ঞের প্রদত্ত শিক্ষা বলিয়া উহাতে ভ্রম থাকিবে না।

যদি বলা যায়—হউক, বর্ণাত্মকভাষা শিক্ষিত এবং নিত্যভাষা। কিন্তু তাহাতে বেদের নিত্যতা কোথায় সিদ্ধ হইতেছে? বেদই যে সেই সর্ব্বজ্ঞের দ্বারা শিক্ষিত আদি ভাষার গ্রন্থ তাহা কে বলিল? তাহা হইলে বলিব—বেদ বলিয়া থাকে, যে বেদের ভাষা নিত্য এবং সর্ব্বজ্ঞদ্বারাই মনুষ্য উহা লাভ করিয়াছে। যথা—"বিরূপ! নিত্যয়া বাচা" ইত্যাদি। অর্থাৎ হে বিরূপ! তুমি নিত্য বাক্যদ্বারা যজ্ঞার্থ দেবতাবিশেষের স্তুতি কর। শুক্লযজুর্ব্বেদ ৩৪।৫ মন্ত্রে আছে—

"যস্মিন্ ঋচঃ যজূংষি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা রথনাভাবিবারাঃ।"

অর্থাৎ রথনাভিতে অরাসমূহ যেমন প্রতিষ্ঠিত থাকে, তদ্রূপ ঋক্, সাম, যজুঃ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত, ইত্যাদি।

মনু বলিয়াছেন—

অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ংভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ।

এই সব বাক্যে বেদের বাক্যকেই নিত্যবাক্য বলা হইতেছে। তদ্রূপ "ব্রহ্মা হ দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব * * স * * অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ" "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং, যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ" ইত্যাদি বেদবাক্যে বেদই সেই সর্ব্বজ্ঞের উক্ত ভাষা—ইহাই বুঝা যায়। বেদমধ্যে যে শব্দপূর্ব্বিকা সৃষ্টির কথা আছে, তাহাও এস্থলে স্মরণ করা যাইতে পারে।

যথা—"এতে" ইতি বৈ প্রজাপতিঃ দেবান্ অসৃজত, "অসৃগ্রম্" ইতি মনুষ্যান্ "ইন্দবঃ" ইতি পিতৄন্ "তিরঃ পবিত্রম্" ইতি গ্রহান্, "আসবঃ" ইতি স্তোত্রং, "বিশ্বানি" ইতি শস্ত্রম্, "অভিসৌভগা" ইতি অন্যাঃ প্রজা" ইত্যাদি, এবং "স মনসা বাচং মিথুনং সমভবৎ" এবং "স ভূরিতি ব্যাহরন্ ভূমিম্ অসৃজত" ইত্যাদি। ইহাদের ব্যাখ্যাদি ব্রহ্মসূত্র ১।৩।২৮ সূত্রে দ্রষ্টব্য।

যদি বলা যায়—বেদ নিত্য, এবং সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ মানুষকে এই বেদই শিক্ষা দিয়াছেন—একথা বেদে বলে কি করিয়া? এ কথা ত মনুষ্যেরই কথা বলিতে হইবে। তাহা হইলে বলিব—নিত্যের নিত্যতার কথা অনিত্য বলিবে কি করিয়া? নিত্য ভিন্ন নিত্যের নিত্যতার কথা বলিবার কাহারও অধিকার নাই। আর বর্ণাত্মক ভাষা সর্ব্বজ্ঞই মানুষকে প্রতিসৃষ্টিতে শিক্ষা দেন, একথা একটা নিত্য সত্য, এজন্য বেদ যেমন অপর নিত্য সত্য শিক্ষা দেয়—ইহাও তদ্রূপই শিক্ষা দেয়।

যদি বলা যায়—হউক, বেদ নিত্য, তাহা যে অভ্রান্ত তাহা কে বলিল? নিত্য অথচ ভ্রান্তভাষা কেন বেদ হইবে না? তাহা হইলে বলিব—বেদ যখন নিত্য ও মনুষ্যরচিত নহে, তখন ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবরূপ মনুষ্যদোষ তাহাতে প্রবেশ করিবে কি করিয়া? আর মনুষ্যদোষ প্রবেশ না করিলে তাহাতে ভ্রম থাকিবে কেন? নিত্য ভাষা বেদে ভ্রম আছে, ইহা যদি সেই নিত্যভাষাই নিজে নিজে বলে, তাহা হইলে তাহাতে ভ্রম স্বীকার্য্য হয়। নচেৎ কিরূপে ভ্রম স্বীকার্য্য হইবে?, কিন্তু বেদ যে ভ্রান্ত, তাহা ত বেদ বলে না। অতএব বেদ নিত্য, অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত—ইহাই বলিতে হইবে।

যদি বলা যায়—বেদের মধ্যে অনেক অসম্ভব কথা আছে, যেমন—প্রস্তর ভাসিতেছে, জড়বস্তু কথা কহিতেছে, ইত্যাদি; অতএব বেদ নিত্য অরচিত ভাষা হইলেও বেদের মধ্যে ভ্রম আছে? তাহা হইলে বলিব—বেদের উদ্দেশ্য অলৌকিক বিষয় উপদেশ করা। যথা—এইরূপ যজ্ঞ করিলে স্বর্গ হয়, ব্রহ্ম অসঙ্গ পূর্ণ অদ্বৈত, ইত্যাদি, সুতরাং তাদৃশ অসম্ভব বাক্যে বেদের তাৎপর্য্য নাই। অতএব তাহা ভ্রম বলা যায় না। এই সব অসম্ভব বাক্যদ্বারা বেদোক্ত কর্ম্মের বা জ্ঞানের স্তুতি বা নিন্দা করা হইয়া থাকে মাত্র।

যদি বলা যায়—সেই অলৌকিক বিষয়ে ভ্রম থাকুক, তাহা যে

সত্য তাহা বলিবার প্রয়োজন কি? বেদোক্ত কর্মে স্বর্গ হয় না, অসঙ্গ অদ্বৈত ব্রহ্মও নাই, তাহা বলাই ভ্রম। তাহা হইলে বলিব—উহাতে ভ্রম থাকিলে এই স্মরণাতীত কাল হইতে কত কত মহা মহা মনীষী ইহার অনুসরণ করিবেন কেন? বেদোক্ত কর্মের যে দৃষ্টফলের উল্লেখ আছে, তাহা মিথ্যা হইলে লোকে এতকাল ধরিয়া অনুষ্ঠান করিয়া আসিবে কেন? তাহার পর যে সব তত্ত্বকথা আছে, যথা—ব্রহ্ম অসঙ্গ পূর্ণ অদ্বৈত ইত্যাদি, তাহা যুক্তির দ্বারা সমর্থন করাই যায়, মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করা যায় না। অতএব বেদোক্ত অলৌকিক তত্ত্বে ভ্রম নাই।

যদি বল—যুক্তির দ্বারা বেদোক্ত বিষয় সমর্থিত হইলে তাহা যুক্তি-গম্যও বটে, তাহা আর অলৌকিক হইল কি করিয়া? তাহা হইলে বলিব সমর্থিত হয় বলিয়া যুক্তিগম্যই হইবে—এমন নিয়ম নাই। যুক্তির দ্বারা বেদোক্ত সত্যের সম্ভাবনা সিদ্ধ হইলেই যুক্তির দ্বারা সমর্থন করা হইয়া থাকে। যুক্তি উহা স্বাধীনভাবে সিদ্ধ করিতে পারে না বলিয়া উহা যুক্তিগম্য নহে।

যদি বলা হয়—বেদের মধ্যে গঙ্গা যমুনা কুরুক্ষেত্র রাম লক্ষ্মণ কৃষ্ণ অর্জুন প্রভৃতির নাম থাকায় বেদ উহাদের জন্মের পর রচিত—এইরূপই বলিতে হয়? তাহা হইলে বলিব—বেদে ঐরূপ নামাদি অবলম্বনে আখ্যায়িকার দ্বারা বেদোপদিষ্ট বিষয়ের স্তুতিনিন্দার জন্য নামাদির ব্যবহার করা হইয়াছে মাত্র। এজন্য "বেদ রচিতগ্রন্থ" বলিবার আবশ্যকতা হয় না।

বস্তুতঃ সেই আখ্যায়িকার অনুরূপ ঘটনাস্থলে বা আখ্যায়িকাতে উক্ত দেশ ও নদনদীর নামকরণকালে লোকে বেদোক্ত নামেরই গ্রহণ করিয়াছে মাত্র। যেমন বহু তীর্থেই গঙ্গা, যমুনা, কেদার, বদরী, কাশী, বৃন্দাবনাদি তীর্থের নামে কূপ তড়াগাদির প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে দেখা

যায় ; অথবা যেমন এক ব্যক্তির চারি পুত্র হইলে এখনও রাম লক্ষ্মণাদি নাম রাখিতে দেখা যায়। অতএব প্রত্যক্ষদৃষ্ট গঙ্গা যমুনা এবং ঐতিহাসিক কৃষ্ণার্জ্জুনাদির বিবরণ বেদে স্থান পায় নাই, পক্ষান্তরে বেদের অনুকরণে এই সব স্থান ও ব্যক্তিবৃন্দের নামকরণ হইয়াছে বলা হয়। বেদোক্ত নামগুলি আখ্যায়িকার অঙ্গ মাত্র। অতএব বেদ "পৌরুষেয় গ্রন্থ" বলিবার আবশ্যকতা নাই।

তাহার পর ঐতিহাসিক দৃষ্টিতেও দেখা যায়—বেদ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ আর নাই। বেদের অস্তিত্ব সর্ব্ব প্রাচীন বলিয়াই সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং বেদরচনার কথা বেদসমকালীন কোনও গ্রন্থে নাই বলিয়া তাহা পৌরুষেয় গ্রন্থমধ্যে পরিগণিত হইতে পারিল না। এ বিষয়ে পরবর্ত্তী গ্রন্থের কথার মূল্য অতি অল্প, অথবা নাই।

যদি বলা যায়, বেদমধ্যেই আছে—"ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে ন স্তদ্ বাচক্ষিরে" অর্থাৎ ধীরগণের নিকট আমরা এইরূপ শুনিয়াছি, এবং কিছু ব্যাখ্যা বলিবার পর "তদেষঃ শ্লোকো ভবতি" অর্থাৎ এজন্য এই শ্লোক অর্থাৎ প্রসিদ্ধ বাক্য আছে, ইত্যাদি। ইহা হইতে প্রমাণিত হয়, বেদ মনুষ্যরচিত গ্রন্থবিশেষ। তাহার পর বলা হয়—বেদের সংহিতাভাগের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগকথা ব্রাহ্মণভাগে আছে। সুতরাং ইহা মনুষ্যরচিত ইহাই ত মনে হয়। এতদুত্তরে বলিতে পারা যায় যে, বেদ যেমন বর্ণাত্মকভাষা শিক্ষার আদি ও নিত্য গ্রন্থ, তদ্রূপ ইহা মানবকে ব্যবহারও শিক্ষা দিয়াছে। এজন্য মনুসংহিতা মধ্যেই আছে—

"সর্ব্বেষাং চ স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে।"

তৎপরে বিষ্ণুপুরাণে আছে—

"নামরূপে চ ভূতানাং কর্ম্মণাং চ প্রবর্ত্তনম্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমে স মহেশ্বরঃ।"

বস্তুতঃ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি সর্ব্বত্রই এই জাতীয় বহু কথাই আছে। অনেকে ইহার আপাতবিরুদ্ধ কয়েক কথা শাস্ত্রমধ্যে দেখিয়া স্বমত প্রকাশ করেন, কিন্তু বিচার করিলে সে মত স্থায়ী হয় না।

যাহা হউক, কি বর্ণাত্মক ভাষা, কি ব্যবহার কিছুই স্বাভাবিক আবির্ভূত বিষয় নহে। ইহা মানবকে না শিক্ষা দিলে মানবে আপনি বিকশিত হয় না। ইহাও পরীক্ষাসিদ্ধ বিষয়। ধীরগণের শ্রবণ, এবং প্রসিদ্ধ শ্লোকের উল্লেখ করিবার প্রয়োজন—এ সবই উপদেশদানের পদ্ধতিপ্রভৃতি শিক্ষাদান। ইহাও আধ্যায়িকারই অঙ্গমধ্যে গণ্য করা হয়। আর বর্ণাত্মক ভাষাজ্ঞানের পূর্ব্বে বেদের ব্যাখ্যা মানবে করিতে পারে না, এজন্য বেদের ব্যাখ্যাও বেদই হওয়া উচিত। বেদবক্তা ঈশ্বর পদ ও পদার্থের সম্বন্ধজ্ঞান করাইয়া দিয়াছেন মাত্র। অতএব এজন্যও বেদ পৌরুষেয় হয় না।

তাহার পর বেদের কর্ত্তার স্মরণ করা হয় নাই বলিয়াও ইহাকে অরচিত গ্রন্থ বলা হইয়াছে। অনেকে বলেন—পাড়াগাঁয়ে অনেক অনেক গান গাথা কবিতা লোকমুখে চলিয়া আসিতেছে, তাহার কর্ত্তার স্মরণ নাই বলিয়া কি সে গুলিও অরচিত বলা হইবে? কিন্তু এই আপত্তি সমীচীন নহে। কারণ, অনুসন্ধান করিলে এরূপ গান গাথার কর্ত্তার সন্ধান অনেক পাওয়া যায়; এবং এখন সেই অনুসন্ধানের ফলেও অনেক পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু বেদের কর্ত্তার কথা অতি প্রাচীন স্মরণাতীতকালেও কেহ বলেন নাই। প্রত্যুত সেই সময়ের সুধীবৃন্দ ইহাকে অরচিতই বলিয়াছেন—দেখা যায়। অতএব এ আপত্তি অসমীচীন। শিষ্টাচার এ বিষয়ে অতি প্রবল প্রমাণ।

যাহা হউক, এইরূপ বহু কারণ আছে যাহাতে বুঝা যায়—বর্ণাত্মক ভাষা শিক্ষিত ভাষা। ইহার শিক্ষক কোন সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি বেদবাক্যানুসারে ব্রহ্মা। এই ব্রহ্মাই ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বেদ

শিক্ষা দিয়াছেন। আর এই বেদ অলৌকিক বিষয়ের উপদেষ্টা। সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তিও বেদরচনা করেন নাই। যেহেতু সর্ব্বজ্ঞের বচনা অসম্ভব। আর সেই বেদপ্রধান সিদ্ধান্তই বেদান্তদর্শন। আর সেই বেদান্তদর্শনের মতের পরিষ্কারসাধনই এই অদ্বৈতসিদ্ধি করিয়াছে। এজন্য সর্ব্বজ্ঞপ্রদত্ত নিত্যভাষার অভ্রান্ত উপদেশের তাৎপর্য্য কি—যদি জানিতে হয়, তাহা হইলে এই অদ্বৈতসিদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী গ্রন্থ। এতদ্দ্বারা জীবের পরমাভীষ্টলাভের পথ দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল পাশ্চাত্ত্যশিক্ষাসংস্কৃত বিদ্বদ্গুলী বেদকে যে দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, তাহাতে মানবসমাজের প্রকৃত চরম উন্নতির পথ বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। অতএব এ বিষয়ে আর ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা উচিত নহে।

(৩) বেদোক্ত বিরুদ্ধমতবাদের সত্যতাবাদ।

আজকাল আবার অনেকে বেদের মহত্ত্বজ্ঞাপনার্থ বলেন—

(১) বেদে অদ্বৈত দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি সকল প্রকার বিরুদ্ধ মতবাদই আছে। আর বেদে আছে বলিয়া ঐ সকল মতবাদই সত্য। বিভিন্ন অধিকারে বিভিন্ন মত উপযোগী বলিয়া সকলেরই উপকারিতা আছে—এজন্য সকলই সত্য মতবাদ।

(২) কেহ কেহ বলেন—সকল মতবাদদ্বারাই সত্য লাভ হইয়া থাকে। সকলগুলিই সত্যের বিভিন্ন পথ। "যত মত তত পথ" এই প্রসিদ্ধ উক্তি অতি সঙ্গত কথা। এজন্য উহাদের যে বিরোধ, তাহা যথার্থ বিরোধ নহে। সুতরাং বেদ অনন্তজ্ঞানের ভাণ্ডার। বেদে নাই, এমন কিছুই নাই, বেদে যাহা আছে সবই সত্য।

(৩) কেহ কেহ বলেন—বেদ সত্যদর্শী পুরুষগণের সাক্ষাৎ অনুভব-সূচক বাক্য। এজন্য বেদে বিভিন্নব্যক্তির বিভিন্ন পথের উল্লেখ আছে, আর তজ্জন্য তাহাতে বিরোধ দেখা যায়। বেদ সম্বন্ধে নানা জনের নানা কথার মধ্যে এইগুলিই প্রধান কতিপয়।

বস্তুতঃ বেদ যদি এই কয় প্রকার মতবাদের মধ্যে কোনরূপই হয়, তাহা হইলেই এই অদ্বৈতসিদ্ধিজাতীয় গ্রন্থপাঠে লোকের মনে আগ্রহ জন্মিতে পারে না। পক্ষান্তরে যাঁহাদের কিঞ্চিৎ আগ্রহও আছে, তাঁহাদের সে আগ্রহটুকুও অন্তর্হিত হইবার কথা। কারণ, অদ্বৈত-সিদ্ধিজাতীয় গ্রন্থে বেদকে অন্যদৃষ্টিতে দেখা হয়, অর্থাৎ বেদের তাৎপর্য্য একই, এবং তাহা সেই অদ্বৈতসিদ্ধান্ত—ইহাই বলা হয়। এখন দেখা যাউক, বেদ সম্বন্ধে উক্ত মতবাদগুলি কতদূর যুক্তিসহ।

প্রথম দল বলেন—বেদে অদ্বৈত দ্বৈত এবং বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি বিরুদ্ধ মতবাদ আছে এবং সকল গুলিই অধিকারভেদে সত্য—ইত্যাদি। কিন্তু এই কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা বড়ই অসঙ্গত কথা বলেন। কারণ, বেদে বিরুদ্ধ মতবাদ আছে সত্য, কিন্তু তাহারা সকলেই সত্য নহে। উপকারিতা থাকা ও সত্য হওয়া একথা নহে। কারণ, অসত্য হইয়াও উপকারিতা থাকে—ইহা বহুস্থলেই দেখা যায়।

তাহার পর স্ববিরোধী কথা থাকিলে তাহা কখন প্রমাণ হয় না। কোন বিষয়ে আমি যদি একবার "হাঁ" বলিয়া আবার পরক্ষণে "না" বলি, তাহা হইলে আমার কথা প্রমাণ হয় না। এজন্য যে শাস্ত্র প্রমাণ হয়, তাহার তাৎপর্য্যমধ্যে বিরুদ্ধ কথা থাকিতে পারে না। তাৎপর্য্যের যাহা অবিরোধী, তাহাই সত্য, আর তাৎপর্য্যের যাহা বিরোধী, তাহা অসত্য বলিতেই হইবে। বেদের তাৎপর্য্য যদি অদ্বৈত হয়, তাহা হইলে দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত সত্য হইতে পারে না। তদ্রূপ বেদের তাৎপর্য্য যদি দ্বৈত হয়, তাহা হইলে অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত সত্য হইতে পারে না; আর বেদের তাৎপর্য্য যদি বিশিষ্টাদ্বৈত হয়, তাহা হইলে দ্বৈত ও অদ্বৈত সত্য হইতে পারে না। ইহার কারণ, এই জাতীয় বাদগুলি পরস্পর বিরোধী। অতএব এইরূপ বাদসমূহমধ্যে একটী বাদই বেদের তাৎপর্য্য, আর অপর সকল বাদ

তাহার পূর্ব্বপক্ষ। অভীষ্টবাদের দৃঢ়তার জন্য পূর্ব্বপক্ষ গ্রহণ করা হয় মাত্র। পূর্ব্বপক্ষে কখন তাৎপর্য্য থাকিতে পারে না। এজন্য বেদে নানামতবাদ থাকিলেও একটীতে তাহার তাৎপর্য্য থাকে, অপরগুলি তাহার বিরোধী হইলে পূর্ব্বপক্ষ বলা হয়, এই মাত্র। আর তাৎপর্য্য-সমূহ অবিরোধী হইলে গৌণমুখ্যসম্বন্ধে সম্বদ্ধ বলা হয়। সুতরাং মুখ্য-তাৎপর্য্য একই হয়। বস্তুতঃ, এই অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থমধ্যে দেখান হইয়াছে—অদ্বৈতমতই বেদের তাৎপর্য্য। এইজন্য এই অদ্বৈতমত কিরূপে বেদের তাৎপর্য্য হয়, তাহা যদি জানিতে হয়, তাহা হইলে এই অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থ পাঠ করা আবশ্যক।

যদি বলা যায়—অধিকারিভেদে সব বাদই সত্য, কেহই মিথ্যা নহে—কিন্তু একথাও অসঙ্গত। কারণ, সত্য কখন ব্যক্তিভেদে স্ববিরোধী হইতে পারে না। অধিকারিভেদে সত্য—যথার্থ সত্য নহে। উহা উপযোগিতামাত্র। উপযোগিতা ও সত্য এক কথা নহে। যাহা সত্য, তাহা সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সকলের নিকটই সত্য।

যদি বলা হয়—দ্বৈতও সত্য, তদপেক্ষা বিশিষ্টাদ্বৈত সত্য, তদপেক্ষা অদ্বৈত সত্য—সবই সত্য, কেবল সত্যের তারতম্য মাত্র স্বীকার্য্য। তাহা হইলে বলিব—এই তারতম্য থাকিলে, যে সত্যমধ্যে কিঞ্চিৎ মিথ্যা আছে, তাহা অপেক্ষা যাহাতে মিথ্যা কম, তাহা সত্যতর, আর যাহাতে মিথ্যা নাই, তাহাই সত্যতম হয়। সত্যের সহিত সত্যাতিরিক্ত মিথ্যার মাত্রানুসারেই সত্যের তারতম্য হয়, নচেৎ সত্যের তারতম্যই অসম্ভব। অতএব সত্যতম হইতে সত্যতর মিথ্যা, আর সত্যতর হইতে সত্যটী মিথ্যা বলিতে হয়, আর যাহাতে কোন সত্যই নাই, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা—এইরূপই বলিতে হয়। অতএব সবই সত্য, কেবল সত্যের মধ্যে তারতম্য আছে মাত্র, আর তজ্জন্য এক অধিকারে একটী ভাল, অপর অধিকারে অপরটী অল্প ভাল—এরূপ বলা সঙ্গত হয় না। সত্যের

সহিত সত্যাতিরিক্ত কিছু অর্থাৎ মিথ্যামিশ্রিত হইলে সত্যের তারতম্য সম্ভব—নচেৎ নহে। অতএব অদ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত এই তিনটীই সত্য, আর এই তিনটীতেই বেদের তাৎপর্য্য আছে, এরূপ কথা বলা সঙ্গত হয় না। তাৎপর্য্য কখন বহু হয় না। আপাতদৃষ্টিতে বহু বোধ হইলেও তাহারা মুখ্যগৌণসম্বন্ধে সম্বদ্ধ থাকে। নানা মুখ্যতাৎপর্য্য বেদের নাই। কারণ, নানা মুখ্যতাৎপর্য্য হইলেই তাহারা কতকটা বিরোধী হইতে বাধ্য। আর যদি নানা মুখ্যতাৎপর্য্য অবিরোধী স্বীকার করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সেই সমগ্র তাৎপর্য্যের মধ্যে কোন একটী অপর সাধারণ তাৎপর্য্যই থাকিয়া যায়—বলিতে হইবে। এজন্য নানা মুখ্য অথচ অবিরোধী তাৎপর্য্য বেদের স্বীকার করা হয় না।

আজকাল এই পূর্ব্বপক্ষ কথার বশবর্ত্তী হইয়া বহুমান্য কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বেদের তাৎপর্য্য দ্বৈত অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত—সবই। শঙ্কর ও রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ অপর মতের অনুকূল বেদবাক্যকে স্বমতে বলপূর্ব্বক আনিয়া মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, ইত্যাদি। কিন্তু একথা পূর্ব্বোক্ত কারণে বাস্তবিকই মহা অসঙ্গত কথা। পক্ষান্তরে "আচার্য্যগণ স্বমতে অপর মতানুকূলবাক্য বলপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন" বলায় ইহাই বুঝায় যে সকল আচার্য্যই জানিতেন, যে বেদের তাৎপর্য্য কখন নানা হয় না, তাহাদের একবাক্যতা করিলে যে অর্থ হয়—তাহাই বেদের তাৎপর্য্য। এইজন্যই আপাতবিরুদ্ধ বাক্যের একবাক্যতা করা আবশ্যক, আর তজ্জন্যই তাঁহারা ঐরূপ করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে তাদৃশ মহামহিম আচার্য্যগণকে এতদূর অজ্ঞ ভাবা কখনই উচিত নহে।

অতএব দ্বৈতাদি সকল মতেই বেদের তাৎপর্য্য আছে, এরূপ বিবেচনা করা কখনই সঙ্গত নহে। অবশ্য সেই তাৎপর্য্য—দ্বৈত, কি বিশিষ্টাদ্বৈত, কি দ্বৈতাদ্বৈত, কি অদ্বৈত—তাহা বিচারাধীন হউক,

কিন্তু তাই বলিয়া সবগুলিই তাৎপর্য্য—এরূপ বলা উচিত নহে। বলা বাহুল্য, আমাদের অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থে বেদের তাৎপর্য্য যে অদ্বৈত, তাহাই বলা হইয়াছে এবং তদনুসারেই অপর বিচারও করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় দল বলেন—বেদের সকল মতবাদদ্বারাই সত্য লাভ হইয়া থাকে, সবগুলিই সকল অধিকারে সত্যলাভের বিভিন্ন পথ, অর্থাৎ "যত মত তত পথ", ইত্যাদি। কিন্তু এ কথাও সঙ্গত নহে। কারণ, সত্যের মধ্যে এমন কোন বিশেষভাব নাই যে, একটা বিশেষভাব অবলম্বন করিয়া এক একটা পথ হইবে। সকল পথ দিয়া সত্যলাভ হয়—এ কথার অর্থ অন্যরূপ। ইহার অর্থ—চিত্তশুদ্ধির জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন পথ। কিন্তু সত্যলাভের জন্য পথ একই। এই পথটী—সত্যনির্ণয় করিয়া তাহার চিন্তন বা অনুধ্যান করিতে করিতে যে তদ্ভাবাপন্ন হওয়া, তাহাই বুঝিতে হইবে। ইহারই অপর নাম—শ্রবণের পর মনন ও তৎপরে নিদিধ্যাসন করিলে তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়। সত্যনির্ণয়টী মননস্থানীয়।

এই শ্রবণমননাদিতে অধিকারী হইবার জন্য কর্ম্ম ও উপাসনার প্রয়োজন। এই কর্ম্ম ও উপাসনা নিজ নিজ অধিকারানুসারে হইয়া থাকে। ইহারা উক্ত জ্ঞানের সাধনবিশেষ, অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইয়া জ্ঞানের প্রতিবন্ধক নিবারণ করে এবং উপাসনার দ্বারা একাগ্রতা উৎপাদন করিয়া চিত্তে গুণাধান করা হয় মাত্র। ইহার পর জ্ঞানের জন্য শ্রবণ, মনন ও ধ্যানদ্বারা সত্যসাক্ষাৎকার হয়। এইজন্য সত্যসাক্ষাৎকারের যে উপায় শ্রবণাদি, তাহার যে উপায় কর্ম্ম ও উপাসনা, সেই কর্ম্ম ও উপাসনার ব্যক্তিবিশেষে ভেদ থাকায় পরম্পরা-সম্বন্ধে সত্যসাক্ষাৎকারের উপায়ও নানা বলা হয়। বস্তুতঃ সাক্ষাৎকারের মুখ্য বা সাক্ষাৎ সাধনের নানাত্ব স্বীকার করা হয় না। অতএব "যত মত তত পথ"—এই কথার অর্থ—যথাশ্রুত অর্থ নহে, পরন্তু প্রদর্শিতরূপ অর্থই ইহার প্রকৃত অর্থ।

যদি বলা যায়, সত্য—এক ও নির্বিশেষ হইলেও নানা পথে তাহা লভ্য হইতে বাধা কি? একটী প্রাসাদের কি পাঁচটী পথ থাকিতে পারে না। পাঁচটী পথ দিয়া কি একটী গ্রাম বা নগরে যাওয়া যায় না? আর গন্তব্যস্থানে পাঁচটী পথ দিয়া উপনীত হইলে ভিন্ন পথের পথিকের নিকট গন্তব্যস্থানটী বিভিন্নরূপ হইবে—তাহাও ত বলা যায় না; অতএব সত্যলাভের নানা পথ হইতে বাধা কি? ইহা ত প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিষয়।

এতদুত্তরে বলিতে হইবে যে, বাধা আছে। কারণ, আত্মবস্তু-লাভের একই পথ হইয়াছে। কারণ, এস্থলে দৃষ্টান্তটী পরিচ্ছিন্ন জড় বস্তু, আর আত্মা অপরিচ্ছিন্ন বস্তু। ইহার প্রাপ্তিতে নানা পথ কল্পনা করা অসঙ্গত। যাহার নানা পথ হয়, তাহারা সকলেই পরিচ্ছিন্ন বস্তু হয়। অজ্ঞানবশতঃ আত্মা অলব্ধ রহিয়াছে, সুতরাং অজ্ঞাননাশই সেই পথ। আর জ্ঞানদ্বারাই অজ্ঞান নষ্ট হয়, সুতরাং জ্ঞানলাভরূপ পথটী একই পথ হইয়াছে। এই আত্মা আবার অদ্বৈত, সুতরাং তাহার লাভের যে উপায়, তাহা অদ্বৈতের উপলব্ধি, আর তাহা এই জগৎকে মিথ্যা বুঝিয়া এই মিথ্যার অধিষ্ঠান এক অদ্বৈতকে বুঝা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অর্থাৎ অদ্বৈতবস্তুলাভের জন্য অদ্বৈতেরই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনই পথ। বস্তুতঃ ইহাই একমাত্র পথ।

যেমন গ্রামে যাইবার পথভিন্ন অন্য কোনও পথ গ্রামের পথ নহে, পরন্তু গ্রামাভিমুখী পথই গ্রামের পথ হয়, তদ্রূপ অদ্বৈতাভিমুখী পথই অদ্বৈতের পথ হইবে, অদ্বৈতভিন্নের অভিমুখী পথ অদ্বৈতের পথ নহে। কিন্তু কর্ম্ম ও উপাসনায় দ্বৈতজ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক, কর্ত্তৃকর্ম্মভেদ, উপাস্য-উপাসকভেদ থাকা একান্ত প্রয়োজন, এজন্য তাহাদের যে বিষয়, তাহার নানা পথ হয়, কিন্তু অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞানের পথ অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞানেরই দৃঢ়তাসাধনরূপ একটীই পথ হয়, নানা পথ হয় না। "যত মত তত পথের" অর্থ অন্যরূপ, তাহা উপরে বলাই হইয়াছে। অদ্বৈতব্রহ্মবস্তুলাভে "যত মত তত পথ" হয় না।

তাহার পর, "যত মত তত পথ"—ইহার অর্থই হইতেছে—যদ্‌বিষয়ক যত মত, তদ্বিষক তত পথ। এখন "যত" যদি ভিন্ন হয়, তবে সেই মতপ্রতিপাদ্য বিষয়ও বিভিন্নই হয়। কিন্তু বিষয় যদি এক নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত ব্রহ্ম হয়, তবে তাহার পথ একই পথ হইবে—ইহাতে আর অন্যথা হয় না।

যদি বল—দেবতার বরে বা আশীর্ব্বাদে এবং গুরু বা অবতারের কৃপায়ও ত সত্যলাভ হইতে পারে? সুতরাং সেটাও ত একটা পথ। আর তাহা শ্রবণাদিভিন্ন পথই বটে। তাহা হইলে বলিব—উহাও ঠিক্ পথ নহে; উহা ঠিক্ পথে উঠিবার জন্য অন্য পথবিশেষ। দেবতার কৃপায় অদ্বৈতব্রহ্মের জ্ঞানলাভ করিয়া তাহার ফলে অদ্বৈতভাবলাভ হয়। একথা শ্রুতিমধ্যেই উক্ত হইয়াছে। যথা—"দেহান্তে স তং তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে" অর্থাৎ দেহান্তে দেবতা তাহাকে তারক ব্রহ্মের উপদেশ দেন। বস্তুতঃ দেবতার বরে বা গুরুকৃপায় প্রবৃত্তি জন্মে, একাগ্রতা হয়, এবং চিত্তশুদ্ধি হয়; আর তাহার ফলে জীবব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান ফলপ্রদ হয়। সুতরাং এগুলি প্রকৃত পথে উঠিবার উপ-পথবিশেষ। আর এজন্য সত্যলাভের পথ একটীই হয়, নানা

নহে। এই প্রকৃত একটী পথে উঠিবার নানা পথ আছে বলিয়া উপ-পথসহ আসল পথকে সমগ্রভাবে নানা পথ বলা হয় মাত্র।

তৃতীয় দল বলেন—বেদ সত্যদর্শী পুরুষগণের সাক্ষাৎ অনুভব-সূচকবাক্য। এজন্য বেদে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন পথের উল্লেখ আছে। আর তজ্জন্য তাহাতে বিরোধ দেখা যায়; এই বিরোধ থাকিলেও তাহা সত্য, ইত্যাদি।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, সত্য কখন নানা হয় না, সত্যদর্শীর কথামধ্যে ভেদ থাকিতে পারে না। অতএব তাহাদের কথায় বিরোধও থাকিতে পারে না। আর বিরুদ্ধ কথা কখন সত্য হয় না।

তাহার পর বেদ মনুষ্যরচিত নহে—ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। অতএব বেদ—সত্যদর্শী পুরুষের সাক্ষাৎ অনুভবসূচক বাক্য—এরূপ বলাই অসঙ্গত। বেদ কাহারও রচিত নহে বলিয়া বেদের-ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় বেদার্থ প্রকাশ করিলেও তাহা বেদ হয় না; তাহা বেদমূলক উপদেশ হইতে পারে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এক বস্তুর ঠিক্ ঠিক্ বিভিন্ন নামই হয় না। অর্থাৎ বিভিন্ন শব্দদ্বারা ঠিক্ একই বস্তু বুঝায় না। প্রত্যেক শব্দের অর্থ, যতই এক বিষয়ক হউক কেন, তাহাদের অর্থমধ্যে কিছু না কিছু ভেদ থাকে। অতএব বিভিন্ন শব্দের দ্বারা একই সত্য সমান-ভাবে বুঝান যায় না। অতএব এই জাতীয় কথা নিতান্ত অসার।

বস্তুতঃ একটী মন্ত্রদ্বারা যে ফল হয়, তাহা অন্য মন্ত্রদ্বারা সম্ভবপর হয় না—ইহা অভিজ্ঞমাত্রই জানেন। আর এই জন্যই বেদবাক্যদ্বারা যে জ্ঞানলাভ হইবে, তাহা অপর বাক্যদ্বারাও হইতে পারে না। অধিক কি, বেদার্থ অন্য বাক্যদ্বারা প্রকাশিত হইলেও সেই অন্য বাক্যের ফল ঠিক্ বেদবাক্যের ন্যায় হয় না।

কখন বস্তুর অন্যথা সাধিত হয় না। নাম যাহাই হউক না, বস্তু বা নামী যাহা, তাহাই থাকে, ইত্যাদি। কিন্তু এ কথা বেদপ্রতিপাদ্য বিষয়ে প্রযুক্ত হইতে পারে না। কারণ, বেদ যাহা প্রতিপাদন করে, তাহা অন্য প্রমাণগম্য নহে। অন্য প্রমাণগম্য হইলে এই আপত্তি সঙ্গত হইত। বেদ যাহা প্রতিপাদন করে, তাহা অলৌকিক বিষয়। এজন্য বেদবাক্যদ্বারা বেদার্থ বুঝিয়া তাহার অনুধ্যান করিলে যে ফল হইবার কথা, তাহা বেদের অনুবাদক বাক্যদ্বারা পূর্ণ মাত্রায় হইতে পারে না। অতএব বেদ সত্যদর্শী পুরুষের বাক্য,—এ জাতীয় কথা নিতান্ত ভ্রান্ত।

যাহা হউক, এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, বেদোক্ত বিরুদ্ধ মতবাদগুলি সবই সত্য হইতে পারে না। বেদার্থ-নির্ণয়ের জন্য যে "উপক্রম উপসংহারাদি" ষড়বিধ তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গ আছে, তদ্দ্বারা বেদের যাহা তাৎপর্য্য, তাহা অভ্রান্তরূপে নির্ণীত হয়, আর তজ্জন্য তাহার বিরোধী যে কথাই বেদের মধ্যে পাওয়া যাইবে, তাহাই পূর্ব্বপক্ষ বলিয়া বুঝিতে হইবে। তাহা কখনই সত্য হইতে পারে না। আর সেই তাৎপর্য্যানুকূল যে অপর কথাই পাওয়া যাইবে, তাহাতে অবান্তর তাৎপর্য্য থাকে, অর্থাৎ তাহা মুখ্যতাৎপর্য্যের সহিত গৌণমুখ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বলা হয়।

এই অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থে অদ্বৈতই বেদের তাৎপর্য্য বলিয়া প্রমাণিত করা হইয়াছে, আর তজ্জন্য দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত অথবা দ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি যাবতীয় মতবাদই বেদের তাৎপর্য্য বিষয়ীভূত নহে, পরন্তু উহারা পূর্ব্বপক্ষস্থানীয় মতবাদবিশেষ, উহার দ্বারা অদ্বৈতবাদেরই পুষ্টিসাধন করা অভিপ্রেত—ইহাই বুঝিতে হইবে।

(৮) মহর্ষি ও আচার্য্যগণের মতের প্রামাণ্য।

আজকাল অনেকেই বলেন—মহর্ষিগণের কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ

এই দুইটী ব্যাখ্যা যে কেবল পরস্পর অত্যন্ত বিরোধী তাহা নহে, কিন্তু ইহাদের সিদ্ধান্তও পরস্পরবিরোধী। সিদ্ধান্ত অবিরোধী হইয়া যে কেবল ব্যাখ্যাটী ভিন্ন, তাহা নহে, অর্থাৎ ইহাদের কি ব্যাখ্যা কি সিদ্ধান্ত উভয়ই বিরোধী। শঙ্কর—অদ্বৈতবাদী, রামানুজ—বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী।

তাহার পর এই বিরোধটী প্রাচীন পদ্ধতির পণ্ডিতবর্গের নিকট যে আকারে ছিল, বর্ত্তমান পাশ্চাত্যশিক্ষিতের নিকট তাহা আবার এক অভিনব আকার ধারণ করিয়াছে। প্রাচীন পদ্ধতির পণ্ডিতের নিকট এই বিরোধটী, উপনিষদাদি শাস্ত্রানুসারী সূত্রার্থসংক্রান্ত ছিল, বর্ত্তমানের শিক্ষিত সমাজে উহা উপনিষদাদি শাস্ত্রের অননুসারী সূত্রার্থ-সংক্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইতেছে। জর্ম্মান পণ্ডিত ডাক্তার থিবো, বেদান্তদর্শনের শঙ্করভাষ্যের এবং রামানুজভাষ্যের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া শাঙ্করভাষ্যানুবাদ ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, শঙ্করের সূত্রব্যাখ্যা উপনিষদ অনুযায়ী, আর রামানুজের সূত্রব্যাখ্যা সূত্রাক্ষর অনুযায়ী। অর্থাৎ উপনিষদের যাহা তাৎপর্য্য, তদনুসারে সূত্রার্থনির্ণয় শঙ্কর করিয়াছেন, আর উপনিষদ্ ছাড়িয়া কেবল সূত্রগুলি পড়িলে যে অর্থবোধ হয়, সেই অর্থ রামানুজ প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য এজন্য থিবো সাহেব যে যুক্তিপ্রদর্শনের চেষ্টা করেন নাই, তাহা নহে। তিনি এজন্য উভয় মতের অর্থতুলনাও করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, অমনি আমাদের শিক্ষিত সমাজ ইহাই শিরোধার্য্য করিলেন এবং এতদনুসারে শিক্ষাদানেও প্রবৃত্ত হইলেন। অতএব দেখা যাইতেছে,—

(১) প্রথমতঃ—ঋষিগণ পরস্পর বিরোধী বলিয়া অভ্রান্ত হইতে পারে না।

(২) দ্বিতীয়তঃ—সেই ঋষিবাক্যের ব্যাখ্যাতৃগণও অধিকতর পরস্পর বিরোধী বলিয়া সত্য হইতে আরও দূরে চলিয়া আসিয়াছেন।

ঈশ্বরের অবতার বা অবতারকল্প পুরুষগণের মতে শাস্ত্র ব্যাখ্যাত হইলে তাহাই সত্য বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে।

(৩) তৃতীয়তঃ—ডাক্তার থিবো প্রভৃতিগণের অনুসরণে বলিতে হয়—শঙ্করের বড়মিত্র ব্যাসদেব, ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শনমধ্যে উপনিষদের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া নিজমত প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এজন্য তাঁহারা উপনিষৎপ্রতিপাদ্য সত্য হইতে অবশ্যই দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন, ইত্যাদি।

এখন দেখা যাউক, এই কথাগুলি কতদূর যুক্তিসহ—

(১) প্রথমতঃ দেখা যাউক, ঋষিগণ পরস্পর বিরোধী বলিয়া ভ্রান্ত কি না। আমরা বলি, এজন্য তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বলা সঙ্গত নহে। কারণ, উদ্দেশ্যভেদে বিরুদ্ধ কথা অভ্রান্ত হইতে বাধা নাই। বিভিন্নবিষয়ক কথা বিরুদ্ধ হয় না। এজন্য মূলতঃ ঋষিদিগের মধ্যে ঠিক্ বিরোধই নাই। আর তজ্জন্য তাঁহারা ভ্রান্তও নহেন। ঋষিগণ পরস্পর পরস্পরকে খণ্ডন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা অভ্রান্ত।

দেখা যায়, মানব দুঃখনিবৃত্তি এবং সুখ চায়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে যদি কোন একটী নির্বাচন করিতে বলা হয়, তাহা হইলে দেখা যায়, লোকে সুখ যদি নাও পায়, তথাপি দুঃখনিবৃত্তি সে অবশ্যই চাহে। দুঃখনিবৃত্তি ও সুখলাভের মধ্যে অন্যতর প্রাপ্য হইলে লোকে দুঃখনিবৃত্তিই চাহে। সুখলাভ হয়—ভাল কথা, কিন্তু দুঃখনিবৃত্তি না হইলে চলিতে পারে না। এ বিষয়ে সকলে একমত।

সাধননির্দ্দেশ করিলে যেরূপ মতের উদ্ভব হয়, দুঃখনিবৃত্তি ও সুখলাভ উভয়কে লক্ষ্য করিয়া উক্ত কার্য্য করিলে যে মতের উদ্ভব হয়, তাহা অন্যরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। বাস্তবিক এইজন্য ন্যায়মত ও বেদান্তমত— দুইটী পৃথক্ মতই হইয়াছে। ন্যায়মতে দুঃখনিবৃত্তিই লক্ষ্য এবং বেদান্তমতে উভয়ই লক্ষ্য। বস্তুতঃ ছয়খানি দর্শনকেই এই দুইভাগে বিভক্ত করাই যায়।

তাহার পর মানুষের বুদ্ধির প্রকৃতি অনুসারে এবং সংস্কার অনুসারে যদি তত্ত্বনির্ণয় ও সাধননির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে আবার অন্যরূপ মতভেদ উপস্থিত হইয়া যায়। যাহা সকলে সহজে বুঝে, এমন কথার উপর যদি তত্ত্বনির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে পরমাণুবাদ, জীববহুত্ববাদ প্রভৃতি ন্যায় ও বৈশেষিকমতের অনুসরণ আবশ্যক হয়, অথবা কর্ম্মপ্রধান পূর্ব্বমীমাংসার শরণ গ্রহণ করিতে হয়। আর যদি আরও একটু অসাধারণ দৃষ্টিতে সেই কার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে সাংখ্যমত ও পাতঞ্জলমত আবশ্যক হয়, এবং আরও যদি অসাধারণ দৃষ্টিতে উক্ত কার্য্য করিতে হয়, অথবা সংস্কারনিরপেক্ষ সত্যনির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে বেদান্তের অনুসরণ আবশ্যক হয়।

ন্যায় ও বৈশেষিক—জগৎকারণরূপে নয়টী নিত্য দ্রব্য এবং তদন্তর্গত বহু আত্মা স্বীকার করিলেন। পূর্ব্বমীমাংসাও প্রায় তদ্রূপই স্বীকার করিলেন। সাংখ্য ও পাতঞ্জল—এক নিত্য প্রকৃতি ও বহু আত্মা স্বীকার করিলেন। আর বেদান্ত—মিথ্যা মায়া ও একই আত্মা স্বীকার করিলেন। কিন্তু দুঃখশূন্য নিত্য অবস্থারূপ মুক্তি সকলেরই স্বীকার্য্য রহিল। এইরূপে প্রত্যেক বিষয়ে দেখা যাইবে, লোকের বুদ্ধির প্রকৃতি এবং সংস্কারের প্রকারভেদবশতঃ সেই দুঃখনিবৃত্তি এবং সুখপ্রাপ্তির উদ্দেশে ঋষিগণ তত্ত্বনির্ণয় ও তাহার সাধননির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেদান্তই কেবল সংস্কারনিরপেক্ষ তত্ত্বনির্ণয়ে প্রবৃত্ত। ঋষিদিগের এই সব

হন নাই। সকলেই ঋষিমতমূলক মতের অবলম্বী ছিলেন। আর সেই ঋষিগণও আবার বেদমূলক মতেরই প্রচার করিয়াছেন। অতএব আচার্য্যগণের মতের মধ্যেও সত্য আছে। যাহা কিছু অন্যথা দৃষ্ট হয়, তাহা অধিকাংশস্থলে স্বমতে নিষ্ঠাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, এবং অতি অল্প স্থলেই দুরাগ্রহের ফলজন্য ভুলভ্রান্তি বলিতে হইবে। এজন্য ন্যায়, সাংখ্য ও বেদান্তসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের বিরোধটী বেদান্তশাস্ত্রের উপর ভ্রান্তবুদ্ধির উৎপাদক হওয়া উচিত নহে। আধুনিক শিক্ষার ফলেই এই ভ্রান্তবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে মাত্র। প্রচারকের ভুলের জন্য শাস্ত্র ভুল বলা উচিত নহে। অবশ্য একই শাস্ত্রমধ্যে যখন মতবিরোধ দেখা যায়, তখন অবশ্যই কোন মতটী ভুল হইবে, কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্য্যমধ্যে যে মতবিরোধ, তাহাতে তত ভুলের সম্ভাবনা নাই। আর এই জাতীয় মতবিরোধ পাঠকও মীমাংসা করিয়া লইতে পারেন। ইহা মূলোচ্ছেদী মতবিরোধ নহে। একই সম্প্রদায়মধ্যে অত্যন্তবিরোধ, যেমন বেদান্তে দেখা যায়—এমন আর অন্য দর্শনে দেখা যায় না। যাহা হউক, এ বিষয়টী পরে আলোচিত হইতেছে।

এই দৃষ্টিতে যদি কোন্ আচার্য্য কিরূপ বলিতে হয়, তাহা হইলে মনে হয়, স্বসম্প্রদায়ের নিজমতে নিষ্ঠামাত্র বৃদ্ধির জন্য যাঁহারা অদ্বৈত-মত খণ্ডন করিয়াছেন, তাঁহারা ভাস্কর, শ্রীকর, শ্রীকণ্ঠ, নিম্বার্ক ও বলদেব, আর যাঁহারা নিজমতে নিষ্ঠাবৃদ্ধির জন্য দ্বেষভাবসংকারে অদ্বৈতমতের খণ্ডন করিয়াছেন, তাঁহারা রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ ও বিজ্ঞান-ভিক্ষু বলা যাইতে পারে। ইঁহাদের মধ্যে দ্বেষভাবটী রামানুজাচার্য্য অপেক্ষা মধ্বাচার্য্যেরই অতিশয় অধিক। এই কথা ইঁহাদের জীবনবৃত্ত এবং লেখা হইতে বেশ স্পষ্ট প্রতিভাত হয়।

এখন এই সম্পর্কে যাঁহারা বলেন—ঋষিগণের মত আচার্য্যগণের হাতে পড়িয়া যেরূপ বিকৃত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের কথা অনুধাবন

না করিয়া আজকাল যে সমস্ত অবতার বা অবতারকল্প মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের প্রচারিত মতের দ্বারা শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়া সত্যানুসন্ধান করিতে হইবে—তাঁহাদের কথা এইবার আলোচ্য। বস্তুতঃ কথাটী মন্দ নহে। কারণ, সনাতন সত্য কালবশে বিকৃত হইলে অবতারগণ তাহার সংশোধন করিয়াছেন। যেমন দ্বাপরে যখন শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বিকৃত হইয়াছিল, তখন ভগবান্ কৃষ্ণ আসিয়া গীতার দ্বারা তাহার সংশোধন করেন। কিন্তু এই নিয়মটীর যথাতথা প্রয়োগ বড় নিরাপদ নহে। কারণ, আজকাল যেরূপ অবতার পুরুষের ছড়াছড়ি, তাহাতে কাহার বাক্য লইব, আর কাহার বাক্য লইব না, তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য।

তাহার পর এত সব অবতারপুরুষের বাক্য ও তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া যিনি তন্মতে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবেন, তাঁহার সামর্থ্যই বা কতটুকু তাহাও দেখা আবশ্যক। ওকালতির ফলে সত্য মিথ্যা হয়, মিথ্যাও সত্য হয়। পরিশেষে এই সব অবতারপুরুষের উপদেশ যিনি বা যাঁহারা সংগ্রহ করিয়াছেন, তিনি বা তাঁহারা তাহা কতদূর অবিকৃত রাখিতে পারিয়াছেন, তাহাও ভাবিবার বিষয়। আমাদের জীবনে যে কয়টী স্থলে ইহার অনুসন্ধান হইয়াছিল, দেখিয়াছি—সকল স্থলেই স্বকপোলকল্পনা যথেষ্ট প্রবেশলাভ করিয়াছে।

তাহার পর এই সব অবতারপুরুষের উক্তি নানা শিষ্য নানারূপে পরিব্যক্ত করিয়া থাকেন—ইহাও দেখা যায়। অবশ্য এই সব মহাত্মা যদি স্বয়ং গ্রন্থাদি লিখিতেন, তাহা হইলে বরং একটা অবিকৃত কথা পাওয়া যাইত, কিন্তু তাহাও হয় নাই। স্বয়ং ভগবান্ বুদ্ধ হইতে এ পর্য্যন্ত বহু অবতারই নিজে কিছুই লেখেন নাই। আর তজ্জন্য তাঁহাদের মতের কতরূপ যে ব্যাখ্যা হইয়াছে, তাহা সুধী পাঠকবর্গ অবগত আছেন। অতএব এ পথেও সত্যলাভের সম্ভাবনা বোধ

হয়, সত্যাপেক্ষা অল্প। সুতরাং শাস্ত্রীয় রীতিতে পবিত্র অন্তরে শ্রুতি-বাক্য, ঋষিবাক্য এবং আচার্য্যবাক্য আলোচনা করিয়া যাহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে—তাহাই অবলম্বনীয়। আর তাহা যদি হয়, তবে এই অদ্বৈতসিদ্ধি জাতীয় গ্রন্থ আলোচনা বিশেষ আবশ্যকই হইবার কথা—ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

বস্তুতঃ, যাঁহারা শাস্ত্রানুসারে সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা কখনও শাস্ত্রের বিরোধী হয় না। তথাপি যদি কোন সিদ্ধান্ত অবলম্বনই করিতে হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রজ্ঞান বর্জ্জন করিয়া এইরূপ সিদ্ধপুরুষের বাক্য অনুসরণ করা উচিত নহে। কারণ, যে শাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধিলাভ ঘটিয়াছে, তাহার প্রামাণ্য সেই সিদ্ধপুরুষের বাক্য হইতে নিশ্চিতই অধিক। প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহার কথা অনুবাদ মাত্র। অনুবাদকের প্রামাণ্য নাই। অতএব সামর্থ্য অর্জ্জন করিয়া শাস্ত্রবাক্য, আচার্য্যবাক্য এবং সিদ্ধপুরুষের বাক্য আলোচনা করিতে হইবে, আর তাহা হইলে ভগবৎকৃপায় সত্য প্রকাশিত হইবে, নচেৎ পদস্খলনের সম্ভাবনাই অধিক। আর এই সামর্থ্য অর্জ্জনের জন্য এই জাতীয় বিচারগ্রন্থ আলোচনা উপেক্ষণীয় হইতে পারে না।

যদি বলা হয়—একই বেদান্তের ব্যাখ্যায় যখন মতভেদ, তখন বেদান্তের কোনও মতই অভ্রান্ত নহে। ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাসদেব অবশ্যই একটা অর্থ লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা যখন দুর্নির্দ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছে, তখন সকলের কথামধ্যেই কিছু সত্য আছে, অথচ কেহই সম্পূর্ণ সত্য নহে। আর যাহার এক অংশ সত্য, তাহাকে প্রমাণই বলা যায় না।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যামধ্যে এরূপ মতভেদ হইলেও ইহার মীমাংসার নানা উপায় আছে, যথা—

(ক) ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ইহার একটা সুন্দর পথ পাওয়া যায়।

সে পথটী এই—প্রথমতঃ বেদান্তদর্শন একটী প্রাচীন গ্রন্থ, অতএব যেটী ইহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ব্যাখ্যা, তাহারই সত্যসান্নিধ্য অধিক হইবার কথা। কালক্রমে সকল বস্তুই বিকৃত হইতে বিকৃততর হইতে থাকে। এজন্য প্রাচীনবস্তুর প্রাচীনব্যাখ্যায় বিকৃতি অল্পই হইবার কথা। এতদনুসারে বর্ত্তমানে যত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে শঙ্করকৃত ব্যাখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। অতএব প্রথমতঃ প্রাচীনতার দৃষ্টিতে এই শঙ্করকৃত ব্যাখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক বলিতে হয়।

(খ) শঙ্করের পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাগুলি শঙ্করেরই উদ্ধৃত পূর্ব্বপক্ষের বিস্তার বা বিকৃতি মাত্র—দেখা যায়। এই সকল পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাতৃগণ স্বস্বসম্প্রদায়ের প্রাচীন আচার্য্যের অনুসরণ করিয়াছেন বলিলেও কেহই সেই প্রাচীন আচার্য্যের ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিতে পারে নাই। অতএব ইহাদের ব্যাখ্যার প্রামাণ্য শঙ্করকৃত ব্যাখ্যার প্রামাণ্যের ন্যায় নহে বলিতে হইবে।

(গ) বেদান্তদর্শনখানি উপনিষদের একবাক্যতাসাধক। ইতিহাস, পুরাণ ও স্মৃতির একবাক্যতাপ্রদর্শন—ইহার উদ্দেশ্য নহে। এখন এই উপনিষন্মীমাংসারূপ বেদান্তদর্শনের অর্থ করিতে যাইয়া যিনি উপনিষদকে যত অধিক অবলম্বন করিবেন, তিনি ততই সূত্রকারের অভিপ্রেত অর্থের নিকটবর্ত্তী হইবেন এবং যিনি যত ইতিহাস পুরাণ বা স্মৃতির সাহায্য লইবেন, তিনি তত সেই অভিপ্রেত অর্থ হইতে দূরবর্ত্তী হইবেন—ইহাই সঙ্গত। এতদনুসারে দেখা যায়—শঙ্করাচার্য্য বেদান্তসূত্রব্যাখ্যায় যত উপনিষদের সাহায্য লইয়াছেন, এত আর কোন আচার্য্যই লয়েন নাই। অপর সকল আচার্য্যই ইতিহাস ও পুরাণাদির সাহায্যে সূত্রার্থনির্ণয়ে যত্নবান্ হইয়াছেন। অতএব এই দৃষ্টিতেও শঙ্করকৃত ব্যাখ্যাই অধিক প্রামাণিক হইতেছে।

তাহার পর একটী কথা এই যে, শঙ্করমতে অপর সকল মতের

একটী স্থান আছে। অর্থাৎ উপাসনার জন্য সকল মতই অধিকারি-ভেদে ফলপ্রদ, কেহই নিষ্ফল নহে। সুতরাং উপযোগিতাকে যদি সত্য বলা হয়, তাহা হইলে তাহারা সত্যমত নামেও অভিহিত হইতে পারে। কিন্তু অপর মতে শাঙ্কর মতটী নিতান্ত ভ্রমভিন্ন আর কিছুই বলা হয় না। এজন্য শাঙ্কর মতে বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা হইলে অপর মতের উচ্ছেদ আবশ্যক হয় না। আর তজ্জন্য সেই মতাবলম্বিগণ স্ব স্ব মতে দৃঢ়তাবুদ্ধির জন্য ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া স্বমতের পুষ্টিসাধন করেন, তাহা হইলে শঙ্করমতের অনুরোধে তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বলিবার আবশ্যকতা নাই। এই কারণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সত্য শঙ্করমতেই স্থান পাইতেছে। পরস্পরমত-বিরোধের জন্য যে এমতকেও ভ্রান্ত বলিয়া উপেক্ষা করিতে হইবে—এমন কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না।

(৩) তৃতীয়তঃ, দেখা যাউক—ডাক্তার থিবো সাহেবপ্রবর্ত্তিত মতটী কতদূর যুক্তিসহ। আমাদের মনে হয়, ডাক্তার থিবো সাহেব বেদান্ত-দর্শনের ব্যাখ্যাসম্বন্ধে যে মতটী প্রচার করিয়াছেন, সেটী একটী নিতান্ত উপহাসাস্পদ মত। এটী নিতান্তই অসঙ্গত মত। ইহা কোন বেদ-সবীর সেবা নহে। কারণ, যে উপনিষদের মীমাংসা বেদান্তদর্শন, সেই বেদান্তদর্শনের মত ও উপনিষদের মত বিভিন্ন—ইহা বালকেও কল্পনা করিতে পারে না।

যদি বলা যায়,—বেদান্তদর্শনের রচয়িতা ভুল করিয়া, অর্থাৎ উপনিষদ্ না বুঝিয়া বেদান্তদর্শনে উপনিষদের মতের বিরোধী মতের সমাবেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে বড়ই বিসদৃশ কল্পনা হয়। কারণ, যে বেদব্যাস বেদ বিভাগ করিলেন, তিনি বেদ জানেন নাই—ইহা কে বলিতে যাইবে?

উপনিষদের মত ঠিক্ ঠিক্ প্রকাশ করিলেন—এ কথা বলা আরও অসঙ্গত। বেদব্যাস উপনিষদের মীমাংসা লিখিতে বসিয়া উপনিষদের মত জানিলেন না, বা উপনিষদের মত পরিত্যাগ করিলেন—ইহা নিতান্তই অসঙ্গত কথা। আর যদি বেদব্যাস তাহাই করিয়া থাকেন, এবং শঙ্কর ভাষ্যদ্বারা সূত্রার্থ অন্যথা করিয়া তাহার সংশোধন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে শঙ্কর বেদব্যাসের এই ভুল বুঝিয়া বেদব্যাসেরই ভাষ্য করিতে যাইবেন কেন? নিজেই ত একটী উপনিষদ্-মীমাংসা লিখিতে পারিতেন। কিন্তু শঙ্কর তাহা না করিয়া যখন বেদব্যাসেরই চরণসেবা করিয়াছেন, তখন শঙ্কর জানিতেন যে, বেদব্যাস ভ্রম করেন নাই বা ইচ্ছা করিয়া উপনিষদের মত পরিত্যাগ করেন নাই। অতএব ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর ব্যাখ্যা উপনিষৎসম্মত, আর রামানুজের ব্যাখ্যা সূত্রাক্ষরসম্মত—এ কথা বলা নিতান্ত ভ্রম।

যদি বলা যায়, শঙ্করের জীবনেই আছে যে, বেদব্যাসের সঙ্গে শঙ্করের সাক্ষাৎকারকালে শঙ্কর বেদব্যাসের ভ্রম নিজ ভাষ্যমধ্যে দেখাইতেছেন, এবং ব্যাসই তাহা বলিতেছেন—এরূপ বর্ণনা আছে। সুতরাং ব্যাসমত ও শঙ্করমত পৃথক্ বলিয়া কল্পনা করা অসঙ্গত হইবে কেন? তাহা হইলে বলিব যে, সেই শঙ্করজীবনেই আছে যে, ব্যাসদেব বলিতেছেন—"শঙ্কর! তুমি আমার প্রকৃত আশয় ব্যক্ত করিয়াছ," ইত্যাদি। অতএব উভয়ে একমতই বটে—ইহাই বলিতে হইবে।

সাধারণের জন্য একটা সগুণব্রহ্মবাদও প্রচার করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তাঁহার নিজ মত তাহা নহে। বস্তুতঃ, ব্যাসদেব নিজমতে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে পারেন, কিন্তু উপনিষদের মীমাংসা করিতে বসিয়া যদি উপনিষদের কথা না বলিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার একপক্ষে যেমন অজ্ঞতা প্রকাশ পায়, অন্য পক্ষে তদ্রূপ প্রবঞ্চনা প্রকাশ পায়। কারণ, জানিয়া শুনিয়া অন্যমতপ্রকাশে সত্যগোপনরূপ প্রবঞ্চনা ঘটে, আর না জানিয়া অন্যমতপ্রকাশে অজ্ঞতাই প্রমাণিত হয়। বস্তুতঃ, কোন হিন্দুসন্তানই ব্যাসদেবকে এই দুইটীর কোনটীই বলিতে ইচ্ছা করেন না। যাঁহারা থিবো সাহেবের এই অদ্ভুত কল্পনা অনুমোদন করেন, তাঁহারা না বুঝিয়াই তাহা করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। অতএব ব্রহ্মসূত্রের যে শাঙ্কর ব্যাখ্যা, তাহাই উপনিষদের অর্থ, তাহাই সূত্রেরও অক্ষরার্থ, আর তাহাই ব্যাসেরও অভিমত অর্থ।

যদি বলা হয়—সূত্রাক্ষর হইতে যে অর্থ হয়, তাহা যদি অন্যরূপ হয়, তাহা হইলে ওরূপ কল্পনায় দোষ কি? তাহা হইলে বলিব—বাক্যার্থনির্ণয়ে তাৎপর্য্যজ্ঞানও একটী কারণ, বলা হয়। তাৎপর্য্যানুরোধে অনেকস্থলে স্পষ্টার্থের অন্যথা করা পণ্ডিতগণেরই রীতি। অতএব এ আপত্তিও সমীচীন নহে। এতদ্ব্যতীত শ্রৌতরূঢ়ী অর্থ ও লৌকিকরূঢী অর্থ একরূপ নহে, এবং কালভেদেও শব্দার্থের প্রসিদ্ধ অর্থ অন্যথা হইয়া যায়। সুতরাং আধুনিক ব্যক্তির এই জাতীয় কল্পনা কখনই আদ্রেয় হইতে পারে না।

আর তাহা যদি হয়, তবে সেই শাঙ্কর মতেরই চরম পরিষ্কার অদ্বৈতসিদ্ধি হওয়ায় অদ্বৈতসিদ্ধির আলোচনা একান্ত আবশ্যক।

(৫) জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ।

এখন অবশিষ্ট—জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ। এই মতবাদের অনুসরণে অনেকেই বলিয়া থাকেন—জ্ঞান আপনা আপনি প্রকাশিত হয়।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ইহা স্বতঃই প্রকাশিত হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতেও হইবে। সুতরাং সৎপথে থাকিয়া সৎচর্চা, এবং 'একজন ঈশ্বর আছেন'—এই মাত্র জ্ঞানে ঈশ্বরশরণ গ্রহণ করাই আবশ্যক। বেদাদি শাস্ত্রই একমাত্র সত্যের ভাণ্ডার, আর তাহার শরণ গ্রহণ করিতে হইবে—এমন কোন কথা নাই।

বলা বাহুল্য—এরূপ মতবাদীর নিকট এই অদ্বৈতসিদ্ধির উপযোগিতা বিশেষ নাই। কারণ, তাঁহাদের মতে জ্ঞান আপনা আপনিই প্রকাশিত হয়।

কিন্তু আমরা দেখিতে পাই—এইরূপ মতবাদটী সত্য নহে। কারণ, জ্ঞান স্বপ্রকাশ হইলেও বেদোক্ত জ্ঞানের উৎপত্তি জীবহৃদয়ে কখনই স্বতঃ হয় না। উহাও বর্ণাত্মক ভাষার ন্যায় শিক্ষিত বিষয়। ইহার কারণ, বেদের কর্ম্মকাণ্ড শিক্ষা না পাইলে তাহা যেমন জানা যায় না, তদ্রূপ উপাসনাকাণ্ডের জ্ঞানও শিক্ষা ব্যতীত সম্ভবপর হয় না। আর জ্ঞানকাণ্ডের অসঙ্গ, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিশেষ, অদ্বৈত ব্রহ্মের জ্ঞানও কেহ না বলিয়া দিলে কল্পনাতেও আনা যায় না। যেমন, "আমি আছি কি না" সন্দেহ করিয়া সাধারণ লোকে কোন কিছুই করে না—তদ্রূপ এই অসঙ্গ ব্রহ্মের সম্ভাবনার কথাও মানবমনে আপনা আপনি উদিত হয় না। যেহেতু, অসঙ্গ ব্রহ্ম প্রমাণ বা যুক্তির অতীত বিষয়। তবে বেদ বলিয়া দিলে যুক্তির দ্বারা ইহাই সম্ভাবনা প্রদর্শন করা যায়, এবং অসম্ভাবনা নিবারণমাত্র করা যায়। অতএব জ্ঞান স্বপ্রকাশ বলিয়া স্বতঃই উদিত হয়—এ কথা ঠিক্ নহে। জীবের স্বাভাবিক আহারাদির জ্ঞান স্বতঃই উদিত হয় বটে, কিন্তু বেদোক্ত বিষয়ের জ্ঞান স্বতঃ উদয় হয়—বলা যায় না। যেমন ধ্বন্যাত্মক বা ইঙ্গিতের ভাষা জীবের স্বতঃই উদয় হয়, কিন্তু বর্ণাত্মক ভাষার জ্ঞান স্বতঃই উদিত হয় না—ইহাও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে।

অনেকে বলেন—অদ্বৈত ব্রহ্মের জ্ঞান যখন অবেদসেবী ইয়োরোপবাসীর হৃদয়ে উদিত হইতে দেখা যায়, তখন উহা আপনা আপনি প্রকাশিত হইবে না কেন? কিন্তু একথাও ঠিক্ নহে। কারণ, জানা গিয়াছে, অতীতকালে অনেক সময়ে ইয়োরোপবাসী বেদসেবী ভারতবাসীর সম্পর্কে আসিয়া তাহা পাইয়াছিলেন, আর তাহাই সময়ে সময়ে ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। ভারতীয় বৌদ্ধগণ ইয়োরোপে প্রচারার্থ গিয়াছিলেন, ইহা ইতালির ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয়। এই বৌদ্ধগণও বেদজ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন। স্বয়ং যিশুখৃষ্ট পূর্ব্বদেশে আসিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, ইহাও শ্রুত হওয়া যায়। কাশ্মীরে এখনও যিশুখৃষ্টের অবস্থান স্থান প্রদর্শিত হয়। "ইসাই মলম" নামক একটী ঔষধি সে দেশে এখনও প্রচলিত আছে, ইহার দ্বারা যিশুখৃষ্টের ক্রুশের ক্ষত আরোগ্য হয় বলিয়া "ইসাই মলম" ইহার নাম হইয়াছে—এরূপও প্রবাদ আছে। মহামতি ক্যাণ্টের জীবদ্দশাতেই উপনিষদ্ আরবি ভাষা হইতে ল্যাটিনে অনুদিত হইয়াছিল। এরিষ্টটল ভারতে আসিবার পর ন্যায়শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার পদার্থবিভাগও বৈশেষিকের পদার্থবিভাগ অনেকটা একরূপ। এইরূপ বহু প্রমাণই আছে, যে ভারতের জ্ঞানভাণ্ডারই পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞানভাণ্ডারের বীজ। অতএব বেদোক্ত জ্ঞান সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসম্বন্ধে বেদনিরপেক্ষরূপে প্রকাশিত হইতে পারে না।

যদি বলা যায়—বৌদ্ধগণ বেদ না মানিয়াও, না জানিয়াও অদ্বৈততত্ত্ব যুক্তির দ্বারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সুতরাং অদ্বৈতজ্ঞান স্বতঃ উৎপন্ন হইবে না কেন? এ কথাও কিন্তু সঙ্গত নহে; কারণ, বৌদ্ধদর্শনের আবির্ভাব ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধ হইবার পর হয়। আর বুদ্ধও স্বয়ং বেদজ্ঞ ছিলেন, ইহা বৌদ্ধগণও স্বীকার করেন। অতএব বৌদ্ধগণের অদ্বৈতত্ত্বাবিষ্কার বেদনিরপেক্ষ আবিষ্কার নহে।

পক্ষান্তরে বেদ হইতে অদ্বৈতের জ্ঞানলাভ করিয়া বেদনিরপেক্ষ অদ্বৈতস্থাপনে প্রয়াসী হওয়ায় তাঁহাদের শূন্য অসদ্রূপই হইয়াছে, অথবা সদসদ্‌ভিন্নরূপই হইয়াছে, সচ্চিদানন্দরূপ হইতে পারে নাই। অতএব বেদজ্ঞান স্বতঃ প্রকাশ হয় না।

যদি বলা যায়—দর্পণ পরিষ্কৃত করিলে প্রতিবিম্ব আপনা আপনিই পতিত হয়। সুতরাং চিত্তশুদ্ধ হইলে ব্রহ্মজ্ঞান স্বতঃই উদিত হইবে। কিন্তু একথাও সঙ্গত নহে। কারণ, মলিন দর্পন বিম্বমুখী থাকিলে এবং পরে সেই দর্পণ পরিষ্কৃত হইলে, তবে সেই প্রতিবিম্ব পড়ে, নচেৎ নহে। তদ্রূপ অদ্বৈতব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞান থাকিলে চিত্তশুদ্ধ হইলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়, নচেৎ নহে। অতএব বেদোক্ত জ্ঞান স্বতঃ উৎপন্ন হয় না।

যদি বলা যায়—চঞ্চল জলে যেমন প্রতিবিম্ব পড়ে না, কিন্তু স্থিরজলেই প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তদ্রূপ চিত্তবৃত্তিনিরোধ করিতে পারিলে জ্ঞান আপনা আপনি উদয় হয়, শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা নাই। তাহা হইলে বলিব—এস্থলেও বিম্বাভিমুখতা প্রয়োজন হয়। আর তজ্জন্য অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান বা কর্মকাণ্ডের জ্ঞান আপনা আপনি প্রকাশিত হয় না।